ভারতের চিত্রকলা

লেখকের অন্যান্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস রিপোর্ট (১৯৫১) ৮ খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের হ্যাণ্ডবুক (পরিবর্ধিত গেজেটিয়ার) :
বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার

ফেয়ার্স অ্যাণ্ড ফেস্টিভ্যাল্‌স্‌ অভ ওয়েস্ট বেঙ্গল

দা ট্রাইব্‌স্‌ অ্যাণ্ড কাস্ট্‌স্‌ অভ ওয়েস্ট বেঙ্গল

অ্যান একাউন্ট অভ ল্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল

পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা

আনন্দর সংসার

সম্পাদনা

আমার দেশ

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড্‌স্‌ নিউ সিরিজ :
বীরভূম, বর্ধমান

দা ফোক ডান্সেজ অভ বেঙ্গল

ইণ্ডিয়াজ ভিলেজেস

ভারতের চিত্রকলা

অশোক মিত্র

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স : স্বাক্ষর

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বাক্ষর প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায় প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৩

প্রচ্ছদপট : শ্রীখালেদ চৌধুরী

মুদ্রণ
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

বাঁধাই
ওরিএণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

ব্লক
শ্রীহীরালাল সেন
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং

আর্টপ্লেট ও কভার মুদ্রণ
ভারত ফোটো টাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য ১৫৲ টাকা

আমার মায়ের স্মৃতিতে

ভূমিকা

১৯২৭ সালে পার্সি ব্রাউনের ইণ্ডিয়ান পেন্টিংএর পর ইংরেজি বা বাংলায় ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস আর বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। আশা করি বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়াস হিসাবে বইটি সহৃদয় পাঠকের কাছে নানা ত্রুটি বিচ্যুতির মার্জনা পাবে।

সর্বপ্রথমে আমার বন্ধু ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করি। তিনি বিশেষভাবে লেগে থেকে উৎসাহ না দিলে বইটি আদৌ হাতে নেওয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। যে সমস্ত বই এবং প্রবন্ধের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী তার সংক্ষিপ্ত তালিকা বইয়ের শেষে দিয়েছি। এই সুযোগে অজন্তার রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে শ্রীমতী জান ওবোয়ের একটি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ বইয়ের একটি অংশে শুধু যে আমি তার অনুবাদ দিয়েছি তা নয়, তাঁর লেখাটি এতই সার্থক যে ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে অত মূল্যবান একক প্রবন্ধ দুর্লভ। ভারতের নানাস্থানে যতগুলি সাধারণগম্য চিত্রশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি তাদের কর্তৃপক্ষদের কাছেও আমি এই উপলক্ষে আমার ধন্যবাদ জানাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট প্রাচীন ও আধুনিক ছবি এখন ভারতের বাইরে, সেগুলি দেখার সুযোগ আগে সামান্য যা হয়েছে তা এই বই লেখার কাজে আসেনি, অতএব ছাপা এ্যালবাম দেখেই সাধ মেটাতে হয়েছে। বলা বাহুল্য বড় বড় সংগ্রহের খুব কম ছবিই ছাপা হয়, আর বিশেষ করে ভারতীয় ছবির উৎকৃষ্ট ছাপা নকল খুব কমই আছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ দেখার যে আবেগ ও প্রত্যয় লেখায় আসা সম্ভব তা বইয়ের অনেক জায়গায় আসেনি।

আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় অনেকগুলি অধ্যায় সযত্নে পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন, যদিও যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য আমিই দায়ী। তাঁর কাছে আমার ঋণস্বীকারের প্রয়াসও ধৃষ্টতা মাত্র, আমার সামান্য উদ্যমকে তিনি দুর্মূল্য মর্যাদা দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, বস্তুত আধুনিক শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি আমাকে যত তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী আভা মিত্র আদ্যোপান্ত পাণ্ডুলিপি নকল করে দিয়েছেন ও শ্রীযুক্ত সমর সেন কিছু কিছু অংশ পড়ে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে দিয়েছেন।

আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি ব্লকের ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন; তাঁকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের ছবি ছাপাতে পেরে বইটি বিশেষ মর্যাদালাভ করেছে। অন্যান্য ছবির জন্য যাঁদের কাছে বইটি ঋণী তাঁদের উল্লেখ যথাস্থানে করেছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বি-এস কেশবন ও পশ্চিমবঙ্গ দপ্তরের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার চক্রবর্তী ও তাঁদের সহকর্মীরা অনুগ্রহ না করলে আমার পক্ষে অনেকগুলি বই বারবার করে দেখা অসম্ভব হত। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির কিছু কিছু অংশ সাহিত্যপত্র, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, পরিক্রমা, তরুণের স্বপ্ন, চতুরঙ্গ ও অগ্রণীতে প্রথম বেরোয়, পত্রিকাগুলির সম্পাদক মণ্ডলীকে এই সুযোগে আমার ধন্যবাদ জানাই। ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ বিশেষ ধৈর্য ও যত্ন সহকারে বইটি ছেপেছেন, তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ, ইতি।

কলকাতা, ৩০শে জুলাই ১৯৫৬

অশোক মিত্র

সূচী

(সংখ্যা দিয়ে পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে)

চিত্রসূচী

ক—রেখাচিত্র

পৃষ্ঠা

খ—হাফটোন চিত্র

পৃষ্ঠা

১৬৫ জয়পুর প্রাসাদের দেয়াল চিত্র, সতেরো শতক
(আনন্দ কুমারস্বামীর রাজপুত পেন্টিংএর সৌজন্যে)

১৬৬ ঝিলম নদীর উপর নৌকাসেতুতে হাতীর পিঠে আকবরের যুদ্ধ। আকবর-নামা হইতে : বসাওআন ও ছতরের কাজ।
(ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার সৌজন্যে)

১৬৭ আকবরনামা (অনুমান ১৬০২) রাজপুত্র সলীমের জন্মসংবাদ (কেশুর রেখা, ছতরের রঙ)
(ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার সৌজন্যে)

১৬৮ যুধিষ্ঠিরের নরকে অবরোহণ : চিত্রকর মুকুন্দ (জয়পুর রজমনামা) ষোল শতক : প্রদর্শনী ১৮৮৬।
(জার্নাল অভ ইণ্ডিয়ান আর্টের সৌজন্যে)

১৬৯ ষাঁড়ের এক্কা (চিত্রকর আবুল হাসান নাদিরুজ্জমান। নামসহি : রকিম আবুল হাসান)
(এন-সি মেহতার স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান পেন্টিংএর সৌজন্যে)

১৭০ যুবরাজ সলীম হিসাবে জাহাঙ্গীর (দারা শিকো অ্যালবামের ১৮নং ফোলিও)
(ভি-এ স্মিথের ফাইন আর্ট ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোনের সৌজন্যে)

১৭১ প্রাণীহত্যা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের ফর্মান সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিপত্র (সতেরো শতক)
(হীরানন্দ শাস্ত্রীর এনশেণ্ট বিজ্ঞপ্তিপত্রজের সৌজন্যে).

১৭২ শা দৌলতের প্রতিকৃতি (চিত্রকর বিচিত্র)
(চেস্টার বিয়াটি সংগ্রহের সৌজন্যে)

১৭৩ রাত্রে পথিকদের আগুন পোহান
(ই-বি হ্যাভেলের ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিংএর সৌজন্যে)

১৭৪ গাছতলায় বিশ্রামরত ফকীরের দল (অনুমান ১৬৫০ খৃঃ)
(ব্যারন মরিস রথ্‌স্‌চাইল্ডের সংগ্রহের সৌজন্যে)

১৭৫ রাজান্তঃপুরের দৃশ্য : কাপড়ের উপর আঁকা, চারপাশের পাড় ছাপা (অনুমান ১৬১৫-৪০)
(নিউ ইয়র্কের মেট্রপলিটান মিউজিয়ম ও আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে)

১৭৬ ধনশ্রী রাগিনী (অনুমান ১৫৭০) (ব্যাজল গ্রের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্সের সৌজন্যে)

১৭৭ কৃষ্ণলীলা : দানলীলা (রাজপুত, অনুমান ১৫৮০) ভাগবত পুরাণ পুঁথিচিত্র (এইচ গোয়েট্‌সের দি আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিটেকচার অভ্‌ বিকানীর স্টেটের সৌজন্যে)

১৭৮ রসিকপ্রিয়া পুঁথিচিত্র, মালোয়া, মধ্য ভারত (সতেরো শতকের তৃতীয়াংশ) (স্টেলা ক্রামরিশের আর্ট অভ ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে)
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা : ভাগবত পুরাণ পুঁথিচিত্র, মারোয়াড় (যোধপুর), সতেরো শতকের মাঝামাঝি (তুলারাম সংগ্রহের সৌজন্যে)

১৭৯ খণ্ডিতা নায়িকা : মধুমালতী পুঁথিচিত্র, রাজস্থানী, অনুমান আঠারো শতক (আশুতোষ মিউজিয়ম ও আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে)

গ—রঙীন চিত্র

প্রস্তাব

১৯১১ সালে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক রজার ফ্রাই প্রাচ্যদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে এই মন্তব্যটি করেন :

গত বিশ বছরে যে সব বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে, পাশ্চাত্য চারুকলার উপর তার ফল কি রকম দাঁড়াবে ? ফল যে প্রায় সবটাই নিতান্ত শুভ হবে এ বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। একবার যদি বিদগ্ধ-সমাজ প্রাচ্য চারুকলার শ্রেষ্ঠ কীর্তির সংযম, উপকরণের মিতব্যয়, তাদের অনির্বচনীয়, চরম গুণে অভ্যস্ত হন, তাহলে আশা করা যায় তাঁরা আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলার অধিকাংশ কাজের দিকে আর ফিরেও তাকাতে চাইবেন না। তখন তাহলে বোধহয় আমাদের শিল্পীদের নতুন এক বিবেক চেতনা হবে, তাঁরা তখন নিছক চোখে-যেমনটি-দেখছি তেমনটি নিখুঁত করে আঁকার জবরজঙ্গ যন্ত্রপাতি সব ফেলে দেবেন, তারপর শুধু বিশ্বপ্রকৃতির মূল সত্তাটুকু রূপায়িত করার দিকে মন দেবেন। এইভাবে চিত্রকলাকে পরিশুদ্ধ করে, যে সব লক্ষণ গৌণ, যাদের সাক্ষাৎ তন্ময় প্রকাশ শক্তি নেই, তাদের থেকে মুক্ত হয়ে, পাশ্চাত্য শিল্পীরা আবার নিজেদের পুরনো বহুবিস্মৃত ঐতিহ্যে ফিরে যাবেন মাত্র। আমাদের কাছে প্রাচ্য চিত্রকলার সবচেয়ে বেশী ব্যবহারিক মূল্য হচ্ছে এই যে প্রতিচ্ছবি বা ভেরিসিমিলিটিউডের মৃগতৃষ্ণার পিছনে ঘুরে যে সব মূল সূত্র আমরা চাপা দিয়েছি, প্রাচ্যের শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে ঠিক সেইগুলিকেই অনেক বেশী একাগ্রমনে তুলে ধরেছেন।

বীজ থেকে অঙ্কুর, তার থেকে ছোট চারা যেমন কালক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, ইওরোপীয় চিত্রকলাও সেরকম বহু শতাব্দী ধরে ক্রমবিবর্তনের পথে অবিচ্ছিন্ন পরিণতি লাভ করেছে, বিকশিত হয়েছে। অন্যপক্ষে প্রাচ্য বা ভারতীয় চিত্রকলা যেহেতু কতগুলি মূল সূত্র বারবার নানাভাবে

সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, সেহেতু তার ইতিহাস কতকটা মানুষের কুলপঞ্জীর সঙ্গে তুলনীয়। মনে হয়, একই বংশ যেন নানা স্থানে ছড়িয়ে গেছে, ঠিক একটানা বিবর্তনের প্রশ্ন সেখানে আসে না। সেই হিসাবে ভারতের বিভিন্ন দেশকালের চিত্রকলার বিচিত্র রীতি, নীতি, অন্বিষ্টের একটানা বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে যেমন কিছুটা নিরর্থক, অন্যদিকে ভারতের চিত্রকলায় একটি স্পষ্ট ঐতিহাসিক ধারা যে আছে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতি যুগে, প্রতি রীতিতে চিত্রকলার মূল সূত্রগুলি কিভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তাদের প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং মহিমাই বা কি, সংক্ষেপে সে সব কথা বলার উদ্দেশ্যে এই ছোট বইটি লেখা। লেখকের ব্যক্তিগত রুচি বা ভাললাগা-মন্দলাগা যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা হয়েছে। রজার ফ্রাইয়ের মতে পশ্চিমের মন আজ যেমন প্রাচ্যের দিকে ছুটেছে, প্রাচ্য মনও আজ পশ্চিমের অনুমোদন না পেলে তৃপ্ত হয় না। ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে আজ চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে পাশ্চাত্য সতীর্থের কাছে তাঁকে আজ শিখতেই হবে। কি করে এক টুকরো স্পেস বা জমিকে বিজ্ঞানী চোখে দেখে, বিশ্লেষণ করে, তারপর সংশ্লেষণ করতে হবে, সে অনুসন্ধানের আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। ছবির জমি বা সারফেস, রঙ, রেখা, খোলের বুনন বা টেক্সচার, মাত্রা বা ডিমেন্‌সন ইত্যাদি বহু বিষয়ে আজ ভারতীয় শিল্পী বিনয়নম্রচিত্তে ইওরোপীয় শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশী করতে বাধ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের দেশের চিত্রকলার ঐতিহ্যও তাঁর ভুললে চলবে না। সে ঐতিহ্য সুমহান। কালো ও সাদা নিয়ে চূড়ান্ত কাজ প্রাচ্য চিত্রেই হয়েছে। স্থাপত্য এবং জ্যামিতি নিয়ে চূড়ান্ত কাজও হয়েছে এই প্রাচ্য চিত্রে। স্থাপত্য, গাছপালা, ফুলপত্রফল, মানুষের শরীর, সমস্ত কিছু একই ছবিতে অখণ্ডভাবে, এক সমগ্র, সর্বাশ্রয়ী চিত্রডিজাইনের মধ্যে গাঁথার কাজও প্রাচ্যে যতখানি হয়েছে, ইওরোপে ঠিক ততখানি নিশ্চয় হয়নি। তাছাড়া সাজন, অলঙ্কার বা ডেকরেটিভ চিত্র এবং রঙের অপূর্ব বিন্যাসের যে চূড়ান্ত কাজ ভারতীয় চিত্রে হয়েছে তার সমকক্ষ অন্যত্র সত্যই দুর্লভ। তাই ভারতীয় চিত্রঐতিহ্য ভারতীয় শিল্পীর অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আরও গর্বের বিষয় এই যে যে-লোকচিত্র ইওরোপে আজ লুপ্ত বললেই হয়, যার অভাবে শিকড় আটকাবার মাটি না পেয়ে আজ ইওরোপীয় শিল্পী প্রায়ই দিশাহারা হন, সেই লোকচিত্র ভারতে এখনও দৈনন্দিন ব্যবহারের সমস্ত সামগ্রীতে বর্তমান ; যার থেকে প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পী বারংবার বিচিত্র শক্তি আহরণ করতে পারেন।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিল্পসৃষ্টির মূলে ছিল ধর্মভাব ও ধর্মবিশ্বাস। যা কিছু সৃষ্টি হত অধিকাংশই ধর্মের উদ্দেশে উৎসর্গ হত। অবশ্য একান্ত লোকায়ত শিল্পও যে যথেষ্ট ছিল তা আমরা অনেক সময়ে মনে রাখি না। অধিকাংশ মহান সৃষ্টির মূলে থাকে এক মহান আদর্শ, শুদ্ধ ভাব, তীব্র ভক্তি ও আরাধনা ; যা না থাকলে শিল্পীর মনে পবিত্রতা, তন্ময়তা, একাগ্রতা আসা শক্ত। পবিত্র, শুদ্ধ, চেতনা ব্যতীত কোন সৃষ্টি ষড়ঙ্গের রসোত্তীর্ণ হয় না। কিন্তু এই ধর্মহীন, তামস যুগে আমরা

পবিত্র, শুদ্ধ চেতনাকে প্রচলিত হিন্দু অধ্যাত্মবাদের সামিল করি। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত মহাধার্মিক কি করে পতিতা নারীর জন্য অশ্রুপাত করে তাকে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন, তা আজও আমরা বুঝতে অপারগ।

ফল হয়েছে এই যে বৌদ্ধবাদ, অধ্যাত্মবাদ, বা বেদান্তবাদের ধূসর কাঁচের মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না আমরা ভারতশিল্প দেখি ততক্ষণ স্বস্তিবোধ করি না। এমন কি যেখানে জীবন সম্বন্ধে আনন্দ, উল্লাস নিরতিশয় স্পষ্ট, যেখানে শিল্পীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করার কোন কারণ নেই, সেখানেও আমরা জোর করে গভীর ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের পরাকাষ্ঠা দেখি। ভারতশিল্পে গভীর ধর্মভাব প্রণোদিত অনেক সৃষ্টি আছে যার জুড়ি পৃথিবীর অন্যত্র মেলা দুঃসাধ্য। কিন্তু তবুও একথা মানতেই হবে যে ভারতীয় শিল্পী তাঁর শিল্পে চারপাশের জীবনের পরিপূর্ণতা ফুটিয়ে তোলার জন্যই যেন বেশী ব্যস্ত ছিলেন ; পরলোকের চেয়ে ইহলোকই যেন বেশী ভালবাসতেন ; ভালবাসতেন গ্রাম ও শহর ; অরণ্যের নির্জনতা নয়, বরং তার পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ। এসবের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ডভাবে প্রথম দেখি ভারুত, সাঁচি, বা অমরাবতীতে ; তারপরে অজন্তার মৃদু আদর্শবাদের আবরণে ; শেষে মধ্যযুগে, সারা দেশময় অজস্র মন্দিরগাত্রের চিত্রভাস্কর্যের প্রাণের তূর্যনিনাদে।

ঠিক যে সময়ে, অর্থাৎ মধ্যযুগে, ইওরোপ ধর্মভাব নিয়ে মেতে রইল, ঈশ্বরের চিন্তা আরাধনাকে রূপ দিল তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর, সুউচ্চ গথিক স্পায়ারে, তীক্ষ্ণ কোণকরা খিলানে ; তাদের ভাস্কর্যে খ্রীষ্ট, অবতার, সাধুসন্তদের মূর্তি হল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, সর্বাঙ্গ রইল বসনে ঢাকা যাতে বাসনার অবকাশ না থাকে ; দেহ হল তপস্যায় উজ্জ্বল, শান্ত, কিন্তু শীর্ণ, কঠোর, এমন কি স্মিতভাববর্জিত ; যখন ইওরোপ বেশ কয়েক শতক ধরে ইহলোকের কামনা বাসনা, ভোগলিপ্সা থেকে মুখ ফিরিয়ে, শিল্পে ভগবানের আরাধনায় মন দিল ; ঠিক সে সময়ে ভারতীয় শিল্পের প্রতিটি অঙ্গে এল প্রাণের বিচিত্র, দুর্বার জোয়ার, যা শতভাবে শতধারায় মহা উল্লাসে চারিদিকে ফেটে পড়ল। মন্দির চাইল না লম্বিত হয়ে আকাশ ভেদ করে শূন্যে আরোহণ করতে, সে রইল নিজের ওজন ও অস্তিত্ব নিয়ে মাটির উপরে বসে। মন্দির খুব উঁচু হল না, বরং তার গড়ন হল কতকটা দোহারা, বলিষ্ঠ, এমন কি বেঁটেও বলা যায়। দেবতারা হলেন অল্পবয়স্ক, সুপুরুষ, তাঁদের শরীর নধর, সুপুষ্ট, এমন কি খানিকটা মেয়েলি। দুঃখবাদের চেয়ে সুখবাদই বেশী প্রশ্রয় পেল। নটরাজ ছাড়া সব মূর্তিই রইল মাটিতে ভাল করে বসে বা দাঁড়িয়ে। স্বল্পবসন বা নগ্ন নারীদেহ বারবার ঘুরে ফিরে এল সাজন হিসাবে, এবং সে দেহও হল সর্বদা পূর্ণ, ফুল্লবিকশিত।

তা ছাড়া ভারতশিল্পের আরেকটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। ইওরোপ শীতের দেশ, কিছুটা রুক্ষ ; সেখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সর্বদা চলে লড়াই, সব সময়ে চলে প্রকৃতিকে পরাজয় করার চেষ্টা। ফলে ইওরোপীয় শিল্পের চেষ্টাও হয় প্রকৃতির মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিক্ষেপ করে ঘোষণা করতে ;

তাই আকাশ ফুঁড়ে ওঠে তীক্ষ্ণ, ছুঁচের মত স্পায়ার ; গড়ন হয় অপ্রাকৃত, তীর্যক। ভারতীয় জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই যত না আছে, তত আছে প্রকৃতিকে অকুণ্ঠ গ্রহণ, যার ফলে নিসর্গ ও মানুষ ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, অন্যোন্যনির্ভর হয়। ফলে, ভারতশিল্পে নিসর্গ, প্রকৃতি, গাছপালা, ফুলফল, পশুপক্ষী, মানুষ সবই একত্রে এক সুডৌল সার্বিক ডিজাইনে পড়তে অসুবিধা হয় কম।

কঠোর তপশ্চর্যায় বিশীর্ণ, শুষ্ক, বৈরাগ্যসন্ন্যাসের কথা আমাদের দেশের সাহিত্যে যথেষ্ট থাকলেও, ভাস্কর্য ও চিত্রে সন্ন্যাসীরা হলেন গোলগাল, প্রফুল্ল। এ বিষয়ে ইওরোপ আর ভারতবর্ষ ঠিক যেন উল্‌টো। ইওরোপের ভাস্কর্যে সাধুসন্তরা হলেন গম্ভীর, কঠোর, দীর্ঘদেহ, বিশুষ্ক, আপাদমস্তক আলখাল্লায় আবৃত, অথচ সাহিত্যে দেখা দিলেন তাঁরা নধর, প্রায়লম্পট বেশে। তার কারণ ইওরোপে স্থাপত্য ভাস্কর্য করলেন ব্রহ্মচর্যাবলম্বী চার্চ, সাহিত্য সৃষ্টি করলেন জীবনাসক্ত বোকাচ্চো, চসারের সন্ততিরা। আর ভারতবর্ষে পুঁথি ও শাস্ত্র লিখলেন কঠোর তপশ্চর্যারত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ, শিল্পসৃষ্টি করলেন সংসারাশ্রমের পার্থিব মানুষ, রাজা ও প্রজা। ভারতশিল্পে দেবদেবী, সাধুসন্তরা বরাবরই যেন মাটির টান ঠেলতে পারেন না, যেন ইচ্ছাও তেমন নেই। তপশ্চর্যার মধ্যেও সর্বত্র দেখা যায় পার্থিব বাসনা। শিল্পশাস্ত্রের কঠোর আইনকানুনের ফাঁকে শিল্পী ঢুকিয়ে দিতেন এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে সুতীব্র আবেগ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি দুর্মর টান, পৃথিবীর সর্ববিধ প্রাণ সম্বন্ধে প্রগাঢ় মমতা।

এই সামান্য বইয়ে যদি এসব সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিতও দিয়ে থাকতে পারি তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।
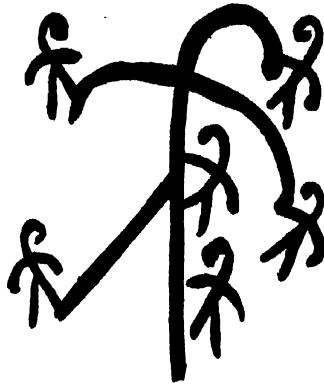
প্রথম অধ্যায়

ভারত চিত্রকলার আদিকাণ্ড

আমাদের দেশে ইচ্ছামত ছবি দেখতে পাওয়া মুস্কিল। মূল ছবি অধিকাংশই বিদেশে, যেটুকু এদেশে আছে তা নানাস্থানে রাজরাজড়া ও ধনীলোকের সংগ্রহে ছড়িয়ে আছে। একমাত্র সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে গুহার ছবি যেগুলি স্থানান্তর করা যায় না। সুতরাং ইচ্ছামত ছবি দেখা যায় না। কোন গ্রন্থাগারেও দেশবিদেশের ছবি সম্বন্ধে পুরোপুরি সংগ্রহ নেই, ছবি বুঝতে গেলে যে ধরণের ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে বই থাকা দরকার তাও নেই। ফলে চিত্রকলার ছাত্রকে প্রায়ই দিশাহারা হতে হয়।

ছবি সম্বন্ধে জানতে গেলে, বুঝতে গেলে ছবি দেখা দরকার। কারও আঁকা একটি ছবি আবার একক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সে ছবি সেই শিল্পীর অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে মাত্র একটি। সুতরাং তাঁর অন্যান্য কাজ না দেখলে একটি ছবি থেকে তাঁর সম্বন্ধে আন্দাজ করতে যাওয়া ভুল। সেই শিল্পী আবার কোন একটি বিশেষ দেশে, একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করেছেন। সুতরাং শুধু সেইটুকু দেশ, সেইটুকু কাল, সেইটুকু পরিবেশের মধ্যে সেই শিল্পীকে বুঝতে যাওয়াও ভুল। সেই দেশের, সেই কালের, সেই পরিবেশের পূর্বাপর আছে। সুতরাং সেই পূর্বাপর বুঝতে গেলে অন্য অনেক দেশের অনেক যুগের অনেক শিল্পীর কাজ জানা ও বোঝা প্রয়োজন। শুধু একটি শিল্প সম্বন্ধে চর্চা করলেও কিছু হয় না, আনুষঙ্গিক সমস্ত ধরণের শিল্পকলার চর্চার প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে নানাদেশের ইতিহাসের, বিজ্ঞানের।

এর কারণ জগজ্জয়ী প্রতিভাও স্বয়ম্ভু নয়। সেও অনেক কিছুর সাহায্যে বেড়ে ওঠে। বিশেষ করে শিল্পজগতে দেশকালের ব্যবধান নেই, একদেশের শিল্পী অন্যদেশের, অন্যকালের শিল্পীর কাছে অনবরত ধার করতে, শিখতে বাধ্য ; সে সব শিখে, অধিকার করে, তিনি মৌলিক সৃষ্টি করে ঋণশোধ করেন। উপরন্তু তাঁর পক্ষে সবার উপরে প্রয়োজন হয় একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ যুগে,

বিশেষ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তার জন্যে দরকার হয় অন্য দেশ, অন্য যুগ, অন্য সময় সম্বন্ধে জ্ঞান।

তা ছাড়া, কোন একটি ভাষা যেমন কোন জাতির সাধারণ সম্পত্তি হওয়া সত্বেও, তা শুনতে ভাল লাগে না, তার চরিত্র প্রকাশ পায় না, যতক্ষণ না সে ভাষা কোন বিশেষ ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ভঙ্গী ও কথার টানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি, শিল্পকলা বা চিত্রের ভাষা বিশ্বজনীন হলেও যতক্ষণ না দেশকাল পাত্রভেদে তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত, রাষ্ট্রগত, সমাজগত লক্ষণ, ভঙ্গী ও রীতির নিজস্ব চরিত্র প্রকাশ পায়, ততক্ষণ তার মহিমা পূর্ণ হয় না।
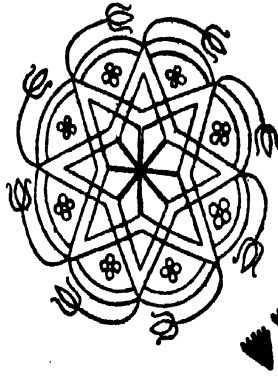
ইতিহাসের আগের যুগ : সবচেয়ে পুরনো ছবি

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে আঁকা। সে যেমন আঁকাই হোক। এ স্বভাব যেমন খুব অল্পবয়সেই দেখা দেয়, তেমন অনেক যুগ আগে মানুষের ইতিহাসের শৈশবেও নিশ্চয় এ স্বভাব ছিল। এ স্বভাব কেন ছিল, কিসের তাগিদে মানুষ তখন আঁকত তার সম্বন্ধে নানা গবেষণা নানা পণ্ডিত করেছেন, সে সব আলোচনায় নাই গেলুম, তবু কথা থেকে যায় যে বহু হাজার বছর আগে যখন আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বীরভূম, বাঁকুড়া পাহাড়প্রমাণ বরফের নীচে চাপা ছিল, তারও আগে, মানুষ যখন কাঁচা মাংস খেত, আগুন জ্বালাতে শিখেছে কি শেখেনি, তখনও মানুষ গুহায় থেকে গুহার দেয়ালে কষ্ট করে ছবি আঁকত। কি তাগিদে ছবি আঁকত কে জানে, কিন্তু আঁকত। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, সে ছবির মধ্যে এমন সব ছবিগত গুণ আছে, যা আজকালকার জ্ঞানী গুণী, পণ্ডিত শিল্পীরাও অবজ্ঞা করতে ত পারেনই না, বরং তার সরলরেখা, ঋজুতা, বলিষ্ঠতা, আবেগ নিজের ছবিতে আনতে পারলে ধন্য বোধ করেন।
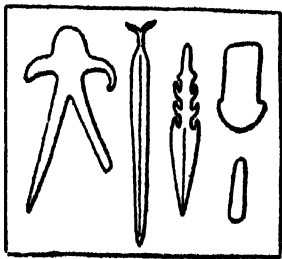
প্রথম শুনলে অবাক হতে হয় যে, সারা ভারতে অন্তত সাতশ ছোটবড় জায়গা আছে যেখানে কোথাও হয়ত একটা, প্রায়ই তার বেশি, কোথাও কোথাও একত্রে পঁচিশ ত্রিশ বা তার বেশি গুহা আছে যেখানে পুরাকালে মানুষ বাস করত, সেই যুগে যাকে প্রত্নতাত্বিকরা বলেন পাথরের যুগ বা অরিগনেসন যুগ। তার বহু

পরে, বহু হাজার বছর পরে এল আমাদের হাল আমলের ইতিহাসের যুগ, যার বয়স মাত্র তিন চার হাজার বছরের বেশি নয়। এই যুগেও মাত্র কয়েক শ' বছর আগে পর্যন্ত মানুষ দল বেঁধে গুহায় থাকত। এখনও অনেক জায়গায় থাকে।

আমাদের দেশে ইতিহাস শুরু হবার হাজার হাজার বছরের আগেকার গুহাচিত্র খুব কমই আছে। তারই দু'একটার কথা দিয়ে শুরু করা যাক। যেটুকু আছে তা কম মূল্যবান নয়, স্পেনের

আলতামিরা গুহা ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দেয়। আর আশ্চর্য মিল আছে স্পেনের কোগুল বা আলতামিরা বা অরিগনেসন গুহার ছবির সঙ্গে আমাদের দেশের গুহাচিত্রের। ভারতের ঠিক মাঝখানে কাইমুর রেঞ্জ ব'লে এক পাহাড়ের মালা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি গুহায় শিকারের ছবি কিছু কিছু এখনও অস্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি গুহাচিত্র হিসেবে খুব ভাল বলা যায় না কিন্তু বোধহয় পাথর যুগেরও আগেকার ছবি।

মির্জাপুরের কাছে বিন্ধ্যপর্বতমালার মধ্যে কিছু গুহা আছে তাতে পাথরযুগের শেষের দিককার সময়ের কিছু কিছু ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই গুহাগুলি কিছু বছর আগে খুঁড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে। এইসব গুহার কাছে, লাল লোহাপাথরের চাঙড় পাওয়া গেছে, তাকে বলে 'রাড্‌ল'।

সেই লোহাপাথর ঘসে ঘসে লালচে বা খয়েরি রঙের গুঁড়ো বার করা হত, আর সেই গুঁড়ো থেকে রঙ তৈরি করার জন্য শিলনোড়ার মত জিনিষও কাছে পাওয়া গেছে। প্রায় একেবারে চিত্রশিল্পীর স্টুডিও বল্লেই হয়, গুহার মানুষের ছবি আঁকার কারখানা!

মধ্যপ্রদেশে রায়গড় বলে আগে একটা দেশীয় রাজ্য ছিল এখন সেটি একটি জেলা, উড়িষ্যার সম্বলপুরের ঠিক উত্তরে। মন্দ্ ব'লে একটা নদী আছে, তার পাড়ে সিংহনপুর বলে একটি গ্রামের গায়ে ছোট একটি পাহাড়ের মালা আছে। এর মধ্যে কতকগুলি গুহার মুখের দেয়ালে বেলে পাথরের গায়ে লাল রঙে আঁকা কয়েকটি ছবি আছে যা নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন। মানুষ আর জন্তুর ছবি, তার সঙ্গে হিজিবিজি অক্ষরের মত আঁকা খানিকটা ঈজিপ্শন্ হাইঅরোগ্লিফিকের মত। জন্তুগুলি একেবারে গুহাচিত্রের জন্তু, বড় হরিণ, অতিকায় হাতী বা ম্যামথ, খরগোশ, মানুষগুলি গতিও কর্মব্যস্ততায় মুখর। একটা ছবি আছে খুব সুন্দর, তার মধ্যে ছন্দ আর গতি যেন জোরে পাক খাচ্ছে, বিষয়টা হচ্ছে একটা বাইসন শিকার; মধ্যিখানে একটি বিরাট হিংস্র বাইসন, তার চারধারে লোক ছুটোছুটি করছে, শিকারের চেষ্টায় কয়েকটি লোক বাইসনের শিঙের ঘায়ে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে পড়ে, আর বাকি ক'জন বাইসন শিকারে মত্ত। সেই দেয়ালেরই অন্যধারে আরেকটি ছবি: একটা বুনো মোষ বর্শা খেয়ে ভীষণভাবে জখম হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে আর তাকে চারদিকে ঘিরে শিকারীর দল উল্লাসে প্রায় নাচ্ছে। এরই কাছে পাথরের তৈরি অস্ত্র, যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয়, এ সব পাথরকাটা ছবি, পাথর গুঁড়িয়ে রঙ করে' সেই রঙে পাথরের তুলি দিয়ে আঁকা। আশ্চর্য মানুষের খেয়াল।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় কয়েকটি গুহা আবিষ্কার হয়েছে, সেখানেও লাল লোহা-পাথরের গুঁড়োর রঙ দিয়ে কতকগুলি খুবই অদ্ভুত ছবি আঁকা আছে। শিকারের ছবিই বেশি, জন্তুজানোয়ার তাড়া করা হচ্ছে, তারা ছুটে যাচ্ছে, তাদের গতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, জন্তুদের মধ্যে আছে গণ্ডার, বড় শিংওলা হরিণ, সাম্বার।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এসব গুহাচিত্র ইতিহাসের আগের যুগের, অর্থাৎ পাথর যুগের ছবি নাও হতে পারে। এগুলি হয়ত সত্যিই এমন কিছু বিশ ত্রিশ হাজার বছর প্রাচীন নয়। তার কারণ আমাদের দেশে এখনও অনেক জাতি আছে, যারা পাথরের অস্ত্র, হাতিয়ার ব্যবহার করে। দু তিন হাজার বছর আগে তাদের সংখ্যা নিশ্চয় বেশি ছিল এবং তাদের আঁকার রীতির মধ্যে আদিম বলিষ্ঠতা আর ঋজুতাও ছিল। সেই হিসেবে যে সব গুহাচিত্রের কথা এখানে বললুম সেগুলি খুব পুরনো নাও হতে পারে। বর্কিট বলে একজন ইংরেজ পণ্ডিত এরকম মনে করেন। কিন্তু সঠিক কিছু বলা যায় না।

স্পেনের গুহাচিত্রে যেমন কালো আর লাল রঙের মধ্যে দিয়ে ছবির ঘনত্ব, পরস্পরের মধ্যে

দূরত্ব, সম্বন্ধ, পরিপ্রেক্ষিত বা ইংরেজিতে যাকে বলে পরস্পেক্‌টিভ, এসেছে, এসব গুহাচিত্রেও ঠিক তেমনি এসেছে। তাছাড়া রায়গড় বা কাইমুরে যে সব গুহাচিত্র পাওয়া গেছে তাতে জ্যামিতিক রেখা, জ্যামিতিক চিত্রের পুরো আভাস পাওয়া যায়। আজকের দিনে এ সবের মূল্য খুব বেশি।

মানুষ যখন গুহা ছেড়ে বাড়ী তৈরি করতে শিখল, তখনও বাড়ীর দেয়ালে ছবি আঁকার অভ্যাস রয়ে গেল। বিশেষত যেসব বাড়ী টিকে থাকবে বলে লোকে মনে করত, সেসব বাড়ীর দেয়াল ছবি দিয়ে মুড়ে দিত। যেমন ধরা যাক ঈজিপ্টের পুরাকালের কবর বা মন্দির, দুই নদীর দেশ ক্যালডিয়া, অসিরিয়ার শহরের বাড়ীর দেয়ালের টালি। এই সময়ে বা তারও আগে থেকে মাটির ভাঁড়ে বা অন্যান্য নানা পাত্রে মানুষ ছবি আঁকা আরম্ভ করে। মাটির ভাঁড় বা চিনেমাটির পাত্রে একরঙা বা নানা রঙা ছবি আঁকা এখনও চলে আসছে, মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন নিশ্চয় চলবে কারণ, মানুষ বোধ হয় রঙ, রেখা, ছবি ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমরা সামান্য পোষাকই কত পরিপাটি করে, রঙ মিলিয়ে পরি, চুল আঁচড়াই যাতে মাথাটা ছবির মত দেখায়।

আরও অন্যান্য জায়গায় ইতিহাসের আগের যুগের কিছু কিছু গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। যেমন, ওয়াইনাদের এদাকল গুহায়, বেলারি জেলার কাপগালাইয়ে, কালাটে, বুন্দেলখণ্ডে, বান্দায়, হোসঙ্গাবাদে, বাঙ্গালোরে। ঘাটশিলার কাছেও কিছু পাওয়া গেছে। এখন পাঁচ ছ' হাজার বছর আগেকার মাটির ভাঁড়ের ছবির কথা বলব।

দুই নদীর দেশ : বালুচিস্তান আর সিন্ধু

পাব্‌লো পিকাসো বলে জগদ্বিখ্যাত আধুনিক শিল্পীর নাম সকলেই জানেন। বছর চারেক আগে কলকাতায় একটা আন্তর্জাতিক ছবির প্রদর্শনী হয়, তাতে তাঁর আঁকা একটি ছবি ছিল, রেখা দিয়ে নিজের ছোট্ট মেয়ের ছবি। সে ছবির কথা এখন বলতে বসিনি। বলব তাঁর একটি বিশেষ উক্তি সম্বন্ধে। পিকাসো বলেন, গত দু' তিনশ' বছর ধরে আমরা ছবি বলতে বুঝি একটুকরো চট বা ক্যানভাস বা কাঠের পাটা বা কাগজ, তাতে কিছু রং আর তার চারধার ঘিরে একটা ফ্রেম যা আশপাশের সব জিনিস থেকে রঙীন বস্তুটিকে আলাদা করে রাখছে। ছবির এই সংজ্ঞা বদলাতে হবে তা না হলে আমরা ভবিষ্যতে নানা দিকে এগোতে পারব না, অতীত থেকেও শিখতে পারব না।

কথাটা এভাবে বললে স্বতঃসিদ্ধ মনে হয় ; মনে হয় এ আর নতুন কথা কি। কিন্তু গত শতকেও এমন দিন গেছে যখন কর্তাব্যক্তিরা মিশরীদের কবরচিত্রকে বা গ্রীক ভাসকে বা পম্পিয়াই, ইট্রুস্কান মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা অপূর্ব ছবিকে ছবি বলে মানতেই নারাজ ছিলেন। এমনও বলতেন যে ওসব জিনিস চারুশিল্পের পর্যায়ে পড়ে না।

আমরাও উনিশ শতকের পণ্ডিতদের মানব না। যেখানেই মানুষ রেখা, রঙ, তুলি বা কলম দিয়ে ছবি এঁকেছে সেইখানেই আমাদের ছবির উৎস, ছবির মালমশলা খুঁজতে যেতে হবে। চিত্রকলা তুলোর বাক্সয় সযত্নে রাখা কান্দাহারী আঙ্গুর ব'লে মানতে আমরা নারাজ। চিত্রকলা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অবশ্য ব্যবহারের জিনিস, মোটেই সৌখিন কিছু নয়, ছবি না হলে আমাদের দিন চলে না।

মধ্যপ্রাচ্য দেশে ঈজিপ্টের প্রায় হাজার মাইল পূবে একটা দেশ আছে তাকে বলে মেসপটেমিয়া। দুই নদীর মাঝখানে যে জমি বা দেশ তাকে বলে মেসপটেমিয়া, টাইগ্রিস্ আর ইউফ্রেটিস্ নদী তার দুধারে। ভারতবর্ষ নদীর দেশ, বলা যায় অনেকগুলি মেসপটেমিয়া দিয়ে ভর্তি। একবার ম্যাপ খুললেই বুঝতে দেরি হয় না যে কলকাতাই এক বিরাট মেসপটেমিয়ার মধ্যে। এখন

যেটা পশ্চিম পাকিস্তান সেখানেও একটি দুই নদীর দেশ আছে, পূবে বিরাট সিন্ধু নদ, পশ্চিমে জোব নদী। মধ্যে আছে আধুনিক কালের বালুচিস্তান আর সিন্ধু।

এই সারা দেশটিতে বহু পুরনো সভ্যতার যে কিছু থাকতে পারে তা কয়েক বছর আগে পর্যন্ত লোকে জানত না। সেখানে প্রথম খোঁজখবর আরম্ভ করেন ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক কৃতী বাঙালী এবং হার্গ্রাভস্ বলে এক ইংরেজ ১৯২৫ সালে। তাঁদের ঠিক পরেই স্যর অরেল স্টাইন বলে এক জগদ্বিখ্যাত ভবঘুরে পণ্ডিত ১৯২৬-২৭ সালে উত্তর বালুচিস্তানে আর ১৯২৭-২৮ সালে দক্ষিণ বালুচিস্তানে খোঁড়াখুঁড়ি করে এমন সব জিনিস আবিষ্কার করেন যাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ইরান ও মেসপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাসের-আগের-যুগের সভ্যতার অনেক

মিল আছে। আর এই মিল ধরিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে মাটির ভাঁড়ের টুকরোর রঙ করা ছবি, খোলামকুচির রঙ ও ছবি, যার কি দাম না জানলে সাধারণত লোকে ঝাঁট দিয়ে ফেলেই দেয়। স্টাইনের সঙ্গেই এলেন আর বাঙালী ভদ্রলোক, নাম ননীগোপাল মজুমদার। তাঁর মত প্রতিভাসম্পন্ন আর সন্ধানী ব্যক্তি ভারতীয়দের মধ্যে রাখালদাসের পরে দুর্লভ। খুব আক্ষেপের কথা তিনি অল্প বয়সে মারা যান। এই অঞ্চলে ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাজ ক'রে তিনি অনেক কিছু মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করেন।

স্টাইন আর মজুমদার এই দুই নদীর দেশ ঘুরে ঘুরে সিদ্ধান্ত করেন যে পণ্ডিতরা যাকে ব্রঞ্জ যুগ বলেন সেই যুগে এ অঞ্চলের নানা জায়গায় লোকের ভালরকম বাস ছিল। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় এ সবই তাঁরা বেশ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করেন মাটির ভাঁড়ে আর খোলামকুচিতে আঁকা ছবি দেখে। তাঁরা বলেন উত্তর বালুচিস্তানে খৃস্টপূর্ব ২৯০০-২৮০০ বছর আগে এখন যেখানে কোয়েটা শহর সেখানে ঘন বসতি ছিল। তারও আগে থেকে এবং কয়েক শ' বছর ধরে, খৃস্টপূর্ব ২২০০ বছর পর্যন্ত জোব নদীর ধারে এক সংস্কৃতি ছিল, তার নাম রাণা ঘুণ্ডাই। রাণা ঘুণ্ডাই সংস্কৃতির আবার বয়স হিসাবে নানা স্তর আছে, সে আলোচনার মধ্যে যাওয়া এখানে সম্ভব নয়। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ বালুচিস্তানে খৃস্টপূর্ব আন্দাজ ৩০০০, ২৮০০, ২৫০০, বছরে আম্‌রি, নান্দারা, নাল বলে তিনটি জায়গায় পরপর তিনটি সংস্কৃতি দেখা দেয় (এগুলি সবই আধুনিক নাম, পুরাকালের নাম জানা নেই)। এই দক্ষিণ বালুচিস্তানেই কুল্লী বলে জায়গায় খৃস্টপূর্ব ২৪০০ বছরে আরেকটি সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। কুল্লীর ঠিক পশ্চিমে শাহীটুম্প বলে জায়গায় খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছরে আরেকটি সংস্কৃতি ছিল।

জ্ঞান আর অধ্যবসায় দিয়ে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না এমন জিনিস বোধ হয় খুব কমই আছে। মাটির খেলনা, ভাঁড়, খোলামকুচি দেখে দেখে আগেকার পণ্ডিতরা ঠিক করেন যে ইতিহাসের আগের যুগে পারস্য দেশের দক্ষিণ দিকে হত বাফ্ বা হলদেটে রঙের মাটির পাত্র, আর উত্তর দিকে হত লালরঙের পাত্র। বালুচিস্তানেও ঠিক একই জিনিস দেখা গেল। দক্ষিণদিকে বাফ্ বা হলদেটে রঙের পাত্র ; উত্তর দিকে লালরঙের পাত্র। এছাড়া মাটিতে গড়া স্ত্রী পুরুষের মূর্তি বা মডল দেখেও তাঁরা উত্তর-দক্ষিণের চরিত্রগত তফাৎ ঠিক করলেন। লালরঙের পাত্র একমাত্র উত্তরদিকে জোব নদীর ধারের সভ্যতাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু হলদে রঙের পাত্র বালুচিস্তান আর সিন্ধুর নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। জায়গাভেদে এইভাবে সংস্কৃতি ক'টিকে ভাগ করা যায়।

ক। লালরঙের মাটির পাত্রের সংস্কৃতি

উত্তর বালুচিস্তানে জোব নদীর সংস্কৃতি বা রাণা ঘুণ্ডাই-এর নানা স্তর। খৃস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ২২০০।

খ। বাফ বা হলদেটে রঙের মাটির পাত্রের সংস্কৃতি

(১) কোয়েটা সংস্কৃতি ; বোলান গিরিবর্ত্মের কাছে, খৃস্টপূর্ব ২৯০০-২৮০০।

(২) আম্‌রি (খৃস্টপূর্ব আন্দাজ ৩০০০) নান্দারা (খৃঃ পূঃ ২৮০০), নাল (খৃঃ পূঃ ২৫০০) সংস্কৃতি ; দুটি জায়গায় পাওয়া গেছে, প্রথমটি সিন্ধু, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বালুচিস্তানের নাল উপত্যকার মাথায়।

(৩) কুল্লী সংস্কৃতি ; দক্ষিণ বালুচিস্তানে কোল্‌ওয়া বলে জায়গায় পাওয়া গেছে। খৃস্টপূর্ব ২৪০০।

(৪) শাহীটুম্প সংস্কৃতি ; দক্ষিণ বালুচিস্তানে, কুল্লীর প্রায় একশ' মাইল পশ্চিমে। খৃস্টপূর্ব ২০০০।

এবারে খুব অল্পের মধ্যে প্রত্যেকটির কথা বলব। কারণ, ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে এত যুগ আগের হলেও প্রায় সবগুলি নক্সাই কাঁথা, ছাপাকাপড়, বোনা শাল, ছুঁচের কাজ, চীনেমাটির বাসনে এখনও আমাদের মধ্যে চলছে এবং আরো নতুন করে বেশি করে আসছে।

প্রথমে বলব জোব নদী বা লালরঙের মাটির পাত্রের সংস্কৃতির কথা।

জোব নদীর ধারে রাণা ঘুণ্ডাইতে যে সব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি, বিশেষ করে দু নম্বর স্তরে, খুবই সুন্দর রং করা, চাকে ঘুরিয়ে তৈরি। তাদের গোলাপী কিংবা হলদে কিংবা গাঢ় পোড়ামাটি রঙের গায়ে কালো রঙে সুন্দর মিহি স্টাইলাইজ করে আঁকা ককুদওলা ষাঁড় আর সোজা সোজা কালো শিংওলা কালো হরিণের ছবি। যেমন আঁকার দক্ষতা, তেমনি সাহস। ইংরেজিতে স্টাইলাইজ কথাটির বাংলা এক কথায় ঠিক নেই, সংকেতিত বা একটা রীতির ছাঁদে ফেলা বলা যায়। ষাঁড়ের আকৃতি মোটামুটি রেখে তার বিশেষত্বগুলি মুখ্য করে দেখালে যা হয় তাকে বলে স্টাইলাইজ করা, অর্থাৎ যেটির যা বিশেষত্ব, অন্য সাদৃশ্যকে গৌণ করে, সেই বিশেষত্বটিকে ফলাও করে এঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়। মহেঞ্জোদারোর বিখ্যাত ষাঁড় এখানে মনে পড়ে, তাকে বলে স্টাইলাইজ করা।

এই সব পাত্রে শুধুই কালো ব্যবহার হয়েছে, তার সঙ্গে লালরঙের রেখা নেই। পাত্রগুলির গড়ন খুব সুন্দর আর পরিষ্কার তলায় খুড়ো দেওয়া। পেটের কাছে একটি পটি চারিদিকে ঘুরে গেছে, তাতে হয় স্টাইলাইজ করা ষাঁড় না হয় কালো হরিণ, তাদের পা আর শিং লম্বালম্বির দিকে এত সরু লম্বা করে দেওয়া যে অদ্ভুত দেখায়। কুল্লীতে পাওয়া পাত্রে এগুলি আড়াআড়ি করে টেনে বাড়িয়ে দেওয়া, ধাঁচটি খুব পরিপাটি, কাটাকাটা, একটু অপ্রাকৃত। বহু যুগ আগের গুহাচিত্র আর আমাদের যুগের শিল্পীদের ছবির সঙ্গে খুব মিল। এই রাণা ঘুণ্ডাইতেই আবার আর এক ধরণের ছবি মাটির পাত্রের গায়ে দেখা যায়, সেগুলিতে লাল দ্বিতীয় রং হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, যদিও পাত্রের গা'ও লাল। এই লালের উপর লাল এক অদ্ভুত রীতির সৃষ্টি করেছে, খানিকটা ভাস্কর্যের আমেজ আনে। আধুনিক ছবিতে একই রঙের জমি বা রেখার উপর সেই রঙেরই গাঢ়ফিকে ব্যবহার খুব চল্ হয়েছে।

জোব
আমরি
নাল
কুল্লী
শাহী টুম্প
ঝুকর
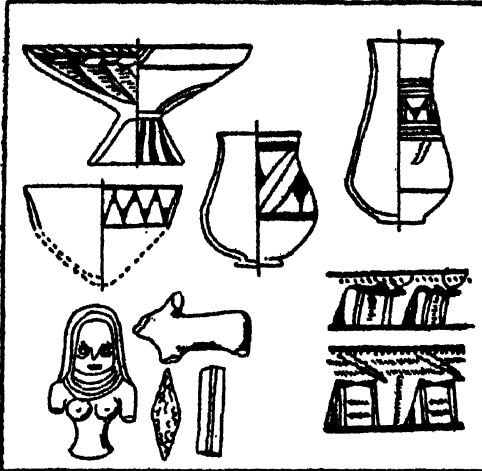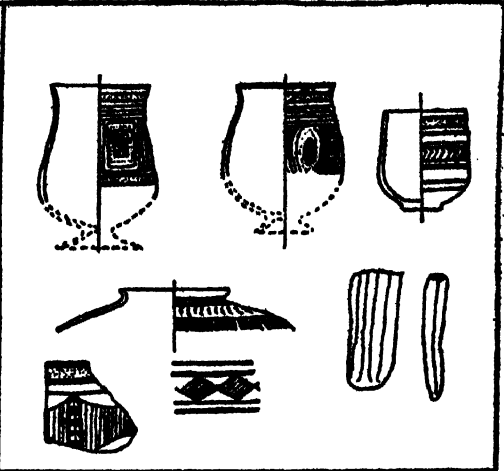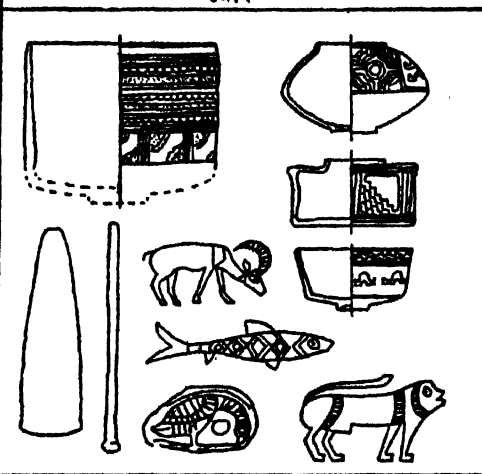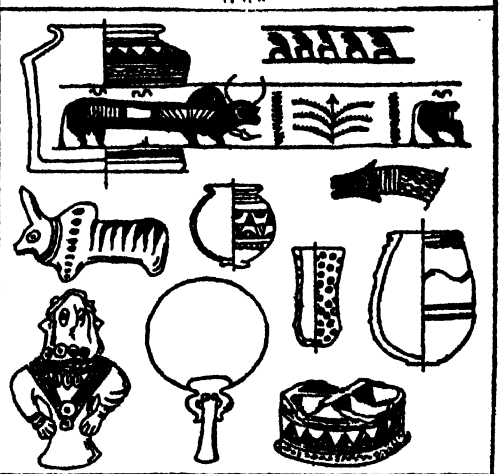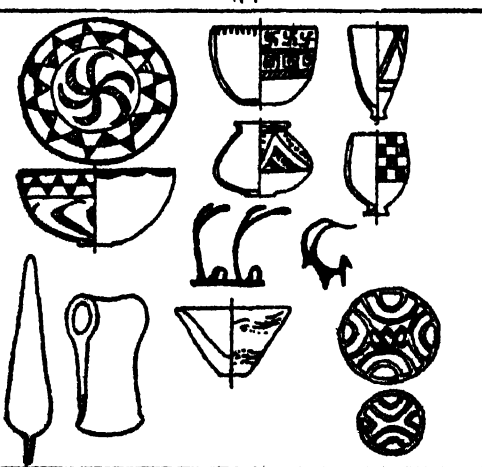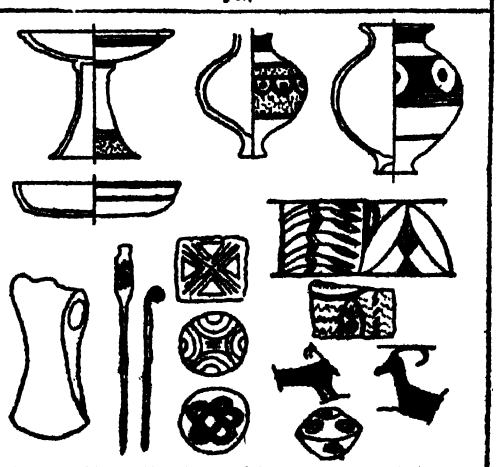
অন্যান্য নক্সার মধ্যে দুই রঙে আঁকা কতকগুলি নক্সার খুব চলন ছিল, যেমন সরুমোটা লালকালো অনেকগুলি লাইন দিয়ে সমচতুষ্কোণ ; এগুলি আমরিতেও পাওয়া গেছে। জোব উপত্যকার সুরজাঙ্গাল বলে একটি জায়গায় দুরঙা মাটির ভাঁড়ের কাজ আরও সুন্দর। দক্ষিণ বালুচিস্তানে গাঢ় জমা রক্তের মত লাল রঙ ব্যবহার হত, কিন্তু এখানে হত জ্বলজ্বলে কমলা রঙ, তাতে লাল জমির উপরে লাল রেখা আরও খোল্‌তাই হত। এক ধরণের ফাঁদালো জামবাটির মত উঁচু খুরোওলা পাত্রের গায়ে আঁকা পটী পাওয়া গেছে, তাতে ককুদওলা ষাঁড়ের সারির এত লম্বা লম্বা পা আর লম্বা লম্বা লেজ পাত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ষাঁড় বলে প্রায় চেনাই যায় না।

এখন কোয়েটা সংস্কৃতির কথা একটু বলি। এখানকার মাটির পাত্রগুলির জমি বাফ বা হল্‌দেটে রঙের, বেগনি আভাওলা লাল্‌চে-খয়েরি (কালো) রঙের কালি দিয়ে দরাজ ভাবে, নিশ্চিত নিপুণ হাতে আঁকা। দ্বিতীয় কোন লাল রঙ নেই। পাত্রগুলির গড়ন বেশ ভাল, একটু পলতোলা মত। কোন কোন পাত্র বেশি পোড়ানর দরুণ গোলাপী সাদা এমন কি ঈষৎ সবজে দেখায়, কোন কোনটা আবার ছাই রঙের, বেশ শক্ত খোলা, তাতে 'কালো' রঙে নক্সা আঁকা। নক্সাগুলি সবই জ্যামিতিক রেখা, কোন জীবজন্তুর ছবি নেই। মোটা সরু রেখা দিয়ে তীরের ফলার আকারে আঁকা, চতুষ্কোণকে আড়াআড়ি ভাগ করে ভাঙা, উল্টোদিকে মুখঘোরানো ত্রিভুজ অথবা ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত করে রেখা আঁকা।
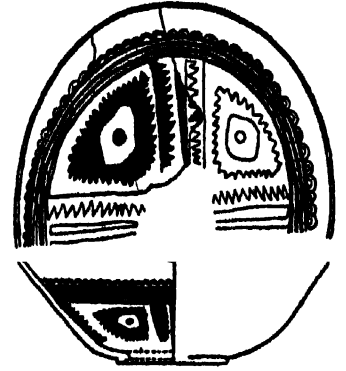
আম্‌রি-নাল সংস্কৃতিতে মাটির জিনিসের জমি প্রায়ই চমৎকার নরম বাফ রঙের কিংবা একটু গোলাপী। তার উপরে মাঝে মাঝে সাদা আস্তর পড়ত। চাকে ঘোরানো হত, সেইজন্য পাত্রগুলি

খুব পাতলা। তলায় খুরো, চ্যাপটা গড়ন, কোনটা সাদাসিধে বালতির মত গড়ন। আম্‌রিতে যে সব মাটির জিনিস পাওয়া গেছে, তাতে জীবজন্তু বা গাছপালার ছবি নেই, কিন্তু নালের পাত্রে এ সব খুব আছে।

আম্‌রি, নান্দারা বা নাল সবেতেই চিত্রগুলির রেখা প্রথমে কড়া তুলি দিয়ে 'কালো' বা ব্রাউন রঙে আঁকা হত। আম্‌রি আর নান্দারায় লাল দ্বিতীয় রঙ হিসেবে ব্যবহার হত। কিন্তু নালে লাল তো থাকতই, উপরন্তু হল্‌দে, নীল, সবুজ রংও দেওয়া হত, তাতে নানা রঙের চিত্ররীতি গড়ে ওঠে। মাটির পাত্রে নীল আর হলদের ব্যবহার পশ্চিম এশিয়ায় ইতিহাসের যুগের আগে একমাত্র নালেই দেখা যায়।

মাটির পাত্রের জমিকে আড়াআড়ি, লম্বালম্বি, একাধিক রেখা দিয়ে লম্বা লম্বা চৌকোণ বা প্যানেলের মত করে ভাগ করে নেওয়া হত। তার পর এই সব প্যানেলের মধ্যে সাদাকালো চৌখুপির ছোট ছোট প্যানেল করা হত, এইসব চৌখুপি প্যানেলের চারদিকে আবার ছোটর থেকে বড়, কালোর পরে লাল, একের পরে আরেক রেখা দিয়ে চতুষ্কোণ এঁকে দেওয়া হত। এ ছাড়াও একরঙা বর্‌ফি বর্‌ফি, কোণের শেষে কোণ লাগিয়ে, পাত্রের গা বেয়ে পটির মত চলে যেত (লম্বালম্বি পটি কমই হত), কখনও বর্‌ফি একরঙা না হয়ে আঁজিকাটা (ইংরেজিতে হ্যাচ করা) হত, কখনও তীরের ফলার মত, কখনও বা ফাঁসের (ইংরেজিতে লুপ) মত, কখনও গ্রীক সিগ্‌মা অক্ষরের মত, কখনও নিক্তির আকারে।

নান্দারার পাত্রে বেশ ভাল আঁকা জীবজন্তু খুব পাওয়া যায়, যেমন সিংহ, মাছ, পাখী, তাদের গায়ের সবটা লাল রঙে ভর্তি। একটি মাত্র বলদ পাওয়া গেছে। হরতনের নক্সা প্রায়ই পাওয়া যায়, এটি পিপুল গাছের পাতা থেকে নেওয়া। পিপুল গাছ এখনকার মত তখনও বোধহয় লোকে পূজা করত। মাঝে মাঝে কালো হরিণ, বা আইবেক্স, স্টাইলাইজড্‌ ভাবে আঁকা, পাওয়া যায়।
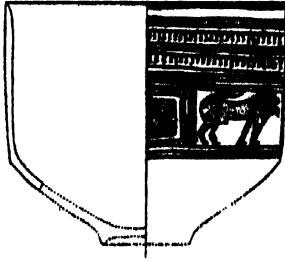
নালে এসব নক্সা আরও জটিল। আমরি-নান্দারার চৌখুপি, রুইতন বা বর্‌ফি, লাল রেখার প্যানেল, সিগ্‌মা চিহ্নের মত সরল নক্সা নেই। তার জায়গায় বাঁকা রেখায় আঁকা ছবি, একের পিঠে আরেক বৃত্ত ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে হল নতুন নক্সা। নতুন নতুন জীবজন্তুরও আবির্ভাব হল, যেমন নানাধরণের পাখী, আইবেক্স, কাঁকড়াবিছে। গরুর জোয়ালের মত একরকম নক্সা হল, বোধহয় গ্রীক সিগ্‌মা অক্ষরকে বিলম্বিত করা। রঙও নানারকম হল, আগে শুধু লাল ছিল, তার উপরে হল নীল, হলদে আর সবুজ।

কুল্লীতে মাটির পাত্রের গায়ে জমি হিসাবে যে রঙ দেওয়া হত ইংরেজিতে তাকে বলে স্লিপ। তা হত সাধারণত বাফ্‌ কিম্বা গোলাপী কিম্বা ফিকে লাল বা সময়ে সময়ে সাদাটে। তার উপরে পাত্রের গা বেয়ে আড়াআড়ি সমভূমিক বা ইংরেজিতে হরিজন্টাল ভাবে মোটা মোটা রেখার পটির মধ্যে নক্সা হত। পাত্রগুলির গড়ন হত সুন্দর, হালের আমলের ফলের ডিশের মত, লম্বা খুরোওলা ডিশ্‌, গোল আকারের জলের পাত্র, লম্বা শিশির মত ভাস, ছোট ছোট চ্যাপটা ডিশ। বড় বড় লম্বা কিম্বা

পেটমোটা গোল জালাও হত। উপরে নীচে জ্যামিতিক রেখা বা নক্সার দুটি মোটা পটি, মধ্যে জীবজন্তু গাছপালার নক্সা, পাত্রের চারদিকে গোল হয়ে ঘুরে গেছে। সাধারণত এই ধরণের পটির মাঝখানে একজোড়া জন্তু থাকে, পিঠে ককুদ, কিন্তু জাতে বাঘ বা বেরাল ধরনের, শরীরটা চ্যাপ্টা, অসম্ভব লম্বা করে আঁকা (ডাক্‌শুণ্ড্ কুকুরের মত খানিকটা, শরীরটা খুব লম্বা পাঁউরুটির মত, পা গুলো খুব বেঁটে বেঁটে), তার সঙ্গে গাছপালার বিশুদ্ধ আকৃতির ল্যাণ্ডস্কেপ (ইংরেজিতে এই ধরনের আঁকাকে ফর্ম্যালাইজড্ বা ছকে ফেলা বা রীতিবিন্যস্ত বলে, যেমন বট গাছ আঁকতে হলে পাতা না এঁকে খানিকটা ইস্কাবন বা চিড়িতনের মত এঁকে দেয়, শুধু আভাস বা দূরসাদৃশ্য আনার জন্য), তার সঙ্গে কখনও কখনও ছোট ছোট, স্টাইলাইজ করা শিংওলা ছাগল। প্রধান জীবজন্তুর উপরে ইংরেজিতে ডব্লিউ অক্ষরের আকারে কখনও থাকে রেখা বা রঙ দিয়ে আঁকা ছোট ছোট পাখী, কখনও মাছ, কখনও নানারকম রোজেট্ বা গোলাপ নক্সা। বলদগুলি কখনও কখনও গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। পিপুলগাছের হরতন আকারের পাতা প্রায়ই দেখা যায়।
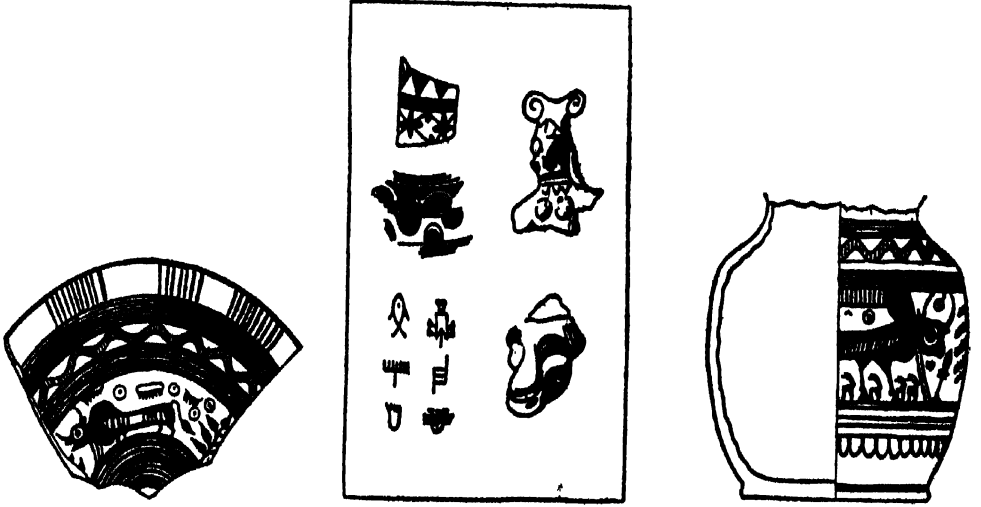
কুল্লীর সব পাত্রই নরম তুলি দিয়ে কালো রঙে আঁকা। বাইরের আকারের রেখা, ইংরেজিতে যাকে বলে আউটলাইন, সেটা কালো, তার মধ্যের জমি মোটা মোটা রেখা অথবা সরু রেখার আড়া-জালি দিয়ে ভরানো। চোখ সব সময়েই বড় করে আঁকা, প্রকাণ্ড বৃত্তের মত, মধ্যে ছোট কালো বৃত্ত, তার চারিদিকে সাদা বৃত্ত। সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত চ্যাপ্টা আর লম্বা করে দেওয়া, কেউ যেন জন্তুটার উপর দিয়ে রোলার চালিয়ে দিয়েছে। অথচ পা, খুর এসব খুব নিখুঁত করে আঁকা। তার সঙ্গে উপরে নীচে যে সব জ্যামিতির নক্সা থাকে সেগুলি কখনও কখনও জোড়া জোড়া ত্রিভুজ, কোণের সঙ্গে কোণ

আড়াআড়ি জুড়ে দেওয়া, অথবা রুইতন। মাঝে মাঝে ফাঁস ঝুলে থাকে, সিগ্‌মা বা চোখ নক্সাও দেখা যায়। কখনও কখনও পাওয়া যায় ঢেউখেলানো নক্সার পটিও। মাঝে মাঝে উপর নীচে মোটা রেখার পটির মত করে লাল রঙ দেয়া। লালটি হচ্ছে দ্বিতীয় রঙ।

শাহীটুম্প্‌ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে দুই নদীর দেশের কথা শেষ করব। শাহীটুম্প্‌ থেকে যে সব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে সেগুলির খোলা খুব উৎকৃষ্ট, শক্ত, পাতলা ; রঙ ছাই থেকে ফিকে গোলাপী, কখনও পরিষ্কার হলদে-বাফ্‌। সব চেয়ে বেশী পাওয়া গেছে এক ধরনের চ্যাপটা গামলা বা বাটির মত পাত্র, তলায় বেশ কেতাদুরস্ত খুরো দেয়া। বড় বড় পাত্রও পাওয়া গেছে।

নরম তুলি দিয়ে নক্সা আঁকা, নক্সার রঙ কালো থেকে নয়নতৃপ্তিকর সেপিয়া, তার থেকে লাল্‌চে-ব্রাউনে চলে গেছে। শাহীটুম্পের একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে যে, রঙে আঁকা রেখার সীমাটি অল্প অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তীক্ষ্ণ নেই—তার মানে সীমান্তে পাতলা রং সীমারেখা ছাড়িয়ে খড়্‌খড়ে বেলে জমিতে ছড়িয়ে শুষে গেছে। আঁকার রীতি খুব ঋজু বা দৃঢ় নয়, বরং ঢিলেই বলা যায়। পাত্রের গায়ে ভাগ ভাগ করে প্যানেল করা, পেটের কাছে সাধারণত স্বস্তিকা আঁকা। ভিতরদিকেও চিত্র করা, স্বস্তিকার খোঁচা খোঁচা ভাবে আঁকা শম্বুক বা স্পাইরল্‌, তার সঙ্গে তীরের ফলা, বর্‌ফি বা ত্রিভুজ। একটি পাত্রে তীরের ফলার নক্সায় লাল কালো দু'রঙেরই রেখা আছে।

হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো

পশ্চিম পাকিস্তানের দুই নদীর দেশের সংস্কৃতির কথা সামান্য বললাম। জায়গাগুলি বালুচিস্তান আর সিন্ধে। জোব্‌ রাণাঘুণ্ডাইএর প্রায় দু'শ মাইল পূবে আর একটি জোড়া নদীর সভ্যতার কথাও মাত্র গত ত্রিশ চল্লিশ বছর হল লোকে ভাল মত জানতে পেরেছে। হরপ্পা জায়গাটি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর শহরের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশে, ঝিলম আর শতদ্রুর মাঝামাঝি, প্রায় রবি নদীর উপরে। এই হরপ্পারই আবার ৩৫০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশে বড় সিন্ধুনদীর উপর আরেকটি বিরাট নগরের কথাও পৃথিবীর লোক মাত্র বছর ত্রিশেক হল জানতে পেরেছে, তার নাম মহেঞ্জোদারো।

গ্রীক ভূগোলবিদ্‌ স্ট্রাবো লিখে গেছেন, 'ঝিলম আর বিয়াস (বিপাসা) নদীর মাঝখানে শোনা যায় নয়টি মহাজাতি পাঁচ হাজার নগরে বসবাস করে, তার এক একটি নগর নাকি আমাদের (গ্রীসের) কোশের মত বড় ; কিন্তু আমার মনে হয় এসব কথা অতিরঞ্জিত।'

সম্প্রতি পণ্ডিতরা মনে করেন যে হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো একই সাম্রাজ্যের দুটি বড় নগর

ছিল। তাদের মধ্যে ছিল অগণিত ছোটবড় শহর। "হরপ্পা সংস্কৃতি" এই নামের আড়ালে হয়ত চাপা পড়ে আছে পশ্চিম এশিয়ার একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের উপাখ্যান। কিছু বিচিত্রও নয়। কারণ হরপ্পা আধুনিক লাহোর থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে, রবি নদীর উপরে। আর মহেঞ্জোদারো তার ৩৫০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সিন্ধু বা ইণ্ডাস্ নদীর উপরে, আধুনিক করাচীর ২০০ মাইল উত্তরে। যা কিছু প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে ধরে নিতে বাধা নেই যে দুটি নগরী একই সময়ের, একই ধরণের প্ল্যানে করা, একটি সাম্রাজ্যের দুটি যমজ শহর, একটি উত্তরে, একটি দক্ষিণে। উত্তরপশ্চিম ভারতে এরকম যমজ শহর আরও ছিল, যেমন শক-কুশানদের সময়ে উত্তরে পেশোয়ার বা তক্ষশীলা আর দক্ষিণে মথুরা একই সাম্রাজ্যের দুটি যমজ নগর।

হরপ্পার আশেপাশে ছোটবড় চোদ্দটি গ্রাম বা নগরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মাঝখান দিয়ে সিন্ধু নদী নিশ্চয় দুটি মহানগরীকে ভাগ করে সংযুক্ত করত, সিন্ধু দিয়ে চল্‌ত জলপথে বাণিজ্য আর বালুচিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়ে চল্‌ত পশ্চিমের সঙ্গে ব্যবসা।

যদিও হরপ্পা সম্বন্ধে প্রায় এক শ'বছর ধরেই পণ্ডিতদের মন উসখুস্ করছে, কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ আরম্ভ হয়েছে মাত্র ত্রিশ বছর। প্রথম হরপ্পা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখান বিখ্যাত ভারতবিদ প্রত্নতাত্ত্বিক জেনারেল কানিংহাম্। ১৮৫৬ সালে তিনি হরপ্পা দেখে আসেন। তারপর আর খোঁজখবর নেই। হঠাৎ স্যর জন মার্শালের উদ্যোগে হরপ্পায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয় ১৯২০ সালে, ১৯২১-এ বন্ধ হয়, আবার আরম্ভ হয় ১৯৩৩ সালে, এক বছর চলে। হরপ্পার কাজ পরিচালনা করেন দয়ারাম সাহনি। হরপ্পায় যখন কাজ আরম্ভ হয়, তখন মহেঞ্জোদারোয় একক উৎসাহে খোঁড়াখুঁড়ি করে নানা চিহ্ন, লক্ষণ, অকাট্য নিদর্শন দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে খননের জন্য খুব উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরই একান্ত উদ্যোগে মহেঞ্জোদারোর কাজ আরম্ভ হয় ১৯২২ সালে, চলে ১৯৩১ পর্যন্ত। তার পরে কিছুদিন বন্ধ, আবার শুরু হয় ১৯৩৫-এ, শেষ হয় ১৯৩৬ সালে। এ সময়ে একজন ইংরেজ ছিলেন, অর্নেষ্ট ম্যাকাই। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ননীগোপাল মজুমদার, যাঁর নাম আগেই করেছি, এই সারা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর আশেপাশে কি ধরণের সভ্যতা ছিল তার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ১৯৩৮ সালে যখন আবার নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করবেন, তখন কীরথার পাহাড়ে পার্বত্য দুরজাতীয় দস্যুদের হাতে তিনি প্রাণ হারান। তারপর আবার ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত প্রোফেসর মর্টিমার হুইলর খোঁড়াখুঁড়ির পরে সম্প্রতি একটি বই বার করেছেন যেটি বেশ প্রামাণ্য বলে ধরা যায়।

মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার নগরগুলিতে কি আশ্চর্য ব্যবস্থা ছিল, তখন সামাজিক সংগঠন, নগর রক্ষার ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা, নগর পরিচালনা, সাধারণ নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে কত পরিপাট্য ছিল, এসবের বর্ণনা মার্শাল বা মর্টিমার হুইলরের বইতে পড়লে তন্ময় হতে হয়। শুনলে

ভাল লাগে যে আধুনিক যুগের সেরা নগরশিল্পীরা, যেমন লকর্বুসিয়ের, জানরো, ম্যাক্সওয়েল ফ্রাই, মোজার প্রভৃতি, খুব মন দিয়ে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর নগরব্যবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তার থেকে কি শিখেছেন তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে আনকোরা নতুন শহর, পূর্ব পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় তৈরি করছেন।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর নগরসংস্থান, নাগরিক ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনের আলোচনা এখানে করব না। শুধু জেনে রাখি যে তাঁদের ব্যবস্থা থেকে আধুনিক জীবনে অনেক কিছু শেখার, নেবার, ধার করার আছে। এইটুকু যদি আমরা জানি তাহলে এটাও বুঝতে দেরী হবে না যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে যদি কিছু ছবি পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তার থেকেও আমাদের যথেষ্ট শেখার আছে, এবং ভারতবর্ষের জীবনে হয়ত সেগুলি বারবার কাজে লেগেছে, কারণ যে কোন যুগে ছবি মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোয় খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে দেয়ালে, পটে বা কাপড়ে আঁকা কোন ছবি পাওয়া যায়নি। মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা সমসাময়িকই বলা যায়, এবং পণ্ডিতরা মনে করেন এ দুটি নগরের সবচেয়ে জাঁকজমক ছিল খৃষ্টপূর্ব ২৯০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য মনোরম মূর্তি, মাটির পুতুল, মাটির ছাপের জন্তুজানোয়ার আঁকা সীল পাওয়া গেছে তার ছবি এক আধটা দেখে মনে হয় এরকম অদ্ভুত তেজ, আঁকার পরিপাট্য, স্টাইলাইজেশন্ খুবই দুর্লভ। কিন্তু রঙ আর তুলি দিয়ে আঁকা ছবি একমাত্র মাটির পাত্রের গায়েই পাওয়া গেছে। তার সম্বন্ধে অল্প করে বলব।

হরপ্পা সংস্কৃতির যে মাটির পাত্র পাওয়া যায়, তার গায়ের ছবি রাণা ঘুণ্ডাই-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কুল্লীর মাটির জিনিসের কথাও মনে আসে। ছবিগুলি লাল জমির উপরে কালো রঙে আঁকা, আল্পনা বা ছবিগুলি গাঢ় লাল, জ্বলজ্বলে পালিশ করা গায়ের উপর চিত্রিত। দুই ধরণের চিত্র বা প্যাটার্ণ ঘুরে ফিরে আসেঃ একটি জ্যামিতিক বা অপ্রাকৃত, তার মধ্যে গোল বা বৃত্ত পরস্পরের উপর পড়ে জাফ্রির মত প্যাটার্ণ তৈরি করেছে। দ্বিতীয় প্যাটার্ণ হচ্ছে
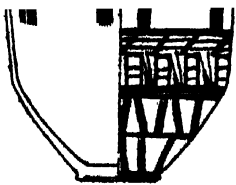
প্রকৃতি থেকে নেওয়া গাছপালা, জন্তুজানোয়ারের ছবি। প্রথম প্যাটার্ণটি অত উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি হরপ্পার নিজস্ব। এগুলি সাধারণত গড়িয়ে গড়িয়ে একটার পর একটা জের টেনে চলে গেছে, কিছুটা যেন অগোছালোভাবে আঁকা ; মাটির পাত্রের সমস্ত গা জুড়ে, যেমন তেমন ভাবে, কোন বিশেষ ছন্দ বা সমতা না রেখে, রাশি রাশি লতাপাতা, লতার ডগা চলে গেছে, তার মাঝে মাঝে পাখী (কখনও ময়ূর), আবার কখনও কখনও অন্য চতুষ্পদ জন্তু। কিছুটা অপরিচ্ছন্ন, ঝাঁকড়া হয়ে যেন গজিয়েছে ; বালুচিস্তান পটারির মত দৃঢ়, কঠিন, তক্তকে, ধ্রুপদী কাজ নয়। মনে হয় যেন

বালুচিস্তানের ছবি সেই দেশেরই মত শক্ত, শুক্‌নো, পাথর বের করা পাহাড়ের মত টান; চর্বিবিহীন পেশী আর হাড়ের মত; আর সিন্ধুনদীর ছবি সেখানকার ভিজে, স্যাঁতসেঁতে সমতলভূমির অজস্র লতাপাতা জঙ্গলের মত বেড়ে উঠেছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর জন্তুজানোয়ারের ছবি খানিকটা কুল্লীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মোটা রেখা দিয়ে শরীরটা আঁকা, মধ্যেকার জমি আড়াআড়ি বেড়াবোনার মত রেখা অথবা সমান্তরাল রেখা দিয়ে ভর্তি। কুল্লীর মতই জন্তুদের শরীরগুলো চ্যাপ্‌টা, লম্বা করে আঁকা কুল্লীর পটারীর সঙ্গে

হরপ্পা সংস্কৃতি
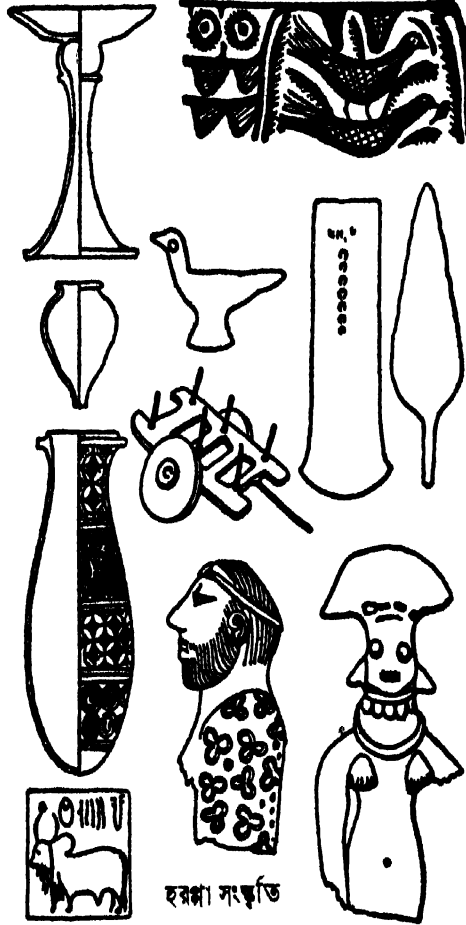
বাস্তবিক খুব সাদৃশ্য আছে। যেমন মহেঞ্জোদারোর একটি পাত্রের গায়ে শরীরটা লম্বা করে আঁকা একটি হরিণ আছে (হয়ত বা শিংওলা ছাগল হবে); তার গা আড়াআড়ি রেখা দিয়ে ভর্তি; প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেটি আবার ফুটকি আর বৃত্ত দিয়ে ভরাট করা, তারই মধ্যে আবার আড়াআড়ি টানা রেখার সঙ্গে রঙের ছোট ছোট চাপ। পাশে আরেকটি দ্বিতীয় জন্তু, বোধ হয় শেয়াল হবে, খোঁচাখোঁচা ডালওলা একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে। যদিও হুবহু কুল্লীর মত নয়, তবুও দেখে

মনে হয় রীতিটা সেখান থেকে মহেঞ্জোদারোর শেষের যুগের আমদানি। কাছেই চানহুদারোতে দেখা যায় আইবেক্স বা শিংওলা কালো হরিণ, আর বড়শিঙ্গা ; এগুলির আদৎ একেবারে হরপ্পার নিজস্ব।

কিন্তু হরপ্পার অদ্বিতীয় ছবি হচ্ছে পটারির গায়ে মানুষের ছবি। একটি পাত্রে একটি মানুষ কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে যাচ্ছে, দুদিকে দুটি বড় বড় মাছধরা জাল, পিছনে বোধ হয় একটি বড় কাছিম, তার
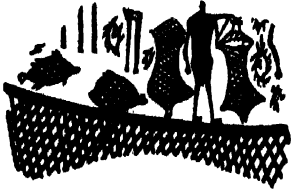
পিছনে মাছ। পা দুটি একটি মোটা রেখার পটির উপর দাঁড়িয়ে; তার তলায় আড়াবোনা রেখা চলে গেছে নীচের দিকে, এটি বোধ হয় নদী, তার পাশ দিয়ে লোকটি হেঁটে চলে যাচ্ছে, অন্ততঃ সেইরকম মনে হয়। যেন কোন আধুনিক ছবি, রেখার অল্পতা আর পারিপাট্যের উপর এত নজর। আর একটি টুকরো পাওয়া গেছে, (এটি বোধহয় অনেক পরের) সেটি দেখে মনে হয় খুব বিশদভাবে আঁকা ছিল। পাত্রটির গা জুড়ে, ফলাও ক'রে অনেকগুলি প্যানেল ছিল মনে হয়। একটি প্যানেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য, তারপরের প্যানেলে চৌকো চৌকো সতরঞ্চ নক্সা, আবার প্রাকৃতিক দৃশ্য, এই ভাবে চলে গেছে। যেটুকু আছে দেখা যায় একটি প্যানেলের একটু টুক্‌রোয় গাছের ডালপালা, তার উপরে একটি পাখী, তলায় এক মা-হরিণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, আরো দুটো পাখী ; প্যানেলের উপর দিকে একটা মাছ, তার সঙ্গে একটা তারা, তারপরে সতরঞ্চর পটি বা প্যানেল। তারপরের প্যানেলের টুকরোয় একটি মানুষ একহাত তুলে দাঁড়িয়ে, আরেক হাত মাথায়, পিছনে একটি ছোট ছেলে, তারও দু'হাত মাথার উপরে তোলা, পাশে দুটি মাছ, মাঠে একটি মোরগ কঁক কঁক করতে করতে যাচ্ছে। আরো দুটো পাত্রের টুকরোয় দেখা যায় গাছ, মানুষের মাথা আর হাত, একটাতে বোধহয় ফনাতোলা গোখ্‌রো সাপ, আরেকটা ডালপালাওলা প্রকাণ্ড গাছ। এইরকম ধরনের কিছু পটারি পারস্যের মাকরাণে 'খুরাব' কারখানায় পাওয়া যায়।

হরপ্পা সভ্যতার আরেক ধরনের পটারির কথা বলতেই হয়। এর নক্সায় একাধিক রঙ ব্যবহার হয়েছে। ইতিহাসের আগের যুগে এ অঞ্চলে নানারঙা পটারি প্রায় পাওয়াই যায় না ; যদিও লাল কালো দুই রঙে আঁকা মাটির জিনিস খুবই পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের রঙীন পটারি, যা আমরা হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোয় পাই, সেগুলি বাফ্‌ বা হলদেটে জমির উপর লাল আর সবুজ রঙে আঁকা। চানহুদারোতে আবার হল্‌দে জমির উপর কালো, সাদা আর লালে আঁকা পাখী আর জন্তু দেওয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি পাওয়া গেছে। কিন্তু হরপ্পায় যেমন লাল, নীল, সবুজ আর হল্‌দে অর্থাৎ পুরো রঙ দেওয়া পটারি পাওয়া গেছে, সেরকম একমাত্র, আগে যা বলেছি, নাল সংস্কৃতিতেই পাওয়া গেছে।

এইবার শেষ করব হরপ্পায় পাওয়া বিশেষ একধরনের পটারির কথা বলে। এটি এইচ— কারখানায় পাওয়া গেছে এক নম্বর আর দু'নম্বর স্তরে। এখানকার পাত্রগুলি খুব মজবুত করে তৈরি,

তাদের গায়ের জমি জ্বলজ্বলে লাল। তাদের গায়ে কালো দিয়ে আঁকা নক্সার সীমাগুলি বেলে-গায়ে শুষে গিয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে, সেরকম তীক্ষ্ণ, কাটাকাটা নেই। শাহীটুম্পের মত। আঁকার রীতিপদ্ধতি খুবই সুনিপুণ, দৃঢ়। পাত্রগুলির গড়ন যেমন মার্জিত, ছবিগুলিও তেমনি সুরুচিপূর্ণ আর পরিপাটি। নিশ্চয় তখনকার কুমারশালে পোড়ানর জন্যে ভাল ভাঁটা বা পোনঘর ছিল। নক্সার মধ্যে পাওয়া যায় নানাধরনের তারা, স্টাইলাইজ করা গাছপালা, ফুটকি আর বৃত্ত, সোজা আর আঁকাবাঁকা লাইনের সারি আর ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বা পিছনের জমি ভরাবার জন্য ঘুরপাক খাওয়া রেখা। এগুলি খানিকটা ধ্রুপদী বা জ্যামিতিক বা ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্মাল নক্সা, তাছাড়া প্রায়ই পাওয়া যায় ষাঁড়, বলদ বা গরু, ছাগল, ময়ূর, মাছ, খুব জঁাকালোভাবে আল্‌পনার মত আঁকা। কখনও কখনও পাত্রের গা বেয়ে সবটা চলে গেছে, কখনও বা প্যানেল করে' আঁকা। কখনও বা ঢাকনির ভিতর গোল করে আঁকা। এসব ছবি মোটেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভাবে আঁকা নয়, উল্টে এগুলি যেন সংকেতে বা প্রতীকে, যাকে ইংরেজিতে বলে সিম্বলিজমে ভর্তি—একসার ময়ূর তাদের মাঝে মাঝে তারার সভা বা সূর্য। এই ময়ূরের গায়ে বা পেটে আবার একটি গোল, তার মধ্যে পুরো মানুষ আঁকা। আরেকটি
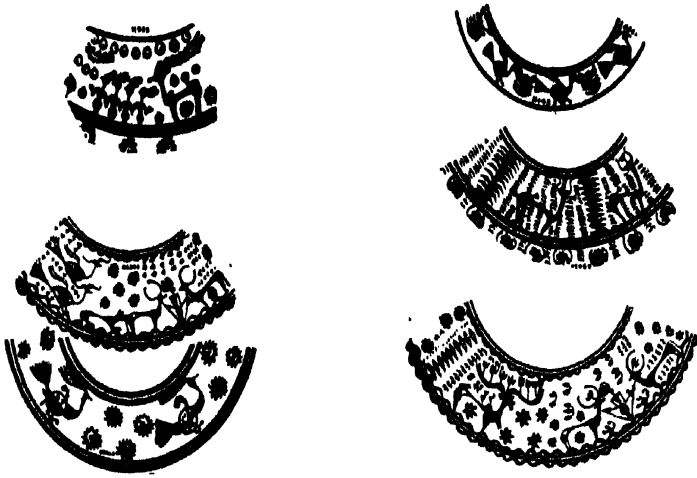
পাত্রে আবার ময়ূরের সঙ্গে এক ধরনের সেণ্টর্‌ একের পর এক চলে গেছে, সেণ্টরের মাথায় বড়শিঙার মত বড় বড় শিং। আরেকটি অদ্ভুত ভাসের উপরদিকে একটা গোল করে' পটি বা ফ্রিজ আছে। শুরু হয়েছে দুটি ময়ূর দিয়ে, তারপরে একটি ছবি, তাতে উস্কোখুস্কো হাওয়ায় উড়ছে চুলওলা একটি মানুষ, ধরে আছে দুটি গরু, তাদের পিছনে একটা কুকুর। তারপরে আসছে একটি পটি, তারপরেই অদ্ভুত ধরনের ককুদওলা একটা ষাঁড়, তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিঙে সাতটি পতাকার মত কি যেন লাগানো, ঠিক বোঝা যায় না। তারপরে আসছে আরেকটি লোক দুটি গরু অথবা ষাঁড় নিয়ে, তাদেরও প্রত্যেকের শিংজোড়ার মধ্যে একটি পতাকা, খানিকটা মনে হয় যেন ক্রীটের মিনোয়ান ষাঁড়, মাথায় জোড়া

কুড়ুল। সারা ছবিটাই আবার তারা, পাতা ঘুরপাক খাওয়া রেখায় ভর্তি। এরকম ছবি আঁকা পাত্র এ অঞ্চলে একেবারেই অভূতপূর্ব। একমাত্র পাওয়া গেছে কিছু সামারা পটারিতে।

ইতিহাসের আগের যুগের ছবির কথা নিয়ে অনেকখানি লিখলাম।

ছবির কথা বলতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্বের কথা বলবার মত হল। কিন্তু ছবিগুলি একটু যত্ন করে দেখলে ঔৎসুক্য বেড়ে যাবে, বড় বইয়ের সন্ধান করতে ইচ্ছা হবে। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকারের প্রকাশিত "ফার্দার এক্সক্যাভেশন্স্ এ্যাট্ মহেঞ্জোদারো" বার হয়, তার দ্বিতীয় খণ্ডে ৫২ থেকে ৯০ নম্বর পর্যন্ত ছবিগুলি পটারি চিত্র, তার সঙ্গে প্রথম খণ্ডে ১৭৪ থেকে ২৯৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তাদের বর্ণনা। ১৯৪০ সালে ভারত সরকারের প্রকাশিত "এক্সক্যাভেশনস্ এ্যাট্ হরপ্পা" বলে বইটির প্রথম খণ্ডে ২৭৫ থেকে ৩১৫ পৃষ্ঠা অবধি আছে বর্ণনা, আর দ্বিতীয় খণ্ডে ৬০ থেকে ৭৫ নম্বর পর্যন্ত ছবি।
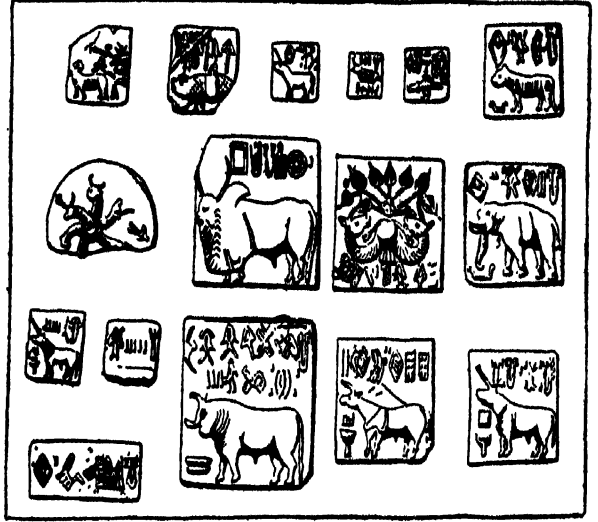
উত্তরপ্রদেশের বেরিলী জেলার অহিচ্ছত্রে খৃষ্টযুগের প্রথম দিকের কিছু চিত্রিত পটারি পাওয়া গেছে।

জোব, রাণাঘুণ্ডাই, কোয়েটা, আমৃরি, নান্দারা, নাল্, কুল্লী, শাহীটুম্প, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারোর সম্বন্ধে বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য আছে। প্রথমেই বলি যে আজকের দিনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপানে যা ঘটছে, তার সন্ধান যেমন আমরা আমাদের দেশে পাই, আমাদের দেশের সন্ধানও তারা পায়, তেমনি ইতিহাসের আগের যুগেও নিশ্চয় সেরকম আদানপ্রদান যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত একদেশে ছবি আঁকার ব্যাপারে নতুন কিছু হলে তার খবরটা নিশ্চয় অন্যদেশে তাড়াতাড়ি চলে যেত, অর্থাৎ শিল্পীরা বৈজ্ঞানিকদের মত চিরকালই আন্তর্জাতিক। শুধু যে রেম্ব্রান্ট পারসীক বা মুঘল ছবি নকল করতেন, তা নয়।

এসবের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের ছবিতে, ভাস্কর্যে জীবনের সব কিছুর সম্বন্ধে আছে অপরিসীম আগ্রহ ও আনন্দ। সৃষ্টির প্রাচুর্য, রূপ, রস, গন্ধ, প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর যোগ, গাছপালা, ফুলফল, লতাপাতার সঙ্গে কীটপতঙ্গ থেকে অতিকায় হাতী পর্যন্ত সমস্ত রকমের জীবন্ত জিনিসের সঙ্গে একান্ত যোগ, সারা বিশ্বের সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা, যাকে ইংরেজ কবি কীটস্ বলেছেন "ওআন্‌নেস্ অব্ দি ইউনিভর্স", তার উন্মাদনায় বিভোর, আত্মহারা হয়ে ভারতীয় শিল্পী যেন পাগলের মত এঁকে গেছেন। এমন কি এই আগ্রহের দরুণ ও সেই অনুপাতে শিল্পজ্ঞানের স্বাধীনতা মনে বা

হাতে না থাকায় আঁকার মধ্যে অসংযম বা পারিপাট্যের অভাবও দেখা যায়। ভারতশিল্পের এ ধারার মূল উৎস আমরা খুঁজে পাই এই দুই নদীর সভ্যতার মৃৎপাত্রের ছবিতে। এর পরের কথা হল, লাল কালো রঙে আঁকা, লালের উপরে লাল দিয়ে ছবি আঁকা, তারপরে জ্বলজ্বলে হলদে, সবুজ, নীল, লালে ছবি আঁকার রীতি বরাবরই যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব রীতি, ঐতিহ্যের সিঁড়ি বয়ে চলে এসেছে আমাদের লোকশিল্পে, একালের সজ্ঞান শিল্পীর কাজ পর্যন্ত। তারপরের কথা হল, যে-ধরণের লতাপাতা, ফুলফল, জ্যামিতিক রেখা, প্রাকৃতিক বা আজগুবি জীবজন্তু বা জীবজন্তুর স্টাইলাইজড বা রীতিবিন্যস্ত ছবি আমরা দুই নদীর দেশে পাই, তার প্রায় সব কটি নক্সা ঘুরে ফিরে সারা ভারতের ভাস্কর্যে আর চিত্রকলায় পাওয়া যায়। বিশেষ দেখা যায় মাটির পাত্রের নক্সায়, কার্পেটে, সতরঞ্চে, বিছানাঢাকায়, সাজে, পুতুলে, আর সবচেয়ে বেশি বোধ হয় বাংলার কাঁথায়।

শেষকথা হল যে এইসব পটারিতে যেখানেই মানুষের ছবি আছে, সেখানেই তারা মিশর বা অসিরিয়ার ছবির রাজারাজড়া বা সম্রাট নয়, তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ, মাঠে কাজ করছে, গরু বাঁধছে, মাছ ধরছে, মাথায় হাত দিয়ে আছে। এই দৈনন্দিন, নিতান্ত ঘরোয়া কাজে রত মানুষের ছবি ভারতের শিল্পে সব যুগেই প্রকাণ্ড একটা জায়গা জুড়ে' আছে, আর সেইজন্যই দেখতে অত ভাল লাগে। : আমরা এখন বুঝতে পারছি যে এরও মূল সূত্র বা ঐতিহ্য সেই আর্যপূর্ব ইতিহাসের আগের যুগের দুই-নদীর সভ্যতার মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোর ছবিতে।
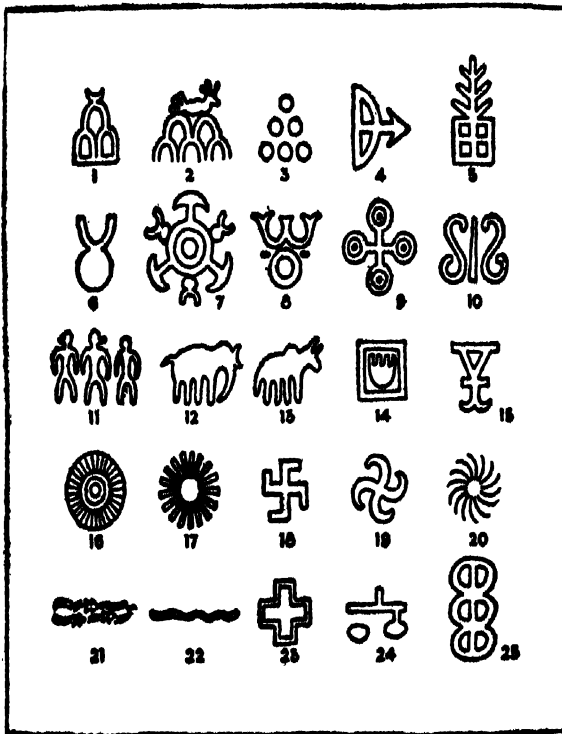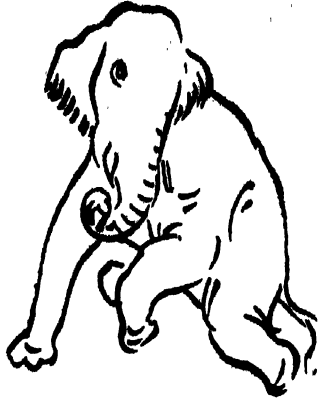
দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের যুগে গুহাচিত্র

যোগীমারা

ভারতবর্ষে পাথরের যুগে যে সব গুহাচিত্র পাওয়া গেছে তার কথা অল্প বলেছি। সেগুলি ইতিহাসের যুগের আগের কথা, বহু হাজার বছর আগে যখন মানুষ বন্য ছিল, গায়ে লম্বা লম্বা লোম ছিল, জন্তু জানোয়ার মেরে তারই মাংস কোন রকমে ঝলসিয়ে খেত, সেই জানোয়ারেরই চর্বির সঙ্গে লাল মাটি বা পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে, কাঠ কয়লার কালি দিয়ে ছবি আঁকত অথবা পাথরের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে গুহার দেয়ালের ভিতরের বা বাইরের গায়ে ছবি খুদত। অনেক সময়ে ছবি খুদে তাতে রঙ ঢুকিয়ে দিত। এ সবের বহু হাজার বছর পরে জোব, আম্‌রি, নান্দারা, নাল, শাহীটুম্প, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর যুগ এল। এসবের পরেও আবার বহুদিন কোন কিছুর চিহ্ন নেই। সোজা চলে আসতে হয় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে, তখনকার চিত্র করা গুহার কথা বল্‌ব। মধ্যপ্রদেশে সুরগুজায় রামগড় ব'লে একটি পাহাড় আছে। সেই রামগড়ে যোগীমারা গুহার দেয়ালে আঁকা কয়েকটি ছবিই আমাদের ইতিহাসের যুগের প্রথম ছবি বলা যায়।

রামগড়ের ছবি ইংরেজিতে যাকে বলে ফ্রেস্কো করা। ফ্রেস্কো মানে কি একটু বলি। পাথরের বা অন্য কিছুর দেয়ালে প্রথমে চুন বালি বা অন্য কিছুর একটা আস্তর দেওয়া হয়। আস্তরকে আমরা বলি পলেস্তারা, ইংরেজিতে প্লাস্টার। সেই আস্তর ভিজে থাকতে থাকতে, অর্থাৎ সদ্য লাগান অবস্থায় ভিজে দেয়ালের গায়ে ছবি এঁকে তাতে রঙ করা হয়। রঙ সাধারণত জলে গোলা হয়। এই রঙ ভিজে আস্তরে লেগে সেই জমিতে শুষে যায়। তারপর যখন শুকোয় তখন আর ওঠে না। সুতরাং ফ্রেস্কোয় আঁকার বা রঙের কিছু ভুল হলে আর উপায় নেই, হয় সেই পলেস্তারাটি আবার চেঁচে

ফেলে দিয়ে, নতুন আস্তর লাগিয়ে নতুন করে জায়গাটি আঁকতে হবে, না হয় যে ভুল হল সেই ভুলই থেকে গেল। ফ্রেস্কো যাতে খুব মসৃণ আর টেকসই হয় সেজন্য ইউরোপীয় ফ্রেস্কো রীতির চেয়ে আমাদের দেশের পুরনো ফ্রেস্কো আরও যত্ন নিয়ে তৈরি করা হত। ইতালিয়ান ইন্‌ফ্রেস্কো থেকে ইংরেজি 'ফ্রেশ' এসেছে, ফ্রেশ মানে কাঁচা বা টাটকা, অর্থাৎ কাঁচা সদ্যলাগান পলেস্তারা। যোগীমারার ফ্রেস্কো দেখে মনে হয়, তখনই ফ্রেস্কো-রীতিতে বহুদিন থেকে শিল্পীরা অভ্যস্ত। গুহার ছবিগুলি অবশ্য খুব উঁচুদরের নয়। কয়েক জায়গায় চৈত্য-জানালা আঁকা, তিন ঘোড়ায় টানা দুই চাকার রথ, রথের উপর ছাতা ধরা। সাঁচি ভারুতের কথা মনে হয়। ফ্রেস্কোগুলির জমি সবটাই সাদা; তার উপরে মানুষ, জীবজন্তু সাধারণত গাঢ় লালে আঁকা, কোথাও বা কালোয়। ছবিগুলি প্যানেলে ভাগ করার সময়ে হলদে পটি ব্যবহার হয়েছে। মানুষের শরীর গাঢ় লালে আঁকা, কখনও বা সীমারেখাগুলি কালো রেখায় আঁকা। মাথার চুল মাথার বাঁ দিকে ঝুঁটি করে বাঁধা। সাদা জমির উপর লাল সীমারেখায় পরিচ্ছদ আঁকা। মানুষের গায়ের মত হাতী, ঘোড়া, পাখী, গাছ সবই লাল রঙে আঁকা। একই বিন্দুকে কেন্দ্র করে কতকগুলি বৃত্তাকারে ছবিগুলি আঁকা। এই বৃত্তগুলি লাল আর হলদে রঙে আঁকা, মধ্যে মধ্যে জ্যামিতিক নক্সা আছে। বৃত্তগুলি ছোট ছোট প্যানেল বা কক্ষে ভাগ করা। তাদের মধ্যে ছবি। ওদেরই মধ্যে যে ছবিগুলি এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে তাদের বিষয় আর রীতি দেখে মনে হয় বোধ হয় জৈন চিত্র হবে, কারণ পুরুষের ছবির গায়ে একেবারে কাপড় নেই। বৌদ্ধ ছবি হলে তা হ'ত না। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কথা জানা আছে নিশ্চয়। তাঁরা পুরাকালে নাগা বা নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। চারটি প্যানেলের ছবি বেশ বোঝা যায়, অন্যগুলি অস্পষ্ট। এই চারটির একটির মধ্যস্থলে একজন পুরুষ গাছের তলায় বসে আছে, বাঁদিকে নর্তকী আর বাদ্যকরের দল, ডানদিকে এক শোভাযাত্রা, সঙ্গে একটি হাতী। দ্বিতীয় কক্ষে কতকগুলি পুরুষ একত্রে, একটি চক্র, তার সঙ্গে জ্যামিতিক নক্সা। তৃতীয় কক্ষের এক অর্ধেকে ফুল, ঘোড়া, কাপড় পরা মানুষের অস্পষ্ট ছবি, অন্য অর্ধেকে একটি গাছের ডালের উপর একটি উলঙ্গ শিশু বসে, তার কাছে একটা পাখী, আর গাছের তলায় গোল করে কতকগুলি উলঙ্গ লোক দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের মাথার বাঁদিকে খোঁপা করে চুল বাঁধা। খানিকটা শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র হরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। চতুর্থ কক্ষের প্রথম ভাগে একটি উলঙ্গ লোক বসে, তার পাশে তিনজন কাপড় পরা লোক দাঁড়িয়ে, পাশে আরও দুটি উলঙ্গ লোক বসে, তাদের পাশে আবার আরও তিনটি কাপড় পরা লোক দাঁড়িয়ে। এরই তলার দিকে চৈত্য জানালাওলা একটা বাড়ি, একটা হাতী, সমুখে তিনটি কাপড় পরা লোক। এদের কাছেই তিন ঘোড়ায় টানা একটা রথ, রথের উপরে ছাতা, তার পাশে আরেকটি হাতী আর তার মাহুত। এই প্যানেলের দ্বিতীয় অংশেও ঐ ধরনেরই ছবি।

যোগীমারায় যেটুকু ছবি আছে সেটুকুর একটু বিশদ বর্ণনা করলাম, ছবির সঙ্গে আবার কিছু

লিপিও আছে। আঁকার রীতি দেখে সাঁচি আর ভারুতের ভাস্কর্যের কথা খুব মনে পড়ে যায়। যোগীমারাকে খৃষ্টপূর্ব এক থেকে দুই শতকে ফেলা যায়। তার পরে নয়ই। যোগীমারা গুহার ছবি যদি ধর্মপ্রণোদিত বলে মানতেই হয়, তবে তাতে বোধহয় বৌদ্ধের চেয়ে জৈনের প্রভাবই বেশী বলতে হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বরাবরই, আবহমান কাল থেকে, ভারতবর্ষে ধর্মবিষয়ক ছবিতেও জাগতিক, দৈনন্দিন জীবনের ছবি প্রাধান্য পেয়েছে বেশী, যোগীমারা এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়। আর ব্যতিক্রম নয় বলে, ইতিহাসের যুগের প্রথম বলে জানা গুহাচিত্র হিসাব, যোগীমারার ছবির একদিকে ইতিহাসের আগের যুগের ছবির সঙ্গে, অন্যদিকে ইতিহাসের যুগের অজন্তা, ইলোরা, ইত্যাদি গুহাচিত্রের সঙ্গে বেশ একটি ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে। আঁকার রীতি হিসাবেও সম্বন্ধ বেশ স্পষ্ট। চিত্রগুলি সাদা জমির উপর প্রায়ই লালে আঁকা, কচিৎ কালোয়। মানুষ বা জীবজন্তুর ছবির রেখা কালোয় আঁকা, কাপড় সাদা, যদিও কাপড়ের সীমারেখাগুলি লাল, চুল কালো, চোখ সাদা, ছবির প্যানেল ভাগ করার সময়ে শুধু সীমারেখায় হলদে এসেছে, কিন্তু নীল সচরাচর দেখাই যায় না।

অজন্তা

এর ঠিক পরেই এল যাকে বলা যায় ইতিহাসের যুগের গুহাচিত্রের পাকা সড়ক, রাজপথ, যা নিয়ে চিত্র জগতে প্রাচীন ভারতের এত নামডাক, সম্মান, অর্থাৎ অজন্তা। অজন্তায় প্রথম ছবি আঁকা আরম্ভ হয় বোধহয় খৃষ্টযুগের এক শতকের মাঝামাঝি, যদিও গুহাগুলি খোদাই আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব দুই শতকে, শেষ হয় খৃষ্টীয় সাত শতকে বা তারও পরে ; অর্থাৎ অজন্তার ছবি প্রায় সাতশ বছর ধরে আস্তে আস্তে আঁকা। খৃষ্টীয় ৭৯ সালে পম্পিয়াই আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদগারের তলায় চাপা পড়ে যায়। ১৭৪৮ সালে পম্পিয়াই খোড়াখুঁড়ি আরম্ভ হয়, তার ফলে সেখানকার বাড়ীর দেয়ালে আঁকা আশ্চর্য্য সুন্দর ছবি সব বেরিয়েছে। ইজিপ্টের পিরামিড, চীনের টুনহুয়াঙ গুহাগুলি, ক্রীটদ্বীপের কিছু ধ্বংসাবশেষ, পম্পিয়াই বাদ দিলে, এক জায়গায় একত্রে এত সুন্দর, এত প্রাচীন ছবি অজন্তা ছাড়া পৃথিবীতে অন্যত্র বোধ হয় নেই।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের খান্দেশ জেলায় ফর্দাপুর বলে একটি ছোট শহরের ৩½ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, অন্যদিকে অজন্তা নামেরই একটি ছোট শহরের চার মাইল উত্তরপশ্চিমে, অজন্তা গুহার সারি। গুহাগুলি ইন্দ্যাদ্রি পর্বতমালার নীচে একটি ঘাটের কাছে, এই ইন্দ্যাদ্রি পাহাড়ের একদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, অন্যদিকে তাপ্তি নদীর উপত্যকা। বাগোড়া বলে একটি পাহাড়ে নদী পাথরের

বুকে গভীর রাস্তা কেটে চলে গিয়ে হঠাৎ সাতটি জলপ্রপাত করে বহু নীচে পড়েছে। তাদের শেষ ধারাটি প্রায় ৭০।৮০ ফিট নীচে লাফিয়ে পড়েছে। এদের বলে সাতকুণ্ড। গুহার পাহাড়টি এই বাগোড়ার গায়ে-চাঁদের কলার মত সোজা প্রায় আড়াই'শ ফিট খাড়াই হয়ে পাড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম, আবার তেমনি মন উদাস করা। এই খাড়াই পাহাড়ের গায়ে উনত্রিশটি গুহা খুদে খুদে তৈরি, সাধু সন্তদের থাকার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা বোধহয় হতে পারে না। লম্বায় প্রায় ছ'শ গজ জায়গা জুড়ে একের পর এক গুহা বাগোড়া নদীর বুক থেকে ৩৫ থেকে ১০০ ফুট উঁচুতে পুব থেকে পশ্চিমে বরাবর চলে গেছে।

গুহাগুলি আবিষ্কার হয়েছে মাত্র সোয়াশ বছর। তার আগে হিউয়েন সাঙের (৬৪০ খৃষ্টাব্দ) পরে অজন্তার খবর ইতিহাসের পাতায় বা ভ্রমণ বৃত্তান্তে নেই বললেই হয়। একবার একটু উল্লেখ পাওয়া যায়, ঔরঙ্গজেবের সৈন্যরা দাক্ষিণাত্য জয়ের পর দিল্লী ফেরার পথে গুহায় ঢুকে বিশ্রাম করেছিল। তারপর আর খোঁজ খবর নেই। ১৮০৩ সালে আসাহী যুদ্ধের পর লর্ড ওয়েলেস্‌লির সৈন্যরা অজন্তা শহরে বিশ্রামের জন্য ছাউনি ফেলে। তখন কয়েকটি পল্টন ছুটকে গিয়ে গুহাগুলি দেখে আসে, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ রান্নার জন্য গুহার মধ্যে আগুন ধরিয়ে অপরিষ্কার করে আসে। কিন্তু অজন্তা আসলে ভাল ভাবে আবিষ্কার হয় ১৮১৯ সালে। ঐ সালে যদিও অজন্তার পরিচয় পাওয়া গেল, তবুও উৎসাহী পণ্ডিতদের আসতে আরও কিছু বছর লাগল। প্রথম আবিষ্কারের সময়ে শত শত বছরের অযত্ন সত্ত্বেও, প্রায় প্রত্যেক গুহাতেই ফ্রেস্কো দেখা গিয়েছিল। ১৮২৯ সালে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অজন্তার চিত্ররাজি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। কিন্তু কারোর টনক নড়ল না। ১৮৩৮-৯ সালে জেম্‌স্ ফার্গুসন বলে এক ভদ্রলোক গেলেন গুহাগুলি দেখতে। ১৮৪৫ সালে তাঁর অজন্তা এবং অন্যান্য গুহার উপর প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি প্রথমে একটি ভাষণ হিসাবে জার্নাল অভ দা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫শ খণ্ডে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। জেম্‌স্ ফার্গুসন ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত আর পাকা জহুরী। ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস আর ভূতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেরই নমস্য গুরু হচ্ছেন ফার্গুসন। যে-সব বিষয়গুলির উল্লেখ করলুম-সে সবের অনেকগুলিতেই ফার্গুসনের কাজ এখনও প্রামাণ্য, অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত। অনেকেই ফার্গুসের লেখা নিজের বলে ভাঙ্গিয়ে বিখ্যাত হবার চেষ্টা করেন, স্বীকারও করেন না। ফার্গুসন সাহেব অজন্তা দেখে লাফিয়ে উঠলেন। তখনি লেগে গেলেন কি করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের বলে কয়ে সরকারের খরচায় অজন্তার ছবির ভাল করে নকল তুলে রাখা যায়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে কোম্পানি মেজর গিল বলে এক শিল্পীকে অল্পদিনের মধ্যেই নিযুক্ত করেন। মেজর গিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে (১৮৪৪-১৮৬৩) বহু কষ্ট স্বীকার করে একা একা বসে বসে নকল করতে থাকেন। ত্রিশটির উপর বড় বড় জড়ান পটে যখন নকল শেষ হয়, তখন সেগুলি এক এক করে

বিলেত পাঠান হয়। কিন্তু তার পরে অত্যন্ত আপশোষের এক ব্যাপার ঘটল। ১৮৬৬ সালে লণ্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখানর ব্যবস্থা হয়, আর সেখানেই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ৫টি পট ছাড়া বাকি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কিন্তু নানা অত্যাচারে অজন্তার ফ্রেস্কোগুলি ক্রমেই নষ্ট হতে থাকে। ১৮৭৯ সালে ডাঃ বার্জেস যখন ভাল করে ফোটো তুলতে যান তখন মাত্র ষোলটি গুহায় ছবি ছিল, বাকিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে বম্বে স্কুল অভ আর্টের অধ্যক্ষ ডাঃ গ্রিফিথ্‌সের চেষ্টায় ভারত সরকার সরকারি খরচে নতুন করে নকল তোলার আদেশ দেন। ডাঃ গ্রিফিথস্‌ তাঁর ছাত্রের দল নিয়ে ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত খেটে বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে ছবির নকল করেন। সেগুলি তিনি অনেক যত্নে সম্পাদনা করে খেটে খুটে সত্যিকারের বিদগ্ধ মন আর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে, একটি প্রকাণ্ড ভূমিকা লিখে, ১৮৯৬ সালে বিরাট আকারের দুই খণ্ড বইয়ে লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন। প্রায় চোদ্দ বছর ধরে ডাঃ গ্রিফিথ্‌স্‌ আর তাঁহার ছাত্রেরদল সব শুদ্ধ ৩৩৫ টি কপি তৈরি করেন, তার মধ্যে ১নং গুহার ১৭৭টি, ২নং গুহার ৫০টি, ৬নং গুহার ৫টি, ৯নং গুহার ১১টি, ১০ নম্বরের ১৮টি, ১১ নম্বরের ১টি, ১৬ নম্বরের ১৮টি, ১৭ নম্বরের ৫১টি, ১৯ নম্বরের ১টি, ২১ নম্বরের ২টি, আর ২২ নম্বরের ১টি। এদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে বড় সেগুলির একটির মাপ ৩৭ ফিট লম্বা ১২ ফিট ১ ইঞ্চি চওড়া, অন্যটির ৩৫ ফিট ২ ইঞ্চি লম্বা ১২ ফিট ২ ইঞ্চি চওড়া। এ রকম অতিকায় সাইজের কপি অনেকগুলিই হয়।

কথায় বলে পোড়া কপাল। অদৃষ্টের লিখনই ছিল বোধহয় যে অজন্তায় গত শতকেও অটুট অবস্থায় যেটুকু ছিল সেটুকুর কপিও পৃথিবীর লোকের ভাগ্যে দেখা জুটবে না। তাই ডাঃ গ্রিফিথ্‌স্‌ কপিগুলি লণ্ডনের সাউথ কেনজিংটন মিউজিয়মে পাঠানর অল্পদিন পরেই সেখানেও অগ্নিকাণ্ড হল, ফলে ১৮৫টি কপি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বাকি ১৫০টির মধ্যে আবার অনেকগুলি খারাপ হয়ে গেছে, যেগুলি এখনও ভাল আছে সেগুলি ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে খুব সযত্নে রাখা আছে। ইতিমধ্যে কিন্তু অজন্তার ছবিগুলির উপর কালাপাহাড়ি অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। নিজামের কর্মচারীরা কিছু কিছু ছবি বেচবার দুরাশায় কোদাল ছুরি দিয়ে পলেস্তারা চাঁচতে লেগে গেলেন; সেই সব ডাকাতের দলে বম্বের এক প্রত্নতাত্ত্বিক, ডাঃ বার্ডও জুটে গেলেন। বলাই বাহুল্য, এই সব বাহাদুর ডাকাতের ভাগ্যে কয়েক সের করে রঙীন ধুলো ছাড়া আর কিছু জুটল না, কিন্তু তাঁরা অজন্তার গুহাচিত্রের দফা অনেক জায়গায়ই বেশ ভাল করে নিকেশ করলেন। ১৯০৩ সালের পর নিজাম সরকারের চৈতন্য হল, কিন্তু ইতিমধ্যে অযত্নে, জলের স্যাঁতসেঁতানিতে, নকলকারদের পাণ্ডিত্যে আর ডাকাতদের লোভের অত্যাচারে অজন্তার ছবির অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেল। ১৯০৯-১১ সালের মধ্যে লেডী হেরিংহ্যামের উদ্যোগে অজন্তার কতগুলি গুহার ছবির নকল হয়। এই নকলগুলি শ্রীমতী হেরিংহ্যাম লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে উপহার দেন। ১৯১৫ সালে সোসাইটি সেগুলি দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। যাঁরা নকলের

কাজে লেডী হেরিংহ্যামকে সাহায্য করেন তাঁদের নাম ডরথি লার্চার, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সৈয়দ আহম্মদ, মহম্মদ ফজলউদ্দিন ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯১৭ সালে মুকুলচন্দ্র দে বিখ্যাত জাপানী শিল্পী আরাইএর সঙ্গে অজন্তা যান, ও ১৯১৯ সালে দ্বিতীয়বার অজন্তা গিয়ে কিছু ফ্রেস্কো নকল করেন। তাঁর 'মাই পিল্‌গ্রিমেজেস্‌ টু অজন্তা অ্যাণ্ড বাঘ' বলে একটি চমৎকার বই আছে। সেটি ১৯২৫ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। অবশেষে দুজন ইতালিয়ান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর লরেনৎসো চেচ্চোনি আর কাউন্ট অর্সিনি এলেন, আর ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত কাজ করে বহু পরিশ্রমে ফ্রেস্কোগুলি পরিষ্কার করে উদ্ধার করেন। ছবিগুলি পরিষ্কার করে, যে সব নিকৃষ্ট শিল্পীরা খেয়াল খুশীমত বাজে রঙ লাগিয়েছিল সেগুলি ঘষে ঘষে তুলে, তাঁরা এমন সব স্বচ্ছ আঠার মত জিনিষ লাগালেন যাতে বাকি ছবিগুলি আর দেয়াল থেকে উঠে না আসে। ঠিক যেমন গত শতকে এক ইতালিয়ান ওস্তাদ ইতালির একটি মনাস্টারির একটা নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘরের দেয়ালে লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা জগদ্বিখ্যাত 'লাস্ট সাপার' ফ্রেস্কোটির উদ্ধার করেন। কিন্তু ১৮১৯ সালে অজন্তার ফ্রেস্কোর যাও বা ছিল আজ তার সামান্য অংশ মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য আজও অতর্কিতে আনাচে কানাচে নতুন ছবি আবিষ্কার হয়, যেমন হয়েছে ১৯৩৫ সালে ৬নং গুহার ছোট ছোট কুঠুরির দরজার উপর। সম্প্রতি নিজাম সরকারের তরফ থেকে ডাঃ জি, ইয়াজদানি চারটি বিরাট খণ্ডে অজন্তার অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন, সেগুলি খুবই ভাল। প্রথম খণ্ডটি বেরোয় ১৯৩১ সালে, চতুর্থটি ১৯৫৫ সালে। ইয়াজদানির অ্যালবামের অধিকাংশ ছবি ই-এল ভেসি বলে এক ভদ্রলোকের তোলা রঙীন ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া। সম্প্রতি ইউ-এন-ই-এস-সি-ও বা ইউনেসকো থেকে অজন্তা সম্বন্ধে ৩২টি রঙীন ছবি শুদ্ধ একটি সুন্দর অ্যালবাম বেরিয়েছে। ফার্গুসন, গ্রিফিথ্‌স্‌, বার্জেস, শ্রীমতী হেরিংহ্যাম আর ইয়াজদানির লেখা অজন্তার ইতিবৃত্তগুলি পড়া খুব দরকার। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে, চীনাভবনে ও কলকাতার রবীন্দ্রভারতীর ভাণ্ডারে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর হাতের অজন্তা ও বাঘের কিছু উৎকৃষ্ট নকল আছে।

১৮৭৯ সালে ষোলটি গুহাতেই মোটামুটি ছবি পাওয়া যায়। তাদের নম্বর পূব থেকে পশ্চিমে হচ্ছে ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২ আর ২৬। গ্রিফিথ্‌স্‌ কোন কোন গুহা থেকে কতগুলি নকল তোলেন তার হিসাব আগেই দিয়েছি। সবচেয়ে বড় সাইজের কপি হয় ১৭নং গুহা থেকে, তারপর হয় ২নং আর ১নং থেকে। ৮, ১২ আর ১৩নং গুহাই বোধ হয় সব চেয়ে প্রাচীন, তাদের গায়ে কোন ছবি নেই। তার মধ্যে আবার ১৩নং গুহাই বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন, এর দেয়ালগুলি খুব মসৃণ, কিন্তু ছবি নেই। এটির খোদাইএর তারিখ বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব ২০০ বছর। ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ আর ১৩নং গুহাগুলি বোধহয় প্রথম কালের হীনযান মতাবলম্বীদের সময়ে খোদাই। এদের বয়স বোধহয় খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ বছরের উপর বিস্তৃত।

আর বাকি সবগুলিই মহাযান মতাবলম্বীদের কীর্তি। ৬ আর ৭নং গুহার তারিখ বোধহয় ৪৫০ থেকে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অন্যগুলি অর্থাৎ ১ থেকে ৫ আর ১৪ থেকে ২৯নং গুহাগুলি বোধহয় ৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে খোদাই, এর মধ্যে কতকগুলি শেষ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণই রয়ে গেছল। ফার্গুসনের মতে ১নং গুহার ছবিগুলির বয়সই সবচেয়ে কম। বলাই অবশ্য বাহুল্য যে গুহা খোদাইএর বেশ কিছু পরে অজন্তার চিত্রসৃষ্টি হয়। বোধহয় ৯ আর ১০নং গুহার চিত্রই সবচেয়ে প্রাচীন। এই দুটি গুহায় এক পরত ছবির তলায় আবার মাঝে মাঝে আর এক পরত ছবি পাওয়া গেছে। এখন ছবি দেখতে পাওয়া যায় ১, ২, ৯, ১০, ১৬ আর ১৭নং গুহায়। অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে ছবি ছিল ১৬টি গুহায়, এখন ৬টিতে। এই ৬টি গুহায় অবশ্য ছবি আছে সারা দেয়ালময়, এমন কি থাম আর ভিতরে ছাতের সমস্ত জায়গা জুড়ে।

ভারুত, অমরাবতী, সাঁচির ভাস্কর্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের যদি কোথাও আশ্চর্য্য মিল থাকে তা ৯ আর ১০নং গুহার ছবির। শ্রীযুক্ত সি শিবরামমূর্তি তাঁর 'অমরাবতী স্কাল্‌পচার্স ইন দা মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট মিউজিয়ম' (মাদ্রাজ, ১৯৪২) বইয়ে পাশাপাশি রেখাচিত্র সাজিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন বসনভূষণ মুকুট, পাগড়ী, অঙ্গভঙ্গী, শরীরের গড়ন, ভাবভঙ্গীতে অজন্তার ছবির সঙ্গে, বিশেষ করে নারীদের, সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীর ভাস্কর্যের কত আশ্চর্য মিল। পণ্ডিতরা বলেন এই দুটি গুহার ছবিই সবচেয়ে প্রাচীন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের। তা যদি হয় তবে ভারুত সাঁচির সমসাময়িক বলতে হয়। অজন্তার ছবি মোটামুটি তিন যুগে ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে ৯ আর ১০নং গুহার যুগ। এগুলি যদিও সবচেয়ে প্রাচীন, তবু এত আগেও চিত্রকলা ক্রমবিকাশের খুব উঁচু পর্যায়ে উঠেছিল বলতে হবে, কারণ এগুলিতে আমরা একদিকে যেমন দেখি নক্সা আঁকার দক্ষতা, অন্যদিকে তেমনি পরিষ্কার পরিপাটি কাজ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে অজন্তার প্রাচীনতম ছবিতেও আমরা শিক্ষানবিশী হাতের অর্থাৎ কাঁচা হাতের নমুনা একটুও পাই না, সবই পরিপুর্ণ, নিটোল, পাকা হাতের কাজ, কোথাও দ্বিধা বা অপরিণত হাতের প্রমাণ নেই, রেখা, রঙ, নক্সার পিছনে হাৎড়িয়ে বেড়ান নেই। পরিষ্কার নিপুণ হাত, যেন চিরকাল বনেদী ঐতিহ্যে অভ্যস্ত বহু শতাব্দীর অভ্যাস। বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে এ চিত্ররীতি বৌদ্ধযুগের আগে থেকেই সরাসরি এক খুব দক্ষ

বিরাট চিত্রঐতিহ্যের রাজপথ বেয়ে চলে এসেছে, যে ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণ, যার নতুন করে আজিকের বিষয়ে শেখার বিশেষ কিছু নেই, বরং নতুন নতুন পথে নতুন নতুন শক্তি আর উন্মেষের পরিচয় দিতেই সে ব্যস্ত। ৯ আর ১০ নং গুহার ছবি যখন আঁকা হয় তখন দেশটি বোধ হয় অন্ধ্র রাজদের অধীন

(খৃষ্টপূর্ব ২৭ থেকে ২৩৬ খৃষ্টাব্দ)। এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মী হলেও বৌদ্ধদের উপর বোধহয় অত্যাচার করতেন না। তখন রাজশক্তির সঙ্গে শিল্পী বা সংঘকর্মীদের কি সম্বন্ধ ছিল সঠিক জানা যায় না; হয়ত এসব হয়েছিল কোনও রাজার আদেশে, কিংবা বৌদ্ধসংঘের কর্তৃপক্ষ রাজার কাজ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়ে। হয়ত রাজার অনুমতিতে এই সব গুহা উৎসর্গীকৃতও হয়। কিন্তু ঠিক কি ধরণের সমাজব্যবস্থায় এদের উদ্ভব সঠিক বলা যায় না। এটা প্রায় নিশ্চিত যে তখনকার দিনেও অজন্তা ছিল দুর্গম, লোকচক্ষুর অন্তরালে। যাঁরা শিল্পী ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই তন্মগত হয়ে সৃষ্টির নেশায় সব কিছু ভুলে কাজ করতেন, কোন রাজা এল, কে বা গেল তার হয়ত হিসাবও রাখতেন না। এই ধরনের শিল্পীগোষ্ঠীর প্রমাণ ভারতবর্ষের যেখানে সেখানে মন্দির ইত্যাদির কাজ দেখলেই পাওয়া যায়, কিন্তু কোণার্ক মন্দিরের মত এখানেও এক মুহূর্ত বুঝতে দেরি হয় না যে, যে সব শিল্পী এখানে সব কিছু ত্যাগ করে নিরলস একাগ্রমনে বছরের পর বছর কাজ করে গেছেন, জীবনের রূপ, রস, গন্ধের প্রতি তাঁদের ছিল নিদারুণ আসক্তি। ফুল, লতা, পাতা, পাখী, প্রাণী, মানুষ, সামাজিক আচার ব্যবহার

নিয়ত তাঁদের উত্তেজিত, চঞ্চল, আবিষ্ট করেছে, যার ফলে বাগোড়ার পাথর কাটা নদীর বুকে, জঙ্গলের গুহায়, তাঁরা কখনই নিজেদের মনকে বাঁধা পড়তে দেন নি। বরং প্রতিটি ধর্মবিষয়ক চিত্রেও একান্ত মানুষী ভাব, প্রকৃতির বৈভব, বৈচিত্র্য, প্রাণস্পন্দন, উত্তেজনা যেন উপছে উপছে পড়ছে। ছবিতে জীবনের যেন শেষ নেই। অবশ্য এত আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস সবই সংহত করে আছে একটি অতি সরল ঋজু, নিরাভরণ চিত্রনীতি, যার মূল উপাদান হল আবেগময়, ক্লেশহীন, প্রাণবন্ত, শুধুহাতে-খেলান সীমারেখা। প্রত্যেকটি চিত্রের কম্পোজিশন, অর্থাৎ ছবিতে আঁকা বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ভারসাম্য, সম্বন্ধ, গভীরতা অতি সুন্দর, প্রতিটি বিষয় নিপুণ হাতে আঁকা, নক্সার দক্ষতা বিপুল। প্রত্যেকটা ছবিতে হাত আঁকা দেখলেই বোঝা যায় হাতের মধ্যেই কি পরিমাণ সংবেদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর পর প্রায় ২৫০ বছর পরে অজন্তার চিত্ররীতির দ্বিতীয় যুগ আসে, যার সূচনা আমরা পাই ১০ নং গুহাতেই। এগুলির তারিখ বোধ হয় ৩৫০ খৃষ্টাব্দের আগে পরে। এই সময়ের ছবির সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাই ১০নং গুহার থামগুলির ছবিতে। এ গুলিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট, এ সম্বন্ধে গ্রিফিথ্‌সের যুক্তি যেমন ভাল তেমনি হৃদয়গ্রাহী। গান্ধার শিল্পের প্রভাব সবচেয়ে দেখা যায় কাপড়ের ভাঁজে বা পাটে, এগুলি খানিকটা গতানুগতিক বা মামুলি হলেও পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, গম্ভীর। এসময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল বলা শক্ত, কিন্তু মনে হয় উত্তর ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের, তথা সমুদ্রগুপ্তের শাসনের ছায়া, সুদূর অজন্তায় বেশ এসে পড়েছে। ১৬ আর ১৭ নং গুহার ছবিগুলি এই দ্বিতীয় যুগে ফেলা

যায়। এদের তারিখ প্রায় খৃষ্টীয় ছয় শতক। তখন দেশ বাকতক বংশের অধীনে। ১৬নং গুহার একটি অস্পষ্ট লিপিতে জানা যায় যে বিহারটি এই বংশেরই এক মন্ত্রীর ছেলের হুকুমে খোদাই হয়। বাকতক বংশের নিশ্চয়ই প্রতাপ ছিল, কারণ একবার গুপ্তবংশের সঙ্গে তাদের সন্ধি হয়। ১৬ নং গুহায় ছবির যেটুকু এখনও আছে তার থেকে বোঝা যায় যে এই গুহার চিত্ররীতি সৌন্দর্যের এক নতুন সীমায় ওঠে, গ্রিফিথ্‌স্‌ দেখিয়েছেন পারস্য রীতির সঙ্গে তার কত মিল। এর ঠিক পরেই আসে ১৭নং গুহার ছবি। এই গুহার ছবিগুলি সব গল্পবলা ছবি, প্রত্যেকটিতে এক একটি জাতক আখ্যান। গুহাটি যেন একটি বিরাট ছবির গ্যালারি, যার মাঝে বুদ্ধের জন্ম, জীবনী, মৃত্যুর নানা ঘটনা, নানা উপাখ্যান ভীড় করে জমজমাট হয়ে আছে। এই ছবিগুলির মূল বক্তব্য উপাখ্যান, রীতি নাটকীয়, শান্ত, নির্লিপ্ত, নির্বাণকল্প, ধর্মভাব যেন কম। যেন ছবিগুলি ভীড় করে চারদিক থেকে কথা কয়ে উঠে সমস্বরে দর্শককে বলছে, বুদ্ধের জীবনী কি মহান, কি অনির্বচনীয়। প্রাণ, আবেগ, উত্তেজনায় ভরপুর, যেন কথা কয়ে ওঠা ছবি। বোধহয় ঠিক এইসময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং সেই হিসাবে বুদ্ধের জীবনী প্রচারের তাগিদও হয় সব চেয়ে বেশী।

সবচেয়ে কম পুরনো চিত্র পাওয়া যায় ১ আর ২নং গুহায়। এদের তারিখ মোটামুটি বেঁধে দেওয়া যায়, কারণ ১নং গুহায় একটি ছবি আছে যেখানে সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীন পারস্যের রাজা খসরু পরভেজের পাঠানো দূতদের সম্বর্ধনা করছেন। ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে খৃষ্টীয় ৬২৬ থেকে ৬২৮ এর মধ্যে। এই ঘটনাটির চিত্র ছাড়াও ১নং আর ২নং গুহায় ছবি আঁকার রীতিতেও পারস্য এবং ঐ অঞ্চলের চিত্ররীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ১নং গুহা যে এখনও ছবিতে ভরতি গ্রিফিথ্‌সের তালিকার হিসেব দেখলেই বোঝা যায়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে যে এই গুহার ছবির সঙ্গে দু'শ বছর পরের জাভার বোরো-বুদুর স্তূপের ভাস্কর্যের সঙ্গে খুব মিল আছে। ২নং গুহার চিত্রই বোধহয় সব চেয়ে আধুনিক। স্পষ্টই মনে হয় শিল্পীর হাতের তেজ, আবেগ কমে আসছে, এর মধ্যে অনেক ছবিই আছে যা তখনকার প্রচলিত রীতিদুরস্ত, অর্থাৎ শিল্পী বাঁধা ছকে ছবি ফেলে তুলি বুলিয়ে গেছেন মাত্র, নতুন সৃষ্টির উত্তেজনা নেই। ২নং গুহারই এক ধরণের ছবিতে খোটানের ছবির সঙ্গে মিল খুব স্পষ্ট, ল কক আর অরেল স্টাইনের উদ্ধার করা খোটানের ছবি দেখলে বেশ বোঝা যায়। এমন কি পুরনো তিব্বতী মন্দিরের ধ্বজা, টাংকার, সঙ্গে মিল সাধারণ চোখেও ধরা পড়ে। এই গুহাতেই আর এক ধরনের ছবি পাই যাতে কিন্তু কম্পোজিশন বা বিষয় সংস্থানের তেমন বাঁধুনি নেই, খানিকটা ঢিলে কাজ। অবশ্য এর মধ্যেও প্রধান প্রধান চিত্রগুলিতে পাকা হাতের চিহ্ন ভুল করার অবকাশ নেই, তবুও মনে হয় যেন অস্থির, অপরিণত, মাঝে মাঝে অনিপুণ হাত, খানিকটা এলোমেলো ভাবে কাজ করে গেছে। এ যেন তখনকার যুগের বৌদ্ধধর্মের অবনতি, অবক্ষয়ের ছাপ ছবিতেও এসে লেগেছে। পারসীক প্রভাব ছাড়াও চীনে প্রভাবও ছবিতে সুস্পষ্ট। ছবিগুলিতে চীনে রীতি কত সুস্পষ্ট তা

১৮৪৩ সালে ফার্গুসনই প্রথম বলেন : "অজন্তার রীতির সঙ্গে চীনে রীতির খুব মিল আছে, বিশেষ করে, ছায়ার অভাবে আর রঙের ফ্ল্যাট চরিত্রে।" আরও কত বিষয়ে চীনে লক্ষণ আছে সে কথা গ্রিফিথ্‌স্‌ বিশদভাবে বলেছেন ; যেমন, সাধারণ কম্পোজিশনের রীতিতে, মানুষের চোখের গড়নে ; সমস্ত শরীরের গড়নে ; অনেক অলঙ্কারের গড়নে, আকারে ; প্রতীক ও অলঙ্কারের ব্যবহারে। মাথার মুকুট ও উষ্ণীষ যে একেবারে চীন থেকে আমদানি, সে কথা গ্রিফিথ্‌স্‌ ছবি তুলে তুলে দেখিয়েছেন। যেমন অজন্তার ছবির সাধারণ লোকের পাগড়ী আর ১৮৯২ সালে চীনদেশের সাধারণ লোকের পাগড়ী এবং বাঁধার ঢঙ যে একেবারে এক, তা ছবি তুলে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে দেখিয়েছেন অজন্তার ছবির মেয়েরা কত একান্তভাবে ভারতীয় ; ভারতীয় স্থাপত্যের মেয়েদের সঙ্গে তাদের কত মিল। এমন কি ছেলে-কাঁখে-করা অজন্তার একটি মেয়ের ছবি এমন তুলে দিয়েছেন ঠিক মনে হয় যেন কোন ভারতীয় মা। সম্প্রতি চীন থেকে চীনের টুন-হুয়াঙ গুহাচিত্রের যেসব ছবি বেরিয়েছে, তার রীতি, নীতি কম্পোজিশনের সঙ্গে অজন্তার অনেক হুবহু মিল আছে। এমন কি, শিবিরাজা প্রভৃতির আখ্যানও এক। বুঝতে দেরি হয় না যে, যে বৌদ্ধধর্ম কয়েক শতাব্দী আগে সারা প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সেই বৌদ্ধ প্রভাবই চীনে গিয়ে টাং বংশের সৃষ্টির তেজ আর আবেগে সঞ্চারিত হয়ে ভারতবর্ষে এসে যেন পিতৃ-পুরুষের ঋণ শুধতে বদ্ধপরিকর। পূর্বপুরুষের রক্ত যখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে তখন এ যেন প্রবাসী বংশধরের নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা।

অজন্তা তা হলে ভারতবর্ষের প্রায় ছ' সাত শ' বছরের চিত্ররীতির ইতিহাস এখনও ধরে আছে। ইতিহাসের যে সময়ে ৯নং ১০নং গুহার ছবি আঁকা হয়, বোধ হয় তাকেই উদ্দেশ করে তারানাথ আক্ষেপ করে বলেন যে নাগার্জুনের পরে (যখন নাগ শিল্পী অত্যাশ্চর্য কাজ করে যান) "বহু বছর ধরে ধারাবাহিক ক্রমে আর ভাল ভাল শিল্পীর দেখা মেলে না, যদিও কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পী আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পরে রাজা বুদ্ধপক্ষর সময়ে (বোধ হয় খৃষ্টীয় পাঁচ কি ছয় শতকে) 'মধ্যদেশ' রীতির প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী বিম্বসারের ভাস্কর্য আর চিত্রকলা এত আশ্চর্য রকম উৎকৃষ্ট হয় যে বিশ্বাস করা শক্ত যে সে সব মানুষের হাতের সৃষ্টি, দেবতার নয়।" এটা সম্ভব যে ৯ আর ১০নং গুহার কাজের পর চিত্রশিল্পের পরিণতিজনিত অবক্ষয় ঘটে, আবার শেষবার প্রদীপ নেভার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মত ১নং আর ২নং গুহায় শেষ প্রতিভার ছটা দেখিয়ে যায়।

ভণিতা অনেক বড় হয়ে গেল। এখন অল্প কথায় প্রথমে বলব অজন্তার ফ্রেস্কো কিভাবে আঁকা হত, অর্থাৎ কি কি উপকরণ, মাল মশলা দিয়ে। তারপর বলব কি চিত্রধর্ম বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে অজন্তার গুহাচিত্র আঁকা। তৃতীয়ত অজন্তার ছবির সংক্ষেপে কিছু কিছু বর্ণনা দিয়ে বলতে চেষ্টা করব এই দর্শন কার্যত কি রকম দাঁড়িয়েছে। শেষে বলব ভারতীয় চিত্রনীতির ইতিহাসে অজন্তার গুহা চিত্রের কতখানি প্রভাব, কি ভাবে তার বৈশিষ্ট্য ভারতীয় চিত্রধারায় পারম্পর্য রক্ষা করেছে, এবং

অজন্তার ঐতিহ্য কতখানি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভারতীয় শিল্পীর হাতের শিরাউপশিরায় বয়ে তার হাতকে চালিত করেছে।

ইতিহাসের আগের যুগের ছবির উপকরণের কথা সংক্ষেপে বলেছি। সেগুলি ছিল লাল লোহা মেশান পাথুরে মাটির গুঁড়ো, যাকে বলত 'রাড্‌ল', চর্বি বা রক্তর সঙ্গে মিশিয়ে, হয় ছুঁচলো কাঠি না হয় আঁশ ওঠে এ রকম কাঠের 'তুলি' দিয়ে আঁকা। ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ রামগড়ের যোগীমারা গুহার শিল্পীর সরঞ্জামে তিনটে রঙ দেখা দিল—লাল, সাদা, আর কালো। লাল রং এল পাথরের গুঁড়ো থেকে, সাদা এল এক ধরনের মাটি থেকে, আর কালো এল হরীতকী থেকে। বহু পুরাকাল থেকে ভারতবর্ষে লোহা মেশান এক ধরনের সোরার সঙ্গে হরীতকী মিশিয়ে খুব উৎকৃষ্ট কালো রঙ তৈরি হয়। সে সময়ে তুলি ছিল বোধহয় বড় বড় দাঁতনের মত জিনিষ, অর্থাৎ কচি ডালকে ছিবড়ে মত করে তাই দিয়ে রঙ লাগান হত। যোগীমারার ছবির জমি ভাল করে মসৃণ করে তৈরি করা নয়। গুহার এবড়ো খেবড়ো গায়ে যেমন তেমন করে অনেক জায়গায় ছবি আঁকা, কিছু কিছু জায়গায় ডিমের খোলার মত পাতলা করে পলেস্তারা লাগিয়ে তার উপরে আঁকা, তাতে বিশেষ সুবিধা হয় নি, কারণ প্লাস্টার লাগানর আগে গুহার গা খুব মসৃণ করে চেঁচে নেওয়া হয়নি। বৌদ্ধযুগের ফ্রেস্কো এখন যেখানেই পাওয়া যায় তার তলার আস্তর বা জমি প্রায় সব জায়গাতেই একই ধরনের তৈরি। ছেনি দিয়ে অসমান করে কাটা গুহার গায়ে মাটি, গোবর, আর মিহি করে গুঁড়ো করা 'ট্র্যাপ' পাথরের বালি একত্রে মিশিয়ে ½ থেকে ¾ ইঞ্চি পুরু করে প্রথম আস্তর দেওয়া হত। মাঝে মাঝে এই ধরনের একমেটের মধ্যে মিহি করে কাটা খড়কুচি বা ধানের তুঁষ থাকত। এই ভাবে 'একমেটে' জমি তৈরি হবার পর অনেক সময়ে এর উপর অত্যন্ত পাতলা, প্রায় ডিমের খোলার মত পাতলা, এমন কি ডিমের খোলার মতই দেখতে, আর একটা সাদা আস্তর পড়ত। এই আস্তরটিকে ঘষে ঘষে খুব মসৃণ করা হত। শেষে এই রকম পালিশ করা, মসৃণ, ঝিনুক বা খোলার মত জমির উপর জলরঙ দিয়ে ফ্রেস্কো হত।

কি করে অজন্তা প্রভৃতি গুহায় এই ধরনের জমির উপর জল রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকা হত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন এগুলি 'আসল ফ্রেস্কো' (ইতালিয়ানরা যাকে বলেন ভাল ফ্রেস্কো বা "ফ্রেস্কো বুয়োনো"); আবার কেউ কেউ বলেন এগুলি 'আসল ফ্রেস্কো' আর 'টেম্পেরা' দুই রীতি মিশ্রণের ফল, ইতালিয়ানে যাকে বলে 'ফ্রেস্কো আ সেক্কো' অর্থাৎ শুকনো ফ্রেস্কো (ফ্রেস্কো বুয়োনো হচ্ছে ভিজে ফ্রেস্কো)। আবার কেউ কেউ বলেন অজন্তার ফ্রেস্কো সবটাই টেম্পেরা অর্থাৎ মিশ্রিত রঙ দিয়ে আঁকা। ইওরোপে বহুকাল থেকে সত্যকরা ভিজে ফ্রেস্কোর চলন। এমন কি খৃষ্টপূর্ব যুগের ভিট্রুভিয়াস আর প্লিনি দুজনেই ভিজে ফ্রেস্কো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। আগেই বলেছি ভিজে ফ্রেস্কো করতে গেলে আস্তর বা পলেস্তারা বা প্লাস্টার দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হয়,

এবং তা ভিজে থাকতে থাকতে দরাজভাবে রঙ দিতে হয়। কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারতে হয়, কারণ প্লাস্টার শুকোবার আগেই ছবি আঁকা, রঙ দেওয়া শেষ করা দরকার। সুতরাং একসঙ্গে বেশী জমিতে ফ্রেস্কো করা অসম্ভব, যেটুকু জায়গায় একচোটে ছবি আঁকা, রঙ দেওয়া সম্ভব, শুধু এক একবারে সেইটুকুই প্লাস্টার দিতে হয়। প্লাস্টারের যেটুকুতে ছবি হল না দিনের শেষে সেটুকু কর্নিক বা ছুরি দিয়ে চেঁচে বাদ দিয়ে ফেলে দিয়ে পরে আবার যেদিন ছবি আঁকা হবে সেইদিন ফের সদ্য প্লাস্টার লাগাতে হবে। সেইজন্য ইওরোপীয় ফ্রেস্কোতে প্রায়ই এই ধরনের জোড়ার জায়গাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। অবশ্য এও ঠিক যে ইওরোপের অনেক ফ্রেস্কোই এত সযত্নে করা যে শত শত বছর পরেও এই জোড়গুলি দেখা যায় না। পুরনো ভারতীয় বৌদ্ধ ফ্রেস্কোতে কিন্তু এই ধরনের জোড় আদৌ দেখা যায় না। এছাড়া ইওরোপীয় ফ্রেস্কো রীতিতে জল রঙ ভাল করে প্লাস্টারে ঢুকে, শুষে, যাতে প্লাস্টারের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তার জন্যে সদ্য করা প্লাস্টারটি অন্তত সিকি ইঞ্চি পুরু হওয়া দরকার, তা না হলে বুয়োনো ফ্রেস্কোর জলরঙ ভাল করে বসে না, ছবির রঙ স্থায়ী হয় না, সমান হয় না, খোলে না। এই যে পুরু শেষ আস্তর যাকে ইতালিয়ানে ইন্তোনাকো বলে সেটি কিন্তু অজন্তাতে, আগেই বলেছি, প্রায় ডিমের খোলার মত পাতলা। ৯নং গুহায় একজায়গায় একটি চিত্র আছে, সেটি গুহার পাথরের দেয়ালের উপর মাত্র ৩২ ইঞ্চি পুরু প্লাস্টারের উপর আঁকা, তার উপর জমিটি চীনেমাটির মত পালিশ করা। ইওরোপের জল বায়ুতে ইন্তোনাকো সিকি ইঞ্চি পুরু হলে চলে, কিন্তু গরম দেশে এই আস্তর আরও পুরু হওয়া দরকার, কারণ জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। সুতরাং ভিজে প্লাস্টার তাড়াতাড়ি শুকোলে রঙকরা ছবিও তাড়াতাড়ি শুকোবে। অতএব শিল্পী একসঙ্গে খুব অল্প কাজই করতে পারবেন যেহেতু সদ্যকরা প্লাস্টার বেশীক্ষণ ভিজে থাকে না। খৃষ্টপূর্ব যুগে ইট্রুরিয়ানদের আধা ফ্রেস্কোর কাজে পাথরের ভিজে দেয়াল শিল্পীকে সাহায্য করত, সদ্য লাগান প্লাস্টারের খোসাকে চট করে শুকোতে দিত না, ফলে জলরঙ ঠিকমত ভিজে প্লাস্টারে ঢুকে শুষে যেত। ইজিপশন বা মেসপটেমিয়ার ছবিতে প্লাস্টার হত বেশ পাতলা, তাতে বিশুদ্ধ বুয়োনো ফ্রেস্কোরীতি দুঃসাধ্য। তাই সে দেশ দুটিতে হত টেম্পেরা বা মিশ্রিত রঙে ছবি আঁকা। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ভারতবর্ষের অজন্তাতে টেম্পেরা রীতিই চলেছিল। ফ্রেস্কো সেক্কো বা টেম্পেরা বা শুকনো ফ্রেস্কো হচ্ছে একধরনের রীতি যা শুকিয়ে যাওয়া প্লাস্টার জমির উপর চুন দিয়ে আঁকা। আগে প্লাস্টার দিয়ে জমি করে সেটা শুকিয়ে নেওয়া হয়, তারপর ছবি আঁকার আগের দিন রাত্রে সেটি অল্প চুন গোলা জলে খুব ভাল করে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। পরের দিন সকালে আবার ঐ ভাবে ভাল করে ভেজান হয়। এই ভাল করে ভেজান জমিতে তখন শিল্পী যে রঙে বুয়োনো ফ্রেস্কো করেন, সেই রঙেই ছবি আঁকেন, কিন্তু এর বেলায় রঙগুলি চুনজল অথবা জলে গোলা পাথুরে চুনের সঙ্গে মিশিয়ে নেন। বুয়োনো বা আসল ফ্রেস্কোর তুলনায় টেম্পেরা ভারি অস্বচ্ছ, আর যদিও বহুদিন টেকে তবুও বুয়োনো ফ্রেস্কোর মত রাসায়নিক স্থায়িত্ব তার নেই।

বুয়োনোতে রঙ জলের সঙ্গে মিশে প্লাস্টারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, একেবারে ঢুকে শুষে, মিশে প্লাস্টারের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কিন্তু সেক্কো কখনই তা হয় না, সে উপরে উপরেই দেয়ালের জমির উপর আলাদা একটি পর্দা হয়ে থাকে। অজন্তার রীতি পরীক্ষা করে পণ্ডিতদের মত যে তা আসল বুয়োনো ফ্রেস্কো নয়, তারই একধরনের রকমফের। আবার অনেকে অজন্তার প্লাস্টার পরীক্ষা করে, রঙের অস্বচ্ছতা দেখে, কিছু কিছু জায়গায় রঙ জলে যাওয়া দেখে, সিদ্ধান্ত করেন যে অজন্তার ফ্রেস্কো আসলে টেম্পেরা অর্থাৎ মিশ্র রঙে আঁকা ছবি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে ফ্রেস্কো বুয়োনো রীতিতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের হিন্দীভবনের তিনটি দেয়ালে, চীনাভবনের সিঁড়ির ঘরে, ও কলাভবনের ছাত্রাবাসে অতি আশ্চর্য কাজ কয়েক বছর আগে করেন।

জমি তৈরির কথা ত গেল। এখন আসল ছবিটি আঁকার রীতি কি রকম ছিল? শ্রীমতী হেরিংহ্যামের মতে, জমি বা প্লাস্টার তৈরি হবার পর শিল্পী সাদা প্লাস্টারের উপর শুধু হাতে প্রথমে লাল কড়া রেখায় একটি রেখাচিত্র এঁকে নিতেন। ঠিক যেমন আজও বাংলার চিত্রকর বা পটুয়া, ছেলেদের পট আঁকা শেখান সন্ত গোবর নিকোন মাটির দেয়ালে আল্‌তা রঙের একটানে আঁকা একটি গরু বা ফুল বা মানুষ এঁকে, সেই রেখাটি ছেলেকে বুলোতে দিয়ে। গ্রিফিথ্‌স্‌ কিন্তু এই লাল রেখার কথা বলেন না। কিন্তু এই লাল রেখার ছবিতেই প্রথম থেকে ফুটে ওঠে ছবির যত কিছু শক্তি, আবেগ, উত্তেজনা, জ্ঞান আর সংকল্প। এর উপরে লাগান হয় খুব পাতলা স্বচ্ছ এক রকম সবুজ মাটি-গোলা রঙ, ইংরেজিতে যাকে বলে টেরা ভার্দ, তার মধ্যে দিয়ে লাল রেখা ফুটে ওঠে। তখন লাগান হয় যেখানে যেমন রঙ দরকার। তারপর আবার ছবির সীমারেখা স্পষ্ট জোরালো করার জন্য লাগান হয়, লাল রেখার পাশে বা উপরে, কাল বা ব্রাউন রেখা যা ছবিকে দেয় দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা কিন্তু সেই সঙ্গে একটু চাপা বা ম্যাড়মেড়ে করে দেয়। অবশেষে একটু গাঢ়-ফিকে বা শেডিং দরকার হয়। আলো ছায়া নিয়ে খুব যে সুস্পষ্ট শেডিং করা হয় তা নয়, কিন্তু জমির রঙের সঙ্গে বিপরীত-ধর্মী জোরালো সাদা বা কালো রঙের বিরোধ ঘটিয়ে খুব বাহাদুরি করে ছবিটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব, ব্যাপ্তি, সমগ্রতা ফুটিয়ে তোলা হয়।

ঠিক এই ধরনের রীতি ঈজিপশনরাও প্রয়োগ করতেন। ফলে গ্রিফিথসের কথা ছেড়ে শ্রীমতী হেরিংহ্যামের কথাই মানতে ইচ্ছা করে। অজন্তার শিল্পী কি ধরনের তুলি ব্যবহার করতেন জানার উপায় নেই। কোথাও উল্লেখ নেই। কিন্তু কি রঙ ব্যবহার করতেন তা আমরা জানি। বুয়োনো ফ্রেস্কো শিল্পীর রঙের ভাণ্ডার খুব ছোট, কারণ তাঁর প্রতিটি রঙ এমন হওয়া দরকার যা চুনের সঙ্গে মিশে খারাপ হবে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক মাটি বা পাথর গুঁড়িয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু অজন্তার শিল্পী, ঈজিপশনদের মত, টেম্পেরায় আঁকতেন, সেহেতু তাঁর রঙের দৌড় ফ্রেস্কো শিল্পীর থেকে বেশী ছিল। তিনি অনায়াসে গাঢ় বা বেগনি-লাল, গোলাপী, সবুজ ব্যবহার করতে পারতেন যা

বুয়োনো রীতিতে অসম্ভব, কারণ সদ্য গোলা পাথুরে চুনে সেগুলি টিকবে না। অজন্তা আর বাঘের নানা পর্দার লাল লোহাপাথরের গুঁড়ো (গেরু বা মেটে সিন্দুর) থেকে নিশ্চয় এসেছে, সবুজ এসেছে খুব মিহি করে গুঁড়নো এক ধরনের লোহামেশানো বালি থেকে। সাদা এসেছে চুন থেকে। নীল এসেছে আল্ট্রামেরিন, ল্যাপিজ ল্যাজুলাই পাথর থেকে, হলদে এসেছে হরিতাল থেকে।

এইত গেল খুব সংক্ষেপে কি কি উপকরণ বা মাল মশলা দিয়ে অজন্তার চিত্র আঁকা হয়েছিল তার সম্বন্ধে আলোচনা। বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে গ্রিফিথ্‌স্‌, বার্জেস, হেরিংহ্যাম, ইয়াজদানির বইয়ে। মেজর গিলের তোলা ৭৪টি ফোটোগ্রাফ সম্বলিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ফার্গুসনের একটি বই আছে, সেটি এখন একান্তই দুর্লভ, জেম্‌স্‌ মারে কোম্পানি ১৮৬৪ সালে প্রকাশ করেন, তাতেও বর্ণনা আছে। গ্রিফিথ্‌সের বইও এখন রীতিমত দুষ্প্রাপ্য, যদিও হাতে পাওয়া যায়। কাগজগুলি আর ছবিগুলি এত পাঁপড়ের মত মচ মচে, ভঙ্গুর হয়ে গেছে, যে নাড়তে ভয় করে। তবুও গ্রিফিথ্‌স্‌ না দেখলে অজন্তার গুহা দেখাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইয়াজদানির অ্যালবামগুলি বহুশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে তৈরি, কিন্তু গ্রিফিথ্‌স্‌ দেখে যেন বেশী তৃপ্তি হয়। তবে সুন্দর রঙীন ছবির অ্যালবাম হিসাবে ইউনেসকো-প্রকাশিত বইটি অতুলনীয়। এবার কি ধরনের চিত্রধর্ম বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে অজন্তার ছবি আঁকা হয় সে সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলা দরকার।

উষা অনিরুদ্ধের উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পাই যে মহাভারতের যুগেও এখন যাকে বলে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট তার বেশ চলন ছিল, তা না হলে নেতি নেতি করে উষা সব দেবদেবীর আঁকা ছবি একে একে বাদ দিয়ে শেষকালে অনিরুদ্ধের পোর্ট্রেটে স্বপ্নে দেখা আরাধ্যকে চিনলেন কি করে ? রামায়ণেও রাম সীতার আলেখ্য দর্শনের কথা আমরা পড়ি। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে চোখের দেখা চেনা বা হুবহু-স্বাভাবিক দৃশ্য আঁকা, অথবা পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজ গেল কমে, এল ধর্মবিষয়ক চিত্র। তার থেকে হল ছবি আঁকা সম্বন্ধে আস্ত একটি দর্শনের সৃষ্টি, যার সন্ধান আমরা পাই বিনয় পিটকে, যেখানে চিত্র ঘরের উল্লেখ আছে। সতেরো শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের একটি ছোট ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আছে। তাতে তিনি বলেছেন যে ভারতে চারুশিল্পের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন, ভগবান বুদ্ধেরও আগের। তারানাথ প্রথম যুগের প্রাচীর চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁর মতে এগুলি এতই উৎকৃষ্ট যে সেগুলি দেবতাদের আঁকা। দেবতাদের কাজ পরে যক্ষরা (পুণ্যজন বা সুজনরা) বজায় রেখে চলেন। সম্রাট অশোক যক্ষদের নিযুক্ত করেন, পরে নাগার্জুন নাগদের এই কাজে নিয়োগ করেন। ঠিক যেমন এখন বাংলার প্রত্যেক শিল্পীজাতিই বিশ্বকর্মার বংশধর বলে পরিচিত হতে চান। সম্ভবত বৌদ্ধপূর্ব যুগেই ভারতীয় চারুশিল্পের বিখ্যাত ষড়ঙ্গ, বা চিত্রকলার ছয়টি অঙ্গ, বা বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে স্বীকৃতি লাভ করে। ষড়ঙ্গকে আমরা ভারতীয় চিত্রকলার মূল নীতি বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। খৃষ্টীয় তিন শতকে বাৎস্যায়ন তাঁর 'কাম সূত্রে' এই ষড়ঙ্গের উল্লেখ করেন।

বলা বাহুল্য বাৎস্যায়ন নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি আরও প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এগুলি উদ্ধার করেন। ষড়ঙ্গের সবচেয়ে ভাল আলোচনা আছে 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'। এগুলি হচ্ছে ষড়ঙ্গ—

(১) রূপভেদ—অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান।

(২) প্রমাণম—স্পষ্ট, চিত্রসিদ্ধ অনুমান, মাপ, গড়ন।

(৩) ভাব—আকারে বা দেহে অনুভূতির প্রকাশ ও বিস্তার।

(৪) লাবণ্য যোজনম—লাবণ্য সঞ্চার, সৌন্দর্য্য বিকাশ ও বিস্তার।

(৫) সাদৃশ্যম—দুটি বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে রূপ বা আকারের পরোক্ষ বা মননগত মিল, যেমন সুপুরুষের দেহকাণ্ডের সঙ্গে মহিষ মুণ্ডের বা মহিষ মুখের মিল।

(৬) বর্ণিকাভঙ্গ—উপকরণের যথার্থ ও সঙ্গত ব্যবহার ও বিন্যাস।

এটা বুঝতে দেরি হয় না যে ভারতীয় চিত্রকলা এই ষড়ঙ্গ দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, যার বলে ভারতীয় চিত্রকলা চোখের দেখা, চোখের চেনা, স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক যথাযথ্য রক্ষার অত্যাচারের কবলে বা শৃঙ্খলে কোন দিন পড়েনি, চিরকালই কল্পনালোকে মুক্ত বিচরণের ছাড়পত্র পেয়েছে। যেমনটি দেখছি তেমনটি আঁকতে হবে এই নিগড়ের কুহক অথবা গোলকধাঁধায় পড়ে যেমন গ্রীক শিল্পী জিউক্সিস, পলিগ্নোটাস থেকে আরম্ভ করে রেনেসাঁসের যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটি ইওরোপীয় শিল্পী যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, সেই কুহক বা নিগড় থেকে ষড়ঙ্গ ভারতীয় শিল্পীকে বহু যুগ আগে থেকেই মুক্তি দিয়েছে। পারস্পেকটিভের সংকীর্ণতা বা চেনা-চেনা আঁকার কড়া আদেশ ভারতীয় শিল্পীকে একদিকে যেমন সহ্য করতে হয়নি, অন্যপক্ষে তাঁর দায়িত্বও তেমনি বরাবরই গেছে অসম্ভব বেড়ে। আর সেই দায়িত্বের গুরুভার সব সময়ে ভারতীয় শিল্পী ঠিকমত বইতে পেরেছেন, একথাও জোর করে বলা যায় না। কিন্তু অজন্তার গুহাচিত্রে ষড়ঙ্গের সুদৃঢ় প্রয়োগ যেমন সুন্দর তেমনি আবেগময়। রূপভেদ হচ্ছে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, ফিগর এবং দেহের জ্ঞান, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য। প্রমাণম হচ্ছে পারম্পর্য্য, ভারসাম্য, মাপ, শরীরের অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান, ফোরশর্টনিং বা সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া—যার থেকে ইওরোপীয় নীতিতে এসেছে পারস্পেক্টিভ্। ভাব হচ্ছে দেহের উপর মনের প্রভাব আর তার অভিব্যক্তি, যার অনেক চূড়ান্ত উদাহরণ বৌদ্ধ চিত্রে পাওয়া যায়। লাবণ্যযোজণম হচ্ছে লাবণ্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ। সাদৃশ্য আসে সত্য আর সততায়। বর্ণিকাভঙ্গ হচ্ছে চিত্রোপকরণের যথাযথ ব্যবহার, এবং যথার্থ, সমুচিত আঙ্গিক, বা প্রকাশ রীতির প্রয়োগ। অবশ্য এই ছয়টি কথার পিছনে আছে বহু বড় বড় গ্রন্থ, গভীর দর্শন। অবনীন্দ্রনাথের "ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ" (বিশ্বভারতী) পড়লে এ বিষয়ে কিছু বোঝার সুবিধা হয়। এখানে আরও দুটি পুঁথির উল্লেখ দরকার। একটির নাম চিত্রলক্ষণ, এটি খুব প্রাচীন। অন্যটি গুপ্তবংশের পূর্ণ মহিমার কালে লেখা, নাম শিল্পশাস্ত্র। এই তিনটি বইয়ের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় চিত্রকলার পিছনে

বরাবরই কত সূক্ষ্ম এবং গভীর এক দর্শন প্রত্যেকটি মহৎ শিল্পীর কাজকে এক সূত্রে গেঁথেছে।

এত অল্প কথায় ষড়ঙ্গের আলোচনা হয় না, কিন্তু এখন ঐটুকুই থাক, কারণ রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য যোজনা, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ, কথাগুলি এমনই ব্যঞ্জনাময় যে যতই লোকের অভিজ্ঞতা বাড়ে ততই যেন তার কাছে ঐ ছ'টি কথার নতুন নতুন মানে ফুটে ওঠে। সংস্কৃত সৌন্দর্য বা নন্দনতত্ত্বে, ইংরাজিতে যাকে বলে ইসথেটিকস, সার্থক এই ছ'টি কথা প্রয়োগ হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু কথা ছ'টি সর্বপ্রথম শুনলে গোড়ায় একটি ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে শাস্ত্রকার যেন চিত্রশিল্পে সব সময়ে একটি আদর্শ অবস্থা, আদর্শ নর-নারী, আদর্শ দৃশ্য, আদর্শ সৌন্দর্যময় পরিবেশের বর্ণনা বা ছবি চাইছেন, যার মধ্যে যা কিছু সাধারণ, দৈনন্দিন, নিতান্ত প্রাকৃত তার প্রবেশ নিষেধ। যেন তাঁরা বলছেন চিত্রে স্থান পাবে সেই ভাব, দৃশ্য, জীবজন্তু, নরনারী যার রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য মানুষের আরাধ্য, আদর্শ। দৈনন্দিন দৃশ্যমান জড়জগতের যা কিছু সাধারণ, তাকে আদর্শের রসে রসিয়ে, সম্পূর্ণ বদলিয়ে, আদর্শ জগতের উপকরণে পরিবেশে ফেলে দেখাতে হবে। একথা অবশ্য বিষ্ণুধর্মোত্তর পড়লে যতটা না মনে হয় তার চেয়ে বেশী মনে হয় চিত্রলক্ষণ বা শুক্রনীতিসার বা শিল্পশাস্ত্র পড়লে, যেখানে বলা আছে দেবতা বা রাজাদের চিত্র কেমন অতিকায় হবে (ঠিক ঈজিপশনদের ছবির মত), সাধারণ লোকের ছবি হবে ছোট, কি করে আদর্শ সাধারণ মুখ হবে "চৌকো, চোখ কান টানা টানা, পরিষ্কার করে আঁকা 'সুন্দর' করে তুলির টানে শেষ করা, মুখে সতেজ, জ্যোতির্ময় ভাব, দেহে অলঙ্কার। মুখ তেকোণা হবে না, বাঁকাচোরা হবে না, কিংবা গোল বা ডিমের মত লম্বাও হবে না। যে এইভাবে ঠিকমত মুখ আঁকবে তার জীবন সর্বদা সুখে কাটবে। সাধারণ লোকের মুখ লম্বা, কিংবা গোল, কিংবা তেকোণা, কিন্তু মুখে শান্তভাব, আঁকলেও চলবে।" স্ত্রীলোক আঁকার সময়ে চিত্রশিল্পীকে আর একটু স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে, যদিও প্রতিটি স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হবে সুঠাম, আদর্শ মাপের, যাতে নম্র সলজ্জ, সুশীলা দেখায়, তাদের শরীরের পেশীতে ত্বকে ফুটে উঠবে যৌবন, দাঁড়িয়ে থাকবে সোজা হয়ে যাতে তাদের লাবণ্য ও পূর্ণতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

শাস্ত্রের বিধি এই ভাবে পড়লে আর অক্ষরে অক্ষরে মানতে চাইলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পরিবেশ শিল্পের বিষয় থেকে শাস্ত্রকার বাদ দিতে চাইছেন। এখন দেখা যাক অজন্তার গুহাচিত্রে কি ধরনের বিষয়ের অবতারণা শিল্পী করেছেন। আমরা অল্প কথায় অজন্তার বিশেষ বিশেষ ছবিগুলির বর্ণনা করব, প্রথমে করব সবচেয়ে প্রাচীন চিত্র, অর্থাৎ ৯ আর ১০নং গুহার, তারপর ১৬ আর ১৭ নম্বরের, সবশেষে ১ আর ২ নম্বরের।

৯নং গুহাটি হচ্ছে চৈত্য গুহা, এটি দেখলে নাসিকের কাছে তেইশটি বৌদ্ধগুহার (হীনযান বৌদ্ধদের 'পাণ্ডু-লেনা') ১৮নং গুহাটির কথা মনে হয়। ৯নং চৈত্য গুহা, নাসিকের কাছে পাণ্ডুলেনার ১৮নং গুহা, আর পুণায় কারলি চৈত্য গুহা, তিনটি প্রায় সমসামিয়িক, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দুই থেকে এক

শতকে খোদাই, অজন্তার গুহাটি বোধ হয় ওরই মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। ৯নং গুহায় একটি ছবির নৈপুণ্য খুব, বিষয়টি হচ্ছে একটি মেয়ে মাটিতে হাঁটু ছুটি মুড়ে উঁচু করে রেখে দর্শকের দিকে পিছন করে বসে। গহনা পরা হাত ছুটি উঁচু করে তুলে প্রণামের ভঙ্গীতে জোড় করে ধরা, পরণে কটিবাস, কানে কারুখচিত গহনা, মাথায় খুব যত্ন করে পাগড়ী বাঁধার মত করে চুলের সঙ্গে খুব মিহি কাজ করা কাপড় বাঁধা। পুর্ণ সুগঠিত শরীর, পিঠে মেরুদণ্ডের সুদৃঢ় রেখা, কাঁধ, কোমর, বস্তি, দেহের পেশী ও কঙ্কাল সংস্থান সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। মুখের ডান পাশ একপেশে, বা প্রোফাইল করে দেখান। এটি গ্রিফিথ্‌স্‌ খারাপ হয়ে যাওয়া একটি ছবি চেঁচে তুলে ফেলে তার তলা থেকে উদ্ধার করেন। এই ছবিটির কথাই আগে বলেছি ; একেবারে পাথরের দেয়ালের উপর ডিমের খোলার মত পাতলা, চীনেমাটির মত মসৃণ পালিশ করা খোসার মত প্লাস্টারের উপর আঁকা। এ ছাড়া আছে সারা দেয়ালময় ফুল, লতা পাতা, জ্যামিতিক নক্সা, রোজেট, গীলোশ, যক্ষের ছবি, যেগুলি এমন মজার যে যেদিক থেকে, যতদূর থেকেই দেখা যায়, মনে হবে যেন দর্শকের দিকেই তাকিয়ে আছে, একই মুখের নানাদিক থেকে নানা রকম ভঙ্গী, কখনও কটাক্ষ, কখনও হাসছে, কখনও গম্ভীর।

দশ নম্বর গুহায় ষাট বছর আগেও বহু ছবি ছিল। ডানদিকের দেয়ালে একধার থেকে হস্তীযূথের সারি ছিল, শুধু তাদের শরীরের রেখাগুলি আঁকা। রেখাগুলি যেমন সার্থক তেমনি বলিষ্ঠ। বাঁয়ের দেয়ালে ছিল একটি পুরুষদের শোভাযাত্রা, কেউ পদব্রজে কেউ ঘোড়ার পিঠে নানারকম পোষাক, তাদের পিছনে মেয়েদের ছোট ছোট দল। কিন্তু এগুলি এখন নষ্ট হয়ে গেছে। যখন ভাল ছিল তখন তাদের কিছু কিছুর নকল বা কপি বার্জেসের বইয়ে পাওয়া যায়, কিছু আছে লণ্ডনের কমন্‌ওয়েল্‌থ অফিসে, জয়রাও রাঘোবা বলে একটি ছাত্রের আঁকা। একটি খুব সুন্দর কম্পোজিশন আছে, রাজা আটজন পরিচারিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে : গ্রুপটির তুলনা মেলা ভার। শোভাযাত্রার অসংখ্য লোকজনের পরস্পরের সম্বন্ধ, দূরত্ব, গভীরত্ব, পরিপ্রেক্ষিত বা যাকে ইংরেজিতে বলে পারস্পেক্‌টিভ তা অতি সুন্দর এসেছে। আঙ্গুল, হাত, বাহুতে ফুটে উঠেছে ভাবের অভিব্যক্তি। এই গুহারই থামের গায়ে আঁকা বুদ্ধের ছবি বোধ হয় এদের পরে আঁকা, তারিখ বোধ হয় পাঁচ শতক বা তারও পরে হবে। শরীরের পিছনের জ্যোতি আর কাপড়ের ভাঁজ বা পাটের রেখা গান্ধার ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। কখনও বা মনে আসে সাঁচির ভাস্কর্যের কথা। আরেকটি ছবি আছে বাঁ দেয়ালে, এক রাজা রাণী আর রাজকুমারী পাত্রমিত্রকে নিয়ে বোধিদ্রুমের পূজা দেখছেন। এটিও অতি সুন্দর।

এখন ১৬ আর ১৭নং গুহায় যাওয়া যাক। ১৮৭৪ সালে গ্রিফিথ্‌স্‌ ১৬নং গুহা থেকে 'মুমূর্ষু রাজকুমারী' বলে একটা ছবি কপি করেন। গ্রিফিথ্‌স্‌ তার বর্ণনা এইভাবে দেন : "রাজপরিবারের এক মহিলা বাঁ বাহু বালিশে ভর দিয়া পালঙ্কে বসে আছেন, পিছনে একটি পরিচারিকা তাঁকে সেই

অবস্থায় ধরে রেখেছে। তারও পিছনে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে বুকে হাত দুটি চেপে মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকে কাপড় বাঁধা আরেকটি মেয়ে পাখার হাওয়া করছে, মাথায় সাদা টুপি পরা একটি বৃদ্ধ দরজা দিয়ে উঁকি মারছে, অন্য একটি লোক একটি থামের পাশে বসে। আরেক জনের মাথায় পারসীক টুপি, সঙ্গে মুখে-বাটি-দেওয়া একটি কলসি, তার কাছে কাফ্রীদের মত কোঁকড়া কোঁকড়া চুলওলা একটি লোক কি যেন চাইছে। ডানদিকে আরেকটি ঘরে দুটি কঞ্চুকিনী বসে। শোক আর দুঃখের এমন কথা-কয়ে-ওঠা ছবি চিত্রকলার ইতিহাসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। ফ্লরেণ্টাইন শিল্পী হয়ত এর চেয়ে ভাল আঁকতে পারতেন, ভিনিশান শিল্পী হয়ত রঙ দিতে পারতেন এর চেয়ে ভাল, কিন্তু তাদের কেউই এমন ভাব ফোটাতে পারতেন না। মাথা ঝুলে পড়েছে, চোখ আধবোজা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল, অবশ, মুমূর্ষু মহিলা শয্যায় হেলান দিয়ে বসে'। দর্শক যেন মৃত্যুর মুখোমুখী। যে পরিচারিকাটি ধরে' আছে তারও মুখে কি ক্লেশ আর করুণার ভাব, আরেকজন কত উদ্বেগে মুখের দিকে চেয়ে আছে।" সকলের মুখে কি উদ্বেগ, শোক, হতাশা।

এই গুহাতেই পারসীক টুপিপরা আরও ছবি আছে, তাতে মনে হয় তখন পারস্যের সঙ্গে বেশ আদান প্রদান ছিল। ১৭ নং গুহাতে নানা ধরনের বিচিত্র ছবি পাওয়া যায়, এর অবশ্য অনেক এখন নষ্ট হয়ে গেছে। ১৭নং গুহার বারান্দার বাঁ দিকের কোণে একটি বৌদ্ধ প্রাণমণ্ডল আছে, অনেকে ভুল করে একে রাশিচক্র মনে করেন। দেখতে খানিকটা তিব্বতী নিশান বা পতাকার মত। বার্জেসের একটি ছবি দেখে মনে হয় যে সিংহলে বিজয় সিংহের অবতরণ চিত্রটি এই গুহায় আছে; আসলে ছবিটির বিষয় 'সিংহল অবদান'। আরেকটি ছবিতে শিবি রাজার গল্প আছে। প্রাণমণ্ডলে মানুষ আর জীবজন্তুর ছবি। বারান্দার পূবদিকের পিছনের দেয়ালে অর্ধেক জুড়ে আছে আরেকটি ছবি: শূন্যের মধ্যে তিনটি নারী আর একটি পুরুষ উড়ে যাচ্ছে। গুহার ভিতরের দেয়ালগুলি ধোঁয়ায় খুব নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিমের দেয়ালে আছে বিচার গৃহের একটি দৃশ্য (শিবি রাজার উপাখ্যান), শিকারের দৃশ্য, আরেকটি ছবি সুতসোম জাতক থেকে নেওয়া। একটি ছবি আছে রাক্ষসীরা মানুষ ধরে ধরে খাচ্ছে। ১৭নং গুহার একটি ছবির তুলনা মেলা ভার। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। যে যার বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে বুদ্ধকে ভিক্ষা দিয়ে ধন্য হতে। একটি মা (অনেকে বলেন যশোধারা) ছেলেকে (অনেকের মতে রাহুলকে) নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, বাইরের দরজায়, ছেলের হাতে ভিক্ষা দিয়ে অতি ব্যাকুলভাবে তাকে এগিয়ে দিচ্ছেন, যাতে ছেলে বুদ্ধকে ভিক্ষা দিতে পারে, ছেলের ভিক্ষা না নিয়ে তিনি যেন না যান। ভিক্ষা দেবার আগ্রহের সঙ্গে বুদ্ধকে দেখার ব্যাকুলতা কি অদ্ভুতভাবে মায়ের চোখে দেহে ফুটে উঠেছে তা ছবিটি না দেখলে কল্পনা করা যায় না।

এক আর দু নম্বর গুহার ছবিরও কিছু বর্ণনা দরকার। ১নং গুহার মুখে, উপর দিকে সোজা সারি করে হস্তীযূথ, শিকার, আর লোকের দলের সারি, সবই অতি উৎকৃষ্ট খোদাই। পশ্চিমের কক্ষে

চারটি ছবি, রোগ, জরা আর মৃত্যুর, যা দেখে বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন। উপরে ছবির সার করা একটি পটি, হংসবলাকার, তারও উপরে সিংহমুখের সারি। বারান্দার দিকে তিনটি দরজা, দুটি জানালা। মধ্যের দরজাটি অদ্ভুত ভাস্কর্য-খচিত। গুহার ভিতরে পিছনের থামের সারিতেও তেমনি ভাস্কর্যের কাজ, নিবিষ্ট মনে দেখার মত। গুহার একেবারে ভিতরে গর্ভগৃহে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি, দু'পাশে দুটি ইন্দ্রের মূর্তি। ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। দুয়ারের দুপাশে উপরের দিকে গঙ্গা যমুনার মূর্তি, নিচের দিকে দুটি নাগ-ফণার মুকুট পরা দ্বারপাল। বুদ্ধের মূর্তির মুখে অদ্ভুত ভাব, সমুখ থেকে আলো পড়লে ধ্যানমগ্ন, স্তব্ধ, গম্ভীর; এক পাশ থেকে আলো পড়লে মুখের ভাব স্নিগ্ধ, সুস্মিত; অন্য পাশ থেকে আলো পড়লে অসীম করুণাময়। গুহার ভিতরে সমস্তটাই ছবিতে মোড়া ছিল। হাতের চারকোণে ছোট ছোট স্থেয়মণ্ডলে বা প্যানেলে বিদেশীদের গ্রুপ, বোধহয় পারসীকদের। সমুখের দেয়ালে সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীন পারস্যের রাজা খসরু পরভেজের দূতকে অভ্যর্থনা করছেন। পিছনে, পূর্বদিকের কক্ষে একটি পার্বত্য দৃশ্য, দুই কক্ষের দরজার মাঝখানের দেয়ালে নাগরাজা আর রাণী আরেকজন রাজপুরুষের সঙ্গে আলাপ করছেন। তার উপরে সাপুড়ের সাপ খেলানর একটি ছবি। আরেকটু দূরে নাগরাজা আর নারীদের আর একটি ছবি। পূর্ব দেয়ালে দ্বিতীয় আর তৃতীয় কক্ষের মাঝখানের দেয়ালে হাতী আর সৈন্যদের একটি দৃশ্য। গর্ভগৃহের সমুখের দেয়ালে একটি প্রকাণ্ড ছবি, বুদ্ধের প্রলোভন: মার বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করছেন। বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির ছবির তুলনা নেই। আর তুলনা নেই জগদ্বিখ্যাত 'কৃষ্ণা রাজকুমারীর', এটিও গর্ভগৃহের সমুখের দেয়ালে আঁকা।

এক নম্বর গুহার ছাতের প্যানেলগুলি সাজানো নক্সা হিসাবে অদ্বিতীয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ডেকরেটিভ ডিজাইন বা বাংলায় অলঙ্কার আল্পনা, তাতে শিল্পীর অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছেন। এগুলি বোধ হয় সবই সাত শতকের প্রথম দিকে আঁকা। গ্রিফিথ্স্ বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এগুলির নকল করান। এগুলির বৈচিত্র্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। বৈচিত্র্যের যেন সীমা নেই, প্রতিটি ছোটখাটো জিনিষের প্রতি নিরলস নজর, ফলে একই জিনিষের পুনরুক্তি কোথাও নেই। প্রগল্ভ কল্পনা আর খেয়াল দুইই বাধাবিমুক্ত, প্রকৃতির অতি সামান্য সৃষ্টি শিল্পীর হাতে পড়ে নয়নাভিরাম হৃদয়গ্রাহী অলঙ্কার হয়ে উঠেছে। ছোট প্যানেলগুলি বিচিত্র, লাবণ্যময় অলঙ্কারে ভরপুর, কল্পনা আর খেয়াল এখানে কোন বাধাই মানেনি।

কোন কোনটাতে অদ্ভুতাকার নরনারীর ছবি, হাসি তামাসায় উজ্জ্বল, কারো মাথায় মজার দেখতে পারসীক পাগড়ী, গায়ে পারসী কোট, পায়ে ডোরাকাটা মোজা, ফল ফুলের আড়ালে আবডালে খেলে বেড়াচ্ছে, ছুটোছুটি করছে, নাচছে, মদ খাচ্ছে, কিংবা গীতবাদ্য করছে, কিংবা হয়ত আষাঢ়ে গল্পে

মত্ত, কারো সঙ্গে নানা জীবজন্তু, তাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে পদ্ম, ঠিক যেমন বিলে ফুটে থাকে। কোথাও হাতির দল, ককুদওলা ষাঁড়, বানর, টিয়াপাখী, কাকাতুয়া, হাঁস, আজগুবি ছবির পাখী, কখনও জোড়ে, কখনও একলা, রীতিবিন্যস্ত বা স্টাইলাইজ করা, মাথায় গাছের পাতার মত ঝুঁটি, লেজগুলি কত ভঙ্গীতে খেলান। কোথাও বড় গোলাপী পদ্ম, পূর্ণ প্রস্ফুটিত, কোথাও আধফোটা, কোথাও কুঁড়ি, কোথাও বা ছোট লাল বা সাদা পদ্ম। কোথাও আম, কোথাও বা আতা। ফলের মধ্যে কোথাও বেল বা বাতাবি লেবু, কোথাও বা বেগুন, আরও কত কি। অলঙ্কারগুলি একটির পর একটি কালো আর লাল জমির উপর আঁকা। প্রথমে সারা প্যানেলময় জমির রঙটি দেওয়া হয়, তার উপরে অলঙ্কারটি সাদা রঙে জমজমাট করে আঁকা আর সাদা রঙ দেওয়া। এই সাদার উপর আবার পাতলা নানারঙের স্বচ্ছ প্রলেপ দিয়ে সম্পূর্ণ করা। খেয়ালও অদ্ভুত। যেমন একটা থামে চারটি হরিণ আঁকা, চারটি হরিণের কিন্তু একটি মাত্র মাথা, অর্থাৎ একটি হরিণের মাথার চারদিকে চারটি হরিণের শরীর। ১নং গুহার ভিতরে পশ্চিম দেয়ালের মুখোমুখি থামের উপর হঠাৎ দুটি ষাঁড়ের লড়াইএর ছবি। তাতে ষাঁড়ের শরীর সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয়, লড়াইএর মধ্য দিয়ে যেন পেশীর চঞ্চলতা, ষাঁড়ের রাগ আর গতি ফুটে বেরোচ্ছে। ঠিক এই চিত্রটি পৃথিবীর নানা জায়গায় আশ্চর্যভাবে পাওয়া যায়, যেমন পুণা জেলার মালভ্‌লির কাছে আঠারোটি গুহা সম্বলিত ভাজার একটি গুহার ভাস্কর্যে (ভাজা বোধ হয় খৃস্টপূর্ব ২০০ বছর আগে খোদাই হয়); ষোল শতকে আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে; ট্রোডের অ্যাসস বলে একটি জায়গার একটি ডোরিক মন্দির থেকে নেওয়া, এখন প্যারিসের লুভরে রক্ষিত একটি বিখ্যাত ভাস্কর্যে।

দু নম্বর গুহাতেও একই ধরনের আশ্চর্য কাজ, অদ্ভুত ছবি। এর গোল গোল প্যানেলগুলি অত্যন্ত দক্ষ কাজের পরিচয় দেয়। থামের মাথা যেখানে বেঁকে আর এক থামের দিকে গেছে, অর্থাৎ আর্চের অর্ধেকে, যাকে ইংরেজিতে স্প্যাণ্ড্রিল বলে, সেখানকার ছবিগুলি অসম্ভব মূর্ত, গতিচঞ্চল। ছাতের লম্বা প্যানেলগুলিও অদ্ভুত। নক্সাগুলি অতি সুনিপুণ, মনে হয় শিল্পী ভেবে ভেবে যত শক্ত শক্ত বসা, দাঁড়ানো, চলার ভঙ্গী বার করে করে তাই এঁকেছেন। ঠিক যেমন মিকেলাঞ্জেলো মানুষের বাঁকাচোরা দোমড়ানো মোচড়ানো নানা শক্ত ভঙ্গীতে অস্থি পেশীর সংস্থান আঁকতে ভালবাসতেন। একটি ছবিতে একটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে। পাকানো

পাকানো ফণার মুকুট পরা নাগ, কিংবা জলদেবতাদের ছবি এই সব কষ্টকল্পিত শরীরের অবস্থার খুব দক্ষ ড্রয়িং। একটি ছবির কথা বলি। একটি স্ত্রীলোক থামে পিঠ দিয়ে বাঁ পা তুলে হাঁটু মুড়ে পায়ের চেটো থামে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীলোকটির পা হাতের মতই নিখুঁত করে আঁকা। দোলনায় বসা মেয়েটি মনকে খুবই দোলা দেয়। একটি ছবিতে রাজারাণী সদ্যোজাত শিশুকে দেখছেন। পূবের দেয়ালে একটি ছবিতে রাজা শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন, সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, পাইক বরকন্দাজ, তার সঙ্গে আবার একটি পালতোলা জাহাজের মত নৌকা, কলসীতে ভরতি। দৃশ্যটি পণ্ডিত জাতক থেকে নেওয়া।

অলঙ্কার বা আল্পনার জন্য আঁকা প্যানেলগুলি ছাড়া ছবির বিষয়গুলি প্রায় সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক। বুদ্ধের নানা ভাবের নানাভঙ্গীর প্রতিকৃতি ত আছেই, উপরন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নানা চিহ্ন আছে। বড় ছবিদের প্রায় সবগুলিই গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোন না কোন ঘটনা নিয়ে আঁকা কিংবা কোন না কোন জাতক থেকে নেওয়া। কয়েকটি ছবি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, কোন্ জাতক অবলম্বনে ছবিটি আঁকা হয়েছে, আবার কোন কোন ছবি এতই নষ্ট হয়ে গেছে যে ঠিক বোঝা যায় না। যেমন ১৭নং গুহায় দানবীর শিবি রাজার (যিনি নিজের দুই চোখ শুদ্ধ ভিক্ষা হিসাবে দান করেছিলেন) উপাখ্যান দেখলেই বোঝা যায়। ২নং গুহার একটি ছবি আবার আর্যসুরের জাতকমালার ক্ষান্তিবাদিন আর মৈত্রবালার জাতক থেকে আঁকা। ১০নং গুহার ছ'টি দাঁতওলা হাতীর গল্প এবং অন্যান্য উপাখ্যান স্পষ্টই জাতক থেকে নেওয়া। আবার সরাসরি জাতক থেকে নেওয়া নয় এমন বৌদ্ধ বিষয়সম্বলিত ছবিও আছে, যেগুলি নাকি বুদ্ধের নিজের জীবনী থেকে নেওয়া বা অবলোকিতেশ্বর সূক্ত থেকে আঁকা। অজন্তার ছবি বইয়ে দেখে সমালোচনা করার আগে কয়েকটি জিনিষ মনে রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার যে চিত্রগুলি গুহার দেয়ালে প্রকাণ্ড বড় বড় করে আঁকা, কোন কোনটির ব্যাস কুড়ি ফিটেরও উপর হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সেগুলি বেশ দূর থেকে দেখবার কথা, সুতরাং খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূক্ষ্ম তুলির কারিকরির প্রমাণ দেবার জন্য আঁকা হয়নি, ঠিক যেমন সিস্তিন চ্যাপেলের ভিতরের ছাতে মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা ফ্রেস্কো। বইয়ের কয়েক ইঞ্চি মাত্র বড় ফোটোগ্রাফে অজন্তার ছবি দেখাও যা আর বড় দীঘি দেখে সমুদ্রের আন্দাজ করাও তা। তাছাড়া আরও মনে রাখতে হবে যে শিল্পী যে ধর্মভাবে আপ্লুত, অভিষিক্ত হয়ে, তদ্গত হয়ে ছবি এঁকেছিলেন, আজকে দর্শকের মনে সে

ধর্মভাব নেই, সুতরাং সেই ভাবজনিত আগ্রহও নেই। কিন্তু এসব সত্বেও অজন্তার ছবি বইয়ে দেখলেও স্তম্ভিত হতে হয়, আসল গুহায় দেখলে ত বটেই। এ রকম গভীর সংবেদনা, আবেগ, বিশ্বসৃষ্টির সব

কিছুর প্রতি ভাস্বর উল্লাস, আর মমতা, ভালবাসা, একাত্মতা, সে পুরুষ হোক, নারী হোক, শিশু হোক, জন্তু, জানোয়ার, উৎকট উদ্ভট জীব হোক, বা ফুল, লতা, পাতা, ফল যাই হোক, নক্সার কাজে এত বাহাদুরি, রঙের কাজে এত কৌশল, রীতির এত নৈপুণ্য, নক্সার এবং তুলির এত বৈচিত্র্য আর প্রাণবন্তুতা যে ইতালির রেনেসাসেঁর যুগের ছবির সঙ্গে অনায়াসে তুলনা চলে। দক্ষতার যেন তুলনা নেই। একটি মাত্র সমান রেখায়, যা কখনও মোটাও হচ্ছে না, সরুও হচ্ছে না, তুলির একটিমাত্র টানে, নিখুঁত, বড় বড়, চূড়ান্ত কৌশলময় ছবি ফুটে উঠেছে। স্পর্শ যেমন কঠিন তেমনি প্রাণবন্ত, বিচার ও ব্যাপ্তি তেমনি দরাজ। অঙ্গসজ্জা ও কাপড়ের ভাঁজ যেমন ভাল জানা আছে তেমনি ভাল আঁকা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাপড়ের ভাঁজ যদিও তখনকার চলিত রীতিতে আঁকা, তবুও গায়ের মাপে কাটা বা শেলাই-না-করা পরিধেয় কি ভাবে গায়ে লেগে থাকে, কি ভাবে পড়ে থাকে, ঝোলে, সে বিষয়ে শিল্পীর শেখার কিছু বাকি নেই। অজন্তার রীতি সম্বন্ধে শ্রীমতী হেরিংহ্যামের কয়েকটি লাইন আছে খুবই ভাল। ১ আর ৯নং, ১৬ আর ১৭নং গুহার বিভিন্ন চিত্ররীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে ১৭ নম্বর গুহার গল্প বলার রীতির আরও উন্নতি দেখা যায় ১ আর ২নং গুহায়। "এই গুহাগুলিতে আছে (১) আরও দৃঢ় আর স্টাইলাইজ করা রীতি, নক্সায় আরও বেশী অপ্রাকৃত রীতি, বেশী কর্মব্যস্ততা আর গতিবেগ, কম মমতা, (২) আরও লোকপ্রিয়, প্রাণবন্ত, নাটকীয় পরিস্থিতি, তার সঙ্গে গল্প বলার তাগিদ, ঘটনা-বাহুল্য আর প্রাকৃত ভাব।

"ছ নম্বর গুহায় আরও তিনটি সুস্পষ্ট রীতি দেখা যায়। একটি ছোট কক্ষের দুপাশের দুটি দেয়ালে আমরা পাই খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা, প্রায় প্রমাণ আকারের চার পাঁচটি নগ্নপ্রায় শরীর। এদের সীমারেখা সারা শরীর ঘিরে পেঁচিয়ে গেছে, ঠিক মনে হয় যেন চীমাবুয়ের আঁকা, প্রায় একই ধরনের গড়ন, ভাব, চিন্তা। এমনভাবে আঁকা মনে হয় যেন প্রলম্বিত ভাস্কর্য; দেয়ালের গায়ে অর্ধেক গভীর পর্যন্ত খোদাই করা, ইংরেজিতে যাকে বলে বেস-রিলিফ, নতোন্নত বা অর্ধ চিত্র ভাস্কর্য, ছবিটি অবশ্য গুহার মতই অনেক পরের যুগের।" এই কক্ষেরই উল্টোদিকে একটি কক্ষে ঠিক একই ধরনের ছবি আর অলঙ্কার। পশ্চিমের দেয়ালের ছবি দেখে মনে হয় যেন চীনে ভিক্ষুদের সমাবেশ আঁকা হয়েছে, ছবির তুলির টানে বিস্ময়কর দৃপ্তি আর আত্মবিশ্বাস, ইংরেজিতে এক কথায় যাকে বলে ব্রাভুরা। রঙ বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই, কিন্তু রঙ উঠে গিয়ে জোরালো কালো আর লালচে ব্রাউনে আঁকা রেখা এমন ফুটে বেরিয়েছে, এত তার সাবলীল ভঙ্গী, প্রাচীন পুঁথির লেখার মত তা এত স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াচ্ছে, যে মনে হয় রঙ উঠে গিয়ে রেখা বেরিয়েছে ভালই হয়েছে, তা না হলে এত প্রাণ ফুটে বেরোত না। এই পশ্চিম দেয়ালেই আরেকটি ছবি আছে; পদ্ম সরোবরে মানুষ আর হাঁস একসঙ্গে আঁকা। বিষয়টি একান্ত ভারতীয় হলেও আঁকার এত নিখুঁত হাত, এত নৈপুণ্য আর স্বাধীনতা যে সবথেকে উৎকৃষ্ট চীনে ছবির সঙ্গে অনায়াসে তুলনা চলে। যেমন নক্সার পারিপাট্য

তেমনি রঙের তীব্র সাদা, গম্ভীর বেগ্‌নে-লালচে-ব্রাউন, স্বচ্ছ, টলটলে পান্না-সবুজ, তার সঙ্গে পরিষ্কার লালের ছিট। ১৭নং গুহায় আবার একই হাতে আঁকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তিনটি ছবি আছে : (১) সিংহ আর কালো হরিণ শিকার, (২) হাতী শিকার, (৩) রাজ দরবারে হাতী শুঁড় তুলে প্রণাম করছে। তিনটি ছবিতেই রঙ গাঢ়-ফিকে বা শেডিং করে এমন পারস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত আনা হয়েছে যা সত্যই বিস্ময়কর। তিনটিই এক রঙা ছবি বললে হয়, রঙের মধ্যে কেবল গাঢ় আর ফিকে ধূসর ; শুধু গাছপাতা আর ঘাস ম্যাড়মেড়ে সবুজ। সমস্ত কম্পোজিশনটি, এমন কি প্রত্যেকটি প্রাণীর ভঙ্গিমাশুদ্ধ যেমন স্বাভাবিক তেমনি আধুনিক, নক্সা সাবলীল, হাল্কা, যেন খেয়াল খুসীমত করা, যদিও রঙ দেওয়া হয়েছে খুব কড়া, ভারি তুলির টানে—খানিকটা ফরাসী পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের কায়দায়। ঘোড়া, হাতী, কুকুর, কালো হরিণ, সব জন্তুই অতি সুন্দর ভাবে আঁকা।

ইলোরা, কাহ্নেরি, কার্‌লি, ভাজা, বেদ্‌সা, নাসিক, বাঘ, বাদামী, জুনার, অজন্তা, গুহাচিত্রের সব শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে অজন্তা। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত কিছুতে অসীম আগ্রহ, সব কিছুতে একান্ত একাত্মতা, সামান্য কীট থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিষ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, দরদ, সংবেদনা দিয়ে আঁকা। নরনারীর ছবির কথা ত বাদই দিলুম। কিন্তু হাত, পায়েরই বা কত বিচিত্র ভঙ্গী, কত বিচিত্র মুদ্রা। একদিকে যেমন চোখের দেখা স্বাভাবিকত্বের বালাই নেই, অর্থাৎ ইওরোপীয় চিত্রের বোকাবানানো রিপ্রেজেন্টেশন নেই, অন্যপক্ষে তেমনি আছে ভাব, সাদৃশ্য, লাবণ্য, রূপভেদ, প্রমাণ আর বর্ণিকাভঙ্গের চূড়ান্ত। ফর্ম্যাল, স্টাইলাইজ করা পরোক্ষরীতিবিন্যস্ত শরীরে কি করে এত মানুষী ভাব, ভঙ্গিমা, ব্যাকুলতা, উত্তেজনা আসতে পারে, কি করে এত কাম, ক্রোধ, ভয়, সম্মোহ প্রভৃতির প্রকাশ হতে পারে, কি করে শুধু কালো রেখার মধ্যে এত কম্পোজিশনের নৈপুণ্য, আর রঙের একান্ত স্বল্পতার মধ্যেও, শুধু গাঢ়-ফিকে বা শেডিং-এর মধ্যে, চূড়ান্ত ভাস্কর্যসুলভ গড়ন আর পরিপ্রেক্ষিত আসতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এত বিচিত্র ভঙ্গী, বিচিত্র ভাব, এত শান্ত, স্তম্ভিত সৌন্দর্য, এত ভাবানুষঙ্গতা বড় বিস্ময়কর। সারা বিশ্বের প্রাচুর্য যেন অকৃপণ হাতে ঢালা। স্ত্রী পুরুষের অলঙ্কারের কত বৈচিত্র্য। উদ্‌ভট, বিদঘুটে কিন্নর, নাগ, রাক্ষসী, গাঁয়ের কুমোরের তৈরি উদ্‌ভট বেহাই-

বেহানের মত পেটমোটা রসিক রসিকারা, ভয়ঙ্করমুখ রাক্ষসরা, আজগুবি জন্তু, গথিক গির্জার ভাস্কর্য, যেমন নোতর দাম, বা র‍্যাঁস, বা শার্তরকেও যেন হার মানিয়েছে। হাতী, ঘোড়া, ছুটন্ত হরিণ, বানর, হনুমান, ভীত সন্ত্রস্ত গরু মোষের পাল, কাকাতুয়া, টিয়া, হাঁসের পাতি, মরাল, রাজহাঁস, নেকড়ে বাঘ, সাপ কোন কিছুই বাদ যায়নি। কোথাও সিংহ আক্রমণ করছে,

কোথাও জোর পাবার জন্য গাছের চারধারে শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে অজগর সাপ হাতীর পা কামড়ে ধরেছে, হাতী সমুখের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পালাবার শেষ চেষ্টা করছে; কোথাও ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষকে আচমকা ভাল্লুক এসে জাপটে ধরেছে। শোভাযাত্রার কি বাহার, কি কৌশল কম্পোজিশনের, তার সঙ্গে কত অজস্র বৈচিত্র্য অস্ত্রশস্ত্র, কলকব্জার। হাত পাখাই কত রকম, কত রকমই বা বাদ্যযন্ত্র। কত রকমের যে টুপি তা বর্ণনা করা শক্ত। ঘড়া, ঘট, ভাজ, পাত্র, কলসি, শিকের বৈচিত্র্য থেকেও চোখ ফেরান দুঃসাধ্য। মানুষ, গরু, ছাগল, হাতী, ঘোড়া, যাবতীয় বিশ্বসৃষ্টির প্রাণীর আর সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কিন্নর রাক্ষসের শরীর, বাঁকা চোরা, দোমড়ানো, মোচড়ানো, নানা ভঙ্গীতে দেখা ছবি আঁকতে যেন শিল্পী অদ্ভুত আনন্দ পান। মিকেলাঞ্জেলোও হার মানেন। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে রাক্ষসীদের বেগে শন্ শন্ করে ছোটা যেন তিন্তোরেত্তোকে কোথায় হার মানিয়ে লজ্জা দেয়। একটি ছবি আছে নৌকা বিহার, তার লাস্যভাব ওয়াতোকে লজ্জা দেয়। ফল, ফুল, লতা পাতার কথা বলে শেষ করা অসম্ভব। স্বাভাবিক পদ্মকে পৃথিবীতে যদি কেউ হার মানিয়ে থাকে তবে অজন্তার ছবি। শিল্পী যেন সারা বিশ্বকে জাপটে ধরতে চান, কিছুই যেন ছাড়তে চান না, অথচ এত নিপুণ ও সত্য তাঁর মাত্রা ও শালীনতা বোধ যে কোথাও অপরিচ্ছন্নতা নেই, নেই পারিপাট্যের অভাব অথবা প্রগল্‌ভতা। সর্বত্র সংযম, অসামান্য রুচি।

আমার সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে জানিনা, দশদিনের অন্তরে আমি কোণার্ক আর অজন্তা দেখি। প্রথমে দেখি কোণার্ক, তারপর অজন্তা। আমার ধারণা কোণার্ক প্রথম দেখার পর অন্তত বছর খানেক অন্য কিছু দেখা উচিত নয়। তার আগে দেখলে, পরে যা দেখা যায় তার উপর সুবিচার হয় না। কিন্তু তবুও কোণার্কের পর অজন্তা দেখলে এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে দুই জায়গার শিল্পীরই অম্বিষ্ট ছিল অনেকটা এক রকম। অজন্তা সম্বন্ধে এত নির্বোধ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য উচ্ছ্বাস হয়েছে, অজন্তার ছবির এত অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিৎ নকল, প্রাণহীন, নীরস, কার্ডবোর্ডে আঁকার মত এত অসুন্দর ব্যর্থ ছবি 'ভারতীয় অজন্তা রীতি' বলে এদেশের কিছু কিছু শিল্পী চালাবার চেষ্টা করেছেন, তার উপরে গ্রিফিথ্‌স্, ইয়াজদানির বই এত দুষ্প্রাপ্য আর দুর্মূল্য, এবং অন্যান্য বইগুলি এত সংক্ষিপ্ত, খাপছাড়া, খারাপভাবে ছাপা, যে অনেক বিদগ্ধ মনও কি রকম যেন অজন্তার প্রতি বিরূপ হয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন বাঘের ছবি অজন্তার চেয়েও ভাল। অবশ্য লরেন্স বিনিয়ন যখন বলেন, যে অজন্তার ছবিতে মহান সর্বাশ্রয়ী ঐক্যের অভাব, অথবা সবকিছু একসূত্রে ধরে রাখে এমন ছন্দ আর ভারসাম্যের অভাব, তখন মনে রাখতে হবে যে বিনিয়ন অত্যন্ত কঠোর মানদণ্ড নিয়ে

বসেছেন, যে মানদণ্ডে পাশ করতে পারে এমন সৃষ্টি খুব কমই আছে। এটা অবশ্য ঠিক যে অজন্তার চিত্র মুখ্যত আখ্যানধর্মী বলে এক হিসাবে অফুরন্ত। সুতরাং চিত্রের যে ধর্মে, একটা গণ্ডীর মধ্যে থেকেও সে চৌহদ্দিবদ্ধ সীমার বন্ধন থেকে ছন্দের মুক্তি, ব্যাপ্তি আর একান্ত চিত্রধর্মসুলভ কৈবল্য পাবে, সে ধরনের গুণ হয়ত অজন্তার ছবিতে গৌণ। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। কিন্তু তবুও চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অজন্তার এক বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রথমত, এত প্রাচুর্যের মধ্যে এত সংযম খুব কম দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, সামান্য কয়েকটি রঙের মধ্যে দিয়ে এত বৈচিত্র্যের প্রকাশ কম বিস্ময়কর নয়। তৃতীয়ত, সারা বিশ্বের একাত্মতা, সমস্ত সৃষ্টির প্রতি এত দরদ, মমতা, তীক্ষ্ণ নজর, ফর্মাল বা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ রীতিতেও এত যথাযথ্যের প্রতি, খুঁটিনাটির প্রতি আগ্রহ খুবই কমই দেখা যায়। চতুর্থত, সামান্য কয়েকটি রঙের উপর নির্ভর করে, শুধু শেডিং বা গাঢ়-ফিকের উপর নির্ভর করে, এত ফোরশর্টনিং, অর্থাৎ সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া, এত পারস্পেক্‌টিভের নৈপুণ্য, প্ল্যাস্টিকরূপে দক্ষতা, ভারতীয় চিত্রকলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় নক্সার, অলঙ্কারের, আল্‌পনার রেখা আর চাপ চাপ রঙের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের, যার ফলে এসেছে সত্যকারের ডিজাইন, ডেকরেশন বা আল্‌পনা, এমন কি আধুনিক চিত্রকলার আরাধ্য ফিগর। পঞ্চমত, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়, পারস্যে, ঈজিপ্টে, গ্রীসে, চীনে, মেসপটেমিয়ায় চিত্রকলার রীতিনীতি, অলঙ্কার ডিজাইন সম্বন্ধে কোথায় কি হয়েছে বা ঘটছে এ সম্বন্ধে অজন্তার চিত্রশিল্পী যে বিলক্ষণ খোঁজ খবর রাখতেন তার প্রমাণ ভুরিভুরি মেলে। সবার উপরে আছে জীবনের সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহ, অসীম বিস্ময়, যার ফলে সংসারত্যাগী ভিক্ষু, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি জপ করতে করতেও, নির্জন, ভয়াল গুহায় সারা বিশ্বের সৃষ্টি, তার রূপ, রস, গন্ধ, সৌন্দর্য, বিস্ময়, তীব্রতা, উত্তেজনা, আবেগ ভীড় করে ঢুকিয়েছেন ; ধ্যান ভাঙ্গানর জন্য কি ধ্যান পরীক্ষার জন্য জানি না।

সবশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন, যে কথা জোর করে অনেকেই বলেন নি। সে হচ্ছে অজন্তার ছবিতে ভাস্কর্যের গুণ, যে গুণ থাকার দরুণ অজন্তার ছবি দেখলেই ভারুত, সাঁচি, অমরাবতী, গান্ধারের কথা মনে পড়ে যায়, মাতিস ও মিউরাল পেন্টিং সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সোভিয়েট লেখক আলেকজাণ্ডার রম যাকে বলেছেন মনুমেন্টালিটির গুণ, বা ছোট নক্সায় চৈত্যগৌরবের বা বলিষ্ঠ বিরাটত্বের সম্ভাবনা। অনেকে অজন্তার ছবির কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাকে ভাবেন কার্ডবোর্ডে বা ক্যানভাসে আঁকা চ্যাপটা সমান ছবি, মনে রাখেন না যে প্রতিটি ছবি গুহার এবড়ো খেবড়ো, অসমান দেয়ালে আঁকা, যার উপর নীচ আছে, যা দূর থেকে দেখতে হয়, যে ছবি ইচ্ছামত উপর নীচে নামিয়ে উঠিয়ে, দূরে কাছে সরিয়ে দেখা যায় না, যে ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী ইচ্ছামত মাপের কাগজ বা চট পাননি। অর্থাৎ মন্দির বা গির্জার স্থাপত্যের সঙ্গে যে ভাস্কর্য যায়, অজন্তার ছবিতে বাধ্য হয়েই আবশ্যিকভাবে সে ভাস্কর্যের বাধানিষেধ, আইন কানুন এসেছে এবং এসে ছবিকে চালিত করেছে।

যে জায়গাটা উঁচু আছে সে জায়গাটা নামানো যাবে না, সেখানে সেই জায়গার মতই ছবি আঁকতে হবে, অর্থাৎ সেই স্থলে ভাস্কর্য মনে করে তার আইন অনুসারে ছবি সেই মাপমত আঁকতে হয়েছে। এমন কি যেখানে দেয়ালের গা এবড়ো খেবড়ো, অমসৃণ, বন্ধুর আছে, শিল্পীকে ছবি আঁকতে হয়েছে ঠিক সেই জমিটি স্বীকার করে, অর্থাৎ অসমান জমিতে স্থির আলো পড়লে ছবি কি রকম দেখাবে তা ঠিক মত ভেবে অনুমান করে নিয়ে। তার ফলে অনেক ছবিই এমন ভাবে আঁকা যে যেদিক থেকেই দেখা যায় মনে হয় যেন ছবির লোকটি বা প্রাণীটি দর্শকের দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে আছে। আরেকটি কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তা হচ্ছে গুহার বাইরে, বারান্দার ভিতরে, থামের চারধারে যেখানে ভাস্কর্য হতে পারে, অর্থাৎ যেখানে খোদাই করা মূর্তির উপরে আলো পড়ে আলোছায়ার খেলা চলতে পারে, সেখানে ভাস্কর্যই আছে, এবং সেখানে ভাস্কর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সংযত, বিনয়ী, শিল্পী শ্রদ্ধাভরে এমন সরল আল্‌পনা দিয়েছেন যাতে ভাস্কর্যের মহিমা ম্লান না হয়। ভাস্কর্যের সার্থকতা সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধা, বিনয় ও জ্ঞান অন্যত্র দুর্লভ। যেখানে আলোছায়ার খেলা নেই, যেখানে স্থির আলো পড়বে, সে সূর্যেরই হোক আর বাতিরই হোক, সেখানেই শুধু অজন্তার শিল্পী ছবি এঁকেছেন, এবং আরও বিস্ময়ের কথা যে ভাস্কর্যের গুণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যেমন অনেক ছবি, অনেক মুখ, অনেক শরীরই আছে যা সমুখ থেকে দেখলে একরকম ভাব ফুটে ওঠে, এধার-ওধার থেকে ভিন্ন ভিন্ন রকম দেখায়। প্যানেলগুলি এমনভাবে ভাগ করা যা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আইন মানে। ব্র্যাকেট বা স্প্যাণ্ড্রিলে এমন ভাবে ছবি আঁকা যা খোদাই বলেও মনে হতে পারে। স্থাপত্যের সঙ্গে যে-ভাস্কর্য সার্থক তার একটি গুণ বা সার্থকতা হচ্ছে যে সমগ্র ইমারত ঘুরতে ঘুরতে যেখানটায় মন ক্লান্ত হয়ে আসে, সুন্দর বা চমৎকার কিছু আশা করে না, যে জায়গাটা আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই আবশ্যক অথচ আবেগ উত্তেজনাহীন আশঙ্কা করা স্বাভাবিক, ঠিক সেইখানেই দর্শকের ক্লান্তি অপনোদন করে, তার স্তিমিত উৎসাহ, আবেগ, উত্তেজনা জাগিয়ে দিতে হঠাৎ নিতান্ত আচমকা আসে কোন আশ্চর্য ভাস্কর্যের টুকরো যা দেখে ক্লান্তি যায় ছুটে ; ফলে পুনরায় অপ্রত্যাশিতের আগ্রহে দর্শক ঘুরতে আরম্ভ করে। অজন্তার চিত্রশিল্পী সার্থক ভাস্কর্যের ঠিক এই জিনিসটি বুঝেছিলেন, যেমন বুঝেছিলেন নোতরদাম বা র‍্যাঁস, বা শার্তরের স্থপতি, যিনি অস্থানে কুস্থানে বসিয়ে দিয়েছিলেন অতি আশ্চর্য আশ্চর্য গার্গয়ল, উদ্‌ভট বিদ্‌ঘুটে জীবজন্তু বা অতি সাধারণ দৃশ্য। ঠিক এই অপ্রত্যাশিতের প্রসাদ এনেছেন অজন্তার শিল্পী নানা আজগুবি মজার উদ্‌ভট ছবি এঁকে, অথবা খুব অন্ধকার কোনও কোণে অসম্ভব রকমের উত্তেজনা, চাঞ্চল্য বা আবেগের কোন দৃশ্য এঁকে। এককথায় বিস্ময় জিনিসটাকে খুব বিস্ময়করভাবে অজন্তার চিত্রশিল্পী কাজে লাগিয়েছেন।

যে কোন জাতি বা সভ্যতার ভাষা ও সাহিত্য যেমন দু' এক শ বছরের জিনিস নয়, বহু যুগ ধরে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে, চিত্রশিল্পের বেলায়ও তেমনি কোন চিত্রনীতির উৎকর্ষ এক আধজনের চেষ্টায় বা কাজে হয় না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক কষ্ট, অনেকের আরাধনার ফলে হয়। কারণ চিত্রও ত মানুষের ভাষা, যেমন ভাষা কথা, সাহিত্য, গান, এমন কি স্থাপত্য, ভাস্কর্য! আমরা যদি এই সামান্য কথাটি মনে রাখি তাহলে এটুকু বুঝতে দেরি হবে না যে অজন্তার ছবি একদিকে যেমন বহুযুগের সাধনা ও ক্রমবিকাশের ফল, তেমনি অন্যদিকে অজন্তার চিত্ররীতি একদিনে লুপ্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তাই আমরা অজন্তা রীতির নমুনা পরবর্তী যুগে অনেক শতাব্দী ধরে এদিকে ওদিকে পাই। যেমন অজন্তার ১৬ আর ১৭নং গুহায় যখন ছবি আঁকা চলছিল প্রায় সেই সময়ে সিংহল দ্বীপের সিগিরিয়া (শ্রীগিরি?) গুহায় সম্রাট প্রথম কাশ্যপের রাজত্বকালে (৪৭৯ থেকে ৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) এমন কতকগুলি ফ্রেস্কো আঁকা হয় যার সঙ্গে অজন্তার ১৬ আর ১৭নং গুহার ছবির আশ্চর্য মিল আছে। সিগিরিয়ার মাত্র দুটি গুহায় ছবি পাওয়া গেছে। সবশুদ্ধ কুড়িটি ছবি এইখানে পাওয়া গেছে, আর কিছু ছবি নেই, সবগুলিই প্রমাণ স্ত্রীলোকের তিন-চতুর্থাংশ মাপে আঁকা, কখনও একক, কখনও দুজন মহিলা একসঙ্গে। বোধহয় সকলেই রাজা কাশ্যপের রাণী। অত্যন্ত সুন্দর দাঁড়ানো ভঙ্গীতে আঁকা, তুলির কাজে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিল্পী আঁকার রীতিনীতি আর মডলিংএ কত দক্ষ ছিলেন।

সিগিরিয়ার কথা সামান্য হল। এখন বাঘের কথা বলি। বাঘের গুহাগুলিতে এমন একটিও শিলালিপি বা নিদর্শন নেই যা দেখে বলা যায় ঠিক কোন সময়ে গুহাগুলি খোদাই হয়, ছবিই বা আঁকা হয়। সুতরাং ইতিহাস সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা নেই। কার রাজত্বে খোদাই, শিল্পীরা কোথা থেকে এসেছিল, কিছু বলা যায় না। গুজরাট থেকে মালোয়া পর্যন্ত একটি খুব প্রাচীন রাস্তা ছিল; গোয়ালিয়র রাজ্যে সেই রাস্তার উপর বাঘ বলে একটি ছোট গ্রামে গুহাগুলি আছে। খুবই দুঃখের কথা যে অজন্তার মতই, বাঘে খুব কম ছবিই এখন অক্ষত অবস্থায় আছে। পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে গুঁড়িয়ে প'ড়ে, পথিকের উনুন ধরান ধোঁয়ায়, আর যুগ যুগ ধরে নানা রকম অত্যাচারে এখনও যেটুকু আছে সেটুকু আমাদের বহুভাগ্য বলতে হবে। প্রথম যখন খোদাই হয় তখন নিশ্চয় অনেকগুলি গুহা ছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি এখন ছাদ ভেঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বেলেপাথরের বড় একটি পাহাড়ে গুহাগুলি খোদাই হয়, একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মাপলে বোধ হয় ৭০০ গজ হবে। স্থানীয় লোকে

এই গুহাগুলিকে বলে পঞ্চ পাণ্ডু, অথবা পাণ্ডব গুফা, তার কারণ ২নং গুহায় কতকগুলি বৌদ্ধ মূর্তি আছে যাদের দেখে পঞ্চপাণ্ডব বলে ভুল হতেও পারে। গুহাগুলি দেখেই বুঝতে দেরি হয় না যে সেগুলি মহাযান বৌদ্ধদের কীর্তি। সবগুলিই বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ, বোধ হয় ৪০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরি। পিছন দিকে একটি ছোট চৈত্যও আছে তার পাশে ছোট ছোট ঘর আছে। ১নং গুহাটিই বোধহয় সব থেকে প্রাচীন, এটিতে স্তূপ বা দাগাবা আছে। সবশুদ্ধ ন'টি গুহা উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে ৮ আর ৯নং এখনও প্রায় চাপাই আছে। ২নং গুহাকে গোঁসাই গুহা বলে, এখানেও এককালে ছবি ছিল, এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল বুদ্ধের একটি মূর্তি আর চারটি দ্বারপালের মূর্তি আছে। ৩নং গুহাকে বলে হাতীখানা। এটিতে ছবি আছে; মাঝখানে বুদ্ধ, তাঁকে চারিদিকে ঘিরে নতজানু হয়ে বসে শিষ্যের দল। (তারা ঠিক কোন দেশের বা কোন জাতের ঠিক বোঝা যায় না) এরপর দু'শ গজ ধরে পাহাড়ের গা। তারপরে ৪নং গুহা। ৪ আর ৫নং গুহা একসঙ্গে, তার মধ্যে ৪নং গুহাই ছবির জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত, রঙমহল বলে পরিচিত। আকারেও চার নম্বর গুহাটি সবথেকে বড়, দৈর্ঘ্যে ৯৪ ফিট, প্রস্থেও তাই। ৫নং গুহাটি বোধ হয় ধর্মোপদেশ গৃহ হিসাবে ব্যবহার হত, ৬ নম্বরে বোধহয় ভিক্ষুরা থাকতেন। ৭নং গুহাটি এখন পড়ে গেছে। ১৯১০ সালেও দর্শকরা এখানে দেয়ালে আঁকা ছবি দেখেছেন, ৮ আর ৯নং গুহার কথা ত আগেই বলেছি।

৪নং এবং অন্য দুটি গুহায় যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে এখানেও বেশ কয়েক শ' বছর ধরে ছবি আঁকা চলেছিল। ৪নং গুহার দেয়াল, ছাদ আর থামগুলি সমস্তই যে এককালে প্লাস্টার করা বা চুনবালি জলের লেপে মসৃণ করা কাজ (ইংরেজিতে স্টাকো বলে) আর উৎকৃষ্ট, অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবিতে মোড়া ছিল, তা এখনও দেখলে বোঝা যায়। এ কাজের শুধু অজন্তার সঙ্গেই তুলনা চলে। যেমন নক্সার বৈচিত্র্য, তুলির বলিষ্ঠ নৈপুণ্য, আলপনার দক্ষতা, তেমনি সব রকম প্রাণের বিপুল বৈভব আর উল্লাস, যার মধ্যে শীর্ণ সন্ন্যাসীর রুক্ষতার লেশ মাত্র নেই। চিত্রের বিষয়েও বৌদ্ধ ধর্মের গোঁড়ামি নেই। যদিও বৌদ্ধ বলে চেনা যায়, তবুও নিতান্ত আমাদের দৈনন্দিন জগতের। যথা এ দুটি ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'হল্লীসক' আঁকা হয়েছে। হল্লীসক হচ্ছে একরকম বৌদ্ধ গীতধর্মী নাটক, কতকটা অপেরা বা যাত্রা বা রবীন্দ্রনাথের নাটকের মত। নাটকগুলিতে সাধারণত মেয়েরাই
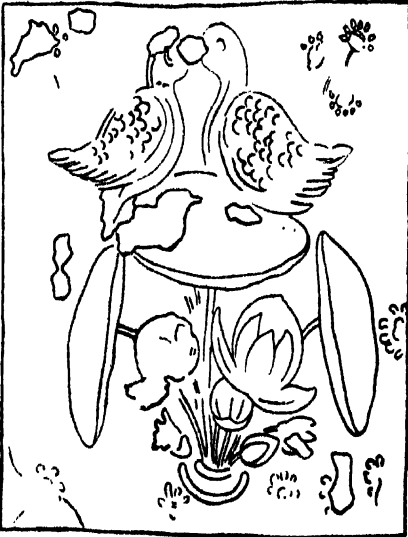
অধিকাংশ চরিত্র করতেন, কেবল অধিকারীর মত একজন পুরুষ নেতৃত্ব করতেন। শাস্ত্রমতে মহিলাদের সংখ্যা হবে সাত, আট অথবা দশ। কিন্তু বাঘে তাদের সংখ্যা এক জায়গায় ছয়, আরেক জায়গায় সাত। সবাই অত্যন্ত পরিপাটি করে সজ্জিত, গান গাইছে, আর পরম উল্লাসে কেউ ঢোল, কেউ ডাক, কেউ খঞ্জনি, কেউ অন্য বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। এরকম গীতমুখর, আনন্দে ভরপুর, উল্লাসময় ছবি দেখে সন্দেহ হয় এগুলি কি ধরনের বৌদ্ধগুহা ছিল যাতে এত হরদম গান বাজনা, মাতামাতি লেগে থাকত! অবশ্য মথুরার ভাস্কর্য বা ঔরঙ্গাবাদ গুহার কথা মনে রাখলে অত অবাক লাগে না, তবুও এটা ঠিক যে এ রকম সখ মিটিয়ে আমোদ আহ্লাদের ছবি দেখলে বোঝা যায় যে পরের যুগের বৌদ্ধধর্মীদের লৌকিক জীবন মন্দ ছিল না।

আগেই বলেছি বাঘে এমন কোন লিপি নেই যা দেখে তারিখ নির্ণয় করা যায়। তবে আঁকার রীতি আর সাজ সজ্জার ফ্যাশন,—যথা পুরুষদের কেশসজ্জা, অথবা স্বচ্ছ, আঁটসাঁট পোষাক—দেখে এটা বলা যায় যে বাঘের ছবির সঙ্গে গুপ্তযুগের শেষদিকের ভাস্কর্যের বেশ মিল আছে, এবং বাঘের কাজ মধ্যযুগের আগের। অন্তপক্ষে এটাও ঠিক যে অজন্তার শেষ যুগের কাজের চেয়ে তা প্রাচীন নয়।

বোধহয় বাঘের চিত্রকে নিরাপদে খৃষ্টীয় ছয় শতকের মাঝামাঝি থেকে সাত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফেলা যায়। ছবিগুলিতে অনেক নক্সাই আছে তাতে কালো আর সাদা রঙের সঙ্গে মেটে সিঁদুর লালের (ইণ্ডিয়ান রেড) রেখা আছে। আবার কিছু কাজ আছে যাতে রঙ 'অত্যন্ত জ্বল জ্বল' করছে, নীল, লাল আর হল্‌দের পরস্পর বিরোধ ঘটান হয়েছে। দুটি রীতি বোধহয় দুটি ভিন্ন যুগের। বাঘ গুহা সম্বন্ধে উনিশ শতকে প্রথম উল্লেখ আমরা পাই 'ট্রানজ্যাক্‌শন্‌স্ অভ দা লিটারারি সোসাইটি অভ্ বম্বে'র ২য় খণ্ডে, ১৮১৮ সালে। তার পরে জার্নাল অভ্ দা রয়াল সোসাইটির ৫ম খণ্ডে ডাঃ ই-ইম্পের একটি বড় লেখা বেরোয়। তার পর লেখেন ফার্গুসন্। কিন্তু বাঘ নিয়ে সবচেয়ে বেশী খাটেন কর্ণেল সি-ই লুয়ার্ড। ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় তাঁর এক বিশদ লেখা বেরোয়। বার্লিংটন ম্যাগাজিনের ১৯২৩ সালের অক্টোবর সংখ্যায় অসিত কুমার হালদার একটি প্রবন্ধ লেখেন। তারপর গোয়ালিয়রের মহারাজা ও কর্ণেল লুয়ার্ডের চেষ্টায় অনেক বিখ্যাত শিল্পীর সাহায্যে বাঘের ফ্রেস্কোর নকল হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, এ-বি ভোঁসলে, বি-এ আপ্তে, এম-এস ভাণ্ড ও জি-বি জগতাপ। মূল নকলগুলি গোয়ালিয়র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। শান্তি-নিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুকৃত দুটি বড় প্যানেলের নকল আছে। ১৯২৭ সালে ইণ্ডিয়া সোসাইটির অনুগ্রহে স্যর জন মার্শাল প্রভৃতির সম্পাদনায় 'দা বাঘ কেভ্‌স্' বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য গুহা

খুব সংক্ষেপে বাঘের কথা বললাম। অজন্তা, ইলোরা, বাঘ ছাড়াও বহু গুহা আছে যাতে অল্পবিস্তর গুহাচিত্র আছে। সবগুলির কথা বলা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। বৌদ্ধ গুহাদের মধ্যে বম্বের কাছে কাহ্নেরি গুহাগুলির কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে সবশুদ্ধ ১০৯টি গুহা আছে, তার মধ্যে এক আধটিতে এখনও ছবির চিহ্ন পাওয়া যায়, যেমন ১৪নং গুহায়। নাসিকের কাছে হীনযান বৌদ্ধদের পাণ্ডুলেনা বলে তেইশটি গুহার কথাও আগে উল্লেখ করেছি এখানেও কিছু কিছু ছবি আর রঙের চিহ্ন আছে। অজন্তা বৌদ্ধগুহা। ইলোরার ১২টি গুহা বৌদ্ধ, এখানেও ছবির কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। ঔরঙ্গাবাদের ৯টি বৌদ্ধ গুহার মধ্যে ৬নং গুহায় চিত্রের চিহ্ন বেশ আছে। তারপর নাম করতে হয় বাঘের। জুনাগড়ের বৌদ্ধগুহাগুলি খুবই প্রাচীন, সম্রাট অশোকের সময়ের (খৃষ্টপূর্ব ২৭২ থেকে ২৩১)। কিন্তু এখানে রঙীন ছবির চিহ্ন বোধহয় একেবারেই নেই। ভুবনেশ্বরের কাছে বৌদ্ধদের উদয়গিরি গুহাগুলিতে ছবির চিহ্ন নেই। বেজওয়াদায় কয়েকটি বৌদ্ধগুহা আছে, এখানে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন, কিন্তু এখানেও এখন ছবি নেই। বম্বের মালভ্‌লির কাছে বিখ্যাত কার্‌লি গুহায় কোন ছবির চিহ্ন আজ নেই, যদিও গুহায় দেয়ালে প্লাস্টার আছে, তাতে মনে হয় হয়ত এককালে ছবি ছিল। ভাজা আর বেদসার বৌদ্ধগুহাগুলি ভাজা, বেদসা বলে দুটি কাছাকাছি গ্রামে, কোনটাতেই আঁকা ছবি নেই।

জৈন গুহার মধ্যে ইলোরাতে খুব বেশী ছবি নেই, ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরিতেও নেই। ওসমানাবাদ বলে একটি জায়গায় কয়েকটি জৈন গুহা আছে, সেগুলিতে কিংবা গোয়ালিয়রে পাথর কাটা মন্দিরেও আঁকা ছবি নেই। একমাত্র গুহাচিত্র আছে বাদামীতে। বাদামী অথবা বাতাপীপুর চালুক্য বংশের প্রথম পুলকেশীনের সময়ে (৫৫০ থেকে ৫৬৬ খৃষ্টাব্দ) রাজধানী ছিল। এখানে ৪টি গুহা আছে, তার মধ্যে ৩টি হিন্দু বা ব্রাহ্মণ, একটি জৈন। জৈন গুহাটি সবচেয়ে আধুনিক। কিন্তু বাদামীর যে গুহায় ছবি আছে সেটি ব্রাহ্মণদের গুহা। এখানকার ছবি খুব সুন্দর, তাদের সবুজ রঙ উল্লেখযোগ্য।

আরেকটি জায়গার কথা উল্লেখ করে ছোট তালিকাটি শেষ করব। গুহাদুটি কিছুদিন আগে বেল্‌ বলে এক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেন। এগুলি মধ্য প্রদেশের উত্তরদিকে কুড়া উলপোতা আর দিম্মুল গল থেকে দক্ষিণে পুল্লিগোদা গোলকোণ্ডার মধ্যে তামান কাছুয়া বলে একটি গ্রামে। এদের

মধ্যে একটিতে আছে পাঁচজন পুরুষের রঙীন ছবি, প্রত্যেকের পিছনে জ্যোতি, মাথায় তে-কোনা টুপির মত, বসে যেন ধ্যান স্তব করছেন। বেল্ লিখেছেন যে ছবির রঙ বেশ ভাল আছে। আর কিছু বিশেষ জানা নেই। যতদূর মনে হয় খৃষ্টীয় সাত শতক বা তারও পরের কাজ।

পুরাকালের চিত্ররীতি

আগেই বলেছি যে অজন্তা বা বাঘের ছবির নিশ্চয় খুব প্রাচীন ইতিহাস আছে, ভুঁইফোড়ের মত তা হঠাৎ একদিন সকালে গজিয়ে উঠতে পারে না, এবং তারপর হঠাৎ একদিন মিলিয়েও যায়নি। সুতরাং পুরাকালের ছবির ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান নিতে হবে। পুরাণের যুগেও ছবি যে খুব আদরের জিনিষ ছিল তা রামায়ণ, মহাভারত পড়লেই বোঝা যায়। রামায়ণে চিত্রশালার কথা আমরা পাই, তার পরে বৌদ্ধ পালি পুঁথিতে আমরা চিত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বিলক্ষণ আলোচনা পাই। উত্তর ভারতে মগধ, কোশলে রাজাদের পুরীতে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্যখচিত, বিচিত্র প্রমোদশালা ছিল তার কিছু উল্লেখ এই সব পুঁথিতে আছে। বিচিত্র ভাস্কর্য, অভিনব আলপনার কথাও আমরা পড়ি। খৃষ্টপূর্ব তিন বা চার শতকে লেখা বিনয়পিটকে চিত্রঘরের (চিত্তগড়) উল্লেখ আগেই করেছি। পুঁথি পড়ে যতদূর মনে হয় এগুলি বোধহয় খানিকটা আধুনিক চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারির মত ছিল। প্রথমে নিশ্চয় ছিল কাঠে বা পাথরে খোদাই করা মূর্তি, তারপর দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি, সেগুলি ক্রমশ পরে ভাস্কর্যে পরিণত হয়ে আসে ইলোরায়, এলিফাণ্টায়, পরে সঞ্চারিত হয় শ্যামরাজ্যের অ্যাঙ্কর ভাটে বা জাভার বোরোবুদুরে ; ভারতীয় স্থাপত্যে, মন্দিরে। খৃষ্টীয় পাঁচ থেকে আট শতক পর্যন্ত কালিদাস, ভাস প্রভৃতি নাট্যকার, লেখকদের লেখায় আলেখ্য, প্রতিকৃতি, চিত্রশালার উল্লেখ ঘনঘনই পাই। প্রথমে মৌর্য, তারপর গুপ্তবংশের মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ইত্যাদি নিত্যব্যবহারের দ্রব্যে লৌকিক চিত্ররীতির নিদর্শন আমরা বহু পাই, যা নিশ্চয় দুই-নদীর দেশ বালুচিস্থান আর সিন্ধু থেকে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবং এখনও ছড়িয়ে আছে। এই সব যুগের ছবি এখন আমরা না পেলেও ছবি যে ছিল তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাই। সিংহলের মহাবংশে (বোধহয় খৃষ্টীয় পাঁচ শতকে লেখা) আমরা খৃষ্টপূর্ব ১৫০ সালে রাজা দত্তগামিনীর তৈরি রুয়নভেলি অস্থিগৃহের দেয়ালে আঁকা ছবির কথা পড়ি। শুধু যে আমাদের দেশে লেখা পুঁথিতে আমরা ছবির ঐতিহ্যের কথা পড়ি তা নয়। খৃষ্টীয় পাঁচ, ছয়, সাত শতকে যে সব তীর্থযাত্রী চীন দেশ থেকে আমাদের দেশে আসেন, তাঁদের লেখাতেও পড়ি। উপরন্তু চিত্রনীতি ও রীতি ব্যাপারে ভারত আর চীনের মধ্যে বহুকাল থেকেই বিশেষ যোগাযোগ ছিল তার বহু প্রমাণ মেলে। যেমন খৃষ্টীয় পাঁচ-ছয় শতকে সিয়েহো

বলে একজন চীনে লেখক চিত্রনীতি সম্বন্ধে এমন সব কথা লেখেন যা নাকি আমাদের দেশের ষড়ঙ্গের সঙ্গে বেশ মেলে। স্পষ্টই বোঝা যায় আমাদের দেশের নন্দনতত্ত্ব লেখকরা যখন ষড়ঙ্গের কথা বিশদ-ভাবে লিখছিলেন তখন চীনেও এই ষড়ঙ্গ নিয়েই আলোচনা চলছিল, কারণ চীনের চিত্রনীতিরও, মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ষড়ঙ্গ নীতির উপরেই ভিত্তি। চীনেরও ছ'টি নীতি, আমাদেরও ছ'টি, এবং তাদের মধ্যে মোটামুটি খুব মিল। অনেকের মতে চীন ভারতের কাছে ষড়ঙ্গ ধার করে, আবার অনেকের মতে ভারতই আসলে চীনের কাছে ধার করে। তবে যাতে এসব লেখা আছে সেরকম চীনে পুঁথির বয়স কম, ভারতীয় পুঁথির বয়স বেশী। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গে আলোচনা করেছেন।

অজন্তা, বাঘ প্রায় গুপ্তযুগের সমসাময়িক। গুপ্তযুগের সুশাসন আর ঐশ্বর্য নিশ্চয়ই চিত্রকলার খুব সহায়ক হয়। এই কয় শতাব্দী ধরে চিত্রকলার নিশ্চয় খুব বৈভব গেছে; যা হয়েছিল, তার তুলনায় অজন্তা বা বাঘে যেটুকু আমরা এখন পাই তা নিশ্চয় সমুদ্রে গোষ্পদের মত। ফা-হিয়ান খৃষ্টীয় ৪০০ সাল নাগাদ ভারতে পর্যটন করেন, হিউয়েন-সাঙ ঘোরেন খৃষ্টীয় ৬২৯ থেকে ৬৪৫ পর্যন্ত। দুজনেই ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘোরেন এবং একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দেয়ালে আঁকা চিত্র সম্ভারের কথা বার বার উল্লেখ করেন। ফা-হিয়ান কপিলাবস্তু নগরের একটি ছবির কথা উল্লেখ করেন, যাতে দেখানো আছে একটি সাদা হাতীর পিঠে চড়ে ভগবান বুদ্ধ মর্তে জন্ম নেবার জন্য তাঁর মায়ের গর্ভে ঢুকছেন। ফ্রা-আঞ্জেলিকোর অনানসিয়েশনের কথা মনে পড়ে যায়, কারণ যীশুও মেরীর গর্ভে ঠিক সাধারণ সৃষ্টির রীতি অনুসারে জন্মান নি। হিউয়েন-সাঙ অজন্তা আর অন্যান্য জায়গার উল্লেখ ত করেনই, উপরন্তু ভারতের উত্তর পশ্চিম কোণে এক মঠের উল্লেখ করেন, যার নাকি জানালা, দরজা, দেয়ালে কাঠের পাটা, সবই অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এসব অধিকাংশই নষ্ট হয়, কিছুটা কালের প্রভাবে, সাধারণ ক্ষয়ে, ধূলো, বালি, ঝড়ে জলে, কিছুটা চিত্রবিরোধী মুসলমান ধর্মের ধ্বংস কাজে। যে সব গুহা নিতান্তই অগম্য বা মাটি চাপা পড়ে গেল সেইগুলিই কিছু কিছু এখনও পর্যন্ত টিকে আছে, যেমন বাঘ, অজন্তা। তাছাড়া বোধ হয় চীন নেপাল তিব্বতের প্রভাবের দরুণই হবে, ভারতে খৃষ্ট যুগের প্রথম দিকে কাঠের বাড়ীরও চল হয় (অবশ্য মহাভারতে জতুগৃহের উল্লেখ আছে)। আগেও অবশ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহস্রস্তম্ভ সভাগৃহ কাঠের তৈরি হয়েছিল। এই সব কাঠের বাড়ীর দেয়ালেও যে ছবি আঁকা হত তার প্রমাণ অজন্তার কোন কোন ছবিতে আমরা পাই, আধুনিক প্রমাণ আছে দার্জিলিং, নেপাল, সিকিম তিব্বতের কাঠের মন্দিরের ছাদে বা দেয়ালে।

খৃষ্টীয় সতেরো শতকে তারানাথ বৌদ্ধধর্মের একটি ইতিহাস লেখেন। তাতে তিনি ভারতের বৌদ্ধযুগের চিত্র রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছুটা লিখে যান যা নাকি খুব বোধগম্য বা স্পষ্ট না হলেও, বিশেষ

মূল্যবান। তিনি বলেন, প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের তিনটি যুগ ছিল, প্রথম দেব যুগ, দ্বিতীয় যক্ষ যুগ, তৃতীয় নাগ যুগ।

দেবযুগে ছিল দেব রীতি। কয়েক শতাব্দী ধরে চলিত ছিল মগধে,—তথাগতের জন্মের পর—খৃষ্টপূর্ব ছয় থেকে তিন শতক পর্যন্ত। তারানাথ বলেন 'তখনকার কালে নশ্বর মানুষ হয়েও এই সব মহান দিক্‌পাল শিল্পীদের ঐশী ক্ষমতা ছিল, যার বলে তাঁরা আশ্চর্য আশ্চর্য শিল্পসৃষ্টি করতেন।' যেমন বিনয় আগমে এবং অন্যান্য পুঁথিতে স্পষ্ট বলা আছে যে তাঁদের আঁকা প্রাচীন চিত্র এমন আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক হত যে সেগুলিকে নিসর্গ বলে ভ্রম হত, গাছপালা, প্রাণী সবই জীবন্ত, আসল বলে লোকের ভুল হ'ত। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যেও চিত্রকলার স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ আছে। ছবিগুলিও প্রায়ই দেয়ালে আঁকা হত। আগে ছিল দৈনন্দিন, সামাজিক বা রাজদরবারের চিত্র আঁকার রীতি, ক্রমে ক্রমে তা বদলে এল বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক ছবি, কিন্তু পুরো ধর্মাত্মক ছবি কখনও হল না। তিব্বতের গিয়াংসি মঠের দেয়ালে একটি ছবি ছিল, তার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে যার থেকে বোঝা যায় প্রাচীন চিত্রকলার রীতি কিরকম ছিল। ছবিটিতে দেখা যায় একজন শিল্পী ভগবান বুদ্ধকে সমুখে মডল হিসাবে রেখে তাঁরই একটা ছবি আঁকছেন, সেই ছবিটি কোন রাজার কাছে উপঢৌকন হিসাবে যাবে। ছবিটি পেয়ে ভগবান তথাগতের করুণাঘন, ধ্যানমগ্ন, মুখ দেখে প্রতিবেশী রাজার মনে এত ভাবের পরিবর্তন হল, এত বৈরাগ্য এল, যে তিনি সেই দিনই সপারিষদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। এই গল্প থেকেই বোঝা যায় যে ভারতের চিত্রকলার সর্বপ্রথম যুগে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট আঁকার দিকে কত ঝোঁক ছিল, যাতে আঁকা ছবি আসল বলে ভুল হত। অনিরুদ্ধের ছবি দেখে উষার ভাববিপর্যয়ের কথা আগেই বলেছি।

তারানাথের মতে এর পর এল যক্ষ যুগ। তারানাথ এই যুগকে সম্রাট অশোকের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব তিন শতক। যক্ষরা কে ছিল তা নিয়ে নানা গবেষণা সত্ত্বেও এটা সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যক্ষ বলতে তারানাথ এমন সুনিপুণ কৌশলী চিত্রশিল্পীদের কথা মনে করছেন যাঁদের ছবি দেখে মানুষের সাধ্য বলে মনে করতে সাহস হয় না, মনে হয় নিশ্চয় ঐশীশক্তিসম্পন্ন দেবতাজাতের লোকের কাজ।

যক্ষযুগের পর এল নাগ যুগ। বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক নাগার্জুন খৃষ্টীয় ৩য় শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন, তাঁর সময়ে চিত্র শিল্পে এই নাগরীতির চলন হয়, নাগ-শিল্পীরা এই রীতির প্রচলন করেন। এই হল তারানাথের কথা। অবশ্য সুদূর কাশ্মীর থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত এই নাগজাতির —যারা নাকি নাগ পূজা করত—এর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যায়। যেমন অমরাবতীর স্তূপে নাগপ্রভাব খুব স্পষ্ট। নাগরা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। তারানাথের লেখা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে এই তিন রীতির মূল কথাই ছিল বাস্তবধর্মী, কারণ দেব, যক্ষ, নাগ শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা

করার পর তিনি বলছেন, "বহু বছর ধরে দেব, যক্ষ, নাগদের শিল্প তাদের বস্তুনিষ্ঠার জোরে দর্শকের চোখে ভ্রম ধরিয়েছে"।

তারানাথ বলেন 'যেখানে বৌদ্ধধর্ম গেছে, সেখানেই অতি নিপুণ ধর্মাশ্রয়ী শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে'। ঠিক যেমন আবির্ভাব হয়েছিল ইতালিতে রেনেসাঁস, বা আবার-জন্মানো যুগের প্রথম দিকে খৃষ্টিয়ান শিল্পীদের, যথা চীমাবুয়ে, জত্তো, ফ্রা আঞ্জেলিকো, ফ্রা বার্তোলোমেও, ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি ইত্যাদির। ঠিক খৃষ্টিয়ান মাঙ্ক-শিল্পীদের মত বৌদ্ধ শ্রমণ-শিল্পীরাও বৌদ্ধ চিত্রকলা দেশ বিদেশে নিয়ে গেলেন। চিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রচার করলেন ভগবান বুদ্ধের বাণী। যতদূর মনে হয় নেপাল তিব্বতের মঠের ধ্বজা বা পতাকা (ইংরেজিতে ব্যানার) যাকে তিব্বতী ভাষায় টাংকা বলে, অর্থাৎ বিচিত্র ছবি আঁকা ধ্বজা, তা ছিল ধর্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কারণ ধ্বজার ছবি সহজে বোঝা যায়, মুহূর্তে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রতীক, তার জন্যে লোকে মরতে রাজী হয়, অক্ষর পরিচয়ের দরকার হয় না। কারণ ছবির ভাষা অক্ষরের ভাষার চেয়ে লোকে অনেক তাড়াতাড়ি পড়তে পারে, এবং হরফের দুস্তর বাধা সেখানে নেই। চীনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল, এমন কি চীন সম্রাট মিংটির অনুরোধে একজন ভারতীয় শ্রমণ, নাম কাশ্যপমাতুংগ, খৃষ্টীয় ৬৭ সালে নানা ধরনের শিল্পকলা, চিত্রকলার নিদর্শন নিয়ে সুদূর প্রাচ্যের দিকে রওনা হলেন। এরপর থেকে সাত শতক পর্যন্ত বরাবর রীতিমত দলে দলে শ্রমণ শিল্পীরা ভারত আর চীনের মধ্যে যাতায়াত করেছেন, তার উল্লেখ ইতিহাসে পাই। এদের মধ্যে অনেকেই চীনে বসবাস করে ফ্রেস্কো শিল্পের প্রচার করেন। শুধু চীনে নয়, আরও পূর্ব-দেশে, জাপানেও, এই প্রচারের চিহ্ন পাওয়া যায়, যেমন সাত শতকের 'নারা' যুগে। আট শতকের প্রথম দিকে জাপানের হরিউজি মন্দিরের দেয়ালে যেসব বিখ্যাত ফ্রেস্কো আঁকা হয় তাতে, লরেন্স বিনিয়নের মতে, অজন্তার প্রভাব এত সুস্পষ্ট, যে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ফা-হিয়ান, হিউয়েন-সাঙ অবশ্য স্পষ্টই বলেছেন যে অনেক চীনে শিল্পী ভারতীয় চিত্রশিল্পগুরুর কাছে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। এমন কি পনেরো শতকেও জাপানী 'তোষা' রীতিতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

তারানাথ বলেন, খৃষ্টীয় ৩য় শতকের পর শিল্পের ভাঙ্গন ধরে, মনে হয় 'যেন মনুষ্য সমাজ থেকে শিল্পজ্ঞান লোপ পেল'। অবশ্য পরে একবার 'আবার-জন্মান' যুগ আসে, এবং এই পরবর্তী যুগের বিভিন্ন রীতির কথা তারানাথ উল্লেখ করেছেন। পরের:যুগেও তিনটি বিশিষ্ট ধারা এল, যথা মধ্যদেশী, পশ্চিম দেশী আর পূর্বদেশী। মানচিত্রে দেখলে মধ্যদেশীয় রীতির প্রধান কেন্দ্র হল আমাদের এখনকার উত্তর প্রদেশ। এই মধ্যদেশীয় ধারার প্রবর্তক হলেন এক বিখ্যাত ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী, নাম বিম্বসার। রাজা বুদ্ধপক্ষের রাজত্বে (খৃষ্টীয় পাঁচ কি ছয় শতকে হবে) বিম্বসার মগধে জন্মান। তারানাথ বলেন, এই ধারার চিত্রশিল্পীরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, এবং তাঁদের চিত্ররীতি খানিকটা পুরাকালের দেবরীতির মত ছিল। অর্থাৎ তাঁদের প্রায় হাজার বছর আগে যে চিত্র নীতির প্রচলন

ছিল বিম্বসার আর তাঁর শিষ্যের দল সেই রীতি যেন আবার ফিরিয়ে আনলেন, অর্থাৎ ইওরোপের মত এই সময়ে একটি আবার-জন্মান যুগ এল। পশ্চিম দেশের রীতির কেন্দ্র হল রাজপুতানা, এই রীতির শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন শৃঙ্গধর, ইনি রাজা শিলার সময়ে মাড়োয়ারে জন্মান। শিলা খুব সম্ভবত উদয়পুরের শিলাদিত্য গুহিল, যিনি খৃষ্টীয় সাত শতকে রাজত্ব করেন। (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজ-কাহিনীতে এঁর গল্প আছে)। তারানাথের মতে এই রীতির ছবি অনেকটা পুরাকালের যক্ষদের ছবির মত ছিল। পূর্বদেশের ধারার প্রধান কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রভূমে, ধর্মপাল, দেবপাল রাজাদের সময়ে। এঁরা খৃষ্টীয় নয় শতকে নাম করেন, এবং এঁদের ধারা কতকটা নাগ ধারার মত। পূর্ব দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন দুজন, ধীমান আর তাঁর ছেলে বিট্‌পাল। তারানাথ বলেন এঁরা দুজনেই ছিলেন সর্বজয়ী, যেমন চিত্রশিল্পে, তেমনি ভাস্কর্যে, তেমনি ধাতু ঢালাইয়ে। তারানাথের বর্ণনা থেকে একটা কথা অনুমান করা অবান্তর হবে না, সেটা হচ্ছে চীনে চিত্ররীতির সঙ্গে ভারতীয় চিত্রনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পশ্চিম দেশের রীতির সঙ্গে চীনের সম্ভবত যোগাযোগ ছিল খোটান, মধ্য এশিয়া ও ইরাণ তুরাণ বা পারস্যের মধ্য দিয়ে (পারস্য চিত্ররীতিতে চীনের প্রভাব পুরাকাল থেকেই খুব সুস্পষ্ট)। মধ্য দেশের রীতির সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ ছিল তিব্বতের মধ্যে দিয়ে। আর পূর্বদেশের রীতির সঙ্গে চীনের নিশ্চয় যোগাযোগ ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের রেখা ধরে, তিব্বত, আসাম, মণিপুর নাগাদের দেশের মধ্যে দিয়ে।

এ ছাড়াও অন্যান্য ধারা ছিল কাশ্মীরে, নেপালে, বর্মায়, দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু তারানাথের মতে এসব ধারা ছিল গৌণ, খৃষ্টীয় ছয় আর দশ শতকের মধ্যে এরা একে একে ওঠে, পড়ে; আসল ছিল মধ্য, পশ্চিম, পূর্ব, যার পূর্বজ ছিল তাদেরও হাজার বছর আগে দেব, যক্ষ, আর নাগ ধারা।

আরেকবার তাহলে অজন্তা, বাঘের চিত্রনীতির কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। নক্সার দক্ষতা, সৌন্দর্য বোধ, রেখার সাবলীলতা, রঙের প্রাচুর্য, উল্লাস, অবাধ উন্মুক্ত কল্পনার কথা আগেই বলেছি। আবেগ আর ভাবে পরিপূর্ণ এমন ছবি দুর্লভ, প্রত্যেকটি ছবি যেন কথা কয়ে উঠছে।

অজন্তার শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই যে চীনে পদ্ধতিতে নিতান্ত পারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে অজন্তার প্রতিটি গুহার ছবিতেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউনেস্‌কোর অ্যালবামটি সহজলভ্য, সুতরাং তার থেকে উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। এখানে বক্তব্য এই যে অজন্তাচিত্রে প্ল্যাস্টিক ফর্মের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, রঙে, আলোয়, রেখায়, স্পেসে যে ঐশ্বর্য দেখা যায় তার উৎস দ্বিমুখী। প্রথমটি অবিসংবাদিত ভাবে ভারতীয়, যার প্রমাণ আছে অমরাবতী, ভারুত, সাঁচির ভাস্কর্যে। এইসব ভাস্কর্যের কম্পোজিশন ও পারস্পেকটিভ খুবই সার্থকভাবে অজন্তাচিত্রে নিয়োজিত হয়েছে, এবং তার ফলে চীনের গুহাচিত্র টুনহুয়াঙের কম্পোজিশন অজন্তার পাশে অপরিণত ঠেকে। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে চীনে রীতিতে রঙের, আলোর, এমন কি রেখারও ব্যবহার। এমন কি লোকের মুখ, চোখ, ভঙ্গীতেও চীনে

মুখ, চীনে ভুরু, চীনে ভঙ্গী ভুল করার জো নেই। ইউনেস্কো অ্যালবামের তিন, চার, পনেরো, আঠারো, একুশ নম্বরের প্লেট এ বিষয়ে সব সন্দেহের নিরাকরণ করে। কিন্তু এখানে আমরা দেহ বা মুখাবয়ব, বা মুখের ভুরু, রেখা নিয়ে ব্যাপৃত নই, আমাদের আলোচ্য অজন্তাচিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্ম অর্থাৎ তার রঙ, রেখা, আলো এবং স্পেসের সমন্বয়। প্রথমেই সকলে স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষে এক গুহাচিত্র ছাড়া ছবিতে আলোর ব্যবহার দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, ফার্গুসন থেকে পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কুমারস্বামী এমন কি লরেন্স বিনিয়ন বা ব্যাজল্ গ্রে পর্যন্ত সকলে যে বলেন যে অজন্তাচিত্র মুখ্যত রেখায়িত রূপ, তার কীর্তি মূলত লিনিয়ার এফেক্ট ; ছবিতে বস্তুর ম্যাস ক্রমিকভাবে, অর্থাৎ ইংরেজিতে সিকোয়েন্সে যায়, এক ম্যাসের পিঠে আরেক ম্যাস চিত্রিত হয়ে ছবির জমক বাড়ায় না, তাঁদের এসব কোন কথাই ধোপে টেকেনা। কারণ, অজন্তায় প্রতিটি গুহায় এসব যুক্তি খণ্ডনের ভুরি ভুরি প্রমাণ মেলে। অজন্তায় পারস্পেকটিভ ও স্পেস কম্পোজিশনের অতি সার্থক বৈচিত্র্য ও গরিমা দেখা যায়। প্রথমত পাওয়া যায় সরল কম্পোজিশন ; অর্থাৎ মধ্যবর্তী ফিগর, তার দুপাশে প্রতিসাম্য রেখে আরও দুটি ফিগর বা গ্রুপ। তারপর পাওয়া যায় যোগসূত্র রচনা, ইংরেজিতে যাকে বলে কনেক্টিং-লিংক কম্পোজিশন। এই ধরনের কম্পোজিশন বাইজান্টাইন ও প্রাচীন খৃস্টিয়ান মজেইকে যথেষ্ট আছে, এমন কি চীমাবুয়ে এবং জত্তোতেও আছে, অর্থাৎ একই দেয়ালে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ছবি ; প্রত্যেকটির কম্পোজিশন ভিন্ন ; যোগসূত্রস্বরূপ থাকে হয় একটি ফিগর বা গ্রুপ নয় কোন স্তম্ভ বা স্থাপত্য, যেমন ঘরবাড়ীর অংশ। এইভাবে ফিগরকে যোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পী এক আখ্যান থেকে অন্য আখ্যানে অবলীলাক্রমে চলে যান। স্থাপত্য উপাদানের যথোচিত ব্যবহারে, আবার, একই কম্পোজিশনের মধ্যে চোখের বিশ্রামের জন্য যতিপাত হয়। উপরন্তু অজন্তাশিল্পী একই দৃশ্যে একাধিক পারস্পেকটিভ বিন্দু আনেন, একে ইংরেজিতে বলে মাল্টিপল্ ভিশন বা বহুমুখী দৃষ্টি। আধুনিক যুগে প্রথমে সেজান, তারপর ব্রাক, তারপর পিকাসো এর প্রবর্তন করেন। এর বলে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে শরীর সামান্য ঘোরালে ভিন্ন ভিন্ন পারস্পেকটিভ প্রতিভাত হয়। এর আরেকটি নাম প্রদক্ষিণ পরিপ্রেক্ষিত বা রোটেশন পারস্পেকটিভ ; এর বিচিত্র ব্যবহার হয়েছে অসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ান ভাস্কর্যে ও মজেইকে। এর ফলে ছবিতে অসম্ভব গতি আসে, দর্শক দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করে। শেষকালে বলা দরকার যে অজন্তাশিল্পী প্রাচ্য পারস্পেকটিভ রীতি (যাতে দূরের বস্তুর সীমান্তরেখা থেকে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি দর্শকের চোখে কেন্দ্রবিন্দু করে) ও পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ রীতি (যাতে চোখ থেকে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি বেরিয়ে দিকরেখায় এক কল্পিত বিলীয়মান বিন্দু বা ভ্যানিশিং পয়েন্টে গিয়ে মেশে), দুইই সমান তালে ব্যবহার করেছেন। ছবির সামান্য অংশে অসীম মিতব্যয়ে নানা চিত্রিত রঙের ও আলোর যে বুনন দেখা যায় তা শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিত্রেও দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, ড্রয়িংই সেখানে রঙীনরূপে দেখা দেয় ; অজন্তাচিত্রে রঙ এবং রেখা আলাদা করা প্রায় অসম্ভব।

উপরন্তু আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে সমস্ত ফিগরটি রঙের মধ্যে দিয়েই নির্মিত হয়; তাতে অবশ্য গুহার পাথরের অমসৃণ গা খুব সাহায্য করে, কিন্তু এইভাবে পাথরের গায়ের সাহায্য নেওয়াও যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীমনের পরিচয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রঙ, আলো, রেখা এবং স্পেসের এই অপূর্ব সংশ্লেষণের ফলে অজন্তাচিত্রে আসে বলিষ্ঠতা, গুরু ওজন, গভীরত্ব, জমক, দ্যুতি, আলো। ইউনেস্কো অ্যালবামের সাত বা ষোল নম্বর প্লেটের হরিণ বা হংসের নিছক হরিণত্ব বা হংসত্ব আনতে পারলে মহাশিল্পীও সার্থক বোধ করতেন। এগারো, বারো, কুড়ি, একুশ, তেইশ, চব্বিশ বা বত্রিশ নম্বর প্লেটের রঙ ও ফিগরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কীর্তির তুলনা অনায়াসে চলে। রঙের অপূর্ব বিস্ময়কর ব্যবহারের পরই উল্লেখ করতে হয় সীমারেখা বা কণ্টুরের ব্যবহারের। যেমন এক নম্বর প্লেটে পাই স্পষ্ট আউটলাইন, তিন নম্বর প্লেটে দেহরেখা অস্পষ্ট, ছয় নম্বর প্লেটে মোটা রঙীন পটি, এগারো নম্বর প্লেটে রেখার দুধার থেকে রঙ উপচে পড়ে, ষোল নম্বর প্লেটে রেখা হারিয়ে, গলে যায়। বলাবাহুল্য স্পেস, রেখা, রঙ এবং আলোর এরকম অসমসাহসী বহুবিচিত্র সংশ্লেষণেই অজন্তাচিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্মে এতখানি ঐশ্বর্য আসে। বর্ণনাত্মক ছবি বলে অজন্তাচিত্রের ডিজাইনে অনেক সময়ে একটু অসন্তোষের কারণ ঘটে, কিন্তু সমগ্র দেয়াল হিসাবে বিচার করলে ডিজাইন সম্বন্ধেও খুঁত কাড়া অসাধ্য।

অজন্তার ছবির অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে রেখার দক্ষতা, সাবলীলতা। এ বোধ হয় সব প্রাচ্য ছবিরই বিশেষত্ব। প্রাচ্যের চিত্রকলার বিশেষত্বই হচ্ছে রেখা, যার কাছে রঙ গৌণ। এমন কি রেখার প্রাধান্য এত বেশী যে তার কাছে মড্‌লিং, শেডিং, পারস্পেক্‌টিভ, রঙ সবই গৌণ হয়ে গেছে, যদিও এসব সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পীর বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। গ্রীক ভাজের ছবির রেখা অপূর্ব; ডিউরর, হোলবাইন, লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির রেখার তুলনা নেই, কিন্তু তবুও অজন্তার কাছে যেন হার মেনে যায়। প্রথম থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় রেখা প্রধান, রঙ বা রঙের গাঢ়-ফিকে, বা এক রঙের মধ্যে নিশ্চিন্তে আরেক রঙের মিল, যার থেকে ছবিতে রঙের টোন বা বর্ণালির বিশিষ্ট আমেজ বা সুর আসে তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় চিত্রে খুব বেশী নেই। অজন্তা বা বাঘেই তবু কিছু আছে। এর কারণ অনেকে বার করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জোর করে বলেন নি। আমার মনে হয় এর এক প্রধান কারণ আমাদের গরম দেশের প্রখর সূর্যের আলো, যা এত প্রখর যে সে আলো সোজাসুজি পড়লে আলোছায়া বা রঙের খেলা খুব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, সে আলোর তলায় থাকে শুধু সীমারেখা, এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু বিচ্ছিন্ন করা লাইনটুকু, আর মোটা মোটা রঙগুলি, যার মধ্যে অনেকগুলিই সূর্যের আলোর তেজে প্রায় স্বচ্ছ, তরল হয়ে আসে; অথবা এত তীব্র হয়, যার মধ্যে রকমারি শেড বা পর্দা পাওয়া অসম্ভব। যেসব ছবি স্পষ্ট দিনের আলোয় দেখবার, সে সব ভারতীয় ছবিতে পারস্পেক্‌টিভ নামমাত্র, মডলিং প্রায় নেই, সবই প্রায় চ্যাপটা, ফ্ল্যাট, তাতে আছে শুধু সীমারেখা আর স্থানে স্থানে মোটা পর্দার রঙ যা এক মিহি পর্দার মধ্য দিয়ে আরেক মিহি পর্দায় যায় না। এর কারণ

খুঁজতে হয় বিষুবরেখা অঞ্চলের প্রখর সূর্যের আলোয়, যে আলোর তীব্র তেজে শিল্পীর মিহি রঙের টোনের কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য, যার অত্যাচারে শুধু এক একটি আয়তন জুড়ে শুধু একটি রঙ নিজেরই রকমের গাঢ়-ফিকে পর্দা নিয়ে টিকে থাকতে পারে। ভারতীয় শিল্পী মড্‌লিং যে বিচক্ষণ বুঝতেন, পারস্পেক্‌টিভ যে খুব ভাল বুঝতেন, আলোছায়ার গুণ যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শিক্ষা করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ মেলে ভারতীয় ভাস্কর্যে, যার উপরে সূর্যের আলো পড়ে সর্বদা আলোছায়া, বিভিন্ন সূক্ষ্ম রঙের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে (বোধ হয় ভারতীয় চিত্র নির্মাণে দেখা যায়)। কিন্তু দেশ সম্বন্ধে জ্ঞানের বলে চিত্রশিল্পী ছবি থেকে সূক্ষ্ম পারস্পেক্‌টিভ বাদ দেন , বাদ দিয়ে, যে রেখা প্রখর আলোয় গলবে না, হারিয়ে যাবে না, চোখে বিভ্রম ঘটাবে না, সেই রেখার আশ্রয় নেন। একটা খুব প্রণিধানযোগ্য ব্যাপারের কথা বলি। অজন্তার গুহার অভ্যন্তরে যেখানে ছবি দেখতে গেলে শুধু বাতি বা মশালের সাহায্যেই দেখতে হবে, সেখানেই শুধু অজন্তার চিত্রকর ভাস্কর্যের উচ্চাবচতা অর্থাৎ মড্‌লিং বা পারস্পেক্‌টিভ অর্থাৎ দূর কাছের সম্বন্ধাভাস এসেছেন, ছবিতে স্থাপত্য আকারের বাহ্যতা গুণ এনেছেন, রঙ গাঢ়-ফিকে করে। কিন্তু বাইরে যেখানে সূর্যের আলোয় ছবি দেখতে হবে, সেখানে মড্‌লিং প্রায় একেবারেই নেই, পরস্পেক্‌টিভও নেই, আছে শুধু রঙীন আল্‌পনা আর নক্সা। এটা ভাববার কথা। ভারতবর্ষে সূর্যের আলোয় তেল রঙের ছবি চলা খুব শক্ত, কারণ তেলরঙ বড় চকচক করে, চোখকে দেখতে দেয় না, যদি না সে ছবি প্রায় অন্ধকার ঘরে দেখা হয়। গল্প আছে জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যর টমাস রো যখন প্রথম তেল রঙের ছবি নিয়ে যান তখন বাদশা খুব চটে গিয়ে ছবি সরিয়ে নিতে বলেন, কারণ সে ছবি নাকি বড় ইতরের মত চকচক করছিল।

চিত্রশিল্পী রেখার সমস্ত গুণাগুণ আয়ত্ত করেছিলেন, ফলে শুধু রেখার মধ্যে দিয়েই তিনি যত কিছু ভাব প্রকাশ করতে শেখেন এবং রেখার মধ্যে আনেন মড্‌লিঙের গুণাগুণ, উঁচুনীচু বোধ, ফোরশর্টনিং, পারস্পেক্‌টিভ। রেখার মধ্যে প্ল্যাস্টিক গুণও আনেন। অজন্তার স্বর্ণযুগে এই রেখা সর্বদা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, তেজোময়।

রেখার সঙ্গে যুক্ত হয় অল্প কয়েকটি রঙ যেগুলি শুধু গাঢ় ফিকে করেই আসে অসীম বৈচিত্র্য। রঙের ঐশ্বর্যের কথা আগেই বলেছি। মানুষের গায়ের চামড়া প্রায়ই হত গোলাপী আর ধূসর। কখনও কখনও সবুজ দেখা যায়, কিন্তু সবুজ রঙ আসলে ছিল তলাকার আস্তর। রীতি ছিল প্রথমে নরম সবুজে মানুষের গা রঙ করা, তারপরে দেওয়া হত গোলাপী রং, ফল দাঁড়াত স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্বচ্ছ-প্রায় এক ধরনের ধূসর রঙ। এ ছাড়া ব্রাউন, কালো আর লালের প্রচুর ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন ছবির সবচেয়ে কৃতিত্ব ছিল ভাবভঙ্গী প্রকাশে, আর হাতের মুদ্রায়। হাত, আঙুল এমন সুনিপুণ ভাবে বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্র আঁকা হয়েছে কিনা সন্দেহ, ছবির মধ্যের হাতে আঙুলে শিল্পী যেন কথা কওয়াতে পারতেন।

কিন্তু শেষে একথা মানতেই হয় যে গুহাচিত্র ছিল মুখ্যত আখ্যানমূলক, অর্থাৎ গল্প বলা ছবি। গল্প বলা ছবিতে গল্প বা আখ্যানই হয় মুখ্য, ছবি হয় গৌণ। ছবির ছবিত্বগুণ, যেখানে সে কি বলছে তার বিশেষ মূল্য নেই (অর্থাৎ ধ্রুপদী সঙ্গীতে যেমন কথা বা ভাষার কোন মূল্য নেই), শুধু সেই ধরনের ছবিতেই আসে একান্ত ছবির মৌল ঐক্য বা বাঁধুনি যার একাত্মতার ছন্দ ছবির নানান বিপরীত বিষয়, রঙ ও রেখাকে একই চৌহদ্দির মধ্যে এক সমগ্রতায় বেঁধে রাখে, নক্সার শ্রেষ্ঠত্ব, চিত্রের কৈবল্য বা নৈর্ব্যক্তিকতা, যা আখ্যানের উপর ভর দিয়ে থাকে না, যা নিজের জোরে সম্পূর্ণ, যা নিছক ছবি এবং সেই হিসাবে কালজয়ী, অর্থাৎ কালকে যে অতিক্রম করে, যা দেখে মনে হয় এ ছবিতে কাল থমকে দাঁড়িয়ে আছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আখ্যানচিত্রকেও অজন্তাশিল্পী কি পরিমাণ চিত্রগুণমণ্ডিত করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়, উপরন্তু প্যানেল চিত্রে আমরা পাই শুদ্ধ আখ্যানহীন ছবি, যার উৎকর্ষ চিরকালই সব শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবে।

অজন্তা চিত্রের রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত

ভারতশিল্পের ইতিহাসে কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজের ও অলঙ্কারে যেমন একটি সুস্পষ্ট প্রগতি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা পাওয়া যায়, ভারতীয় চিত্রকলায় রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির বিভিন্ন ধারাতেও তেমন একটি স্পষ্ট যোগসূত্র দেখা যায়। চিত্রকলায় কোথায় কম্পোজিশন শেষ হয়ে পারস্পেকটিভ শুরু হয়, অথবা দুটির টেকনিকের মধ্যে কোথায় তফাৎ, অথবা আদৌ আছে কিনা, বলা শক্ত, কারণ কম্পোজিশনে যে সব উপাদান দরকার হয় পারস্পেকটিভ সৃষ্টিতেও তাদের স্থান বিশেষ প্রধান।

অজন্তা চিত্রের রচনা এবং পরিপ্রেক্ষিতের টেকনিক এবং ইস্থেটিক উদ্দেশ্য বিচার প্রসঙ্গে শুধু তার ব্যাকরণটুকু আলোচনা করলে খুবই ভুল হবে, কারণ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং মূল আদর্শের উপরেই অজন্তাচিত্রের রচনা এবং পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তি বলা যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে চিত্রের কৌশলগত যাবতীয় সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শনের ওতপ্রোত সম্বন্ধ বর্তমান।

নয় এবং দশ নম্বর গুহার ফ্রেস্কোর পুনঃ সংস্কারের পর এখন প্রায় জোর করে বলা যায় যে অজন্তার ফ্রেস্কো শুরু হয় সাঁচি যুগে, শেষ হয় গুপ্তযুগে। সম্প্রতি ফিলিপ স্টার্ণ বলে এক ফরাসী পণ্ডিত অজন্তার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে ২৯টি গুহার ক্রমপঞ্জী মোটামুটি বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে যখনই আমরা সাধারণভাবে অজন্তা শিল্প, অজন্তা যুগ বা অজন্তা রীতির

উল্লেখ করব তখনই আমাদের মনে জাগবে তার সবচেয়ে গৌরবের যুগ অর্থাৎ খৃষ্টীয় পাঁচ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ছয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। বাস্তবিকপক্ষে ভারতের নানাস্থানের ভাস্কর্যকে বুঝতে এই যুগের অজন্তাচিত্রাবলীই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে ; তার কারণ এর আগের যুগের ফ্রেস্কোগুলি, অর্থাৎ নয় আর দশ নম্বরের ছবিতে এমন কোন টেকনিকের নৈপুণ্য নেই যা নাকি সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীতে নেই।

অজন্তায় গুপ্তযুগের ফ্রেস্কোগুলি প্রথম দেখলে একটু হতভম্ব হতে হয়। আষ্টে পৃষ্টে ফ্রেস্কোয় মোড়া দেয়ালগুলি প্রথম দেখলে মনে হয় যেন পাশাপাশি দুটি চিত্রবিষয়ের মধ্যে কোন রকম সীমা-রেখা নেই, সীমারেখার চেষ্টাও নেই। ফলে জাতকমঞ্জরী বা মূর্তিলক্ষণাদি খুব ভাল রকম জানা না থাকলে, কোনখানে একটি আখ্যান শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হল বলা শক্ত হয়। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি, ছাত থেকে মাটি পর্যন্ত, একটুও জায়গা কোথাও ফাঁক না রেখে, সমস্ত দেয়ালময় ছবি আঁকা ; তাতে প্রথম প্রথম চোখ কোন ছবিকে আলাদা করার অবসরই পায় না। সারা দেয়ালময় নরনারী, নগর, অট্টালিকা, পাহাড়, পাথর, গাছপালা, পশুপক্ষী ভীড় করে থাকে। কিন্তু এসব জিনিষ যতই ঝাঁকালো হয়ে গিজগিজ করুক না কেন, কোথাও ভারস্বরূপ হয় না ; সমস্ত দেয়ালটি যেমন নিপুণ, কুশলী, তেমনি বিচিত্র, সঙ্গত সুরে বাঁধা। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে কিছু কিছু গ্রুপ চারপাশ থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, দৃষ্টিপথে পড়ে, তাদের খুঁটিনাটি নজরে পড়তে শুরু করে। সেগুলি দেখা হলে দৃষ্টি আবার চলে যায় যেগুলি কম দরের বা কম জরুরী গ্রুপ, যেগুলি প্রধান দৃশ্যগুলির চারদিকে সাজানো আছে, তাদের দিকে। সেগুলি দেখা হলে পর চোখ আপনা আপনি, নিজের অজান্তেই আস্তে আস্তে আবার আরেকটি মুখ্য গ্রুপের উপর গিয়ে পড়ে।

এই সব কম্পোজিশনের ভিতরে কি ধরনের শৃঙ্খলা, কি ধরনের সঙ্গতি বর্ত্তমান, তারা কোন আইনের অধীন, সেইটুকু আবিষ্কার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সবচেয়ে সরলরীতির কম্পোজিশন অবশ্য হচ্ছে যেগুলিতে প্রতিসাম্য বর্তমান, অর্থাৎ মধ্যস্থলের দুপাশে ফিগরগুলি সাজানো, যাতে ডাইনে বাঁয়ে এবং মধ্যের ফিগরগুলিতে ভারসাম্য আসে। এই ধরনের কম্পোজিশন সবচেয়ে বেশী পাই বৌদ্ধ গ্রুপগুলিতে ; সেগুলির বিষয় বহু পুরনো, চিরাচরিত ; অজন্তা যুগের অনেক আগে থাকতেই তাদের সূত্র স্থির হয়ে গেছে। মধ্যস্থলের দুপাশে প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশন রীতি এমন কিছু মূল্যবান নয় ; কারণ বিহার, মঠ, মন্দির সর্ব্বত্রই দেয়ালে এই ধরনের অজস্র ভাস্কর্য দেখা যায়। এই ধরনের কম্পোজিশনে বোধহয় গ্রীক-বৌদ্ধ রীতির ছাপ দেখা যায়। সে রীতিতে প্রতিসাম্য ভাঙা, ভারসাম্যতাহীন কম্পোজিশনের চেয়ে প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশনই বেশী প্রশ্রয় পায়। তা সত্ত্বেও কতকগুলি পুরনো বিষয়, যেমন মারের প্রলোভন, অজন্তায় নতুনভাবে, অনেক স্বচ্ছন্দ ছাঁদে আঁকা

হয়েছে। যথা, মারের প্রলোভন চিত্রে প্রতিসাম্যের আড়ষ্টতা নেই বলা যায়; সেখানে ছবির প্রসাদ ঘনবস্তু বা ম্যাসের বিশেষ বিশেষ বিন্যাসে যতটা এসেছে রেখার সংস্থানে ততটা আসে নি।

এই ধরনের সরল পদ্ধতি বা প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশনের পরে আসে দ্বিতীয় পদ্ধতি, তাতে যে-কোন দৃশ্যের বিভিন্ন গ্রুপগুলি একত্রে যোগ করে গাঁথা। এই রীতির আমরা নাম দিতে পারি যোগসূত্র রচনা বা ইংরেজিতে কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশন। অজন্তা রীতিতে যোগসূত্র রচনা এত বেশী দেখা যায় যে এই টেকনিকটিকে আমরা অজন্তার একান্ত বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। এই ধরনের রচনার কল্যাণে একই আখ্যানের একাধিক দৃশ্য পরের পর একই দেয়ালে সাজানো হয়, তাদের ক্রমান্বয়তার মধ্যে কোন স্পষ্ট বিরাম বা যতিরেখা থাকে না। সাধারণত চিত্রকলায় একটা মস্ত অসুবিধা এই যে তাতে উপন্যাস বা নাটক বা কবিতার মত কালাতিপাত দেখানো যায় না, কিন্তু এই ধরনের কম্পোজিশনের কল্যাণে সময়ের গতি দেখানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ ক্রমিক পর্যায়ে ছবিতে গল্প বলা যায়।

এই ধরনের কম্পোজিশন ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণটি সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ জাপানের মাকিমোনোর কম্পোজিশনেও দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিল্পী চিরকাল যে কোন দৃশ্য বা ছবি একটি স্পষ্ট, বিশিষ্ট ফ্রেমে বাঁধা অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত। তিনি সেটি দেখেন একটি বাঁধা-ধরা, অনড় স্থান বা বিন্দু থেকে, দেখেন যেন জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে (লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির খড়খড়ি বা ভেন্টিলেটার)। অপর পক্ষে ভারতীয় শিল্পী কোন দৃশ্য শাড়ীর পাটের ভাঁজের মত খুলে খুলে দেখতে অভ্যস্ত, ঠিক যেন চলন্ত রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা ক্রমান্বয় দৃশ্য বা প্যানোরামা। তার মধ্যে বিভিন্ন আখ্যান ভাগ করতে, সেই সঙ্গে আবার তাদের মধ্যে যোগসূত্র রাখতে, সাঁচির প্রথম স্তূপের যুগ থেকেই ভারতীয় শিল্পী তাঁর ছবিতে, লেখায় যতিচিহ্ন বা পাঙ্কচুয়েশন চিহ্নের মত কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করতেন। তাদের কাজই হত দুটি আখ্যানের মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা। সাধারণত সেগুলি হত নগর-তোরণ, অথবা মন্দির দ্বার, চাতাল বা অলিন্দ, গাছ, স্তম্ভ ইত্যাদি। সেই সঙ্গে তিনি আখ্যানটির মুখ্য কেন্দ্রবিন্দুর দিকে আখ্যানসংশ্লিষ্ট সব ফিগরগুলি উপযুক্ত ভঙ্গীতে এঁকে দিতেন, ইংরেজিতে যাকে বলে ওরিয়েন্টেট করে দিতেন। বস্তুত, সাঁচিতেই এই ধরনের কম্পোজিশনের প্রথম স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাঁচির এই ধরণের কম্পোজিশনে অবশ্য সেখানকার পোর্টিকো, লিন্টেলের প্রলম্বিত আকার সাহায্য করে। এই রীতির বিশেষ উন্নতি হয় অমরাবতীতে। অমরাবতীর আল্‌সে বা ব্যালাসট্রেডের হাত রেলিং ধরে, একের পর এক দৃশ্য ক্রমান্বয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে চলে গেছে, নগর তোরণ, পোর্টিকোর খিলান, চবূতারা থাম ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে এসে তাদের স্রোত যা ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিয়েছে।

অজন্তা শিল্পীও একই উদ্দেশ্যে তাঁর কাজে অমরাবতীর রীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন হয়ত

একই আখ্যানের দুটি দৃশ্যের মাঝে আসে কোন নগর তোরণ, কোন দৃশ্যের সবটাই হয়ত কোন অলিন্দের ফ্রেমে আবদ্ধ, পাথর, পাহাড় হয়ত আকাশের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে দেয়। কিন্তু অমরাবতীর টেকনিক অজন্তাচিত্রশিল্পী এমন নিপুণভাবে, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন যে দেখে অবাক হতে হয়। উপরন্তু অমরাবতীর স্থাপত্যে নগর তোরণ, পোর্টিকো বা থাম যেমন নিতান্ত আবশ্যিক এবং হাতরেলিংএর ভাস্কর্য যেমন গৌণ, অজন্তায় তা নয়, বরং উল্টো, অর্থাৎ অজন্তায় চিত্রশিল্পী এসব উপচারকে চোখকে ক্ষণিকের বিশ্রাম দেবার জন্য আনেন, আর ছবির ঠিক এমন এমন জায়গায় তাদের উপস্থাপিত করেন যেখানে লম্বালম্বি এবং কোণাকুণি সরল রেখাগুলি মুহূর্তের জন্য ভীড় করা ফিগরকে সুসংবদ্ধভাবে আটকে রাখে, আর সেই সঙ্গে কম্পোজিশনের ছন্দ বদলে দেয়।

এগুলি যেন ধ্রুপদে তানপুরার ঝঙ্কার, গানের সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক নেই, অথচ আলাদাভাবে গানের সঙ্গে বেজে চলেছে, যার মৃদু গুঞ্জনের উপর অপূর্ব মূর্ছনায় ওঠে সুরের কলি। অজন্তায় এইসব সুরের কলি হচ্ছে অতি লাবণ্যময় নানা ভঙ্গীতে আঁকা নরনারীর দল, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের এলোমেলো মনে হলেও তারাই দৃশ্যগুলির আসল বিষয়। তাদের হাবভাব, ভঙ্গী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বক্ররেখা, সব মিলে আমাদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ কম্পোজিশনের কেন্দ্রস্থলে ঠেলে দেয়, তার থেকে অবলীলাক্রমে পরের কম্পোজিশনে চালিত করে; অর্থাৎ ফিগরগুলির নানাবিধ রেখাই হয় আমাদের দৃষ্টির পথপ্রদর্শক। প্রধান গ্রুপগুলির আশে পাশের ফিগরগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে, তাদের একপাশ থেকে দেখা ছবি বা প্রোফাইল, ত্রিভঙ্গের বাঁক, তাদের অপসৃত দৃষ্টি, যে গ্রুপের মধ্যে তারা আছে তার দিকে না দেখিয়ে পরের দৃশ্যের দিকে তাদের বাড়ানো হাত, সবই চোখকে পরের দৃশ্যের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ তারা পাশাপাশি আঁকা দৃশ্যের সেতুবন্ধন করে, ঠিক যেমন কোন রঙের ক্রমিক পর্যায় ছবিতে আলো আর ছায়ার মধ্যে সেতুবন্ধন করে।

এই পদ্ধতিটি মোটেই অজন্তা চিত্রশিল্পীদের আবিষ্কার নয়, অমরাবতীতে আগে থেকেই চালু ছিল, যদিও এটুকু বলা যায় যে অজন্তাতেই তার চরম উৎকর্ষ হয়। ভারতের বাইরেও যেখানেই শিল্পে ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে এশিয়ায়, এই টেকনিক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু টুনহুয়াঙের ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে মধ্য এশিয়ায় এই টেকনিকটি বড় বেশী বাঁধাগতে দাঁড়িয়ে যায়; সেখানে ফিগরগুলি গতানুগতিকভাবে সাজানো, বৈশিষ্ট্য নেই, কল্পনা নেই; বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট নয়, এলোমেলোভাবে সাজানো। অজন্তায় যেমন প্রতিটি ভঙ্গী, মুদ্রা, শরীরের ছন্দ, অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, টুনহুয়াঙে তা নয়; সেখানে শরীরের বক্ররেখা, ভাবভঙ্গী নিতান্ত ছকে ফেলা, আড়ষ্ট, নেহাৎ যন্ত্রের মত এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে দৃষ্টিপথ চালিত করে, তাতে ব্যঞ্জনার কিছু নেই, বৈশিষ্ট্যও নেই।

এতক্ষণ আমরা দুধরনের কম্পোজিশনের কথা আলোচনা করেছি; প্রথমটি সরল অর্থাৎ মধ্যস্থলের ম্যাস বা ফিগরের দুপাশে প্রতিসাম্য রাখা আরও দুটি ম্যাস; দ্বিতীয়টি যোগসূত্র রচনা,

যাতে দৃশ্যগুলি একদিক্রমে আসে ; খণ্ড খণ্ড আলাদা আলাদা অসম্পৃক্তভাবে নয়। এরপর আমরা তৃতীয় একধরনের কম্পোজিশন সম্বন্ধে আলোচনা করব। দ্বিতীয় রীতির সঙ্গে এর ক্রিয়াগত ঘনিষ্ঠ-যোগ আছে, তাছাড়া আরও মিল আছে এই হিসাবে যে এই রীতিটিও অজন্তা চিত্রশিল্পীর নিজস্ব আবিষ্কার নয়। তৃতীয় ধরনের কম্পোজিশনকে বলা যায় চক্রাকার বা মণ্ডলাকার রচনা।

উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। এক নম্বর গুহার শঙ্খপাল জাতক আখ্যানটি ধরা যাক। সমগ্র চিত্রটিতে দুটি স্পষ্ট ভাগ বা দৃশ্য আছে। ডানদিকে ব্যাধরা নাগরাজ শঙ্খপালকে আক্রমণ করে বন্দী করেছে। বাঁ দিকে শ্রেষ্ঠী অলর রাজপুত্র শঙ্খরাজকে নিষাদদের হাত থেকে মুক্ত করে দীক্ষা দিচ্ছেন। রাজপুত্র ভিক্ষুর চীর গ্রহণ করেছেন। পুরো আখ্যানটি দুটি দৃশ্যে ভাগ করা ; প্রতিটি দৃশ্যের গ্রুপ আবার মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রের চারধারে গোল করে সাজানো। ডানদিকের দৃশ্যে ব্যাধদের হাত একঝাঁক কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালের সৃষ্টি ক'রে তাদের শীকারের দিকে বাড়ানো ; নাগরাজের শরীরটি আবার লম্বা একটি পাক খেয়ে ব্যাধদের হাতের দিকে আগানো। দৃশ্যটির তলার দিকের যে ফিগরটি আঁকা তার সাহায্যে পরোক্ষভাবে শিল্পী সেই বিন্দুটি লম্বালম্বি দেখাতে চেয়েছেন যেখানে নাকি ব্যাধরা নাগরাজকে ধরে বন্দী করছে। বাঁদিকের দৃশ্যে আছে দুটি শ্রদ্ধার্হ ফিগর, তাদের মধ্যে যেটি মুখ্য, অর্থাৎ ভিক্ষু, সেটি উপরদিকে তুলে আঁকা ; উপর নীচ বা খাড়াই পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজিতে যাকে বলে ভার্টিকল পারস্পেকটিভের, প্রথানুসারে তাতে বোঝায় যে নাগরাজ ভিক্ষু দর্শক থেকে আরও দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ফিগর দুটি অতি ধীরমন্দ ছন্দে পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ডানদিকের দৃশ্যের দ্রুত তালের গতির স্থলে বাঁদিকের ধীর ছন্দ অদ্ভুত এক বৈষম্যের সৃষ্টি করে, ফলে বাঁদিকের দৃশ্যের শান্ত সমাহিত স্তিমিত ভাব আরও বর্ধিত হয়, দীক্ষার গুরুত্ব, সৌম্য সৌন্দর্য ভাল করে ফুটে ওঠে, দর্শকের মনে ভক্তির উদয় হয়, শিল্পীর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। মুখ্য চরিত্র দুটির পদতলে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, তার দেহটি ত্রিভুজের আকারে আঁকা। তার স্থাণু ভঙ্গীতে চিত্রটির শান্ত সমাহিত ভাব আরও গভীর হয়, সেই সঙ্গে নারী দেহটি কম্পোজিশনের কেন্দ্রবিন্দুটি চিহ্নিত করে। জাতকটি জানা থাকলে দুটি দৃশ্য যে আলাদা তা বোঝা যায়, কিন্তু প্রথম দেখলে দুটিকে একই দৃশ্য বলে মনে হয়। তার কারণ বাঁ দিকের দৃশ্যের দেহরেখার বাঁকগুলির সঙ্গে ডানদিকের নাগরাজের কুণ্ডলীর সর্বদাই যোগাযোগ আছে ; যে গতির বশে দৃশ্য দুটি আলাদা হয়ে যায় তা প্রথমে নজরে পড়ে না ; সে হচ্ছে দুই দৃশ্যের ফিগরগুলির মাথা দুই বিপরীত দিকে ঘোরানো। একাধিক দৃশ্যের যোগ অথবা বিচ্ছেদ সূত্র হিসেবে ফিগরের মাথাগুলিকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে, সুনিপুণ, সূক্ষ্ম কৌশলে খুব সার্থকভাবে আখ্যান চিত্রটি নির্মিত হয়েছে।

এই ধরনের কাজের বহু নমুনা অজন্তায় আছে। এক নম্বর গুহার মহাজনক জাতক আখ্যানটিই ধরা যাক। এই আখ্যানটিতেও দুটি আলাদা অংশ সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান। রাজপ্রাসাদে

ঢাকা বারান্দার মত চাতালে রাজকুমার রাজকুমারীর সামনে নৃত্য হচ্ছে। রাজপরিবার ঘিরে রয়েছে একটি দল বা গ্রুপ, নর্তকী ও বাদ্যকরদের নিয়ে হয়েছে দ্বিতীয় দল বা গ্রুপ। দুটি দল বা গ্রুপ দুটি কেন্দ্রের চারপাশে বৃত্তাকারে রচিত। শঙ্খপাল জাতক আখ্যানের মতই এখানেও প্রত্যেকটি কম্পোজিশন গোল আকারে আঁকা প্রধান ফিগরগুলি বৃত্তের মাঝখানে। দেহের ত্রিভঙ্গে, মাথার ভঙ্গীতে ও সংস্থানে, বাহুর বঙ্কিম রেখায়,—সে প্রথম অংশের রাজানুচরীদের দেহেই হোক, অথবা দ্বিতীয় অংশের বাদ্যকর বাদ্যকরীদের দেহেই হোক,—দর্শকের দৃষ্টি অবলীলাক্রমে অথচ নিতান্ত অনিবার্যভাবে প্রতিটি গ্রুপের মধ্যস্থলের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ চারপাশের ফিগরের রেখাগুলি এমনভাবে রচিত যে তারা দর্শকের দৃষ্টিকে আপনাআপনি অক্লেশে গ্রুপের কেন্দ্রস্থলবর্তী ফিগরের প্রতি চালিত করে। ছবিটির প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে যেতে দুটি ফিগর দৃষ্টিকে সাহায্য করে।
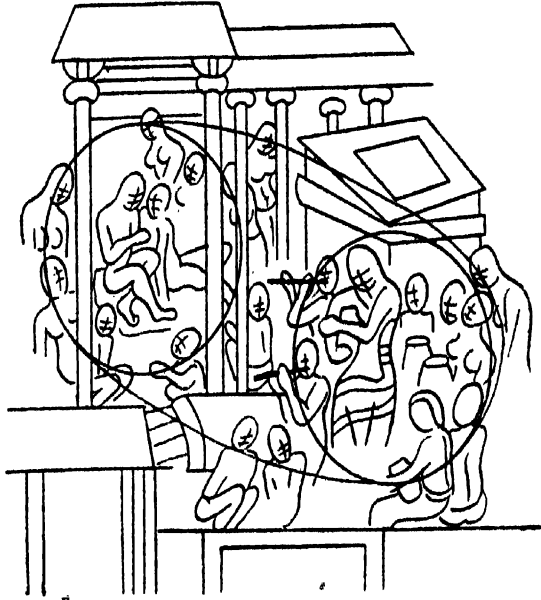
প্রথমটি দুটি থামের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় একজন স্ত্রীলোক, ফিগরটি রাজপুত্রের গ্রুপের মধ্যে পড়লেও তার দেহ খুব স্পষ্টভাবে নর্তকীদের দলের দিকে ফেরানো। দ্বিতীয় ফিগরটি হচ্ছে এই নারীরই পায়ের তলায় জড়োসড়ো, উপুড় অবস্থায় পড়া আরেকটি ফিগর ; স্ত্রীলোকটির মত এও যদিও স্পষ্টত রাজপুত্রের গ্রুপে পড়ে, তবুও দ্বিতীয় গ্রুপের দিকে মাথা ফেরানো থাকার দরুণ সেটি দ্বিতীয় গ্রুপের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে জড়িত। এ ছাড়াও দুই গ্রুপের মধ্যে আরও দূর পরোক্ষ যোগসূত্র আছে, যার মূল্য অত সহজে বা পরিষ্কারভাবে নিরূপণ করা যায় না ; সে হচ্ছে প্রথম গ্রুপের নর্তকীর দেহের বঙ্কিম ছন্দের মিল ; এই দুটি বাঁকা দেহরেখা যেন এক কল্পিত কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালের দুটি প্রান্ত, যে কর্ণরেখাটি রাজকুমারীর ডান পা থেকে শুরু করে উপুড় অবস্থায় পড়া ফিগরের বাহুরেখাটি ধরে দ্বিতীয় গ্রুপের বাঁ দিকের বাদ্যকরদের বাঁশিগুলি বরাবর চলে গেছে।

এই ধরনের জোড়া-কম্পোজিশন শুধুমাত্র রেখায় দেখাতে হলে একটি খুব লম্বা সরু ডিম তেরছা বা কোণাকুণি করে কাগজে আঁকতে হবে। এই ডিমের সীমারেখার চারদিকে এমন করে চিহ্ন দিয়ে যেতে হবে যাতে আরেকটি বড় ডিমের আকারের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকে। এই ছুটি ডিমের বিপরীত প্রান্তদ্বয়ের ঠিক ভিতরে আবার থাকবে ছুটি গোল বা বৃত্ত; প্রতিটি বৃত্তের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সেই বৃত্তের মধ্যে আবার একটি করে গ্রুপ আবদ্ধ থাকবে।

হুবহু ঠিক এই প্যাটার্নটি পাওয়া যায় বাঘের বিখ্যাত হল্লীসক ফ্রেস্কোয়। সেখানেও পাশাপাশি ছুটি বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে ছুটি নর্তকী, সেখানেও কম্পোজিশনের মোটামুটি আকারটি হচ্ছে দেয়ালে কোণাকুণিভাবে ন্যস্ত একটি সরু ডিম। এমন কি অজন্তার কোন কোন চিত্রের কম্পোজিশন অনেক সময়ে অত স্পষ্টাস্পষ্টি বৃত্তাকারে না হলেও তাদের মধ্যে সর্বদাই বেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব থাকে, সেগুলি স্পষ্টত কোন মুখ্য ফিগরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়; ঠিক যেন গোল বাটির আকারে হেলানো ফুলের পাপড়ির সারি, যাদের বাঁকগুলি চোখকে প্রায় একরকম ঠেলে ঠেলে মধ্যের ফিগরের দিকে নিয়ে যায়।

এখানেও অজন্তাশিল্পী কোন নতুন আবিষ্কারের দাবী করতে পারেন না। অর্থাৎ মৌলিক ডিজাইন সৃষ্টির সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। ভারুতে বরাবর গোল বা বৃত্তাকার কম্পোজিশনের চেষ্টা দেখা যায়; বস্তুত ভারুতের পর থেকে গোল কম্পোজিশন প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসে। তাতে অবশ্য স্থাপত্যের তাগিদ খুব সাহায্য করে, কারণ ছাতের আলসের একঘেয়ে একটানা সোজা রেখা ভাঙতে গিয়ে এসেছে ব্যালাস্ট্রেডের গোল পদক বা মেড্যালিয়ন; প্রয়োজন হয়েছে সেই মেড্যালিয়নকে ভাস্কর্য-খচিত করার। এই ধরনের কম্পোজিশন অবশ্য অমরাবতীতেই বেশী দেখা যায়। অজন্তাতেও গোল কম্পোজিশন করা একটি মেড্যালিয়ন পাওয়া গেছে (এটি এখন মাদ্রাজ মিউজিউমে আছে), তার বিষয় হচ্ছে এক রাজা উপঢৌকন গ্রহণ করছেন। দৃশ্যটিতে ফিগরগুলির মাথা যেভাবে সাজানো তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পী বৃত্তাকার কম্পোজিশন নিখুঁতভাবে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের ফর্মে চূড়ান্ত সৌন্দর্য এসেছে অমরাবতীর আর একটি মেডালিয়নে। এটির বিষয় হচ্ছে দেবগণ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র ঊর্ধলোকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে সমস্যা ছিল কি করে দর্শকের চোখ অবলীলাক্রমে বৃত্তের উপরদিকের অংশে অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্রের দিকে চালিত করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ম্যাসগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, তাদের চারদিকের রেখাগুলিকে এমন দৃঢ় অথচ লাবণ্যময় ছন্দে একরোখা করা হয়েছে, যে তাদের অপ্রতিহত নির্দেশে চোখ স্বতই ভিক্ষাপাত্রের দিকে যায়।

এটা নিশ্চিত যে এই ধরনের বৃত্তাকার কম্পোজিশনের প্রতি পক্ষপাত নিছক আকস্মিক নয়; এর মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। এইসব রচনায় মণ্ডলস্থ গূঢ় তত্ত্বের কথা মনে পড়ে, যে মণ্ডলে থাকে

কতকগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্ত অথবা চৌখুঁপী কাটা প্রকোষ্ঠ, যার রহস্যময় মধ্যস্থলে থাকেন স্বয়ং ঈশ্বর বা ধ্যানের দেবতা। এই মধ্যস্থলে যেতে হলে চাই ধ্যান ও আরাধনা, প্রতিটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। এইভাবে স্তরে স্তরে মণ্ডল ভেদ করে সবশেষে সাধকের হয় চরম ব্রহ্মাস্বাদ, ঈশ্বরের সঙ্গে মরমী মিলন, যে ঈশ্বর ভ্রূণস্থিত বীজের মত বিশ্বের অন্তঃস্থলবর্তী কেন্দ্রে সদাই অপ্রকাশিত থাকেন।

এটা সম্ভবত ঠিক যে অজন্তা শিল্পীরা শুধুমাত্র ঐতিহ্যের খাতিরে, অথবা অলঙ্কারের নেশায় বৃত্তাকার রচনা প্রয়োগ করেন নি; তাঁদের চোখে বৃত্তের নিশ্চয় গূঢ় রহস্যময়, মরমী গুণও ছিল। ঠিক এই গুণ, এই তাগিদই নিশ্চয় ছিল অমরাবতীর গোল পদকে বা মেড্যালিয়নে। আবার ঠিক এই গুণ, এই তাগিদই বরাবর এসেছে ভারত চিত্রকলার কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক রাসমণ্ডল চিত্রাবলীতে। রাসমণ্ডল চিত্রের সবচেয়ে সার্থক নিদর্শন আছে জয়পুরের মহারাজার সংগ্রহে। এই মিনিয়েচরটির মণ্ডলবৃত্তগুলি গোপিনীদেহ দিয়ে তৈরি, তাদের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন চরম আরাধনার বস্তু, কৃষ্ণরাধা। এই মেড্যালিয়ন সবচেয়ে বেশী দেখা যায় বাংলার ইঁটের মন্দিরে। পাল ও সেন যুগের শত বা সহস্র-দল পদ্ম অথবা মুসলমান আমলের মরমী গোলাপও টেরাকটা মন্দিরে দেখা যায়, তারই পাশে দেখা যায় সারা দেশময় অজস্র ছোট বড় পোড়ামাটিতে মেড্যালিয়ন আকারে খোদাই অপূর্ব রাসমণ্ডল ভাস্কর্য, যার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ নিদর্শন আছে বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন মন্দিরে, বংশবাটীর বাসুদেব মন্দিরে, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থেকে আনীত পোড়ামাটিতে খোদাই দুটি মেড্যালিয়ন আকারের রাসমণ্ডলও উল্লেখযোগ্য।

অজন্তাশিল্পী কি অদ্ভুত কৌশলে প্রচলিত কম্পোজিশন রীতি ব্যবহার করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়; আরও অবাক হতে হয় কেমন অবলীলাক্রমে তিনি এই রীতিকে যোগসূত্র কম্পোজিশনে প্রয়োগ করেন তাই দেখে, নানা বিচিত্র রূপ এনে তার মর্যাদা যে কত বৃদ্ধি করেন তার যেন ইয়ত্তা নেই।

পারস্পেকটিভের সমস্যা নিরাকরণ ব্যাপারেও অজন্তা শিল্পীরা ঠিক এই ধরনের সুষমা, সঙ্গতি, সংযম, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। একদিকে কম্পোজিশনের প্রাচীন আইনকানুন তাঁরা যেমন মেনেছেন, তেমনি দুর্লভ কৌশল প্রয়োগে তাঁদের মর্যাদাও তাঁরা বাড়িয়েছেন। তাই তাঁদের কীর্তি ভাল করে বুঝতে হলে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী কী চোখে এই সমস্যাগুলিকে দেখতেন তা জানা দরকার।

ভারুতের নতোন্নত ভাস্কর্য বা রিলিফের মত অত প্রাচীন কাজেও পরবর্তী যুগের ভারতীয় কীর্তির সবকটি লক্ষণ প্রায় বর্তমান। আখ্যানের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকায় (গুপ্তযুগের অজন্তা-চিত্রেও এই লক্ষণটি সবিশেষ প্রবল) ভারুত শিল্পীরা পাণ্ডিত্যের প্রমাণ যত না দিয়েছেন তত দিয়েছেন

পরিচ্ছন্ন যুক্তির। তাঁরা দৃশ্যমান জগতের বিবিধ লক্ষণকে বড় বেশী সরল করেছেন ; সেই সরলী-করণের মধ্যে শুধুমাত্র নৈপুণ্যের অভাব ঢাকা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল। ঘনবস্তুর গভীরত্ব ফুটিয়ে তোলার আইন কানুনের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে তাঁরা বস্তুকে সমগ্রভাবে, পুরোপুরি-ভাবে দেখালেন, তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গীর পরিচয় দিলেন, উপরন্তু যেসব ভঙ্গী সবচেয়ে সহজে প্রতিফলিত করা যায় সেগুলি দিলেন। কিন্তু ভারুত শিল্পীকে চট করে অপটু বা মূর্খ ভাবাও হঠকারিতা হবে। তাঁরা নিজেদের কাজ বিলক্ষণ জানতেন, ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট ; প্রয়োজনমত তাঁরা কিছু কিছু লক্ষণ খুব ভালভাবেই চাপা দিতে পারতেন, কিন্তু তা যে স্বেচ্ছায় করতেন তা নয়, কেন যে করতেন তার কারণও তাঁদের কাজে তাই পাওয়া যায়। প্রথমত তখনও তাঁরা প্রতিমার যাদুকরী শক্তিতে বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন, তাঁরা প্রকৃতির নকল অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি করতেন না, অন্তরের মানস প্রতিমাকে রূপ দিতেন। প্রতিমার যাদুকরী শক্তির অর্থ ই হচ্ছে যে তাতে এমন শক্তি থাকবে যার কৃপায় মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটতে পারে। ফলে প্রতিমা যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে তাতে না থাকবে তার পরিপূর্ণ কারিকাশক্তি, না থাকবে তাতে প্রতিমার নিখুঁত গুণাগুণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঠিক এই কারণেই প্রাচীন যুগের শিল্পে কোন প্রাণীর পাশ থেকে দেখা ছবিতেও অর্থাৎ প্রোফাইলেও শিল্পী তার দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি শিংই গোটাগুটি স্পষ্ট করে দেখাতেন। এর অনেক পরে, পশ্চিম ভারতের মিনিয়েচর চিত্রশিল্পীরা সদাসর্বদা একপাশ করা প্রোফাইলে ফিগর আঁকলেও তাতে দুটি চোখই গোটা গোটা করে এঁকে দিতেন, ফলে কোটর থেকে দূরের চোখটি বেরিয়ে গিয়ে ছবির জমিতে পড়ত। এই রীতিটি বাংলার পটুয়াদের পটে বিশেষ প্রচলিত, আর প্রচলিত বাংলা কাঁথায় ; তাছাড়া সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছোট ছেলেদের আঁকা ছবিতে, যাদের দৃষ্টির নিষ্কলুষতা এখনও অক্ষুণ্ণ, যাদের জগতে ম্যাজিক এবং রিয়ালিটির ভেদসূত্র অস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতশিল্পে প্রোফাইলের ব্যবহার যদিও বিরল, তবুও অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিমা যেভাবে আঁকা বা খোদাই হয়েছে তাতে সাধারণত যে অঙ্গগুলি শুধুচোখে একপাশ থেকে দেখা সম্ভব নয়, সেগুলিও আঁকা বা খোদাই করা হত। তাতে চক্ষুবিজ্ঞানের আইন কানুন ভাঙ্গা হত বটে কিন্তু চিত্রে অসম্পূর্ণতাদোষ থাকত না। ঠিক এইখানে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য শিল্পীর মধ্যে প্রভেদ শুরু হল : এইখানেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ভারতীয় শিল্পী চোখে যেমনটি দেখছি তেমনটি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবিমূলক চিত্র আঁকার চেষ্টা করেননি, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফের গুণ আনার চেষ্টা করেননি, বরং তাঁদের মানসে যেসব প্রতিমা তাদের বিশিষ্ট মৌলিক গুণে প্রতিভাত হত তাই আঁকবার চেষ্টা করতেন।

এবং যেহেতু প্রথম যুগের শিল্পীরা এই আদর্শে কাজ করে যান, সেহেতু উত্তরগামীরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, অতীব যত্নসহকারে সেই পদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রাখেন, বিধিবদ্ধ করেন, ঐতিহ্য ভাণ্ডারে সসম্মানে স্থান দেন।

খৃষ্টযুগের তিনশতকে শিল্পের ষড়ঙ্গ নামে যে শাস্ত্র লেখা হয় এবং পরবর্তী যুগে ষড়ঙ্গের যেসব ব্যাখ্যা এবং টীকা তৈরি হয় তার থেকে এইটুকু প্রমাণ হয় যে নতোন্নত ভাস্কর্য অথবা প্রাচীন চিত্রকলার যে ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপিত হল তা আদৌ ভুল বা কষ্টকল্পিত নয়। যথা ষড়ঙ্গে রূপভেদ বা রূপের অর্থই হচ্ছে মানস প্রতিমার অন্বেষণ, বাস্তবের সত্যরূপ অথবা রিয়ালিটির প্রতিভাস, ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তের মত সবকিছুকে মনের মধ্যে নতুন করে দেখে, সেই জগতের সঙ্গে মিলিয়ে পুনর্সৃষ্টি করা। মরমিয়া সাধক ধ্যানের বলে সমাধিলাভ করেন ; তদ্‌গত ধ্যানের ফলে শিল্পীরও চেতনায় যখন অনুরূপ শূন্যভাব সহজ হয়ে আসে তখন যে রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান সেটি ক্রমে ক্রমে তাঁর চেতনায় প্রবেশ করে প্রতিভাত হয়, দানা বাঁধে। এইভাবে যা কিছু সৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রকৃত রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্মসৃষ্টি।

প্রাচীন শিল্পীরা যেহেতু মানসপ্রতিমাকেই ছবিতে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন, সেহেতু লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির পরে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় যা হল ভারতবর্ষে তা হয়নি, অর্থাৎ চোখের চেনা জানা মত ছবি না হলেই শিল্পীকে অপটুত্ব বা অজ্ঞতার বদনাম কিনতে হত না। সুতরাং একই কম্পোজিশনে, একই ফিগর, বস্তু বা ঘরবাড়ীকে বারবার নানা কোণ থেকে দেখাতে তাঁদের বাধত না। আর তাই দেখাতে গিয়ে প্রতিবারই তাঁরা প্রতিটি ফিগর, বস্তু বা ঘরবাড়ীর সবচেয়ে বিশিষ্ট রূপটি দেখাতেন। ফলে তাঁরা একই কম্পোজিশনে একই ফিগরের সমুখ থেকে আঁকা ছবি, পাশ থেকে আঁকা প্রোফাইল, অথবা অর্ধেকের বেশী দেখা যায় এমন কোণ থেকে আঁকা ছবি, ইংরেজিতে যাকে বলে প্ল্যানে-ফেলা ছবি, পাশাপাশি এঁকে দেখাতে একটুও দ্বিধা করতেন না, সে ধরনের কাজের অসঙ্গতি নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভাবিত হতেন না। এবং হতেন না বলেই তাঁদের ছবি দেখে মনে হয় যেন দর্শকের দৃষ্টিকোণ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। ব্যাপারটির তাৎপর্য যে কত গভীর তা অজন্তা নিয়ে সামান্য আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

এত গেল ফিগরের কথা ; জড়বস্তুর চিত্রণেও অজন্তাশিল্পীরা অনবরত একই বস্তুর প্ল্যানে-দেখা আর প্রোফাইলে দেখা রূপ একসঙ্গে পাশাপাশি চিত্রিত করতেন, তাতে সমচতুর্ভুজ অথবা লম্বাটে অসমচতুর্ভুজ বা রেক্ট্যাঙ্গলকে একাধিকভাবে দেখানো সম্ভব হত। যেমন বসবার আসন বা সিংহাসনগুলিকে পায়ার থেকে উপরদিকে লম্বায় বাড়িয়ে দেওয়া হত, যাতে ভাল করে নজরে পড়ে ; তেমনি কোন দৃশ্যের পশ্চাদপট, মধ্যপট এবং সম্মুখপট একের পর এক আরোপ করে, গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের অনুমান না এনে, এক সারের তলায় আরেক সার, তার তলায় আরেক সার, এইভাবে থাক থাক করে আঁকা হত (ঈজিপশন রীতির সঙ্গে এ বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে)। যেগুলি লম্বালম্বি খাড়াই অর্থাৎ ভার্টিকাল, সেগুলি প্রোফাইলে আঁকা হত, যেগুলি আড়াআড়ি বা হরিজনটল সেগুলি খাড়াই বা ভার্টিকল করে প্ল্যানে-দেখা করে আঁকা হত ; গাছের মাথাগুলি চোখের সমান সমান করে,

অর্থাৎ ইংরেজিতে আই-লেভ্‌ল্‌-এ, আঁকা হত ; কিন্তু সরোবর, নদী এবং অন্যান্য নিসর্গচিহ্ন যা নাকি মাটির সঙ্গে সমান, তা এমনভাবে ছড়িয়ে আঁকা হত যেন সেগুলি আকাশ থেকে দেখে আঁকা হয়েছে।

প্রাচীন যুগে, যথা ভারুতে, আমরা যাকে প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভ বলি তাই প্রয়োগ করা হত। সকলেই জানেন প্রাচ্য পারস্পেকটিভের নিয়মকানুন পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের একেবারে বিপরীত এমন কি পরিপন্থী। ব্রানেলেস্‌কো এবং পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেসকার পর লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের আইনকানুন স্পষ্ট ও প্রায় চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ করেন। লেঅনার্দো-প্রণীত আইন মতে, দৃষ্টির কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি আমাদের চোখ থেকে বেরিয়ে এক কল্পিত রেখা, যাকে আমরা দিকরেখা বলি, তারই এক দূর বিন্দুতে মেশে ; তাকে বলে বিলীয়মান বিন্দু, ইংরেজিতে ভ্যানিশিং পয়েন্ট। পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ এই বিলীয়মান বিন্দুর যথাযথ নির্দ্ধারণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু প্রাচ্য পারস্পেকটিভে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আমাদের চোখে এসে মেশে ; অতএব কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলির কাজ এই দুই রীতিতে ঠিক উল্টো। যথা, প্রাচ্য পারস্পেকটিভ অনুযায়ী চৌকি বা পালঙ্কের যে ধারটি আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরে সেটিই ছবিতে সবচেয়ে চওড়া দেখানো হবে, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটি হবে সবচেয়ে সরু। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ অনুযায়ী যে ধারটি আমাদের সবচেয়ে কাছে সেটিই সবচেয়ে চওড়া দেখাবে, আর সব চেয়ে দূরেরটি সবচেয়ে সরু দেখাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে অজন্তায় এবং সমসাময়িক ভাস্কর্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পারস্পেকটিভ রীতিই পাশাপাশি প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিকে যেমন উপর থেকে নীচে, থাকে থাকে, পশ্চাদপট ও সম্মুখপট আঁকার রীতি আস্তে আস্তে চলে গিয়ে ছবিতে গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের আভাসের সূত্রপাত হল, অন্যদিকে তেমনি ঘরবাড়ী আঁকার ব্যাপারেও পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ প্রায় পুরোপুরিভাবে এল। অপরপক্ষে আবার চোখের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী যেমন কাছের ফিগর বড় দেখায়, দূরের ফিগর ছোট দেখায়, এবং সেই চাক্ষুষ অনুমানের উপর ভিত্তি করে, আকার ছোট বড় করে, শিল্পী সাধারণত যেমন দুই বা ততোধিক ফিগরের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দূরত্ব দেখান, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী কিন্তু অনুরূপ টেকনিকের সাহায্যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, দূরে-কাছে দেখাবার কোন চেষ্টাই করেননি। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী দূরের জিনিষ অস্পষ্ট দেখানো হয়, খুঁটিনাটি দেখা যায় না, রঙ আস্তে আস্তে ম্লান, অপরিস্ফুট করা হয়, যার ফলে দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় ; অজন্তায় কিন্তু এভাবে দূরত্ব দেখানর কোন প্রয়াস নেই। ঈজিপশন পদ্ধতির মত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেও যে ফিগর যত মুখ্য সে ফিগর স্বাধিকার বলে ছবিতেও তত বড় করে আঁকা, অর্থাৎ বড় বড় ঠাকুরের বড় বড় বপু। এবং ঠিক এই জন্যই মুখ্য চরিত্রগুলির দেহ অন্যান্য ফিগরের চেয়ে সর্বদাই বড় করে আঁকা বা খোদাই করা।

অজন্তাশিল্পী এইসব প্রচলিত প্রথার কোনটাই ত্যাগ করেন নি, বরং পূর্বগামীদের চেয়ে তাঁরা সেগুলি অনেক বেশী নিপুণভাবে ব্যবহার করেন, যার দরুণ প্রথম দৃষ্টিতে তাঁদের কাজে পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের মানদণ্ডের কোন ত্রুটি সহজে ধরা পড়ে না, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে তবে তাদের মধ্যে পারস্পেকটিভের গোলযোগ বা দৃষ্টিবিজ্ঞানবিরুদ্ধ কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে।

এক আধটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে। আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী আঁকা একটি স্তম্ভশোভিত ঢাকা বারান্দার মত প্যাভিলিয়ন নেওয়া থাক। এর যে সব রেখা দিক্-রেখার দিকে গেছে সেগুলি যদি পিছন দিকে আরও বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে দেখব ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের বিলীয়মান স্তরগুলি (ইংরেজিতে বলে ভ্যানিশিং ট্রেস) দিকচক্রবালের কয়েকস্থানে মিশেছে। এ দিকে অট্টালিকার সমুখের আড়াআড়ি (হরিজন্টাল) সমান্তরাল রেখাগুলি কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালে রূপান্তরিত হবে, দুপাশের তেরছা রেখাগুলি আরও সুস্পষ্ট হবে, বাড়িটী আরও গভীর, অর্থাৎ ভিতরদিকে অনেক বেশী বিস্তৃত দেখাবে। উপরন্তু পিছিয়ে যাওয়া রেখাগুলি যে সব বিন্দুতে মিশেছে সেগুলি ধরে দর্শক ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তা অনায়াসে বার করা সম্ভব হয়।
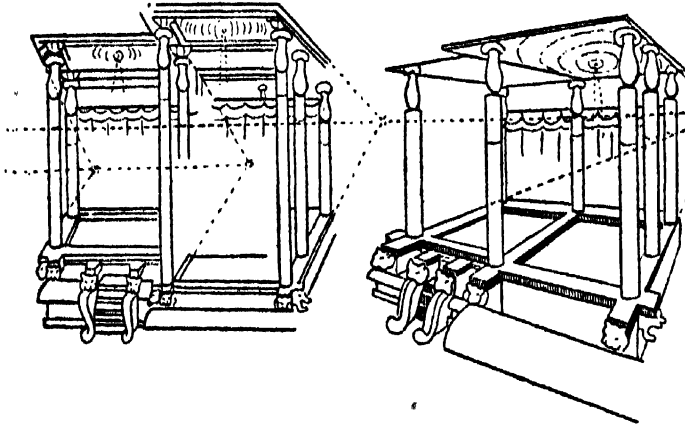
কিন্তু যে উদাহরণটি আমরা নিয়েছি সেখানে যদিও পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতের আইন মোটামুটি মানা হয়েছে, তবুও নানা রকম মজার কাণ্ড আছে। যেমন প্যাভিলিয়নের সম্মুখপট বা ফাসাডটি সমুখো-সমুখি দেখানো হয়েছে, যেন দর্শক সমুখের ঠিক মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছেন ; অথচ সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকার যে ধারটি পিছন দিকে চলে গেছে সেটি দেখে মনে হয় দর্শক যেন প্যাভিলিয়নের কোণা-কুণি দাঁড়িয়ে দেখছেন। এই বিভ্রমটি ঘটেছে তার কারণ শিল্পী সত্যকারের কোন বাড়ী দেখে আঁকেন নি বা নকল করেন নি ; বাড়ীর রূপটি মানস চক্ষে দেখে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

কিন্তু অজন্তা শিল্পীর রীতিকে শিশু বা আদিম শিল্পীর সরল, অশিক্ষিতপটু রীতির সামিল মনে করা খুবই ভুল হবে। শিশু বা আদিম শিল্পী আড়াআড়ি অর্থাৎ হরিজন্টলভাবে সমুখোসমুখি

দেখা ফাসাড এবং একপাশ থেকে দেখা প্রোফাইলের জগাখিচুড়ী করেই খুসী হয়। কিন্তু অজন্তা শিল্পীর সৃষ্টি হচ্ছে বস্তুকে নিজের মত করে দেখার অভিজ্ঞতার ফল, তার নিজস্ব প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত; চারু শাস্ত্রের বহুমুখী দৃষ্টি বা ইংরেজিতে যাকে বলে মাল্টিপ্‌ল্‌ ভিশনের টেকনিকের সঙ্গে অজন্তা শিল্পীর টেকনিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলায় খৃষ্টীয় চোদ্দশতকের পর বহুমুখী দৃষ্টি বা মাল্টিপল্‌ ভিশনের টেকনিকে কাজ আর হয় নি বলা যায়। এই টেকনিকের কল্যাণে দর্শক একই ছবি যেন একাধিক স্থান থেকে দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ পান, অর্থাৎ একই ছবির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিন্দু থেকে আঁকা, সুতরাং একই ছবিতে একাধিক পারস্পেকটিভ পয়েন্ট থাকায় ছবিতে অসম্ভব গতি আসে, স্থাণু বা অনড়ভাব কেটে যায়। অর্থাৎ দর্শক যেন ঘুরে ঘুরে দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পান। ভারতীয় শিল্পে এই টেকনিকটি প্রায় আবহমান কাল থেকে আছে। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল ঐতিহ্যে দর্শক সব সময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে ছবির দৃশ্যটি দেখবেন; সেই স্থান বা বিন্দুটি একেবারে মাপজোপ করে ঠিক করা, তার নড়চড় হবার নয়; সুতরাং দর্শক ও দৃশ্য উভয়েই যে যার স্থানে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে থাকবে, ঠিক যেন চলন্ত দৃশ্যের একটি খণ্ডমুহূর্তের ফোটোগ্রাফ, যেখানে দর্শক এবং দৃশ্য দুইই মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে, যে যেখানে আছে জমে যায়। কিন্তু অজন্তায় ঠিক বিপরীতটি ঘটে, সেখানে দর্শককে একেবারে ছবির মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, দর্শকের স্থান হয় ছবির মধ্যে : ছবিতে ঢুকে তিনি ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে বেড়ান, আস্তে আস্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য যখন উন্মোচিত হয় তখন তিনি নিজের মত করে ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্যে আমন্ত্রিত হন; ফলে দৃশ্যের যত কিছু জটিল ঘটনার মধ্যে তিনি মিশে যান, দৃশ্যের বাইরে দর্শক হিসেবে অস্তিত্ব তাঁর আর থাকে না।

ব্যাপারটি একবার তলিয়ে বুঝলে পাশ্চাত্যরীতির কথা মন থেকে বাদ দিয়ে ভারতীয় রীতিটি আমরা আরও খুঁটিয়ে দেখতে পারি। আরেকটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। এক নম্বর গুহার ভিতরদিকের দেয়ালে যেখানে দুটি প্যাভিলিয়ন পাশাপাশি চিত্রিত আছে সে দুটি ধরা যাক। দৃশ্যটির একটি অংশে
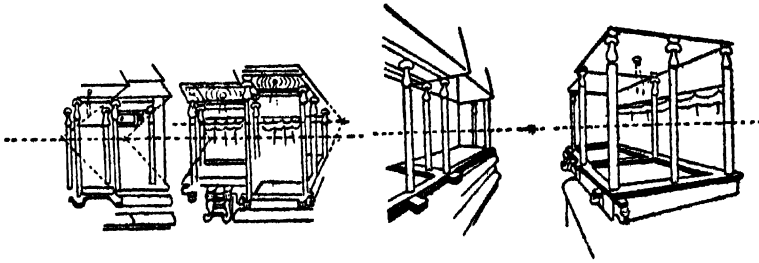
আছে রাজ অন্তঃপুরে রাজপুত্র মহাজনকের অভিষেক; দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধবিহারে তাঁর তপস্যা। প্যাভিলিয়ন দুটির যে-রেখাগুলি পিছনের দিকে গেছে সেগুলি যদি আরও পিছনের দিকে বাড়ানো

যায় তাহলে তার ফল এইরকম দাঁড়াবে; বাড়ী দুটির রেখাগুলি সমানভাবে দুই দিকে বেরিয়ে দুটি বিপরীত বিলীয়মান বিন্দুর দিকে ধাবিত হয়েছে। তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে দর্শকের স্থান প্যাভিলিয়ন দুটির ফাঁকে গলির মত জায়গার মুখে ঠিক নয়, বরং যেন তিনি দুটি বাড়ীর মাঝবরাবর ভিতর দিকে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছেন, যার জন্য বাড়ী দুটি ভাল করে দেখতে গিয়ে তাঁকে একবার বাঁ দিকে ঘুরে দেখতে হচ্ছে, সেটি দেখা হয়ে গেলে আবার ডানদিকে ঘুরে দ্বিতীয়টিকে দেখতে হচ্ছে। এই পারস্পেকটিভ পদ্ধতিটি খুবই প্রাচীন, একে বলে প্রদক্ষিণ পরিপ্রেক্ষিত বা ইংরেজিতে রোটেশন পারস্পেকটিভ। অসিরিয়ান এবং ব্যাবিলোনিয়ান চিত্রে এবং ভাস্কর্যে এর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এক নম্বর গুহার চিত্রটি থেকে বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পী এই টেকনিকটিকে কত সূক্ষ্ম ও অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন; আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে অজন্তাশিল্পী যদি এই টেকনিকে আরও অগ্রসর হতেন তাহলে আধুনিক যুগে মাল্টিপল্ ভিশন টেকনিকে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার সঙ্গে অজন্তা চিত্রের খুব নিকট সম্বন্ধ দেখা যেত।

এইভাবে বিচার করলে গুপ্তযুগে অজন্তাশিল্পী কয়েকটি বিষয়ে যে চরম কাজ করে গেছেন তা স্বীকার করতেই হয়। অতীতের উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে ঐতিহ্য ও প্রথাসিদ্ধরীতির যথাযোগ্য সংশ্লেষণ করে অজন্তা শিল্পী অতি অদ্ভুত নৈপুণ্যে প্রাচীরচিত্রের কাজে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োগ করেন। অজন্তা শিল্পী একই সঙ্গে সমানতালে একদিকে মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডের দুপাশে প্রতিসাম্যমূলক সরল কম্পোজিশন, অন্যদিকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে যোগসূত্র রচনা বা কনেক্টিং লিঙ্ক-কম্পোজিশন প্রবর্তন করেন। দুই অংশের মাঝখানে যোগসূত্র হিসাবে কোন ফিগর এঁকে এক আখ্যান থেকে আরেক আখ্যানে অবলীলাক্রমে পাড়ি দেন: অন্যদিকে আবার স্থাপত্য নিদর্শনের যথাযোগ্য যোজনায় একই কম্পোজিশনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন স্পষ্ট ভাগ করে দেন যাতে চোখের বিশ্রাম হয়, ছবিতে যতিপাত হয়। শেষে আবার একই দৃশ্যে একাধিক পরিপ্রেক্ষিত বিন্দুর অবতারণার দ্বারা অজন্তাশিল্পী ছবিকে বেগমুখর করেন, উপরন্তু দর্শককে চিত্রের মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করেন ও চিত্রের ঘটনায় তাঁকে অংশগ্রহণ করান।

এই সব কথা একে একে আলোচনা করলে অজন্তাচিত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেও ক্রমান্বয়ে একের পর এক দৃশ্য আসে, দুই দৃশ্যের মধ্যে কোন ফাঁক বা যতি পড়ে না, সেখানেও নটনটীর ছন্দ হয় মৃদুমন্দ; অথচ মুখের সাবলীল হাব-ভাবের চেয়ে মাথা হাতের সঞ্চালনেই ভঙ্গী প্রকাশ হয় বেশী। তাই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের রীতির সঙ্গে অজন্তাচিত্রের যোগসূত্র কম্পোজিশনের টেকনিকের এত মিল।

ভেবে দেখলে এই মিলে কিছু আশ্চর্য হবার নেই, কারণ ভারতের যাবতীয় রসশাস্ত্রেরই মূলসূত্র হচ্ছে এক; ইওরোপের মত এখানে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন জগতের মধ্যে

আবদ্ধ নয়। ভারতীয় রসশাস্ত্রের মূল উৎস হচ্ছে ম্যাজিকে অর্থাৎ যা নয় তাই মনে করা এবং সেইমত মূল্য আরোপ করার মধ্যে। মনের গভীরে থাকলেও ভারতীয় শিল্পী একথাটি কখনও ভোলেন না। শব্দশাস্ত্র ও মুদ্রাশাস্ত্রের মত, চারুকলাতেও শিল্পী সর্বদা দেবাসুরসুলভ গুণাগুণ ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যস্ত ; চারুশিল্প হচ্ছে তাঁর সাধনার আধার। ঠিক এই কারণে তিনি খণ্ডিতচিত্রে কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, এবং তার জন্যই তিনি বহুমুখী দৃষ্টি বা মাল্টিপল্ ভিশনের আশ্রয় নেন। চারুশিল্পের সূত্রানুযায়ী শিল্পী ঐশীশক্তির বাহনমাত্র, তাঁর মধ্যে দিয়েই দেবলোকের গুণাগুণ মর্ত্তে প্রতিভাত হয়, তাঁর মধ্যে দিয়েই অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই ঈশ্বরের বৈভব দর্শককে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং শিল্পী এবং নট উভয়ে সমতুল্য। নটের মতই শিল্পী জ্ঞাত বস্তুর উপর ভিত্তি করে কাজ আরম্ভ করেন, 'দৃষ্ট' বস্তুর উপর নয় ; অর্থাৎ তাঁর হাতিয়ার দর্শন নয়, জ্ঞান। তাই তিনি চোখের-চেনা-জানাটুকু প্রতিফলিত করার জন্য মোটেই ব্যস্ত হন না, তিনি ছোটেন বাস্তবের সত্যরূপটুকু ফুটিয়ে তুলতে। সে উদ্দেশ্যে উপায় উপকরণ, ভাষার ঝুলি তিনি ইচ্ছা করেই সংক্ষিপ্ত করে নেন, যা নাকি সকলেই সহজে বুঝবে, এমন কতগুলি ভঙ্গী ও রূপ বেছে নেন যা চিরপ্রচলিত, সকলের জ্ঞাত, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি ইচ্ছামত কমান, বাড়ান। নটের মত চিত্রশিল্পীরও উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে এমন এক ভাব বা স্বাদের সঞ্চার করা যাকে শিল্পশাস্ত্রে বলে রস। এর মূলে কিন্তু আছে বাহ্য জগতের অন্তঃস্থিত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস, দর্শকের স্নায়ুতে এমন এক ঐতিহ্যসিদ্ধ মানসপ্রতিমার সঞ্চার যার কৃপায় দর্শকের মনে একান্ত ব্যক্তিগত ভাব বা রসের উদ্রেক হয়। নটের মত শিল্পীরও উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে এমন কতকগুলি ভাবের সঞ্চার করা যা শুধু মনেরই ব্যাপার, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই, অথচ মনে সঞ্চারিত হয়ে যা চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে। অতএব রঙ্গমঞ্চের মত চিত্রেও যাবতীয় উপাদান এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রকৃত অকৃত্রিম রসটির সঞ্চার হয়। সম্ভবত এই ধরনের নিতান্ত আবশ্যিক কারণেই অজন্তাশিল্পী বৃত্তাকার রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। নৃত্য শাস্ত্রের মত চারুকলাতেও বৃত্ত বা মণ্ডলের আছে মরমী আবেগ এবং ব্যঞ্জনা, নৃত্যের ছন্দে যেমন বিশ্বসৃষ্টি হয়, তেমনি মণ্ডলের ছন্দেই হয় শিল্পীর সৃষ্টি। সুতরাং অজন্তাচিত্রে যে ধরনের কম্পোজিশন ও পারস্পেক্‌টিভ প্রয়োগ হয়েছে তা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের নিতান্ত গোড়ার কথা, যার মূল সমস্যা হচ্ছে কি করে ভাবজগৎকে স্থূল প্রতিভাসে রূপান্তরিত করা যায় এবং সেই প্রয়াসই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
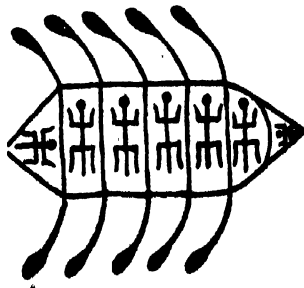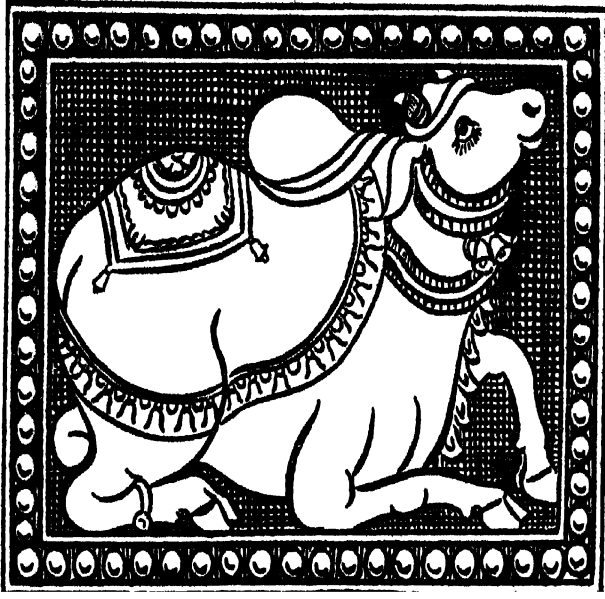
তৃতীয় অধ্যায়

মধ্য যুগ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সন তারিখ যখন থেকে ঠিক মত স্থির হয়েছে তখন থেকে এদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারাবাহিক নজির প্রমাণ খৃষ্টীয় ৭০০ সাল অবধি পাওয়া গেছে। কেন যে নজির প্রমাণ ভারতবর্ষের নানান গুহাতেই কেবলমাত্র পাওয়া গেছে, তাও বলেছি। তার সঙ্গে আরও দেখেছি যে প্রাচীন সাহিত্যের নানা জায়গায় ছবি সম্বন্ধে যে উল্লেখ আমরা পাই তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ছবি ছিল এখনকার মতই তখনও মানুষের জীবনের নিত্য উপকরণ। প্রাসাদে, রাজদরবারে বড় বড় চিত্রশালা ত ছিলই, উপরন্তু ছিল সাধারণ বাড়ীতে, নিত্যব্যবহার্য জিনিষে, যেমন হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, সরা, মালসায়। এটাও আমরা জেনেছি যে সাত শতক পর্যন্ত চিত্র কাজের যে নমুনা এখনও আমরা পাই, তাতে তারানাথের কথা মানতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। রঙ, রেখা, নক্সা, প্রতিকৃতি, আল্পনায় ষড়ঙ্গের সব রীতি নীতিরই যে বেশ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল তাও বোঝা যায়।

পূর্ব্বভারতে নালন্দার পুঁথিচিত্র ছাড়া মধ্যযুগের চিত্রকলার যা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তা প্রায় সবই দাক্ষিণাত্যে। খুব সংক্ষেপে সে সব সম্বন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন।

তাঞ্জোরের মন্দির খৃষ্টীয় দশ শতকে তৈরি হয়। ১০১১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঞ্জোরের মন্দিরের ভিতরের পাঁচিলে কিছু ফ্রেস্কো আঁকা হয় যা স্পষ্টত অজন্তা বা বাঘ রীতির সামিল। এর পরে তেরো শতকে নায়ক রাজাদের সময়ে তাঞ্জোর মন্দিরে আবার কিছু ফ্রেস্কো আঁকা হয়। কিন্তু ইলোরার পর

বিজয়নগর রাজ্য ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরই ফ্রেস্কো রীতির ঐতিহ্য রক্ষা করে। ১৩৮৭-৮৮ সালে বিজয়-নগরের রাজা দ্বিতীয় বুক্কী রায়ার মন্ত্রী ও সেনাপতি ইরুগাপ্পার আদেশে তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরম মন্দির তৈরি হয়। এই মন্দিরের সঙ্গীত মণ্ডপের ছাতে ও দেয়ালে যে সব ফ্রেস্কো আছে তাতে অজন্তার প্রভাব যদিও গভীর তবুও কেরলদেশের প্রভাবও বেশ দেখা যায়। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে ছিল বিজয়নগর শহর; উত্তর তীরে ছিল পুরনো রাজধানী আনেগুণ্ডি। এই আনেগুণ্ডির উচয়াপ্পা মঠের দেয়ালে এবং ছাতে এখনও কিছু চিত্র অবশিষ্ট আছে। এই সঙ্গে বিজয়নগরের লেপাক্ষী মন্দিরের প্রাচীর চিত্রেরও উল্লেখ করতে হয়।

তিরুপতি কুন্দরমের ছবিতে ইলোরার প্রভাব যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণের পহ্লব প্রভাবও বেশ পাওয়া যায়। পহ্লব ভাস্কর্য থেকে এসেছে তন্বী ফিগর, তীর্যক গতিভঙ্গীর তীব্র বেগ, শরীরের বাঁকা রেখার ছন্দ। মুকুট এবং অন্যান্য অলঙ্কারও সরাসরি পহ্লব ভাস্কর্য থেকে নেওয়া। উচয়াপ্পা মঠের চিত্রে কালো সাদা বর্ণের প্রাতুর্ভাব দেখা যায়, তার মধ্যে প্রথম-নক্সার লাল সীমারেখার প্রমাণও আছে। উচয়াপ্পার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র একটি দেয়ালের কুলুঙ্গির নীল জমির উপর আট পাপড়ির একটি পদ্মফুল, তার হৃদয়টি হলদে, চারদিকে লাল। ছাতে স্ত্রীপুরুষের প্যানেলও আছে, তার কম্পোজিশন খানিকটা বাঘ গুহার মত, যদিও মেয়েদের শরীরের উপরভাগ নগ্ন নয়, জামা পরা, শাড়ী কাঁধের উপর তেরছা ভাবে ফেলে ঘুরিয়ে পরা; শরীরের ছন্দে যথেষ্ট তনু, সুকুমার, ভাব বর্তমান। হঠাৎ দেখলে মনে হয় এখনও ঐ অঞ্চলে যে সব গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়, তাদেরই মডল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বুঝতে একটুও বিলম্ব হয় না যে পোশাক, বসনভূষণ, সজ্জার পারিপাট্য, চোখের চাউনি, দাঁড়াবার ভঙ্গী, সাতশ বছরেও বিন্দুমাত্র বদলায়নি। উচয়াপ্পার ছাতের দুটি প্যানেলের সামান্য বর্ণনা পড়লে হয়ত ভাল লাগবে। একটিতে আছে একটি ফুলফোটা ঝোপ, একটি কাঠবিড়ালী, দুজন নারী, তাদের পায়ের কাছে দুটি ছোট অস্পষ্ট ফিগর (বোধ হয় শিশু), সঙ্গে দুটি পুরুষ। উপরের কোণে বড় বড় পদ্মফুল। বোধ হয় রাস্তা দিয়ে দুটি কৃষক পরিবার হেঁটে চলেছে। দ্বিতীয় প্যানেলে আছে একটি পালকি; দুটি মেয়ে-বেহারা বইছে, সমুখের মেয়ে বেহারাটি পিছন ফিরে পিছনের মেয়ে বেহারাটির দিকে তাকাচ্ছে। তার পিছনে একটি ছোট ফিগর, তার হাতে একটি পদ্মকুঁড়ি। উপর থেকে পদ্মমালা ঝোলানো। এই দুটি প্যানেলের পাড় হিসাবে যে সব প্যানেল আছে তাতে আছে পদ্মলতার আল্পনা। এই ঘরেরই দেয়ালে আবার মাথায় মুকুটপরা দাড়িওলা একটি পুরুষের ছবি আছে; উটের পিঠে সওয়ার অবস্থা, সমুখে হাতী দৌড়োচ্ছে। ছাতেরই আরেকভাগে আরও দুটি প্যানেল আছে। একটিতে কিছু লিপি আছে; ছবির মধ্যে আছে হাতীর পিঠেচড়া দাড়িওলা একটি পুরুষ। হাতীটি বড় মজার; পাঁচটি নারীর দেহ দিয়ে হাতীটি আঁকা; ঠিক যেমন কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত অনেক বাড়ীতে মানুষের ছবি দিয়ে গৃহকর্তার নাম কাঁচের ফ্রেমে

বাঁধানো থাকত। এই হাতীর আগে হাতে একটি কাপড় নাড়তে নাড়তে চলেছে আরেকটি নারী। উপর থেকে সারি সারি পদ্মমালা ঝোলানো। দ্বিতীয় প্যানেলে আছে ঐ ধরনেরই ছবি, একই ধরনের দাড়িওলা একটি পুরুষ, পাঁচটি নারীর শরীর দিয়ে আঁকা একটি ঘোড়ার পিঠে চলেছেন। উপর থেকে পদ্ম ঝোলানো, চারপাশে পদ্ম ছড়ানো, ঘোড়ার সমুখে হাতে ছাতি ধরে একটি মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, আরেকজন মেয়ে পাখা হাতে আসছে ঘোড়ার পিছনে।

ত্রিবাঙ্কুরের চিত্রকলার যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা আরও পুরনো। সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়ের গা কেটে তৈরি তিরুনান্দিক্কর গুহামন্দিরে। গুহাটির তারিখ খৃষ্টীয় নয় শতক। ভিতরের গা এককালে নিশ্চয় ফ্রেস্কোয় মোড়া ছিল। অবশ্য অধিকাংশই এখন লুপ্ত হয়েছে। সাতটি প্যানেলের কিছু কিছু এখনও আছে। তাদের নকল ত্রিবান্দ্রমের সরকারী চিত্রশালা শ্রীচিত্রালয়মে রক্ষিত আছে।

সন তারিখ হিসাবে তার পরের নিদর্শন আমরা পাই ত্রিবান্দ্রমের শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরের তিরুভম্পাতি বলে উপমন্দিরের দেয়ালে। মন্দিরগুলির কিছুটা ১৩৭৫ সালে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা আদিত্য-বর্মা সর্বাঙ্গনাথের রাজত্বকালে নির্মিত। ছবিতে ফিগর অধিকাংশই মেয়েদের, তাদের পরণে বিচিত্র বসন, অঙ্গে নানারকম অলঙ্কার। একটি প্যানেলে কয়েকটি মহিলা নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে জলসা করছেন ; বাঘের হল্লীসকের কথা মনে পড়ে যায়।

উত্তর ত্রিবাঙ্কুরে এট্টুমানুর বলে একটি শৈব মন্দির আছে। এটির সিংহদ্বার বা গোপুরমে একটি চিত্র আছে। চিত্রটি ষোল শতকের পরের নয়। ডাঃ কুমারস্বামী একবার ছবিটিকে 'প্রাচীন দ্রাবিড় চিত্রকলার একমাত্র নিদর্শন' বলেন। ফ্রেস্কোটি ১২ ফিট লম্বা, ৮ ফিট চওড়া। মন্দিরের বয়স ষোল শতক, সুতরাং ছবিটিও বোধ হয় সমসাময়িক। নটরাজের চিত্র।

ভাইকোমের শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে এই যুগের কিছু ফ্রেস্কোর অবশিষ্ট এখনও আছে। প্রায় কুড়িটি প্যানেল আছে, তাতে সবশুদ্ধ প্রায় চল্লিশটি দেবদেবীর ফিগর আছে।

ত্রিবাঙ্কুরে ফ্রেস্কো চিত্রকলার স্বর্ণযুগ আসে সতেরো আর আঠারো শতকে। এই সময়ে পদ্মনাভপুরম বলে ত্রিবাঙ্কুরের একটি রাজধানী স্থাপিত হয়। পদ্মনাভপুরমের চারতলা প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় একটি ঘরের চারদেয়ালে পঞ্চাশটি পৌরাণিক চিত্র আঁকা হয়, সেগুলি এখনও আছে। এরকম সম্পূর্ণ ফ্রেস্কো ভারতবর্ষের খুব কম স্থানে আছে। প্রাসাদ চিত্রিত হবার কিছু পরে তিরুভত্তরের আদি কেশব মন্দিরের দেয়ালেও কিছু ছবি আঁকা হয়। এগুলির তারিখ সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। অনেকগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও বেশ কিছু আছে। আঠারো শতকে দ্রাবিড় ফ্রেস্কোর পরিপূর্ণতা আসে ত্রিবান্দ্রমের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে। এগুলি আঠারো শতকের প্রথম ভাগে আঁকা। এদের রীতি একেবারে দেশজ। ছবি দেখলেই বোঝা যায় ভারতের অন্যত্র কোথাও এ রকম ছবি

হয়নি। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ফ্রেস্কো আছে ভাইকোম আর এট্টুমানুরের কাছে মুলাকুলমের তিরুমুখিকুলমে, অরুণমালার বিষ্ণুমন্দিরে, ত্রিবান্দ্রমের দুর্গের প্রাসাদে, কৃষ্ণপুরম প্রাসাদে, মালাবারের পনয়ন্নরকত্তু মন্দিরে।

তবুও বলতে হয় সাত শতকের পর ভারতের চিত্রধারা হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে যেন হয় থেমে গেল, না হয় হারিয়ে গেল। সাত শতকের পর ভারতবর্ষে যেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে আরম্ভ করল, ছবিও গেল কমে। এমন কি এও বলা যায় সাত শতক থেকে চোদ্দ শতকের মধ্যে আঁকা খুব বেশী ছবির হদিশ আমরা পাই না। যা কিছু আছে সে অবশ্য কিছুটা মন্দিরের দেয়ালের গায়ে ও পুঁথির চিত্রে; সেগুলিও খৃষ্টীয় চোদ্দ শতকের খুব আগেকার নয়। কিন্তু এও বিশ্বাস করা অসম্ভব যে চিত্রকলা বৌদ্ধধর্মেরই একচেটিয়া ছিল, এবং বৌদ্ধধর্মের পরাজয়ের পর চিত্ররীতিও লুপ্তপ্রায় হল। কারণ ঠিক এই মধ্যযুগেই (খৃষ্টীয় সাত থেকে পনেরো শতক) এল ভারতীয় স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের স্বর্ণযুগ; ভারতের যত বিখ্যাত বিখ্যাত মন্দির, যত বিখ্যাত বিখ্যাত ভাস্কর্য তার অধিকাংশ এই যুগেই হয়েছে, এবং যেহেতু ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ছবির আশ্চর্য মিল, সেহেতু এটা মানতে বাধে না যে ছবিও নিশ্চয় ছিল। হয়ত এ যুগে ছবি বেশী আঁকা হত বাড়ীর দেয়ালে, অথবা তালপাতায়, অথবা কাগজে, যা অযত্নে, জলহাওয়ার দোষে নষ্ট হয়ে গেছে। এও ঠিক যে এযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য চরমে উঠেছিল বলে ছবিকেও যে সেই সঙ্গে উঠতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং এও সম্ভব যে চার পাঁচ শ বছর ধরে ভারতের সর্বত্র মন্দির আর মূর্ত্তি গড়ার এমন ঢেউ এল যে শিল্পীরা শাশ্বত আকারে, অর্থাৎ পাথরে বা পোড়া মাটির ইটে বা টালিতে নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ রেখে যেতে ব্যস্ত হলেন বেশী; যে জিনিষ লোকের ব্যবহারে, অল্প অযত্নে, হাত, ধুলোবালি, জলহাওয়ায় সহজে নষ্ট হয়ে যায় সেদিকে নজর দিলেন কম। চিত্রিত বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুগুহার একটি চলনসই তালিকা আগেই দিয়েছি, সবেতেই ভাস্কর্যের সম্ভার ছবির সম্ভারের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু মধ্যযুগে যত মন্দির তৈরি হয়েছিল তার যদি বর্ণনা না দিয়ে শুধু তালিকাই দিই, শুধু জায়গাগুলির নাম করে যাই তাহলেও বহু পৃষ্ঠা হয়ে যাবে, তবুও শেষ হবে না। ভারতীয় মন্দিরের গায়ে যে সব ভাস্কর্য পাওয়া যায় তার মধ্যে অধিকাংশই বেস রিলিফে খোদাই সে কথা আগেই বলেছি। বেস-রিলিফ বা নতোন্নত ভাস্কর্য হচ্ছে সেই ধরনের খোদাই যা মানুষের শরীর যতখানি পুরু তার অর্ধেকেরও কম গভীর করে খুদে পাথরের গা থেকে বার করা। অর্থাৎ যদি ধরা যায় মানুষের বুকের খাঁচা সাধারণত আট ইঞ্চি পুরু, বেস-রিলিফের রীতিতে পাথরে মানুষের মূর্তি খোদাই করার সময়ে মূর্তিটি চেঁচে ফেলা জমি থেকে চার ইঞ্চি বা তারও কম জাগিয়ে রাখলেই হবে। বেস-রিলিফের নীতিতে মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই মাপের

সঙ্গে মিলিয়ে আনুষঙ্গিক অন্যান্য মূর্তিও খোদাই করতে হবে। ভারতীয় ভাস্কর্যে এই বেস-রিলিফের প্রাধান্য খুব বেশী। যাকে বলে পুরোটি খোদাই করা, অর্থাৎ ইংরেজিতে 'স্কাল্পচার ইন দা রাউণ্ড', বা সমস্ত শরীরটি পুরোপুরি, সবটুকু গভীরত্ব রেখে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতায় সমস্তটা খুদে মূর্তি করা, ভারতীয় মন্দির শিল্পে তারও প্রমাণের অভাব যেমন একদিকে নেই, তবু একথা স্বীকার করতে হয় যে এ দেশের ভাস্কর্যে বেস-রিলিফের কাজই প্রায় শতকরা আশিটা। সমান জমির উপর রঙ রেখায় আঁকা ছবির গুণ বেস-রিলিফে আনা খুব সহজ। প্রথমত বেস-রিলিফ হলেই পাথরের গা খোদাই করে গর্ত করে জমি তৈরি করে নিতে হবে, যার উপরে ভাস্কর্যটি উঁচু হয়ে জেগে থাকবে। সুতরাং জমি এইভাবে তৈরি করতে গেলেই ছবির মত একটি চৌহদ্দি বা ফ্রেম আপনা আপনিই খোদাই হয়ে সর্বপ্রথম পাথরের গা থেকে তফাৎ হয়ে যাবে, যার মধ্যে খোদাই করা মূর্তি আটকা পড়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত ছবিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব আনার জন্যে, যাতে ছবির প্রাণীটি তার সমস্ত অস্থি মজ্জা কঙ্কাল, সমস্ত ওজন সমস্ত গভীরত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্যে, চিত্রশিল্পীকে শিখতে হয় ছবির মড্‌লিং, ফোরশর্টনিং, পরিপ্রেক্ষিত, যে দেহ নড়ে চড়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তার বিশেষ একভঙ্গীতে দেখা রূপ, যা দেখেই মনে হবে যে সে দেহের রূপ পর মুহূর্তে একটু নড়লেই বদলাবে। এইসব গুণ ছবির মধ্যে এনে ধরে রাখতে হলে দরকার হয় রেখা, রঙ, রঙের গাঢ়ফিকে করা অথবা বিরোধ ঘটান, রেখার বৈচিত্র্য, যার মধ্যে দিয়ে সমান কাগজের জমির উপর পারস্পেক্‌টিভ, গভীরত্ব, আকার, গড়ন, রূপ ফুটে ওঠে। চিত্রকারের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বস্তুর উপরে আলো পড়লে বস্তুটির অনুমান চোখে কি রকম লাগবে তা সম্যকভাবে জানা এবং ছবি এঁকে তা দেখান। এই সমস্যা বহুগুণ কঠিন হয় যদি বস্তুটি সজীব হয় এবং প্রতি মুহূর্তে নড়াচড়ার ফলে তার গায়ের অসংখ্য সমতলে বা স্তরে আলোছায়া নড়ে চড়ে খেলে বেড়ায়। তখন সমস্যা হয় ঠিক কোন অবস্থায় শিল্পী বস্তুটিকে তুলিতে ধরে নিয়ে ছবির জমিতে বেঁধে দেবেন। আবার, বলা বাহুল্য আলো-ছায়ার হের ফেরে রঙও বদলায়, টকটকে লালে একদিক থেকে আলো পড়লে দেখায় টকটকে লাল, আরেকদিক থেকে পড়লে দেখায় গাঢ় বা বেগ্‌নে লাল, তৃতীয় কোন দিক থেকে আলো পড়লে হয়ত দেখায় কাল বা কালচে ব্রাউন। সেসবও আরেক সমস্যা। চিত্রে রঙ আর রেখার মধ্যে দিয়ে

আলোছায়ার যে সমস্তার সমাধান করতে হয়, অর্ধখোদিত ভাস্কর্য বা বেস-রিলিফে অথবা পুরোপুরি চার-তরফ খোদাই করা ভাস্কর্যেও সে সমস্যার সমাধান করতে হয়, কিন্তু অন্যপ্রকারে। তখন ভাস্করের সমস্যা হয় কোন জায়গার কতখানি খোদাই করে কি ধরনের সমতল বা স্তর বার করা হবে, যার উপর এই এইভাবে আলো পড়লে কি ধরনের দেখাবে, তার উপরে আলোছায়ার খেলা কত রকম হতে পারে। বেস-রিলিফে খোদাই আর সমান জমিতে ছবি তৈরির সমস্যা কতকটা এক, অন্তত আলো-ছায়া কায়দা করার ব্যাপারে। কারণ ছবিতে যত ভাল মড্‌লিংই হোক, কখনও তা দেখে মনে হবে না যে সেটি পুরোপুরি ছবির সমান জমি থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি সশরীরে আমাদের চারিদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। খুব জোর যদি হয় তবে মনে হবে সৃষ্টির খানিকটা এক জায়গায় কিছুটা গেঁথে আটকে রেখেছে। যত ভাল পারস্পেক্‌টিভই হোক তবুও মনে হবে চোখই একের পিছনে আরেক জিনিষ করে করে সবটুকু অনুমান করে নিচ্ছে, সত্যই জিনিষগুলি ওখানে একের পিছনে অন্যটি নেই, অর্থাৎ একটির পিছনে আরেকটিকে ঘুরে ফিরে দেখা যাবে না। বেস-রিলিফেও তাই বস্তুগুলি আলাদা আলাদা ভাবে ঘুরে ফিরে চারদিক থেকে দেখা যাবে না, সেগুলি একত্র করে যেন একজায়গায় একটি চৌহদ্দির মধ্যে গাঁথা, খানিকটা জেগে বেরিয়ে আছে, বাকিটা ঢুকে গেছে, যার উপরে আলোছায়া পড়ে প্রতি মুহূর্তে নানা রকম অনুমানের সৃষ্টি করছে। ভারতে বেস-রিলিফের প্রাচুর্যের দরুণ বলা শক্ত ভাস্কর্য থেকে ছবি এসেছে, না ছবি থেকে ভাস্কর্য এসেছে, দুটি এতই একান্তভাবে অন্যোন্যনির্ভর, আর দুটি শিল্পেরই নিজ নিজ সমস্যার মধ্যে এত রকম মিল। এজন্য অধিকাংশ বেস-রিলিফে ছবিত্ব গুণ খুব সুস্পষ্ট। ভাল ভাল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ঘরে টেবিলের উপর একরকম আলো ঝোলান থাকে, তাকে বলে ছায়াহরণ আলো (ইংরেজিতে শ্যাডোলেস ল্যাম্প), যার তলায় কাটাকুটি করার সময়ে কোন জায়গায়ই কোন গভীর ছায়া পড়ে না। স্বাভাবিক আলোয় তোলা ছাপা ফোটোতে ভারতীয় বেস-রিলিফের ছবিসুলভ গুণ খুব স্পষ্ট নজরে পড়ে। তার উপরে যদি এই ধরনের ছায়াহরণ আলো দিয়ে ছবি তোলা যেতে পারত তাহলে বোধহয় ভারতীয় ছবির সীমারেখা শেডিং-এর রীতির সঙ্গে বেস-রিলিফের আরও বেশী মিল ধরা পড়ত। আবার

যেসব খোদাই বেস-রিলিফের চেয়েও কম গভীর, যেমন পূর্বভারতের মন্দিরের টালি বা পাটা, যথা বাংলার মন্দিরের টালি, সে পাহাড়পুরেরই হোক বা বিষ্ণুপুরেরই হোক—সে সবে ছবিত্বগুণ ভাস্কর্যগুণকে ছাপিয়ে গেছে। সুতরাং একথা অনায়াসে বলা যায় যে মধ্যযুগের চিত্রের নমুনা এখন খুব কম থাকলেও, তার চরিত্র এবং গুণাগুণ কি রকম ছিল তার আন্দাজ আমরা ভারতীয় মন্দিরের বেস-রিলিফে বিলক্ষণ পাই। তাছাড়া পাই ইটের মন্দিরের টালিতে, এনামেলের উপর চিত্রকরা রঙীন টালিতে, পুঁথিতে, আর কিছু কিছু জায়গায় মন্দিরের দেয়াল চিত্রে। তবুও একথা থেকেই যায় যে মধ্যযুগের ছবির নিদর্শন এখন ভারতবর্ষে খুব বেশী নেই। ভারতে না থাকলেও আশে পাশের দেশের ছবিতে ভারতীয় মেজাজের ছবি বেশ দেখা যায়। দুটি দেশে ভারতীয় চিত্রের সঙ্গে মিল খুব সুস্পষ্ট, একটি পূর্ব তুর্কীস্থান বা খোটান, অন্যটি তিব্বত। খোটান একসময়ে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল, এবং অরেল স্টাইন আর ল কক বহু পরিশ্রমে যে সব নজির প্রমাণ বার করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকে খোটানে, গ্রীক, ভারতীয়, পারসীক আর চীনে সভ্যতার খুব আদান প্রদান ঘটে। খোটান এবং মধ্য এশিয়া থেকে দুজন পণ্ডিত যে সমস্ত চিত্রের নমুনা উদ্ধার করেছেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। খোটানের গুহাচিত্রের অধিকাংশই টুন-হুয়াঙ ও অজন্তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়, এবং এটা মনে রাখা দরকার যে খোটানের গুহাচিত্র অজন্তার পরে (খৃষ্টীয় আট শতকে) আঁকা। খোটানের ছবি বৌদ্ধ, তার রেখার দার্ঢ্য আর দক্ষতা স্পষ্টই চীন থেকে পাওয়া এবং অজন্তার সঙ্গেও তার বেশ মিল। সেই হিসাবে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যে যুগের নমুনা আমাদের হাতে বিশেষ নেই, ঠিক সেই যুগে খোটানে ছবিতে কি ঘটছিল তা দেখে আমরা ভারতের অবস্থার খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। স্টাইন আর ল কক দেখিয়েছেন কি ভাবে মধ্যযুগে খোটান ছিল অনেকগুলি সভ্যতার মিলনস্থল। অর্থাৎ খোটানের চারপাশের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চিত্ররীতির আলাদা আলাদা নমুনা খোটানে খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দণ্ডন-উলিখ বলে একটি জায়গায় ও তার আশে পাশে যে সব ফ্রেস্কো বা প্রাচীর চিত্র আবিষ্কার হয়েছে, তাদের তারিখ খৃষ্টীয় আট শতকের পর থেকে।

সেগুলি দেখে একদিকে টুন-হুয়াঙের শিল্পী অন্য দিকে অজন্তার শিল্পীর আঁকা বলে ভুল হলে কিছু দোষ হয় না, কিছু কিছু জায়গায় তুলির কাজ এতই এক ধরনের। খোটানেরই চিউ-জি বলে একটি জায়গায় ল কক কতকগুলি চিত্র করা ধ্বজা আবিষ্কার করেন, যা তিব্বতী ধ্বজার (টাংকা) সামিল। টাংকার ইতিহাস নিশ্চয় খুব প্রাচীন, কিন্তু এ পর্যন্ত তিব্বত থেকে খুব কম টাংকাই পাওয়া গেছে যা নাকি খৃষ্টীয় সতেরো শতকেরও আগে তৈরি। সম্প্রতি ইতালিয়ান পণ্ডিত জুসেপ্পে তুচ্চি একাধিক খণ্ডে 'টিবেটান স্ক্রোল পেন্টিং' বলে একটি বহুমূল্য বই প্রকাশ করেছেন, তাতে টাংকা বা অন্যান্য তিব্বতী চিত্রের কয়েকটি প্রাচীন নমুনার ছবি ছাপিয়েছেন। কিন্তু তিব্বতে যা পাওয়া গেছে

তার কোনটাই চিউ-জির ধ্বজার চেয়ে প্রাচীন বলা যায় না, কারণ চিউ-জির ধ্বজাগুলি খৃষ্টীয় আট শতকের, তাতে টাংকা শিল্পের প্রাচীন রীতিনীতির হদিশ পাওয়া যায়। টাংকা যে সে সময়ে শুধু তিব্বতে বা খোটানেই হত তা নয়, ভারতবর্ষেও যে হত তার উল্লেখ পাই এগারো শতকের এক সমালোচকের লেখায়, তাঁর নাম টেং-চুন, তিনি সে সময়ে বাংলার অন্তর্গত নালন্দা বিহারে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে 'নালন্দার শ্রমণরা পশ্চিম দেশের কাপড়ের উপর বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বের ছবি আঁকেন।' খৃষ্টীয় দশ শতকেরও আগে থেকে তিব্বত আর বাংলার মধ্যে যে বেশ আদান প্রদান ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে।

তিব্বতের বিহার আর মন্দিরের দেয়ালে চীনে বা অজন্তা রীতিতে যে অনেক ফ্রেস্কো আঁকা হত, তার প্রমাণের অভাব নেই। সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে এখনও যে সব প্রাচীন তিব্বতী বিহার বা মন্দিরের দেয়ালে ফ্রেস্কো বর্তমান সেগুলিতে চীনে এবং অজন্তা রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। তিব্বতী টাংকার সঙ্গেও প্রাচীন অজন্তা চিত্ররীতির মিল আছে। কারণ এক হিসাবে টাংকাকেও ফ্রেস্কো বলা যায়, যেহেতু সেগুলি মোটা চট বা কানাতের উপর টেম্পেরায় আঁকা, প্রাচীর চিত্রে জমি যেভাবে তৈরি।

অজন্তার ছবির রঙের কথা সামান্য বলেছি। বৌদ্ধ শিল্পী সর্ব প্রথমে ছবির মডল করে নিতেন পরিষ্কার একরঙা শীতল ছাইরঙে, যার মধ্যে দিয়ে ছবির গভীরত্ব ফুটে ওঠে। এটি হল ছবির কোরা অবস্থা। তার উপরে দিতেন মাংসের রঙের গোলাপী টলটলে রঙ, তাতে ফল দাঁড়াত একধরণের উষ্ণ, স্বচ্ছপ্রায় ছাই রঙ। এই ধরনের অনুপান অবশ্য সব ক্ষেত্রে চলতনা, যেমন আদিবাসী বা হাবসীর গায়ের রঙ হত কাল, ব্যাধের রঙ হত গাঢ় লাল। রঙের বহু বৈচিত্র্য ছিল, যেমন ১৭নং গুহায় মহাহংস জাতক থেকে আঁকা ছবিটিতে হাল্কা রঙের শরীরগুলি গাঢ় সবুজ শূন্যের পটভূমিতে গ্রুপ করে আঁকা, যে গাঢ় সবুজ নীচের দিকে প্রায় কালো হয়ে গেছে। এর উপর নানা ছোটখাটো বস্তু নানা রঙে আঁকা যার ফলে সমস্তটা জোরালো দেখালেও, অতিরঞ্জিত মনে হয় না। ছবির নীচের দিকটা সবুজ রঙের নানা পর্দায় মিলিয়ে আঁকা, যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাঝে মাঝে সাদা আর নরম লাল রঙে আঁকা কিছু কিছু অংশ দিয়ে।

অজন্তার একটি ছবির রঙের সামান্য একটু অবতারণার মধ্যে দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অজন্তার ছবিতে এমন কোন হিসাবের সন্ধান মেলে না যাতে মনে হয় কোন বিশেষ জিনিষের কোন বিশেষ ধরনের ভাব কোটাতে গেলে, এক বিশেষ রঙ দিতেই হবে। অর্থাৎ বিষয় হিসাবে ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশে রঙের বাঁধা গৎ তখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু তার কিছু পরেই তিব্বতী ছবিতে কখন, কিসে, কোন বিষয়ে, কি ধরনের বস্তুতে বা ভাববিন্যাসে কি রঙ ব্যবহার করতে হবে তার প্রায় বাঁধাধরা ছক তৈরি হয়ে গেল। খৃষ্টীয় সাত শতকে তিব্বতের রাজা সংসান গাম্পোর আদেশে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধ

ধর্ম বিষয়ে একটি বই প্রণীত হয়, তার নাম মনিকাজুম। তাতে বিখ্যাত 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রটির বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে এই মন্ত্রটি বার বার উচ্চারণ করলে জীব ছয় অবস্থার যেটিতেই থাকুক তার প্রতিটি থেকেই পুনর্জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। ছয় অবস্থা হচ্ছে, দেব, অসুর, মানুষ, জন্তু, ভূত, আর নরকস্থ অধিবাসী। মন্ত্রটির প্রতিটি শব্দের আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক রঙ আছে, যেমন ওঁ অথবা স্বর্গীয় অবস্থার রং হচ্ছে সাদা (যার মধ্যে সব রঙই আছে), ম অর্থাৎ অসুর অবস্থার রঙ হচ্ছে নীল ; নি বা মানুষী অবস্থার রং হলদে : পদ্ বা জন্তুর অবস্থার রঙ সবুজ ; মে, বা আশাহীন ভূতের অবস্থার রঙ হচ্ছে লাল ; হুঁ অথবা নরকস্থ অধিবাসীর রঙ কালো। বৌদ্ধদের কাছ থেকে হিন্দু শিল্পীদের মধ্যেও ক্রমশ বিভিন্ন রঙের আলাদা আলাদা ছক কাটা মানে স্থির হয়ে যায়। যেমন বৌদ্ধ আর হিন্দু দুই রীতিতেই সাদা রঙ মানে স্বর্গীয় শুভ্রতা ও শান্তি। হিন্দু চিত্রে সাদা শিব ও হিমালয়ের রঙ, শিবের স্ত্রী পার্ব্বতীরও রঙ। সাদা আবার জলেরও রঙ। আকাশের রঙ হচ্ছে নীল ; নীল বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রামের রঙ, প্রত্যেকেই ছিলেন পালক আর রক্ষক। বৌদ্ধদের মতে হলদে হচ্ছে মানুষী অবস্থার রঙ, তাই বৌদ্ধ শ্রমণরা হলদে রঙের পোশাক পড়েন। বুদ্ধ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রীর দেহের রঙ সোনালী হলদে ; পৃথিবীর প্রতীকও আবার এই হলুদ রঙ। বৌদ্ধদের মতে প্রাণী অবস্থার রঙ সবুজ, হিন্দুদেরও তাই। বৌদ্ধদের আশাহীন ভূতের অবস্থার রঙ লাল। হিন্দুদের কাছে লাল হচ্ছে সূর্য বা ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্তা আর সৌরমণ্ডলের রঙ, যে মণ্ডলে মর্ত্যজীবনের শেষে অদেহী আত্মারা বাস করেন। বৌদ্ধ পুঁথিতে পড়া যায় যে সম্রাট হর্ষের বাবা প্রতিদিন একটি চুণীর পাত্রে নিজেরই হৃৎপিণ্ডের মত লাল এক গুচ্ছ পদ্মফুল সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিতেন। লাল, সাদা আর নীলের সংযোজনে হয় হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির সৃষ্টি (ব্রহ্মা শিব আর বিষ্ণু), অথবা এই মূর্ত্তিরই বৌদ্ধ সংস্করণ। বৌদ্ধদের কাছে নরকস্থ অধিবাসীর রঙ হচ্ছে কালো। হিন্দুদের কাছে কালো হচ্ছে ব্যাপ্তচরাচরের প্রতীক, হিন্দুশাস্ত্রমতে সৃষ্টির আগে রূপহীন নিরবস্থার রঙ ছিল কালো, যার থেকে কালীর রঙ হয় কালো, যিনি একদিকে সৃষ্টির আদ্যাশক্তি, অন্যদিকে সংহার শক্তি।

রঙের ছক ঠিক হয়ে যাবার পর আসে নানারকম ভঙ্গী আর মুদ্রার ছক, যার ফলে সৃষ্টি হয় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু মূর্তি নির্মাণের নানা চুলচেরা বিধি প্রকরণ। এই মূর্তি নির্মাণের বিধি প্রকরণকে ইংরেজিতে বলে আইকনোগ্রাফি। অবশ্য মূর্তি নির্মাণের বিধি প্রকরণ যে শুধু প্রাচ্যেই প্রচলিত ছিল তা নয়, পশ্চিমে অর্থাৎ ইওরোপেও বিলক্ষণ ছিল।

পশ্চিম দেশ অর্থাৎ মাড়োয়ারে রাজা শিলা বা শিলাদত্য গুহিলের সময়ে প্রাচীন যুগের যক্ষরীতির পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে তিব্বতী পণ্ডিত তারানাথ কি লিখে গেছেন সে সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ভারতীয় চিত্ররীতিতে চীনে প্রভাব কত বেশী তারও কথা সংক্ষেপে বলেছি, কি করে পশ্চিমদিকে মধ্য এশিয়া এবং পারস্যের মধ্যে দিয়ে এই প্রভাবের আদান প্রদান চলে ; মধ্যদেশে

নেপাল তিব্বতের মধ্যে দিয়ে, পূর্বদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধরে ধরে আসাম, মনিপুর, পূর্ববঙ্গের মধ্যে দিয়ে। দুঃখের বিষয় রাজপুতানায় অথবা রাজস্থানে খুব প্রাচীন প্রাচীর চিত্র বা ফ্রেস্কো একটিও অবশিষ্ট নেই। বিকানীরের পুরাতন প্রাসাদে শুধু সতেরো শতকের প্রথম দিকে আঁকা প্রাচীর চিত্র এখনও কিছু আছে। একটি ছবিতে চীনে প্রভাব খুব স্পষ্ট, বিশেষত মেঘ আর বিদ্যুতের নক্সায় চীনে প্রভাব খুবই প্রকট। দূর প্রাচ্যের প্রভাব রাজস্থানী চিত্রশিল্পে থেকে থেকে প্রায়ই এসেছে, বিশেষত বিকানীরে। বিকানীরের গালার কাজ করা পুরনো ঢালে যেসব মেঘের ছবি আছে সে মেঘ ভারতবর্ষের নয়, পুরোপুরি চীনের। উদয়পুরে জলের মাঝখানে প্রাসাদগুলির দেয়ালে যেসব চিত্র সেগুলি আঠারো শতকের হলেও তাতেও চীনে প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনে প্রভাব পাহাড়ী ছবিতেও আছে। কিন্তু রাজপুত ছবিতে চীনে প্রভাব হঠাৎ আসে, পারসীক বা মুঘল ছবির মত অত স্থায়ী আর চরিত্রগত নয়। আনন্দ কুমারস্বামী মনে করেন যে রাজপুত ছবিতে চীনে প্রভাব নৌ বাণিজ্যের ফল। কারণ গুজরাটে চিরকালই চীনে পণ্য আমদানী হয়েছে, এখনও হয়, ফলে এখনও পশ্চিম ভারতের বহু জায়গায় মাঝে মাঝে ছুঁচের কাজ করা কাপড়ে বিশুদ্ধ ভারতীয় কাজের পাশাপাশি বহু প্রাচীন চীনে কাজও দেখতে পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম শুধু এই বলার জন্যে যে ইতিহাসের প্রথম যুগে ভারত আর চীনের চিত্ররীতি নীতিতে যে আদান প্রদান সুরু হয় তা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, যার প্রথম প্রমাণ পাই অজন্তার চিত্রে। কিন্তু এখানে আমার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে যে মধ্যযুগে এবং তারপরে রাজপুত ছবি যে ভাবে আঁকা হত, সেই আঁকার পদ্ধতিতে অজন্তার পদ্ধতিই নিযুক্ত হত। রাজপুত ছবিও মুখ্যত রেখারই ছবি। সে ছবির ভাষা হচ্ছে খুব প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ, প্রাচীন রেখা। রাজপুত ছবির সীমারেখা গ্রীক ভাজ, অজন্তা অথবা মিনোয়ান ফ্রেস্কোর মতই দৃঢ় আর সুস্পষ্ট; নক্সা আর রঙীন চিত্র যে একাত্ম, অভিন্ন হতে পারে তার প্রমাণ। প্রথমে সীমারেখাটি, সে ছোট বড় যে কোন ছবিতেই হোক, তুলি দিয়ে লাল রঙে সাপ্‌টা করে আঁকা হত; এর উপর পড়ত সাদা আস্তর, যার মধ্যে লাল নক্সাটি ফুটে বেরোত। তার উপরে মিহি তুলি দিয়ে দ্বিতীয়বার সীমারেখাটি আঁকা হত, প্রায়ই প্রথম রেখাটি ইচ্ছামত বদলে। এই দ্বিতীয় রেখাটি খুব যত্নে আঁকা হত কারণ এটিই হত চূড়ান্ত নক্সা, যার অদল বদল হত না। রঙীন ছবিতে শেষ পর্যন্ত যা থাকবে তার সবই এতে উচ্চারিত হত। এই রেখা সম্পূর্ণ হবার পর, পটভূমি অর্থাৎ ছবির 'পিছন'টায় রঙ দেওয়া হত; প্রথমে আকাশ, ঘরবাড়ী, তারপর গাছ। অনেক উল্লেখযোগ্য রাজপুত নক্সা আছে যেগুলি এই পর্যন্তই আঁকা, তারপর আর আঁকা হয়ে ওঠেনি। পরিশেষে, আকারগুলি রঙ দিয়ে ভরান হত, তারপর আবার সীমারেখা স্পষ্ট করে আঁকা হত। সাদা আস্তরে আসত ঔজ্জ্বল্য, জল জলে ভাব, তার সঙ্গে মসৃণ পালিশকরা মিহি প্ল্যাস্টার করা দেয়ালের মত জমি, যার উপরে দ্বিতীয়বার রেখা পড়ত। প্রথমবারের রেখাতে

কাগজে দাগ পড়ত। আস্তর লাগানর পর কাগজে আর দ্বিতীয় বারের রেখার দাগ পড়ত না। যে রঙ লাগান হত সে রঙ কাগজের উপর পাতলা খোসার মত লেগে থাকত। কাগজ একটু ঘসলে বা মুড়লেই খোসাটি চটা উঠে পড়ে যেত, উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ত নীচের রেখা। সুতরাং পদ্ধতিটি নিতান্তই অজন্তার টেম্পেরা পদ্ধতির সামিল।

অজন্তার চিত্র নির্মাণ রীতি কি করে রাজপুত ছবি নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে পরবর্তী যুগে ভারতীয় ছবি আঁকার পদ্ধতি প্রকরণকে চালিত করে তা সংক্ষেপে বললুম। এখন অজন্তার চিত্র বিষয় কিভাবে পরবর্তী যুগের চিত্র বিষয়কে প্রভাবিত করেছে তা অল্প কথায় বলব।

অজন্তা ছবির বিষয় মোটামুটি চার ধরনের। প্রথম হচ্ছে আখ্যান বা গল্প, যেমন জাতকের গল্প, শিবিরাজার গল্প ইত্যাদি। এই আখ্যান মূলক চিত্র দেয়াল চিত্রে বা বইয়ে বরাবরই দেখা যায়। পরবর্তী যুগে এর যেভাবে রূপান্তর হয় তার নিদর্শন আছে মাদ্রাজের প্রাচীন মন্দির আনেগুণ্ডি ও তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরমের ছাতে আঁকা চোদ্দ শতকের ছবিতে। আনেগুণ্ডির ছবি বা দশ এগারো শতকে তাঞ্জোরের মন্দিরের গায়ে আঁকা ছবির সঙ্গে অজন্তা রীতির বেশ মিল আছে মনে হয়। কিন্তু তিরুপতির ছবি যাকে বলে বাংলা পটুয়া চিত্রকরদের জড়ান পটের আদি বা পূর্বপুরুষের চিহ্ন। আধুনিক যুগের খবরের কাগজে ছোটছেলেদের জন্যে আঁকা কমিক ছবির মত, একটার পর একটা 'ক্রমশ প্রকাশ্য' রীতিতে আঁকা ; অজন্তার ১৭নং গুহার মহাহংস জাতকের ছবি যার মূল। এর ফলে সাধারণ লৌকিক নীতিতে আসে পটুয়ার আঁকা, সস্তার জড়ান পট ; আর দরবারী ঐতিহ্যে সুরু হয় ধারাবাহিক চিত্র। সেই ধারাবাহিক চিত্র পরে পর্যবসিত হয় কোনও বিশেষ বিষয় বা আখ্যান অবলম্বন করে আঁকা ছবির বইয়ে, যাতে ছবিগুলি একের পর এক নম্বর করা থাকত, ছবি উল্টে উল্টে গেলে আপনিই গল্পটি পড়া হয়ে যেত, আধুনিক যুগের ফ্ল্যাশ কার্ড বা ফিল্ম স্ট্রিপের মত। এই বিষয়-রীতির আরেকটি সংস্করণ হয় 'রাগমালা' বা 'নায়িকা' চিত্রে যার কথা পরে বলব।

দ্বিতীয় হচ্ছে মুখ্যত নক্সা বা আলপনামূলক ছবি যার উত্তরাধিকার সূত্র সঞ্চারিত হয়েছে মন্দির ভাস্কর্যে, ছবির পাড়ে, সযত্নে লেখা পুঁথির অলঙ্কারে, নিত্য ব্যবহার্য ঘট, কলসী, হাঁড়িকুড়ি, থালায়, পুতুলে, মাটির দেয়ালের আলপনায়, দৈনন্দিন জীবনের পূজাব্রতের আলপনায়, ছুঁচের কাজে, গৃহসজ্জার অলঙ্কারে। এগুলি আবার ঘুরে ফিরে আসে ইটের টালিতে, বাসনে, এনামেল করা রঙীন টালিতে, পটারিতে।

তৃতীয় হচ্ছে চিত্রপ্রধান ছবি, যার মধ্যে আখ্যান নেই, আছে মুখ্যত ছবিত্বগুণ, যার উদ্দেশ্য গল্প বলা ততটা নয়, যতটা চিত্ররূপের পরীক্ষা। রঙ রেখা, আকার যার অভিষ্ট। এ রকম ছবি আছে অজন্তার চৌখুপি প্যানেলে। পরবর্তী যুগে এই রীতির একদিক যায় পুঁথিচিত্রে, যা প্রথম দেখা যায় পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিতে, তারপর আস্তে আস্তে অন্যান্য পুঁথিতে। অন্য এক ধারা যায় মন্দিরের

ভাস্কর্যে, তার থেকে ইটের মন্দিরের পাটায়, টালিতে; তারপর ফের আসে রাজপুত, পাহাড়ী, মুসলমান ছবিতে, লৌকিক পটে।

চতুর্থ হচ্ছে নরনারীর প্রেমের চিত্র। এই বিষয়টি অজন্তার বহু আগে সুরু হয়ে অজন্তার ছবিতে নিয়ে আসে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি। তারপরে ক্রমশ নিতান্ত খোলাখুলি ভাবে যায় মন্দিরের ভাস্কর্যে, শরীরের মিলনাত্মক মিথুন খোদাইয়ে। চিত্ররীতিতে প্রেম, মিলন, বিরহ, প্রতীক্ষার ছবি যেমন ভাবে, বিন্যাসে ও দ্যোতনায় অসীম, তেমনি সংখ্যায় অগুণতি। পরে এই বিষয়ের ভাস্কর্যসুলভ নিষ্পাপ বলিষ্ঠতা আর প্রাণবন্ততার বিকার আসে চিত্রপটে। বিলাসীদের প্রমোদভবনে নিছক কামোদ্দীপক বন্ধমালার ছবিতে পর্যবসিত হয়। পরবর্তী যুগে এই বিষয়ের অনেক ছবিতে নক্সার অসাধারণ দক্ষতা সত্বেও এর উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে নিতান্ত হেয় ও কুরুচিপূর্ণ।

মধ্যযুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত এই চারটি ধারার নমুনা কোথায় কি রকম পাওয়া গেছে খুব অল্প কথায় তার উল্লেখ করব। প্রথমত আখ্যানমূলক ছবির রীতি নানাভাবে আসা যাঁওয়া করে শ্যামে, জাভায়, খোটানে, তিব্বতে। ভারতবর্ষে এই রীতি নানান সুত্রে যায় দাক্ষিণাত্যে, রাজস্থানে, নেপালে। প্রাচীন মন্দির তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরমের ছাদে আঁকা ফ্রেস্কোয় এই ছবি কি রকম আশ্চর্যভাবে বাংলার জড়ান পটের কথা মনে করিয়ে দেয় তার উল্লেখ করেছি। তিরুপতিতে একটি ফ্রেস্কো আছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। এটি গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহে প্রাপ্ত একটি জড়ান পটের যমজ বললেও ভুল হয় না। আখ্যানমূলক ছবি এইভাবে সারা ভারতময় জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায়। এরই একধরণের সংস্করণ পরে হয় রাগমালা চিত্রে, অথবা রঙীন চিত্রের অ্যালবামে, যাতে একই বিষয় একের পর এক ছবিতে আস্তে আস্তে খুলে বলার রীতি চালু হয়।

দ্বিতীয় রীতি, অর্থাৎ নক্সা বা আল্‌পনা, যে-কোন মধ্যযুগের মন্দিরে এত প্রচুর যে বিশদভাবে বলা এখানে দুঃসাধ্য। তাই মন্দিরের কথা উল্লেখ না করে এনামেলের উপর নক্সা করা টালি (ইংরেজিতে টাইল) দু এক জায়গায় যা পাওয়া গেছে তার কথা বলব। প্রথমে উল্লেখ করতে হয় মালদহ জিলার গৌড়ে তাঁতিপাড়া আর লোটন মসজিদের টালির কথা (খৃষ্টীয় ১৪৭৫ থেকে ১৪৮০)। কিন্তু লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে তারও আগেকার কিছু টালি গৌড় থেকে সঞ্চয় করে রক্ষিত আছে, যেগুলি 'স্পষ্টই হিন্দু প্রভাব সম্বলিত, এদের চরিত্র মুসলমান যুগের টালি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুসলমান টালির নক্সাসুলভ নীল, রুইতনের আকারে ডায়ামণ্ড কাটা অথবা পটি আঁকা এতে নেই। এগুলি মুঘল আমলের জ্যাবড়া কাজ করা টালির থেকে তফাৎ'। এই টালিগুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নমুনা বর্তমানে নেই।

তৃতীয় রীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পশ্চিম ভারতের চিত্রিত পুঁথির উল্লেখ করেছি। সবচেয়ে প্রাচীন যে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথির উল্লেখ পাওয়া তা ১১২৭ খৃষ্টাব্দের, তার পরে যে তিনটি পুঁথির

উল্লেখ পাওয়া যায় সে তিনটিই হচ্ছে একই বই, কল্পসূত্রের তিনটি নকল। সবচেয়ে প্রাচীন নকলটি আছে পাটান গ্রন্থগারে। তার তারিখ হচ্ছে খৃষ্টীয় ১২৩৭ সাল। পরের দুটির একটি আছে লণ্ডনের কমনওয়েল্থ্ লাইব্রেরিতে (১৪২৭) অন্যটি বৃটিশ মিউজিয়ামে (১৪৬৪)। কলকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের কাছে একটি পুঁথি আছে, তার বয়স ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ। জৈন বা অন্যান্য ভারতীয় পুঁথিচিত্র কিন্তু সব সময়ে ইওরোপীয় পুঁথিচিত্রের মত বইয়ের বিষয় বা আখ্যানকে চিত্ররূপ দেয় না। ভারতীয় পুঁথিচিত্রের অধিকাংশই বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখে না। এগুলি সাধারণত শিল্পীর খেয়াল খুসীমত আঁকা, পুঁথির যেখানে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাই এগুলি আখ্যানমূলক নয়, মুখ্যত চিত্রধর্মী। গুজরাটী বা জৈন পুঁথিচিত্রের সঙ্গে মধ্যযুগের নেপালী ছবির খুব সম্বন্ধ দেখা যায়। আবার অন্যপক্ষে জৈন চিত্ররীতি অতি অদ্ভুতভাবে নানা আঁকাবাঁকা পথে বাংলা জড়ান পটে অথবা চৌকা পটেও দেখা দেয়; যেমন বাবু হয়ে, পা মুড়ে বসা অবস্থায় কাপড় বা শাড়ীর ভাঁজের রীতি, পাশ বালিশ আঁকার রীতি, পাশ বালিশে হেলান দেবার রীতি ইত্যাদি। উড়িষ্যার পুঁথিতে আর পটে গুজরাটী প্রভাব বেশ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা পুঁথিচিত্রের রীতি আবার কিছুটা আলাদা হয়ে পড়ে, বোধহয় নেপালী ও তিব্বতী প্রভাবে। এছাড়া মন্দিরের পাথরে, ইঁটের টালিতে চিত্রধর্মী ছবির খুব চলন হয়।

চতুর্থ ধরনের ছবি ভারতের সর্বত্র নানাভাবে, নানা রীতিতে পাওয়া যায়। বিশদভাবে বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন।
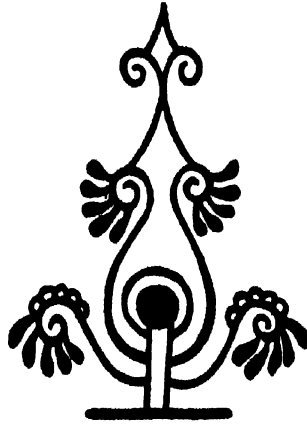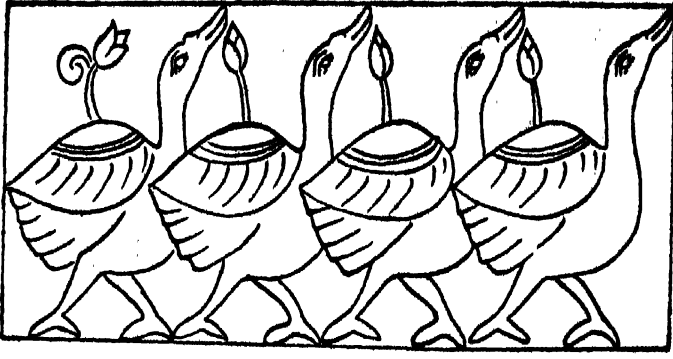
চতুর্থ অধ্যায়

ষোল থেকে আঠারো শতকের ছবি

ভারতবর্ষে যদিও আট থেকে পনেরো শতকের মধ্যে চিত্রিত ভারতীয় চিত্রকলার নমুনা খুবই কম পাওয়া যায়, তবুও ভারতবর্ষে ও আশে পাশের দেশগুলিতে চীনে ও তিব্বতী চিত্ররীতির প্রভাব যে বেশ ছড়িয়েছিল তার প্রমাণ সে সব দেশের ঐ যুগের আবিষ্কৃত ছবিতে সুস্পষ্ট। কিছু কিছু উল্লেখ আগেই করেছি, যেমন দণ্ডন-উলিখের ফ্রেস্কোর ; বিশেষত বিখ্যাত জলপরীর আখ্যানটি যেটির বর্ণনা হিউয়েন-সাঙও করেন। গল্পটি হচ্ছে কেমন করে একজন মন্ত্রী এক নাগ রাজার বিধবাকে বিয়ে করেন এই আশায় যে বিবাহের ফলে খোটানে এক জলধারা আসবে। এ ছাড়াও তুরফানের পশ্চিমে ইয়ার-খোটোতে স্টাইন কতকগুলি সিল্কের উপর আঁকা ছবি আবিষ্কার করেন যার বৌদ্ধ ছবিগুলি স্পষ্টতই ভারতীয় প্রভাবে পূর্ণ। ল কক বাসাক্লিক বিহারে কতগুলি ফ্রেস্কো পান যেগুলি মাটি আর কুচি কুচি খড়ের প্রলেপের উপর আঁকা। অজন্তাতেও ঠিক এই উপায়ে তলাকার জমি তৈরি হত। চিক্কন কোল আর টোয়োক বলে ছুটি জায়গায় যে ছবি পাওয়া গেছে তা প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে আঁকা। অন্য প্রভাবও সুস্পষ্ট। আসলে খোটানে নানা দেশের চিত্ররীতির মিলন ও মিশ্রণ ঘটে। তবুও এটা ঠিক যে চীনে ও জাপানী ছবিতে যেখানেই বৌদ্ধবিষয়ক চিত্রের আধিক্য দেখা যায়, সেখানেই সে সব ছবির চিত্র-রীতি যে ভারত থেকে খোটানের মধ্যে দিয়ে প্রথমে চীনে তারপরে কোরিয়ার মধ্যে দিয়ে জাপানে গিয়েছিল তা বোঝা যায়। এর অবশ্য ঐতিহাসিক নজিরও আছে। চীনের সম্রাট ইয়াং-টির সময়ে (খৃষ্টীয় ৬০৫ থেকে ৬১৭) তাঁর দরবারে ছুজন ভারতীয় ভিক্ষু আসেন, তাঁদের নাম কবোধ আর ধর্মকৃষ্ণ। এই ছুজন ভিক্ষু যাবার পরই অনেক শিল্পী নানা দেশ থেকে চীনে যান ; তাঁদের মধ্যে এক-জনের নাম ছিল বাজ্‌না। বাজ্‌নার দেশ ছিল খোটান। বাজ্‌নার ছেলে ওয়াই-চি-আই-সঙ কোরিয়া হয়ে জাপান যান। চীনে লেখকদের মতে বাজ্‌না আর তাঁর ছেলে ছুজনেই 'বিদেশী' রীতিতে ছবি আঁকতেন। বিদেশী মানে ভারতীয়, আর বৌদ্ধ শিল্পী হিসাবে তাঁদের খুব নামযশও ছিল।

প্রাচীন জাপানী চিত্রে সুস্পষ্ট ভারতীয় প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। তবে এইটুকু নজির হাতে নিয়ে অনেক ভারত উৎসাহী পণ্ডিত প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে যান যে ভারতীয় প্রভাব আসার আগে চীনে চিত্রকলা ছিল নিতান্ত অপরিণত, এবং ভারতীয় চিত্ররীতি ও নীতি আমদানির পরই কেবল চীনের চিত্রকলার পুষ্টি ও প্রসার ঘটে। ভারতউৎসাহী বন্ধুদের হাতে ভারতীয় চিত্রকলার রীতিনীতির লাঞ্ছনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। আসলে বৃটিশ মিউজিয়মে চীনে ছবির যে সবচেয়ে প্রাচীন দৃষ্টান্ত আছে, সেটি খৃষ্টীয় চার শতকে কু কাইচির আঁকা, এবং তাতে ভারতীয় বা গ্রীক কোন প্রভাবই নেই। আমরা সাধারণত ভুলে যাই যে চীনের চিত্রকলায় বৌদ্ধ বিষয়ক ছবি নানান চিত্রবিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি। প্রফেসর জাইল্‌সের মতে চীনে চিত্রবিষয়ের সাতটি বড় বড় ভাগ আছে : (১) ইতিহাস (২) ধর্ম (বৌদ্ধ ও টাও) (৩) নিসর্গ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য (ল্যাণ্ডস্কেপ), (৪) ফুল (৫) পাখী (৬) জন্তু জানোয়ার (৭) প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রে্ট। দ্বিতীয়োক্ত ভাগে বৌদ্ধ নক্সা বা আল্‌পনার রীতি ছাড়া ভারতীয় শিল্পীর কাছে চীনে চিত্রশিল্পীরা আর বিশেষ কিছু শিখেছিলেন কিনা সন্দেহ। একথা যদি স্বীকার নাও করা যায় যে চীনই এশিয় চিত্রকলার জনক তবুও এটা বোধ হয় ঠিক যে চিত্রকলার পূর্ণ বিকশিত ফুল চীনেই আমরা সর্ব্বপ্রথম পাই।

খৃষ্টীয় সাত শতকের পর অজন্তার ফ্রেস্কোরীতি যে কিছুটা রাজপুতানায় গিয়ে পৌঁছয় তা আগেই বলেছি। জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর, উদয়পুরের প্রাসাদে ফ্রেস্কোর চলন ছিল, এখনও সে পদ্ধতি রাজপুতানায় চালু আছে। জৈন পুঁথিতেও কিভাবে চিত্র ঐতিহ্য বজায় ছিল তারও উল্লেখ করেছি। তবুও এটা ঠিক যে মুঘলদের আসার আগে রাজপুত চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নমুনা আমরা একটিও পাই না। যখন মুঘল চিত্রকলা প্রায় একশ বছর ধরে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যখন সম্রাট আকবর অতি সাদরে হিন্দু চিত্রশিল্পীদের অভ্যর্থনা করে তাঁর দরবারে স্থান দেন, তারপরেই শুধু রাজপুত ছবির প্রমাণ আমরা পাই, তার আগে নয়। হয়ত এও সম্ভব যে নিতান্ত দেশজ বলে রাজপুত চিত্রকলা স্বদেশে ছিল অনাদৃত, বিদেশী যখন এসে তাকে সম্মান দিল তখন গেঁয়ো যুগী ভিখ পেল। কারণ দেশে যে ভাল চিত্রকর ছিল, তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় আছে। যেমন আট শতকের প্রথম দিকে মহম্মদ বিন কাশিম যখন সিন্ধুদেশ জয় করেন, তখন তাঁর অনুচরদের একজনের লেখায় জানা যায়, একদল হিন্দু শিল্পী কাশিমের কাছে তাঁর আর তাঁর সেনাপতিদের ছবি আঁকার প্রস্তাব করে। এটা সামান্য উল্লেখ হলেও খুব মনে রাখার কথা, কারণ এতেই বোঝা যায় তখনকার দিনেও ভাল পোর্ট্রেট আঁকা হত। এতে আরও প্রমাণ হয় যে রাজপুতদের অধীনে যখন দেশ ছিল তখন সমাজে চিত্রকলার বিশেষ স্থান ছিল, যে স্থান পরে রাজনৈতিক পরাজয়ে হয়ত হারিয়ে যায়, পুনরায় মুঘলদের উৎসাহে নিজের দেশেই উজ্জীবিত হয়। সুতরাং আমরা ইতিহাসের নজির প্রমাণ অনুযায়ী প্রথমে পাঠান মুঘল চিত্রকলার আলোচনা করব, তারপর রাজপুত এবং রাজপুত প্রভাবান্বিত চিত্রকলার।

মুঘল চিত্র

'ফতেপুর সিক্রি আর লাহোরের দেয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো ছাড়া ভারতবর্ষে মুসলমান চিত্রের যা কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে তা সবই ছোট আকারের ছবি, যাকে বলা যায় ক্ষুদ্রকায় সূক্ষ্মালেখ্য, ইংরেজিতে বলে মিনিয়েচর। এসব ছবি দূরে বা উঁচুতে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখার জন্য আঁকা হয়নি ; এগুলি হাতে ধরে, চোখের কাছে এনে, অথবা কোলে পেতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আঁকা, ঠিক যেমন চোখের কাছে ধরে পুঁথি পড়তে হয়, সুতরাং এগুলি প্রায়ই তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে পূর্ণ হত। ক্ষুদ্রাকার ছবি আঁকার রীতি মূলত পারস্য থেকেই এসেছে। একদিকে যেমন আমাদের দেশে আসে, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপে যায়। যে সময়ে ভারতবর্ষে আকবর বাদশার দরবারে বিখ্যাত বিখ্যাত ক্ষুদ্রাকার ছবি আঁকা হচ্ছিল, ঠিক একই সময়ে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের দরবারেও হিলিয়ার্ড প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা বিখ্যাত মিনিয়েচর আঁকছিলেন। প্রথমেই মনে রাখা ভাল যে আমাদের দেশে হাতীর দাঁতের পাতে যে সব ক্ষুদ্রাকার বা মিনিয়েচর ছবি আঁকা হয়েছে তার উৎস হচ্ছে বিলেতী বা ইওরোপীয় মিনিয়েচর। অর্থাৎ হাতীর দাঁতের পাতে বিদেশী মিনিয়েচর দেখে তবে এদেশের শিল্পীরা হাতীর দাঁতের পাতে ছবি আঁকা শুরু করেন। ' পারস্য চিত্রনীতি ইতিহাসের যুগ অনুসারে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় : মংগোল, তৈমুরিদ আর সাফাভিদ। মুসলমান ধর্মে প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ বা জন্তুর প্রতিকৃতি যে আঁকবে, শেষবিচারের দিনে তাকে নিজের আত্মা ঐ প্রতিকৃতিকে দিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ তার নিজের আর উদ্ধার নেই। ঠিক এই কারণে খুব প্রাচীন আরব পুঁথিতে কোন ছবি নেই। পরে যখন গোঁড়ামি খানিকটা কেটে গেল, যখন আইয়ুবী সুলতানরা এলেন, তখন মুসলমান জীবনে চিত্রকলা ফের দেখা দিল। কারণ আইয়ুবী সুলতানদের মুদ্রার উল্টোপিঠে বাইজানটাইন খৃষ্টের মাথা দেখা দিল। ঠিক যেমন রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের (যিনি প্রথম খৃষ্টিয়ান হন) অব্যবহিত আগে রোমের গৃহসজ্জার দ্রব্যে, যথা আয়নার পিঠে, খৃষ্টীয় ক্রসের ছবি খোলাখুলিভাবে দেখা দিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ' প্রাচীন পুঁথিতে প্রথম ছবি দেখা যায় তার নাম মকমত-ই-হরিরি, এটি ১২৩৭ সালে লেখা। এর মধ্যে যে সব ছবি আছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এক প্রাণবন্ত দেশজ চিত্রভাব বিদেশী ক্ষীয়মান রীতিতে আত্মপ্রকাশ করবার খুব চেষ্টা করছে। ছবিগুলিতে বাইজানটাইন প্রভাব নিতান্ত স্পষ্ট : পিছনের জ্যোতি, বসন ভূষণ, কাপড়ের ভাঁজ, পিছনে ঘর বাড়ীর স্থাপত্য, সবই সরাসরি বাইজানটাইন ছবি থেকে তুলে আনা। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে প্রাচীন পারসীক মৃৎশিল্পীদের পটারিচিত্রের চিহ্ন, আর পারস্যের নিজস্ব

ঐতিহ্যের স্মৃতি, যা নাকি ছিল অসিরিয়, গ্রীক, ব্যাক্ট্রিয়, ভারতীয়, সাসানিয়ান, চীনে ধারার মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল বাণিজ্যের কৃপায়, কারণ পুরাকালে সব বাণিজ্যের পথ ছিল পারস্যের মধ্যে দিয়ে। তাই মংগোলরা পারস্য জয় করে সে দেশের চিত্রনীতিকে ইসলাম ধর্মের বিধি নিষেধের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার আগেই বাণিজ্যের প্রভাবে পারসীক চিত্রকলায় অজ্ঞাতসারে অনেক পরিবর্তন ঘটে, নতুন জিনিষ আসে। ফলে প্রথম দিকের পারসীক ছবিতে বিদেশী প্রভাব প্রধান হলেও, নক্সার রীতি ছিল দেশী আর কৌতূহলোদ্দীপক ; বিশেষ করে মামুলি বিষয়, যথা ঘোড়া, ঘোড়-সওয়ার, আসবাবপত্র, অভিজাতদের বংশচিত্র (কোট অভ আর্মস্) ইত্যাদির চিত্রে দেশজ পৌরুষ যথেষ্ট স্পষ্ট।

আব্বাসিদদের যুগে, টাইগ্রিস উপত্যকার শহরে, বাগদাদে, বসিটে, বস্রায় চিত্রকলার উৎকর্ষ দেখা যায়। ঠিক যে সময়ে খালিফেত আপন মহিমার সপ্তশীর্ষে, অর্থাৎ ১২৫৮ সালে, সেই সময়ে মংগোল আক্রমণ দুর্নিবার পার্বত্য জলপ্রপাতের মত মধ্য এশিয়া থেকে নেমে আসে। বান নেমে যাবার পর থেকে গেল উর্বর পলি। মংগোলরা আসার ফলে চীন আর পারস্যের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হল। পূব দিক থেকে আগত সংস্কৃতির স্রোতের মুখে মৃতপ্রায় বাইজানটাইন প্রভাব দূরে গেল ; যদিও মধ্য এশিয়ায় চীনের প্রভাব ছাড়া, খৃষ্টিয়ান বা ইওরোপীয় আর ভারতীয় প্রভাব যথেষ্ট ছিল, তবুও পারসীক ছবিতে চীনে প্রভাব মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। চীন থেকে এল চিত্রের রীতি-পদ্ধতি, চেতনা, আগ্রহ। শুধু যে চীনে বাসন-পত্র, বসন-ভূষণ, সিল্কে ছুঁচের কাজ, ট্যাপেস্ট্রির মধ্যে দিয়ে এ প্রভাব পরোক্ষে পারস্যে ছড়িয়ে পড়ল তা নয়, সরাসরি চীনে কারিকর, মৃৎশিল্পী, ছুঁচের কারিকর, চিত্রশিল্পী, পারস্যে আমদানি হল। ফলে মারাঘান, সুলতানিয়া, তাব্রিজ, ইত্যাদি নগরে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হল।

মংগোল যুগের (১২৫৮-১৩৩৫) ঝড়ঝঞ্ঝার পর আরম্ভ হল তৈমুরের বংশ। ফলে অক্সাসতীরের নগরগুলিতে, বোখারায়, সমরকন্দে সভ্যতা ও শিল্প যেন নতুন করে জন্মাল। তৈমুরের বংশে এলেন ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর। তৈমুরিদ যুগে পারস্যে স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ আসে। ওদিকে তৈমুরের কবি ছেলে হিরাটের শাহরুখ নিজের দরবারে চিত্রশিল্পী রাখা সুরু করলেন, এদের মধ্যে একজন সম্রাটের দূতের সঙ্গে চীনে যান। পনেরো শতকের শেষের দিকে সুলতান হুসেন মির্জা নিজের দরবারে সবচেয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জড়ো করলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিহ্‌জাদ।

১৫০৬ সালে হুসেন মির্জার মৃত্যুর পর বিহজাদ সাফাবিদ সম্রাট ইস্‌মাইলের কাছে কাজ নিলেন। নতুন বংশে তৈমুরিদ যুগের পরিষ্কার, তরতরে কাজ, রেখা আর রঙের সংযম, স্বচ্ছ, ঋজু রীতি চলে গিয়ে এল প্রগল্‌ভতার যুগ, নক্সার প্রাচুর্য আর রঙের ছড়াছড়ি। যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা

যায় রোমান্টিসিজমের প্রসাদ, ধ্রুপদী রীতির বদলে খেয়াল। ষোল শতকের শেষের দিকে শাহ আব্বাসের সময়ে এই রীতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল।

১৫২৫ সালে বাবর ভারত জয়ে মন দিলেন। পাঁচ বছর পরে মারা যান। যদিও এদেশের বর্ষাকাল ছাড়া কোন কিছুতে তাঁর মন উঠত না, অধিকাংশ জিনিষই অশিক্ষিত, বর্বর বলে মনে হত, তবু তিনি চারুশিল্পের উন্নতির দিকে মন দেন। বাবর বিহজাদের খুব ভক্ত ছিলেন, নিজের রোজনামচায় লেখেন 'বিহজাদ চিত্রশিল্পীশ্রেষ্ঠ'। বিহজাদের ছবি ভারতবর্ষে কার কাছে আছে ঠিক জানা নেই। কিন্তু মহম্মদ তুঘলকের দরবারে খোরাসানের শিল্পী শাপুরের ১৫৩৪ সালে আঁকা 'গানের জলসা' বলে একটি ছবি কলকাতার মিউজিয়মে আছে, সেটি যেমন নিপুণ হাতে আঁকা তেমনি তাতে রঙের বাহার। ছবিটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীর কাজ যখন এত ভাল ছিল তখন শিল্পীশ্রেষ্ঠ বিহজাদের ছবি নক্সায়, রঙে, তুলির কাজে কতই না উৎকৃষ্ট ছিল। এই ছবিটি ই-বি-হ্যাভেল তাঁর ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিং' বইয়ে তুলে দিয়েছেন, তার সঙ্গে দিয়েছেন 'আহত সিংহ' বলে আরেকটি ছবি, যেটি সত্যই অতুলনীয়। এটিতে বহু প্রাচীন অসিরিয় ভাস্কর্যের প্রভাব নিতান্ত সুস্পষ্ট। এটিও ষোল শতকের মাঝামাঝি আঁকা, কলকাতায় রক্ষিত আছে।

বাবরের ছেলে হুমায়ুন ১৫৪৬ সালে ভারতের রাজত্ব হারিয়ে ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত পলাতক হয়ে এদেশে সেদেশে ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে এক বছর তিনি তাব্রিজের সাফাবিদ দরবারে আশ্রয় নেন, তখন শাহ তামাস্প্‌ ছিলেন সাফাবিদ বাদশা। বিহজাদ তখন মারা গেছেন, কিন্তু বিহজাদের সম-সাময়িক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বাদাকশানের মীর মনসুরের ছেলে মীর সয়ীদ আলির তখন উঠ্‌তি বয়স, খ্যাতিও আস্তে আস্তে হচ্ছে খুব। আরেকজন উঠ্‌তি শিল্পীর কাজও হুমায়ুনের নজরে পড়ে, তাঁর নাম আবদুস সামাদ।

১৫৫০ সালে দুজনেই কাবুলে হুমায়ুনের দরবারে এসে ভর্ত্তি হলেন। চিত্র-শিল্পের প্রতি হুমায়ুনের এতই দরদ ছিল যে নিজে গরীব অবস্থায় নির্বাসনে থেকেও তিনি মীর সয়ীদ আলিকে দাস্তাঁ-ই-আমীর হাম্‌জা বলে কাব্যের ছবি আঁকার ফরমায়েস দিলেন। হুকুম হল ছবি বারো খণ্ড বইয়ে শেষ হবে, প্রতি খণ্ডে থাকবে একশটি ছবি। বিশেষ যত্ন করে তৈরি করা তুলোর কাপড়ের উপর টেম্পেরায় আঁকা এরই ষাটটি ছবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ভিয়েনায় ছিল, আর পঁচিশটি আছে ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে। সবগুলি নিশ্চয় মীর সয়ীদ আলির হাতের আঁকা নয়, হয়ত তাঁর তত্ত্বাবধানে অন্য শিল্পীদের তৈরি, যেমন র‍্যাফেইল বা রুবেন্স করতেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মীর সয়ীদ আলি আকবরের দরবারে রয়ে গেলেন, একবার হজ করতে গেছলেন। গোড়ার দিকের মুঘলচিত্রের রীতি প্রায় সবটাই বিদেশী, অর্থাৎ সাফাবিদ, কিন্তু তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে নানা পরিবর্তন ও নতুন নীতির উদ্ভব চোখে পড়ে। পণ্ডিতরা বলেন

বিহজাদ প্রতিকৃতি আঁকায় বিশেষ নৈপুণ্যের সৃষ্টি করেন, তাঁর হাতেই পোর্ট্রেট ইরানী রীতিতে নতুন মর্যাদা পায়। এই প্রতিকৃতি রীতি মুঘল চিত্রশিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তার সঙ্গে আসে পটভূমির অন্যান্য গৌণ বস্তু থেকে মুখ্য বিষয়টিকে বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলার রীতি (যাকে ইংরেজিতে বলে রিলিফ); এবং সঙ্গে সঙ্গে রঙের অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য। যদিও এই যুগের ছবিকে সাধারণত ঈরাণী কলমের ছবি বলা হয়, এবং যদিও তাতে তৈমুরিদ ছাপ সুস্পষ্ট, তবু ব্যাকগ্রাউণ্ড বা ছবির 'পিছন'টি আঁকার মধ্যে যে গাছপাতা, ফুলফল দেখা যায়, তার রীতি নিতান্ত এবং নিঃসংশয়ভাবে ভারতীয়, তার মধ্যে পারসীক কিছু নেই। এইসব ছবির মধ্যে এমন একটি সারল্য, ঋজুতা, দরাজ নক্সা, ছবির খুঁটিনাটির প্রাচুর্যকে আয়ত্তে রাখে; পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জামের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজও ফুটে বেরোয়; দেয়াল, কার্পেট ও পিছনের স্থাপত্য ভাস্কর্য সুদ্ধ এমন সযত্নে আঁকা হয় যে সমস্ত ছবিটি নানা জিনিষে ভর্তি থাকলেও চোখকে কখনও পীড়া দেয় না, বরং আনন্দ ও বিস্ময় জোগায়। এসব ছবি সাধারণত বিশেষ একধরণের কাপড়ে চিত্রিত হত। কাগজ খুব কম পাওয়া যেত, বড় সাইজের কাগজ প্রায় পাওয়া যেত না।

এক কথায় ষোল শতকের প্রথম অর্ধেকের মুঘল ছবি, সাফাবিদ রীতি বা ঈরানী কলমেরই অপভ্রংশ বলা যায়, শিল্পীরা বিহজাদের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মুখ্যত ঈরানী কলম হলেও, অত প্রথম দিকের ছবিতেও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এল প্রাকৃতিক দৃশ্যে, ফুলে, লতাপাতায়, গাছে; যাতে বুঝতে দেরি হল না যে ইরানী কলম ভারতের জমিতে শিকড় নিয়ে শীঘ্রই ফুলে ফলে পূর্ণ হবে।

আবুল ফজল যখন আইন-ই-আকবরী লেখেন তখন 'দাস্তাঁ-ই-আমীর-হামজার' ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেছে। 'ছবিগুলিতে শরীরের গড়ন কিছু কিছু পারসীক, কিন্তু বর্ণবিন্যাস রীতিতে যে ঐক্য ও ঐশ্বর্য দেখা যায়, ছবির জমি যে ভাবে ভরান হয়েছে, স্তর থেকে স্তরে যেভাবে ছবি বিস্তার পেয়েছে, যার ফলে ছবিতে পশ্চাদপট নেই বল্লেই হয়, তা নিতান্তই ভারতীয়। ছবিতে পশ্চাদপটের বদলে আছে মুখ্য ছবির আশে পাশে ছোট ছোট গৌণ ছবি; এ রীতি নিতান্ত ভারতীয়। শরীরের গড়নে পারসীক আমেজ থাকলেও, মুখের গড়নে ভারতীয় ছাপ স্পষ্ট। যদি আমরা এই সূত্রে মনে রাখি যে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের পর অনেক হিন্দু ও ডেকানী শিল্পী উত্তর ভারতে কাজ পেয়ে চলে যান, তাহলে দাস্তাঁর ছবির ঘরবাড়ীর স্থাপত্যে যে সুন্দর মিনে করা টালির কাজ, গাছপালার পত্রপুষ্পের প্রাচুর্য ও রঙের ঐশ্বর্য দেখা যায় তাতে মনে হয় কিছু কিছু ডেকানী শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য অনেক ছবিতে গাছের কাণ্ড ও নিষ্পত্র শাখায় পারসীক প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু মোটামুটি বলতে গেলে এসব ছবিতে যে অপূর্ব কর্মব্যস্ততা, গতিবেগ দেখা যায়, তা নতুন মুঘল রীতির সূচনা করে।

প্রথম যুগের মুঘল ছবিতে রঙের বাহাদুরি আশ্চর্য। সারা ছবিটি সাধারণত হত প্রাচ্যের

ঝকমক করা লাল, নীল আর সোনালির জড়োয়া। ওরই মধ্যে আবার রঙের সেরা রঙ হত নীল; বৃষ্টির পর রোদে ঝকমক করা আকাশের নীল বা বৃষ্টিধোয়া দূর পাহাড়ের নীল, যা আসত ল্যাপিজ ল্যাজুলাই পাথর থেকে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকত প্রতিটি জিনিষ অতি নিখুঁতভাবে নজর দিয়ে আঁকা, যা ভাল করে তারিফ করতে হলে প্রায় আতস কাচের সাহায্য নিতে হয় (অনেকটা জার্মান শিল্পী ডিউরর বা ক্রানাখের কাজের মত); অলঙ্কারবহুল কম্পোজিশন; অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম অথচ 'হ্রস্ব' রেখা; পোষাকে এবং 'পিছনে' সোনালির প্রচুর ব্যবহার; আর বসনে, ভূষণে, গৃহসজ্জায়, আসবাব পত্রে জটিল, বিশদ নক্সা। তাতে চিত্রের চেয়ে নক্সার গুণই বেশী।

এই ছিল আকবরের আগে পর্যন্ত ভারতে ঈরাণী কলমের ছবি। ক্রমে ঈরাণী প্রভাব, তার জড়োয়া চিত্র চলে গেল; এল মুঘলদের উপর ক্রমশ ভারতীয় প্রভাব। তার ফলে যে সব চিত্র হল তাতে এল আরও স্বাধীনতা, বাস্তবতা, স্বচ্ছন্দ গতির আত্মবিশ্বাস। দেশজ রাজপুত রীতি আর পারসীক রীতির মিলনের ফলে হল একটি নতুন সৃষ্টি, পণ্ডিতরা যার নাম দেন মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবি বা মুঘল মিনিয়েচর। এই ছবিতে দুই ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের ফলে যা সৃষ্টি হল তার একান্ত নিজস্ব একটি চরিত্র হল। নিছক রঙীন নক্সা রূপান্তরিত হল হৃদয়গ্রাহী চিত্রে। তার কারণ ঈরাণী রীতি ইতিমধ্যে ভারতীয় আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে, ভারতের অংশ হয়ে উঠেছে। অবশ্য রাজপুত চিত্রের লৌকিকভাব বা চরিত্র যে মুঘল ছবিতে এল তা নয়, কিন্তু তবুও তা ভারতীয় ছবিই হয়ে দাঁড়াল, ঠিক যেমন আকবর বাদশা ও তাঁর বংশধররা আর সমরকন্দী রইলেন না, ভারতীয় হয়ে গেলেন।

কি করে এটা সম্ভব হল? কি করে একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রীতি খুব অল্প সময়ে বিশিষ্ট ভারতীয় রীতিতে পর্যবসিত হল? কি করে সম্ভব হল এই পরিবর্তন, পুনর্জন্ম?

সম্ভব হল আকবর আর জাহাঙ্গীর বাদশার জন্য। তাঁরা নিজেদের দেশের বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এদেশের বিখ্যাত শিল্পীর; দুজনকে লাগিয়ে দিলেন একত্রে, একসঙ্গে, একই কাজে। মীর সয়ীদ আলি, আবদুস সামাদের সঙ্গে একত্রে একই দরবারে বসে কাজ করতে লাগলেন বসাওঅন, দশ্বন্ত্, কেশুদাস। উভয়েই পেতে লাগলেন সমান রাজানুগ্রহ। এর ফল হ'ল অদ্ভুত, ভারতের চিত্র ইতিহাসে আশ্চর্য।

সম্রাটের কাজই হচ্ছে দেশ শাসন। বিশেষত যে সব সম্রাটকে নিজে দেশ জয় করে শাসন করতে হয় তাঁদের শাসনের দায়িত্ব যে কত, বিশেষত ভারতবর্ষের মত বিশাল, জটিল দেশে, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান বাদশার ছিল এই ধরনের দায়িত্ব, মাথায় নিশ্চয় ঘুরত রাজ্যের চিন্তা, ভাবনা, কূটনীতি, কত রকম শাসন চক্রান্তের কথা। এ সত্ত্বেও পৃথিবীর ইতিহাসে এই তিন সম্রাটের মত চারুশিল্পের মহান পৃষ্ঠপোষক খুব বেশী পাওয়া যাবেনা। স্তম্ভিত হতে হয় তাঁদের নিখুঁত রুচিবোধে, সৌন্দর্যপিপাসায়, প্রতিভার স্বীকৃতি দেখে।

পৃথিবীর চিত্রজগতে মুঘল মিনিয়েচরের সৃষ্টি তাঁদের জন্যই সম্ভব হয়েছে একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আকবর বাল্যকালে বাদশা হলেন। বাবর বা হুমায়ুন কেউই ভারতে জন্মান নি, আকবর জন্মান। আর ভারত থেকে বোখারা বা সমরকন্দ বহুদূর। ১৫৬৯ সালে ফতেপুর সিক্রি যখন গড়লেন সেই সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে এল এক নতুন যুগ। স্থপতি, ভাস্কর, রাজমিস্ত্রির পর ডাক পড়ল চিত্রশিল্পীর। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের দেয়ালে ছবি আঁকতে হবে। ছবি যা আঁকা হল তা হল ক্ষুদ্রকায় ছবিরই বৃহদাকার সংস্করণ, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ নেই ; যদিও প্রায় একই সময়ে বিকানীর, জয়পুর, উদয়পুরের প্রাসাদের দেয়ালে যে ছবি আঁকা হল সে ছবিতে অজন্তার রীতি আর প্রভাব অতি স্পষ্ট। ফতেপুর সিক্রিতে বেলে পাথরের উপর সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হত, তার উপরে দেওয়া হত রঙ। কতকগুলি ছবি হল একেবারে ঈরাণী রীতিতে আঁকা, কতকগুলি ভারতীয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বহু শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজের মত করে কাজ করে গেছেন। এইভাবে সম্রাটের দরবারে নানা ধর্মের নানা রীতিপথের চিত্রশিল্পীরা কাজ করতেন, যাদের সকলের উপরে অবশ্য ছিলেন মীর সয়ীদ আলি আর আবদুস সামাদ। আবদুস সামাদ কালে ফতেপুরের টঁ্যাকশালের কর্তা হন, এবং পরে মুলতানের দেওয়ান হ'ন। তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের দরবারে আমীর-উল-ওমরার পদ পান।

ফতেপুরের প্রাচীরচিত্র সম্বন্ধে ই-ডব্লিউ-স্মিথের একটি প্রামাণ্য বই আছে, তার নাম 'দা মুঘল আর্কিটেক্চার অভ ফতেপুর সিক্রি।' এই প্রাচীর চিত্রগুলির রীতি হচ্ছে সমান, চ্যাপটা, বা ফ্ল্যাট ; গভীরত্ব নেই, রঙ গাঢ় ফিকে করা নেই। একটি ছবি আছে, তাকে স্থানীয় প্রদর্শকরা বলেন, 'দি অনান্‌সিয়েশন' (মেরির গর্ভে যীশু জন্ম নেবেন, এক দেবদূত কর্তৃক তার ঘোষণা)। চীনে ড্রাগন আকারের মেঘ স্পষ্টত পারসীক উত্তরাধিকার, বুঝতে দেরি হয়না। তুর্কী সুলতানার বাড়ীর দেয়ালে অনেকগুলি বেস-রিলিফের প্যানেল আছে, তাতে ফুলফোটা গাছ আর জন্তু জানোয়ারের খোদাই যেমন সজীব তেমনি বাস্তবধর্মী ; স্পষ্টই বোঝা যায় যে চিত্রশিল্প আর ভাস্কর্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তবুও একথা বলতেই হয় যে ফতেপুর সিক্রির প্রাচীর চিত্রের সঙ্গে বিকানীর উদয়পুরের বা অজন্তার প্রাচীর চিত্রের জাতিগত কোন সম্বন্ধ নেই। বরং সেগুলি মুঘল মিনিয়েচরেরই অতিকায় সংস্করণ।

ভারতীয় অন্যান্য চিত্ররীতির সঙ্গে মুঘল ক্ষুদ্রকায় চিত্ররীতির একটি বিশেষ পার্থক্য আছে, যার ফলে মুঘল ছবির যে বিদেশে জন্ম তা বেশ বোঝা যায়। এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছবির সীমারেখায় চিত্র-প্রায় হস্তলিপির প্রসাদগুণ, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্যালিগ্রাফির গুণ। একদিকে পারস্যে, অন্যদিকে চীনে, যেহেতু এক একটি অক্ষর ছিল এক একটি ছবি, সেহেতু অক্ষর আঁকতে হত তুলি দিয়ে

(আমাদের দেশে উল্টো : ছবি আঁকা হত কলম দিয়ে, ফলে ছবির নাম ছিল আলেখ্য, যার জন্তে আমাদের দেশে সর্বত্র চিত্রে প্রথম থেকেই এল রেখার প্রাধান্ত)। তাই চীনে আর পারস্তে তুলি দিয়ে অক্ষর আঁকার দরুণ চিত্রশিল্পীর আঁকার রীতিনীতি, হাতে তুলি ধরার নিয়ম, প্রথম থেকেই ভারতের থেকে ছিল তফাৎ। পারস্তের এই বৈশিষ্ট্য ঈরাণী কলমের মধ্যে দিয়ে মুঘল চিত্রে এল, ফলে মুঘল মিনিয়েচর বরাবরই প্রথম থেকে অন্যান্ত ধরনের ভারতীয় চিত্র থেকে হল তফাৎ। পারস্তে, চীনে, ভারতে পুঁথি লেখকদের খুব সমাদর ছিল। তারা পুঁথি লিখে তারিখ দিয়ে সই করতেন, বিখ্যাত লেখকদের পুঁথি বড়লোকরা সযত্নে সংগ্রহ করতেন। আবুল ফজল আকবরের দরবারের পুঁথি লেখকদের এক তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন কাশ্মীরের মহম্মদ হুসেন, তিনি আকবর মারা যাবার পরও ছ' বছর বেঁচে ছিলেন। অনেক পুঁথি আছে যাদের ভিতরকার ছবির চেয়ে হস্তলিপিরই আদর বেশী। নানা ধাঁচের নানা চালের চোখ জুড়োন হস্তলিপি হত। আবুল ফজল আট রকম হস্তলিপি রীতির উল্লেখ করেছেন, যা নাকি ষোল শতকে ঈরাণে (পারস্যে), তুরাণে (তুর্কীস্থানে), ভারতে, তুর্কীতে চালু ছিল। অক্ষরের সোজা আর গোল রেখার হারাহারের নানা রকমফেরের উপর এই রীতিগুলির পার্থক্য নির্ভর করত। যেমন একদিকে ছিল কুফিক, যার নাকি ছ'টির মধ্যে পাঁচটি রেখাই তীর্যক, খোঁচা খোঁচা, সোজা। অন্য দিকে ছিল নাস্টালিক, যার সব হরফই হত গোল গোল। নাস্টালিক ছিল আকবর বাদশার প্রিয় হরফ। কুফিক যেমন মধ্য এশিয়ার রুক্ষতার সঙ্গে মেলে, নাস্টালিক তেমনি আবার ভারতের সজল গাছপালার গোলগাল ভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। নানা কারণে মুঘল মিনিয়েচরে ক্যালিগ্রাফির গুণ প্রধানভাবে এসে পড়ে, বিশেষত এই সব ছবির পাড়ের কাজে। আবুল ফজল বুঝে সুঝেই তাঁর আইন-ই-আকবরীর ৩৪ অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন 'হস্তলিপি ও চিত্রশিল্প', যেখানে তিনি প্রথম যুগের ভারত পারসীক ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে আট রকম ক্যালিগ্রাফির রীতিরও অবতারণা করেন।

যে ভারত সম্রাট মুসলমান হয়েও অল্প বয়সে মোল্লাদের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে সর্বধর্মসমন্বয় করে দীন ইলাহির প্রবর্তন করেন, তিনি যে তাঁর একান্ত শিক্ষিত ও উদার মন নিয়ে দেশে চারুশিল্পের উৎস খুলে দেবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।, আকবর এক অভূতপূর্ব কাজ করলেন। মীর সয়ীদ আলি ও আবদুস সামাদ আগে থেকেই ছিলেন, তা সত্বেও এলেন ফররুখ কলমাক, আবদুল সামাদ শিরাজী, আরও অনেকে। তারপর তিনি জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে কাজ দিলেন হিন্দুদের ; যাঁদের

মধ্যে এলেন বসাওঅন, দশ্বন্ত্, কেশুদাস। এঁদের দিলেন সমান সম্মান, ফরমায়েস দিলেন কবি নিজামীর কাব্যের ছবি আঁকতে। মুসলমান ও হিন্দু রীতি পরস্পর হাত মেলানর ফলেই সৃষ্টি হল নতুন মুঘল চিত্রনীতি; যার জন্যে আকবরের প্রতিভা, ঔদার্য, দূরদর্শিতা মুখ্যত দায়ী। আবদুস সামাদ আর তাঁর মুসলমান সহকর্মীদের কাজ হিন্দু শিল্পীরা এত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে ফেললেন, এবং তারপর নানা জাতের অসংখ্য হিন্দু শিল্পী তাকে এমন রূপায়িত করলেন, যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেশে মহা মহা হিন্দু শিল্পী অনেক ছিলেন, যাঁরা কোন নতুন জিনিষ দেখামাত্র আয়ত্ত করতে পারতেন। যতই হোক, আকবর বাদশা বড় জোর হিন্দুদের জড়ো করতে পারতেন, কিন্তু গাধা পিটিয়ে ত ঘোড়া করতে পারতেন না। মুসলমান ও হিন্দু শিল্পীদের কি রকম সমান আদর ছিল, তা আবুল ফজলের ৩৪নং আইন থেকে এই অনুবাদটুকু পড়লেই বোঝা যাবে। আবুল ফজল লিখছেন: "যাঁরা খ্যাতির রাজপথে পথপ্রদর্শক হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম করতে পারি।

"১। তাব্রিজের মীর সয়ীদ আলি। তাঁর বাবার কাছে কাজ শিখেছিলেন। রাজদরবারে যেদিন ভর্তি হয়েছেন সেইদিন থেকেই সম্রাটের কৃপারশ্মি তাঁর উপর পড়েছে। নিজের শিল্পে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন, বহু সাফল্যলাভ করেছেন।

"২। খাজা আবদুস সামাদ, লোকে বলে শিরীন কলম, অর্থাৎ মধুর কলম। শিরাজে দেশ। যদিও দরবারে অভিজাত পদ পাবার আগেই তিনি তাঁর শিল্প ভালমত শিখেছিলেন, তবুও তিনি শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় উঠলেন সম্রাটেরই এক ঝলক নজরের বিস্ময়কর ফলে, যার দরুণ আগে যা ছিল শুধু রূপ তা হয়ে গেল শুদ্ধ আত্মা। খাজার কাছে শিক্ষা পেয়ে তাঁর শিষ্যরা এক একজন দিকপাল হয়ে গেছেন।

"৩। দশ্বন্ত্ (দুষ্যন্ত) পাল্‌কি বেহারার (কাহার) ছেলে। সমস্ত জীবন শিল্পের সেবায় নিয়োগ করেছেন, নিজের পেশা এত ভালবাসতেন যে দেয়ালে শুদ্ধ ছবি আঁকতেন, রঙ করতেন। একদিন সম্রাটের চোখ তাঁর উপর পড়ল; তাঁর প্রতিভা ধরা পড়ল, তাঁকে খাজার হাতে তুলে দেওয়া হল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সব চিত্রশিল্পীকে অতিক্রম করে গেলেন, এবং তাঁর কালে তিনি অদ্বিতীয় হলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রতিভার আলো মস্তিষ্কবিকৃতির ছায়ায় ম্লান হয়ে গেল; তিনি আত্মহত্যা করেন। অনেক সেরা সেরা কাজ রেখে গেছেন।

"৪। বসাওঅন। পটভূমি আঁকায়, অবয়ব-আঁকায়, রঙের সংস্থানে, পোর্ট্রেটে, এবং আরও কয়েকটি শাখায় তিনি অপরাজেয়, ফলে অনেক সমালোচক তাঁকে দশ্বন্তের উপরে স্থান দেন।"

আবুল ফজলের এই আইনটির (৩৪ নং) চিত্রনীতির অংশটি এত ছোট অথচ এত মূল্যবান যে সবটুকু অনুবাদ করে না দিলে অন্যায় হবে: "কোন জিনিষের প্রতিকৃতি আঁকাকে বলে তসবীর। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই সম্রাট এই শিল্পের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন, যথাসম্ভব উৎসাহ

দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে এই শিল্প শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন, দুইয়েরই উপায়। ফলে চিত্রশিল্প খুব সমাদৃত আর বহু চিত্রশিল্পী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। দারোগা আর কেরানীরা প্রত্যেক সপ্তাহে সমস্ত শিল্পীর কাজ সম্রাটের সম্মুখে নিয়মিতভাবে মেলে ধরে : তখন তিনি কাজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী হয় পুরস্কার দেন, না হয় মাসিক বেতন বাড়িয়ে দেন। শিল্পীদের যেসব দ্রব্য প্রয়োজন তার আহরণের যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা ছিল ; এবং সেগুলি যাতে ঠিক দামে পাওয়া যায় তার দিকে নজর রাখা হত। বিশেষ করে উন্নতি হয়েছে রঙের মিশ্রণের। ফলে ছবিগুলির অভূতপূর্ব জৌলুষ খোলে। অতি উৎকৃষ্ট ছবি এখন পাওয়া যায়, এবং সেরা সেরা ছবি, যা এমন কি বিহজাদের যোগ্য, তা অনায়াসে জগদ্বিখ্যাত ইওরোপীয় শিল্পীদের আশ্চর্য কাজের পাশে রাখা চলে। খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, শেষ করার পারিপাট্য, সার্থক নির্মাণের নিঃসঙ্কোচ স্পর্দ্ধা ইত্যাদি গুণ অধুনা ছবিতে যে রকম দেখা যায় তার তুলনা নেই। এমন কি প্রাণহীন বস্তুকেও দেখে মনে হয় যেন সজীব। চিত্রশিল্পে একশ'র বেশী শিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতি লাভ করেছেন, আর যাঁরা সে পথে এগোচ্ছেন অথবা মাঝামাঝি স্থানে আছেন, তাঁদের সংখ্যা অনেক। এটা খাটে বিশেষ করে হিন্দুদের সম্পর্কে ; তাদের ছবি আমাদের বস্তুবিষয় সম্বন্ধে ধারণাকেও অতিক্রম করে যায়। সারা পৃথিবীতে এমন খুব কমই আছেন যাঁরা এঁদের সমকক্ষ।"

এরপর আসে চারজন শিল্পী সম্বন্ধে অংশটি, যা আগেই অনুবাদ করে দিয়েছি। তারপর :

"নিম্নলিখিত চিত্রশিল্পীরাও খ্যাতিলাভ করেছেন : কেশু, লাল, মুকুন্দ, মিশকিন, ফররুখ কলমাক, মধু, জগন, মহেশ, খেমকরণ, তারা, সাওলা, হরিবাস, রাম। এঁদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি মাঠ থেকে একটি ফুল তুলব, একটি ফসলের গোছা থেকে একটি শিষ তুলব।

"এটা বলা দরকার যে বস্তুর আকার নিরীক্ষণ করে তার প্রতিকৃতি আঁকা, অনেকের মতে নিরর্থক বা অলসের কাজ হলেও, সুপরিচালিত, সুশিক্ষিত মনের কাছে, প্রজ্ঞার উৎস, এবং অজ্ঞান-বিষের প্রতিষেধক। গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে যাঁরা শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ করেন, তাঁরা চিত্রশিল্পের বিরোধী ; কিন্তু তাঁদের চোখও এখন সত্যদর্শনে সমর্থ হয়েছে। একদিন বন্ধুদের একটি নিভৃত জলসায় সম্রাট কয়েকজনকে তাঁর নিকটে আসার আনন্দদান করে বললেন, অনেকে চিত্রশিল্পীদের ঘৃণা করেন, কিন্তু যাঁরা ঘৃণা করেন তাঁদের আমি পছন্দ করিনা। আমার মনে হয় ঈশ্বরকে চিনে বার করার এক অদ্ভুত উপায় চিত্রশিল্পীদের আছে, কারণ চিত্রশিল্পী যখন কোন প্রাণী আঁকতে বসেন, বসে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অবয়ব, একের পর এক এঁকে, সব সত্বেও তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা দূরে থাক, তার একান্ত একক বৈশিষ্ট্যটি দিতেও অসমর্থ হন, তখন তাঁর মন নিশ্চয়ই ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হয়, যে ঈশ্বর প্রাণ দেন। ফলে তাঁর প্রজ্ঞা বাড়ে।

"চিত্রশিল্প উৎসাহ প্রেরণা পাবার ফলে, শ্রেষ্ঠ চিত্রের সংখ্যাও গেল বেড়ে।' পারসীক গদ্য ও পদ্যের বই চিত্র দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়, এবং এইভাবে বহু সংখ্যক চিত্র তৈরি হয়।' হামজানামা বারো খণ্ডে প্রস্তুত হয়, নিপুণ শিল্পীরা আখ্যানটির বিভিন্ন অংশ অবলম্বন করে আশ্চর্য আশ্চর্য ছবি এঁকে দেন, তাদের সংখ্যা চোদ্দশ'র কম নয়। চিঙ্গিজনামা, জাফরনামা (এই বইটি শরফউদ্দিন-ই-ইয়াজদের প্রণীত তৈমুরবংশের ইতিহাস), রজ্‌মনামা, রামায়ণ, নলদমন (নলদময়ন্তী) কলীলা দম্‌না (কালীয় দমন?) অয়ার দানিশ ইত্যাদি সবেরই ছবি আঁকা হয়। সম্রাট স্বয়ং তাঁর প্রতিকৃতির জন্যে বসেন, এবং তাঁর রাজ্যের সকল সম্ভ্রান্ত লোকের যাতে প্রতিকৃতি আঁকা হয় তার হুকুম দেন।৹ এইভাবে এক প্রকাণ্ড অ্যালবামের সৃষ্টি হল: যাঁরা এখন আর জীবিত নেই তাঁরা নতুন জীবন পেলেন, যাঁরা এখনও জীবিত তাঁরা অমরত্বের প্রতিশ্রুতি পেলেন।

"চিত্রশিল্পীরা পরিপালিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারশিল্পীরা, মিনে ও সোনার জল করা কারিকররা, রেখা আঁকিয়েরা, দপ্তরী, কাগজিরাও উপার্জনের পথ পেলেন।

"এই বিভাগে বহু মনসবদার, আহাদী এবং অন্যান্য সৈন্যরা কাজে বহাল আছেন। পদাতিক সৈন্যের মাহিনা ৬০০ থেকে ১২০০ দাম পর্যন্ত হয়।"

এইভাবে আগ্রা, দিল্লী ও অন্যান্য জায়গায় সম্রাটের হুকুমে গ্রন্থাগার তৈরি হয়। তাতে এশিয়ার সাহিত্যের যা কিছু উৎকৃষ্ট সবই, আসল ভাষায় ও পারসী অনুবাদে রক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি বইয়ের মহামূল্য বাঁধাই হয়, খরচের পরোয়া না করে তাদের ক্ষুদ্রকায় ছবি দিয়ে চিত্রিত করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় রজমনামার। এটি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ফারসী অনুবাদ, ১৫৮৮ সালের তারিখ দেওয়া মুখপত্র আছে। এখন এটি জয়পুরে। তৈরি করতে লেগেছিল প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। ওয়াশিংটনে কর্নেল হান্নার কাছে যে রামায়ণটি আছে সেটি তৈরি করতে খরচ পড়েছিল কমপক্ষে বিশ হাজার পাউণ্ড। আকবর নামাও ঐ ধরনের মূল্যবান ছিল। এর থেকে ১১৭টি বড় বড় চিত্র এখন ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে আছে। ১৬৪১ সালে স্প্যানিশ পাদ্রী সিব্যাস্টিয়ান মান্‌রিক আগ্রায় ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে তখন আগ্রায় সম্রাটের গ্রন্থাগারে ২৪,০০০ বই ছিল, এদের মোট মূল্য শুনলে মাথা ঘুরে উঠবে: ৬৪, ৬৩, ৭৩১ টাকা অথবা ৭,২০,০০০ পাউণ্ড। তার মানে গড়ে একেকটি বইয়ের দাম পড়ল তখনকার টাকায় ৩৭০ টাকা, তখনকার তুল্য মূল্যে ৩০ পাউণ্ড। একেই বলে রাজকীয় বিদ্যোৎসাহিতা।

আকবর যেসব গ্রন্থাগার করে গেলেন, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব সেগুলির তত্ত্বাবধান করে বাড়িয়ে গেলেন। এমন কি তাঁদের বংশধররাও সেগুলির খুব যত্ন নেন। কিন্তু আঠারো আর উনিশ শতকের যুদ্ধ বিগ্রহে সেগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এখন টুকরো টুকরো ভাবে পৃথিবীর যত্র তত্র ছড়িয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু যেখানে পাওয়া যায় সেটুকু ভারত-পারসীক ক্যালিগ্রাফি আর মিনিয়েচর

চিত্রের মহান ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে অনেকগুলি চিত্রের এতদিন পর্যন্ত টিকে থাকার ইতিহাসও অদ্ভুত।

'আকবরের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল চিত্রকলা পরিণতির শীর্ষে নিয়ে যান।' জাহাঙ্গীরের রক্তে বাবরের রুচি আর শালীনতা বিশেষ ভাবে ফুটে উঠল। নিজের দরবারের চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে তাঁর নির্মল গর্ব ও অহঙ্কার উপভোগ করার মত। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায় তিনি তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের কাজ সম্বন্ধে কত উৎসাহ নিতেন, খবর রাখতেন, তাঁদের কত স্নেহ করতেন। তাঁর দরবারে ইওরোপীয়রা আসতে সুরু করলেন ; সম্রাটের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে উৎসাহের কথা তাঁদের অনেকেই লিখে গেছেন। 'দরবারের শিল্পীদের অনেকের প্রতিই তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন।' আবদুস সামাদের ছেলে শরীফ খাঁকে তিনি প্রথমে, যুবরাজ থাকতেই, খাঁ উপাধি দেন, পরে আমীর-উল-ওমরা করেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে তিনি আত্মজীবনীতে লিখলেন :

"আজ আমাদের চিত্রশিল্পী আবুল হাসান, যাঁর উপাধি নাদিরুজ্জমান, আমার দরবারের একটি ছবি আমাকে উপহার দিলেন। তিনি এটিকে জাহাঙ্গীর-নামার মুখচিত্র হিসাবে লাগিয়ে এনে দিলেন। চিত্রটি সত্যই প্রশংসার যোগ্য বলে আমি তাঁকে উপঢৌকনে ভূষিত করলুম। আজ যদি আবদুল হাই আর বিহজাদ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁরাও তাঁর চিত্ররুচির জন্য হাসানকে যথার্থ সম্মান দিতেন।

"ওঁর বাবা, আকা রাজা, আমার যুবরাজ দশায় আমার সঙ্গে সর্বদা থাকতেন, আর উনি (হাসান) আমার গৃহে জন্মান। তবে ছেলে বাপের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করি, ফলে এখনকার কালে তাঁর মত গুণবান বিশিষ্ট লোক বিরল। তাঁর আঁকা পোর্ট্রেট অতি সুন্দর।

"মনসুরও নক্সা বিদ্যায় ওস্তাদ। তাঁর উপাধি দিয়েছি, নাদিরুল-আস্‌লি। আমার সময়ে ত বটেই, আমার বাবার কালেও এই দুজন শিল্পীর সমকক্ষ কেউ ছিল না।"

আবুল ফজলের তালিকায় কিন্তু আবুল হাসান বা মনসুর দুজনের একজনেরও নাম নেই। বোধহয় আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতায় মনসুরের হাতের দুটি খুব ভাল চিত্র আছে।

'জাহাঙ্গীর নিজেকে খুব চিত্ররসিক মনে করতেন, ন্যায্য কারণও ছিল। একই ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশ আঁকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী ফরমায়েস পেতেন ; তার বেশ মজার উল্লেখ তাঁর আত্মজীবনীতে পাই :

"আমি খুব ছবির ভক্ত, এবং সমস্ত শিল্পীর কাজ এত ভাল চিনি যে জীবিত বা মৃত যে কোন শিল্পীর কাজ দেখেই বলে দিতে পারি। যদি একই ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের পোর্ট্রেট ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে আঁকা হয়ে থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের নাম বলে দিতে পারি। এমন কি যদি একটি পোর্ট্রেটের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন লোকে এঁকে থাকে, তাও প্রত্যেকের নাম বলে দিতে

পারি।, বস্তুত, আমি বলে দিতে পারি কে কপাল এঁকেছেন, কে চোখের পক্ষ্ম এঁকেছেন, কিংবা ছবিটি তৈরি হবার পর কে সেটিকে ঠিক ঠাক (ইংরেজিতে টাচ আপ) করে দিয়েছেন।"

যদি কারও একে বৃথা দম্ভোক্তি বলে মনে হয় তিনি শুধু মনে রাখবেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শীল মোহর যে সব ছবিতে আছে সে সব ছবি আজও মুঘল ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়।

প্রথম যুগের মুঘল ছবিতে প্রকৃতির বিশদ অনুশীলন তেমন ছিলনা। একবার গোয়া থেকে জাহাঙ্গীর কতকগুলি দুর্লভ জীবজন্তু উপঢৌকন পেলেন। তিনি সেগুলির ছবির হুকুম দিলেন। আত্মজীবনীতে লিখলেন : "সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে কিছু জীবজন্তুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যা পড়লে তাদের রূপ চোখের সমুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি কোন চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তাদের জীবন্ত অবস্থার ছবি আঁকাননি।"

"প্রকৃতির সৃষ্টি দেখে তাকে যথাযথ ভাবে আঁকার উপর জাহাঙ্গীর বিশেষ ভাবে জোর দেন।" তাঁর সময়ের নক্সা বা ছবির নতুন পথ হল এই দিকে। তবুও এটা মনে রাখতে হবে যে 'যথাযথ' আঁকা ইওরোপীয় রীতির চোখে দেখা বা যা দেখছি তাই ফুটিয়ে তুলছি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'ভেরিসিমিলিটিউড', তা কখনও হল না। ইংরেজিতে যাকে বলে রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ পুনঃপ্রকাশ তাই হল। কিন্তু ইওরোপীয় ছবির মূল হল মড্‌লিং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব ; মুঘল ছবিতে, তথা ভারতীয় ছবিতে, গভীরত্বের উপর দৃষ্টি রইল না, রইল দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপর, অর্থাৎ প্রোফিলের উপর, যার ফলে ছবি হত ফ্ল্যাট, চ্যাপটা। কেন যে গভীরত্বর উপর ঝোঁক ছিল না তার একটা কারণ আগেই একটু বলেছি, সে হচ্ছে আমাদের দেশের সূর্যের আলো, যা নিজের তীব্র প্রখরতায় সব গভীরত্ব গলিয়ে এক সমান স্তরে সব কিছু আনতে চায়। সেইজন্যে এক হিসাবে ভারতীয় ছবি ইমপ্রেশনিষ্ট ছবি বলা যায়, অর্থাৎ শিল্পী কদাচিৎ বিষয়কে সমুখে মড্‌ল্ হিসাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে আঁকতেন। রীতি ছিল খুব ভাল করে বিষয়কে নিরীক্ষণ করার পর চলে গিয়ে, চিত্রে চোখের ছাপটি ফুটিয়ে তোলা, অর্থাৎ চোখে যে ছবি রয়ে গেল, সেটি চিত্রে এঁকে দেয়া।

বাবরের আত্মজীবনী পড়লেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, ইংরেজিতে যাকে বলে ন্যাচরলিস্ট, অর্থাৎ প্রকৃতির যাবতীয় সৃষ্টি, ফুল, ফল, গাছ, লতা, পাতা, কীট, পাখী, প্রাণী সম্বন্ধে তাঁর ছিল উৎসাহ, তাদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সন্ধান নিয়ে লিখে রাখতেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতের উপর অনেক ছবি আঁকা হল। উপরন্তু পোর্ট্রেট ত ছিলই। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের উৎসাহ ও চর্চার দৃষ্টান্ত মেলে সম্রাট যে সব শীকারের চিত্র আঁকার হুকুম দিতেন তার মধ্যে। যে সব ফুল খুব কম দেখতে পাওয়া যায়, বা যে সব প্রাণী বহু কষ্ট করে দূর দেশ থেকে ধরে আনতে হয়, জাহাঙ্গীর বিশেষ করে ফরমায়েস দিয়ে ভাল ভাল শিল্পী দিয়ে তাদের ছবি করিয়ে রাখতেন, সে সব ছবির অনেকগুলি আছে। একটি আস্ত ছবির বই ই গড়ে উঠল শুধু এই

ধরনের অসাধারণ পশু পক্ষীর ছবিতে। দেখলেই বোঝা যায় জাহাঙ্গীরের প্রকৃতি বিজ্ঞানী মনকে খুশী করার জন্য শিল্পীরা কত চেষ্টা করতেন। এদের মধ্যে বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে একটি টার্কি মোরগের। এর রঙ আর সতেজ নক্সা, নিখুঁত যথাযথ্য দেখলে শিল্পীর বাহাদুরি ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে উপায় থাকেনা। এটি বোধহয় শিল্পী মনসুরের হাতের কাজ; ছবিতে জাহাঙ্গীরের শীলমোহর আছে। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর রোজনামচায় ছবিটির বিষয়ে লিখেছেন। তুকিয়ৎ-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে খানিকটা অনুবাদ করার লোভ সংবরণ করা শক্ত। জাহাঙ্গীর তখন সাত বছর হল সিংহাসনে এসেছেন। গোয়াতে মকরব খাঁকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেকে সম্রাটের জন্য কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রাণী নিয়ে এলেন। জাহাঙ্গীর মহা খুসী, লিখছেন :

"ওদের মধ্যে কয়েকটি প্রাণী আমি আগে কখনও দেখিনি, খুব কৌতূহল হল। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে কিছু জীবজন্তুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যা পড়লে তাদের রূপ চোখের সমুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি কোন চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তাদের জীবন্ত অবস্থার ছবি আঁকান নি।
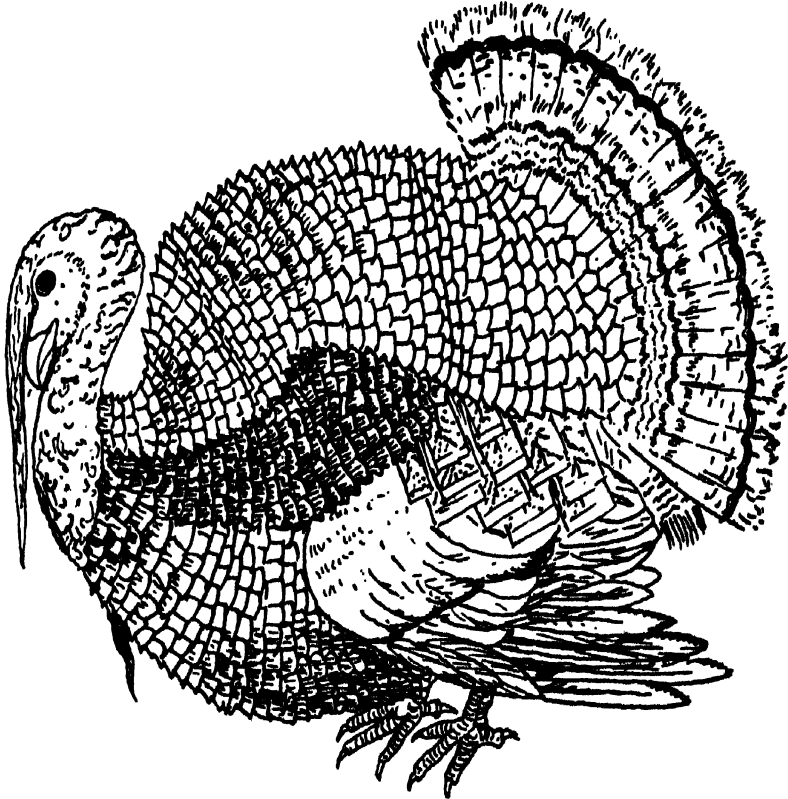
কিন্তু আমার সমুখে যে সমস্ত প্রাণী উপনীত হল তারা এত সুন্দর আর এত দুষ্প্রাপ্য, যে আমি তাদের বর্ণনা লিখে ফেললুম আর জাহাঙ্গীরনামার জন্যে তাদের ছবি আঁকার হুকুম দিলুম, যাতে বর্ণনা পড়ে পাঠকের যত না বিস্ময় হবে, ছবি দেখে তার চেয়ে বেশী হবে।

"ওদের মধ্যে একটি দেখতে কতকটা ময়ুরীর মত, তবে ময়ুরীর চেয়ে একটু বড়, আবার ময়ুরের চেয়ে ছোট। যখন তার সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলতে ইচ্ছা হয়, লেজ, পালক মেলে ধরে, ময়ুরের মত নেচে নেচে বেড়ায়। ঠোঁট আর ঠ্যাং সাধারণ পোষা মুরগীর মত। কিন্তু মাথা, ঘাড়, গলার রঙ মিনিটে মিনিটে বদলায় ; কিন্তু সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন মিলনের ইচ্ছা হয় তখন সবটা চমৎকার লাল হয়ে যায়, মনে হয় যেন সমস্তটাই একটুকরো সুন্দর প্রবাল। আবার কিছুক্ষণ পরে তুলোর মত সাদা হয়ে যায়, আবার কখনও টার্‌কোয়ার মত নীল। এককথায় বলতে গেলে বহুরূপীর মত রঙ বদলায়। মাথায় একটুকরো মাংস ঠিক মোরগের ঝুঁটির মত দেখায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে মিলনের সময়ে মাংসর টুকরোটি হাতীর শুঁড়ের মত এক বিঘত ঝুলঝুল করে, আবার কিছু পরে ছোট হয়ে মাথার উপর দু আঙ্গুল সোজা খাড়া হয়ে থাকে। চোখের চতুর্দিকের রঙ সর্বদা নীল, কখনও সে রঙ বদলায় না। কিন্তু গায়ের পালকের বেলায় উল্টো, সব সময়েই রঙ বদলাচ্ছে ; এ বিষয়ে ময়ুরের থেকে তফাৎ।"

এটি টার্কি মোরগের বর্ণনা, কিন্তু, মজার কথা হচ্ছে, তুর্কী ভাষায় একে বলে 'হিন্দ তৌগী'।

আরেকটি ছবি কলকাতার মিউজিয়মে আছে। এটিও বোধহয় মনসুরের ; ভারী সযত্নে, পেলব তুলিতে আঁকা। প্রাণীটি হচ্ছে বাংলা ফ্লোরিক্যান, মালদহ জেলায় এখনও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ১৯৪৮ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আমি একটি দেখি। ছবিটি এত মিহি কাজ যে ছাপা শক্ত। ছবিটির উপরে জাহাঙ্গীরের নিজের হাতে পারসীতে একটু লেখা আছে : "এটি জুর্‌জ্-ই-বুর বলে একটি পাখীর ছবি, তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ওস্তাদ মনসুরের আঁকা। লিখিত জাহাঙ্গীর আকবর শাহ, ১৯ সন (অর্থাৎ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ)"।

তৃতীয় ছবি হচ্ছে একটি সারসের। পাখীর ছবি হিসাবে এর স্থান শ্রেষ্ঠ জাপানী ছবির পাশে। সাদা পালকে সুচারু সূক্ষ্ম পেলব তুলির কাজ, পাখীটির শরীর সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান ; অসীম ধৈর্য ও বিজ্ঞানী মন নিয়ে আঁকা ; অথচ ছবিটি চিত্র হিসাবে অসামান্য রুচি ও বিচারের পরিচয় দেয় ; অত খুঁটিনাটি সত্বেও চোখ ক্লান্ত হয়না, সমস্তটি একটি চিত্রের ঐক্যে বাঁধা পড়ে আছে। আরেকটি ছবি আছে একটি ভেড়ার। ফুল, লতা পাতার অ্যালবামটিও সমান সুন্দর, বিচিত্র, বিস্ময়কর।

• মূল ছবির চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে ছবির ফ্রেম আর ছবির পাড়, যার অসামান্য সৌন্দর্য, রুচি আর বৈদগ্ধ্য দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ফুললতাপাতামণ্ডিত চওড়া পাড় মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবির রেওয়াজ বললেও হয়, কিন্তু জাহাঙ্গীরের দরবারেই এর চূড়ান্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। বড় আকারে পাড়ের কাজের নমুনা তাজমহলে এবং অন্যত্র দেখা যায়, সাদা মার্বলের মধ্যে রঙীন পাথর বসান নক্সায়। বস্তুত ছবির পাড়ের কাজ আর তাজে বা ইতিমাদদৌলায় দরজা বা খিলানের চারদিকে রঙীন পাথরের নক্সার কাজের জাত একই। কিন্তু ছবিতে কাজ স্বভাবতই আরও মোলায়েম, আরও নিখুঁত, আশ্চর্য। ফুলের গুচ্ছশুদ্ধ লতা ঘুরে ঘুরে গেছে বরফির আকারে, তাতে ছিট ছিট রঙের এক অদ্ভুত নরম সুন্দর

নক্সার সৃষ্টি হয়; উপরন্তু রঙগুলি এমন যত্নে বাছা যাতে মূল ছবির রঙের সঙ্গে নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকে। মাঝে মাঝে এসেছে প্রজাপতি, পাখী। ফল হয়েছে আশ্চর্য; একেবারে বিশুদ্ধ চিত্রকলার উৎকর্ষ, যেমন তার জমক তেমনি জৌলুষ।

জাহাঙ্গীরের দরবারে আঁকা ফুলের পাড়ওলা মিনিয়েচর ছবি বোধ হয় নিছক চিত্রত্বে আশ্চর্য। এই সব পাড়ে যে সব লতা বা ফুল ফল আঁকা হত তা সবই সাধারণ, যা সচরাচর পাহাড়ে বা সমতলে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন পপি, বুনো ষ্ট্রবেরি, জংকুইল, লিলি, আইরিস, মার্গরীট, কিন্তু সে সব প্রায়ই এমনভাবে চিত্রের মামুলি ছকে ফেলে আঁকা (ইংরেজি যাকে বলে কন্‌ভেন্‌শনালাইজ করা) যে চেনা শক্ত।

শীকারের চিত্রও অনেক। বিষয়টি মুঘল শিল্পীর বিশেষ প্রিয়। স্পষ্টই বোঝা যায় সম্রাটের আদেশে আঁকা, যাতে শীকার খেলায় সম্রাটের শক্তিমত্তার নিদর্শন থাকে। শীকারে যে সব মুহূর্ত সবচেয়ে রোমহর্ষক, জাহাঙ্গীর কখনও সে সব মুহূর্তের চিত্র রাখার লোভ সামলাতে পারতেন না। সে কালে কেশরহীন সিংহের শীকার প্রায়ই হত। সিংহ শীকারের উপর একাধিক ছবি আছে। তার মধ্যে একটি অপূর্ব। সম্রাট খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন। কেমন করে যে রক্ষা পেলেন বলা শক্ত, কারণ ছবিতে দেখা যায়, হাতী ভয়ে পাগল হয়ে গেছে, আর তার পিঠে সিংহ চড়ে উঠে ঝুলছে, সম্রাট খালি বন্দুকটি প্রাণপণে বাড়িয়ে দিয়ে তাকে কোনও রকমে হাওদা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। অবশ্য সম্রাট প্রাণে বেঁচে যাবেন বোঝা যায়, কারণ ওদিক থেকে ততক্ষণে এক অশ্বারোহী রক্ষী বল্লম নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু এদিকে সম্রাটের আপন দেহরক্ষী 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' স্মরণ রেখে সম্রাটকে সিংহের মুখে ফেলে হীন কাপুরুষের মত হাওদা থেকে লাফ দিয়ে পালাচ্ছে। বিপদের মধ্যেও ছবিতে এমন বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে যে স্পষ্টই মনে হয় ঘটনাটি ঘটেছিল। এই সমস্ত শীকারের চিত্রে সর্বত্রই ল্যাণ্ডস্কেপ খুব আবেগ দিয়ে আঁকা। দূরের পাহাড়, আর কাছের যে ঝোপে শীকার লুকিয়ে আছে, সবই একান্ত অনুশীলন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দেয়। তুলনা পাওয়া ভার। আকাশের গায়ে সাঁটা তালগাছই বলুন, আর বেগ্‌নে-লাল রঙের মোচা ঝোলা, বড় বড় শাঁসে জলে পাতাওলা কলা-

গাছই বলুন, সোনালি চিনার, অশ্বত্থই বলুন, আর আমের কচি কচি লাল লাল পাতা শুদ্ধ ডালই বলুন ; এই সব অসংখ্য লতা, পাতা, ফুল, ফল, গাছ পাতাড়ির প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা করে মুঘল ছবিতে চেনা যায়।

একটি ছবির কথা না বলে পারছি না। তিনটি হাতীর ছবি, তার মধ্যে একটি ক্ষেপে গিয়েছে। ছবিটিতে লেখা : "ইক্‌বাল নামে হাতীর পিঠে শাহজাহানের ছেলে রাজপুত্র মহম্মদ মুরাদ, ১০৩০ হিজরীতে গোলাম কর্তৃক আঁকা (খৃষ্টীয় ১৬২১)।" ছবিটির মুখ্য চরিত্র হচ্ছে বড় হাতীটি, হঠাৎ ক্ষেপে গেছে, মাহুৎকে ফেলে তার অঙ্কুশটি শুঁড়ে জড়িয়ে, জোরে ডাক ছাড়ছে। রাজপুত্র পিছন থেকে তার পিঠে চড়ে উঠেছেন মাহুতের বদলে, নীচে হয় মাহুতই, না হয় ঐ রকম কেউ হাতীর পা শিকল দিয়ে বাঁধছে। বড় হাতীটির উত্তেজনা অস্থিরতা যেমন আশ্চর্য ফুটে উঠেছে, তেমনি ভাল হয়েছে নক্সার তেজ আর রীতি, আর তেমনি নিখুঁত হয়েছে পিছনের বটগাছটি আর তিনটি হাতীর নক্সা। চিত্রকলায় জাহাঙ্গীরের আসক্তি সম্বন্ধে বাদশার দরবারে ইংলণ্ডের দূত স্যার টমাস রো'র আত্মজীবনীতে কিছু মজার ঘটনার উল্লেখ আছে। ছবি সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের আগ্রহের কথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা জানতেন। ইতিপূর্বে তাঁরা জেম্‌স্ ও তাঁর রাণী, কোম্পানীর গভর্ণর স্যার টমাস স্মিথের ছবি জাহাঙ্গীরকে পাঠিয়েছিলেন, জাহাঙ্গীর সেগুলি আগ্রহ করে রেখেছিলেন। সম্রাটের এইদিকে উৎসাহের খোঁজ পেয়ে স্যার টমাস রো, বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী আইজাক অলিভারের আঁকা তাঁর বন্ধুর একটি ক্ষুদ্রকায় ছবি বাদশাকে উপহার দেন। জাহাঙ্গীর ভারী খুসী হলেন, তবে রো'র সঙ্গে বাজি রাখলেন যে তাঁর শিল্পীরা এমন নকল করে দেবেন যে রো আসল নকল বুঝতে পারবেন না। দরবারের শিল্পীদের সম্বন্ধে রো'র অবজ্ঞা ছিল, সুতরাং তিনি উজির আসফ খাঁর সঙ্গে একটি ভাল ঘোড়া বাজি রাখলেন। রো তাঁর ডাইরিতে লিখলেন, যে আসফ খাঁ চুপি চুপি বাজি ফিরিয়ে নেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। হঠাৎ দরবারে রো'র ডাক পড়ল। ভিতরে ভিতরে সম্রাট তাঁর শিল্পীদের শক্তি যাচিয়ে নিয়েছেন। রো'কে জিগ্‌গেস করলেন, যদি রো বাজি হারেন, তবে শিল্পীকে কি দেবেন। অবজ্ঞার সুরে রো বললেন 'কারিকরের বকশিস—পঞ্চাশ টাকা'। জাহাঙ্গীর বললেন 'বড্ড কম', তাঁর শিল্পী যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

যখন পাঁচটি নকল আসলটির সঙ্গে এনে, পাশাপাশি একই টেবিলে পাতা হল, তখন রো ফাঁপরে পড়লেন। ডাইরিতে লিখলেন, "বাতি নিয়ে খুব নিবিষ্ট মনে দেখলুম, আসলটা বার করতে পারি কিনা। আরেকটু হলে নির্ঘাত হারতুম, কিন্তু বরাতক্রমে আসলটি চিনতে পারলুম। তবে খুব সন্ধানী চোখ ভিন্ন চেনা শক্ত, সাধারণ লোকে পারত না। এটা ঠিক যে প্রথমে দেখে আমি ধরতে পারি নি, তাতে সম্রাট আনন্দে আটখানা ; সে কি হাসি আর ঠাট্টা, ঠিক যেন আমাদের দেশের কোন লোক।"

জাহাঙ্গীর মহানন্দে রো'র কাছে আবদার ধরলেন, শিল্পীকে কি দেবে এখন বল! টাকা পয়সা চলল না, শেষে ঠিক হল যে রো একটি নকল রাখবেন, পরিবর্তে শিল্পী রো'র একটি বিলেতী "পুতুল" পাবেন। (রো নিজের দেশের পুতুল সঙ্গে এনেছিলেন)। শিল্পী মনোহরের আঁকা বাদশার একটি পোর্ট্রেট জাহাঙ্গীর রো'কে উপহার দেন। ছবিটি 'পারচাস পিল্‌গ্রিমেজ' বইটির ১৬২৫ সালের সংস্করণে একটি কাঠখোদাই করে ছাপা হয়। আসল ছবিটি লুপ্ত হয়েছে। মনোহরের কথা পরে একটু বল্‌ব।

'শাহজাহানের সময়ে (১৬২৭-৫৮) মুঘল চিত্রকলা যে পরিণতির চরমে ওঠে একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁর সময়ে দেশময় শাস্তি ছিল, দরবারেও জাঁকজমক ছিল সবচেয়ে বেশী। ফলে আগেকার শিল্পীরা যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহের ছবি আঁকতে ভালবাসতেন সেখানে শাহজাহানের দরবারের শিল্পীরা আঁকলেন দরবারের গৌরব আর জাঁকজমকের দৃশ্য। প্রথম দিকের রঙের উদ্ধত তীব্রতা ও উচ্ছ্বাস কমে গিয়ে এল সুকুমার মনোরম রীতি, চিত্র নির্মাণের কাজেও এল সমধিক কৃতিত্ব।' পোর্ট্রেটে আর জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে খুব কৌশলে 'তুলির সামান্য কয়েকটি সূক্ষ্ম পেলব টানে রঙের সামান্য গাঢ়-ফিকেতে চিত্রশিল্পী অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করলেন। হল কি একদিকে যেমন প্রাচ্যরীতিসুলভ রেখার বলিষ্ঠতা ও প্রাণবন্ততা বজায় রইল, অন্যদিকে 'রঙের টানের বাহাদুরিতে এল ওজন, ঘনত্ব, মড্‌লিং-এর গুণ, নিটোল পরিপূর্ণতার আভাস। অথচ রঙের ব্যবহার এমন সংযত হল যে কোথাও রেখাকে ব্যাহত করল না। শাহজাহানের রাজত্বকালে চিত্রের বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য এল, তেমনি শিল্পীর সংখ্যাও বেড়ে গেল। তার মধ্যে কয়েকজনের কাজ খুবই প্রশংসার যোগ্য : চিতরমন ওরফে কল্যাণদাস; অনুপছতর; রায় অনুপ (বোধ হয় একই ব্যক্তি), যুবরাজ দারা শিকোর দরবারের শিল্পী; মনোহর; মহম্মদ নাদির সমরকন্দী; মীর হাশিম; মহম্মদ ফকিরুল্লা খাঁ।

বৃটিশ মিউজিয়মে যতগুলি অমূল্য অ্যালবাম আছে তার মধ্যে একটি পুঁথির নম্বর হচ্ছে এ-ডি-ডি ১৮৮০১। বইটিতে একটি উৎসর্গ আছে, তার তারিখ হিজরী ১০৭২ (১৬৬১-২ খৃষ্টাব্দ), সুতরাং তৈরি হয় শাহজাহানের সময়ে। ১৭৭৭ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী স্যর জশুয়া রেনল্‌ড্‌স্ পুঁথিটি দেখে এই ছয়খানি ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন;

১। ২০ নং ছবি। শাহজাহানের একজন কর্মচারীর পেন্সিল স্কেচ। শিল্পীর নাম চিতরমন, অন্য নাম কল্যাণ দাস।

২। ২১ নং ছবি। আজম খাঁ কোকার পেন্সিল স্কেচ। শিল্পীর নাম মহম্মদ নাদির সমরকন্দী।

৩। ২৭ নং ছবি। আসফ খাঁয়ের পেন্সিল স্কেচ। শিল্পী অজ্ঞাত।

৪। ২৮ নং ছবি। শাহজাহান দরবার করছেন, চারিদিকে পাত্র মিত্র, অমাত্য, প্রত্যেকের নাম লেখা আছে। বড় সাইজের স্কেচ। শিল্পী অজ্ঞাত। দাম লেখা আছে ২০০৲; সেকালের ২৫ পাউণ্ডের চেয়েও বেশী।

৫। ৩০ নং ছবি। হাকিম মসিউজ্জমানের মাথার স্কেচ। হাকিম আকবরের সময়ে বেঁচে ছিলেন। শিল্পীর নাম মীর হাশিম। ছবিটি অতি ছোট্ট কিন্তু অতি সুন্দর কাজ।

৬। তিনটি পোর্ট্রেট। প্রধান ছবিটি হচ্ছে শের মহম্মদ নওয়ালের স্কেচ। শিল্পীর নাম মহম্মদ নাদির সমরকন্দী। দুটি ছোট রঙীন মিনিয়েচর, একটি জাহাঙ্গীরের, অন্যটি শাহজাহানের, একই শিল্পীর আঁকা।

আরেকটি ছবি আছে। মীর্জা নৌজরের ছোট্ট মাথা ; ভারী সূক্ষ্ম কাজ। মীর্জা শাহজাহানের দরবারে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। শিল্পীর নাম মীর হাশিম। এটিও স্যর জশুয়া রেনল্ড্সের বাছাই করা ছবির সঙ্গে রাখা চলে।

কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের ছবিও খুব সুন্দর। জন্সন্ কলেক্শন বলে একটি বিখ্যাত সংগ্রহ আছে। তাতে শিল্পী মনোহরের আঁকা দারা শিকোর শখের শীকারী ঘোড়া দিল্পসন্দের একটি পোর্ট্রেট আছে। দেখে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। আরেকটি বেশ বড় আকারের ছবিও আছে, দারা শিকো অন্য একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বসে আছেন। এটি বেশ বড় ছবি, ১১ ইঞ্চি লম্বা ৯ ইঞ্চি চওড়া। এই সংগ্রহেই একটি ছোট্ট বেড়াল আছে ; অপূর্ব। এটিই যে একমাত্র বেড়াল তা নয়, আরও আছে। বৃটিশ মিউজিয়মে রাজ লাইব্রেরীতে একটি ছবিতে সম্রাট ফররুখশিয়ারের পায়ের তলায় একটি বেড়াল আছে।

শাহজাহানের সময়ে চিত্রশিল্পে অসামান্য সৌন্দর্য ও অভূতপূর্ব দক্ষতা এলেও চিত্রাঙ্কনের বলিষ্ঠতা কমে গেল। সূর্য মাথার ঠিক উপরে পৌঁছল বটে কিন্তু পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করল। শাহজাহানের রাজত্বে স্থাপত্যে অসাধ্য সাধন হল, কিন্তু চিত্রকলার ক্ষয় শুরু হল। এ যেন ছবির যুগ সারা হয়ে স্থাপত্যের যুগ শুরু হল। অনেক ছবি আঁকা হল বটে কিন্তু ক্রমশ চিত্রজগতে অবনতি এল।

শাহজাহানের বড় ছেলে দারা শিকো ছিলেন চিত্ররসিক, বড় সমঝদার। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে দারা সিন্ধুর মরুভূমিতে পালান, সেখানে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। ট্যাভার্নিয়ের লিখছেন : "(সেখানে) এক চরের মুখে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। এই স্ত্রী সব ভাগ্যবিপর্যয়ের ক্লেশ সহ্য করে বরাবর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কেমন করে অসম্ভব তাপ ও তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে, একবিন্দু জলও মুখে না দিয়ে তিনি মারা যান, দারা যখন সে কাহিনী শুনলেন তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।"

এই দুঃখের কাহিনীর স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে একটি সুন্দর ছোট্ট অ্যালবাম। এটি এখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে। সমুখের সূক্ষ্ম কাজ করা মুখপত্রের একধারে সোনালি জমির উপরে যুবরাজ দারার স্বহস্তে লেখা উৎসর্গ আছে :

"সম্রাট শাহজাহানের পুত্র যুবরাজ মহম্মদ দারা কর্তৃক তাঁর একান্ত আত্মীয়া ও প্রিয়তমা বন্ধু যুবরাণী নাদিরা বেগমকে এই অ্যালবামটি ১৫০১ হিজরীতে (১৬৪১-২ খৃষ্টাব্দে) উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।"

শাহজাহানের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল চিত্রশিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া স্বভাবের কাছে চিত্রকলা নিশ্চয়ই বেশী প্রশ্রয় পেত না। অবশ্য পাত্র মিত্র অমাত্যদের মধ্যে চিত্রকলার যথেষ্ট আদর ছিল, কিন্তু রাজানুগ্রহের অভাবে সবই ম্লান হয়ে গেল। বের্ণিয়ার কোলবার্টকে ১৬৬৯ সালে যখন চিঠি লেখেন, তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব মাত্র বছর এগারো সিংহাসনে এসেছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পীরা সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর বা শাহজাহানের সময়ে যে কদর পেতেন তার অনেক কম মর্যাদা পেতে লাগলেন। তীক্ষ্ণধী বের্ণিয়ারের কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তিনি চিত্রশিল্পী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক অথবা হুকুমের মনিবদের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল তার এইভাবে বর্ণনা করেন :

"ফলে সত্যিই কি বিস্ময়ের কিছু আছে যে এই ধরনের (দীনহীন) অবস্থায় এখানে চারুশিল্পের কেন উন্নতি নেই, যা হতে পারত যদি শাসনযন্ত্র আরও ভাল হত, যেমন হয় ফ্রান্সে? যেখানে লোকজন এত অসম্ভব গরীব, অথবা ধনী হলেও এত গরীবিয়ানা চালে থাকে ; যারা সৌন্দর্য বা গুণাগুণের বিচার না করে শুধু সস্তা খোঁজে ; যে দেশের অতিবিত্তশালী সম্ভ্রান্ত লোকরা সদাই ন্যায্যমূল্যের বহু কম দিতে ব্যস্ত ; কিংবা নিজের খেয়ালখুসী মত দাম দিয়েই রেহাই পায় ; যারা গরীব প্রার্থী শিল্পীকে কোড়া দিয়ে মারতে দ্বিধা করে না ; (যে লম্বা ও ভীষণদর্শন কোড়া সাধারণ ওমরাদের সদর দরজায় ঝোলান থাকে) সেখানে কোনও শিল্পী কি করে মন দিয়ে কাজ করবে? কোনও দিনও ভাগ্যে উপযুক্ত সম্মান জুটবে না, এটুকু যদি কোনও শিল্পী বুঝতে পারে তবে তার কি নিজের কাজে আগ্রহ ঘুচে যাবে না? গৃহে বা প্রাসাদে যদি শিল্পীদের মাহিনা করার রীতি প্রাচ্যে না থাকত, যারা বাড়ীতে কাজ করবে, ছেলে পড়াবে, এবং ছিটেফোটা অনুগ্রহের আশায় অথবা কোড়ার ভয়ে কাজ করবে, তাহলে এ দেশের শিল্প থেকে সৌন্দর্য আর সূক্ষ্ম কাজ বহুদিন আগে লুপ্ত হত। অনেক বড় বড় লোকরা ধনী বণিকদের রক্ষা করেন, যারা ওরই মধ্যে শিল্পীদের একটু বেশী মাহিনা দেয়। 'ওরই মধ্যে একটু বেশী' বললুম, তার কারণ ভাল চমৎকার কাজ দেখে একথা মনে করার কোন দরকার নেই যে শিল্পী সম্মান পান, অথবা তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন। এটা নির্ঘাত কথা যে শিল্পী শুধু মুগুরের গুঁতোর ভয়েই কাজ করেন।"

আরেক জায়গায় বের্ণিয়ের বড় বড় লোকের বাড়ীতে শিল্পীরা কি রকম ভাবে কাজ করেন, তার বর্ণনা করছেন :

"একটি ঘরে হয়ত ছুঁচের কাজ চলছে, একজন তদারক করে যাচ্ছেন, আরেক ঘরে হয়ত সোনারূপোর কাজ, তৃতীয় ঘরে চিত্রশিল্পীরা ইত্যাদি।"

বের্ণিয়ের হয়ত কারুশিল্পীদের হীন অবস্থা সম্বন্ধেই বিশেষ করে লিখেছেন, কিন্তু চিত্র ও অন্যান্য চারুশিল্পীদের সম্বন্ধেও তাঁর উক্তি নিশ্চয় খানিকটা খাটে। সব ওমরাই যে বিলক্ষণ শিক্ষিত ছিলেন তা নয়, আর কোনও মদমত্ত ওমরা একদিকে পুঁথির মিনিয়েচর শিল্পী, অন্যদিকে সুনিপুণ দপ্তরির মধ্যে যে খুব ভেদজ্ঞান করতেন তাও মনে হয় না।

ঔরঙ্গজেবের পর তাঁর বংশধরদের রাজত্বে মুঘল চিত্ররীতির পরিণতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করার ফলে মুঘল চিত্রনীতি দাক্ষিণাত্যে গেল। দক্ষিণে গিয়ে মুঘল ছবি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, ফলে সেই পরিবর্তিত চিত্র-ঐতিহ্যের নাম হয় দক্ষিণী বা দাক্ষিণাত্য কলম। তখনকার দিনে ভারতের যেটুকুকে হিন্দুস্থান বলত, অর্থাৎ উত্তর ভারত, তার বাইরে একমাত্র দাক্ষিণাত্য কলমেই মুঘল রীতির ধারা প্রসারিত হয়। এই কলম ছাড়া দক্ষিণ ভারতে মুঘল চিত্রনীতির প্রভাব আর কোথাও বিশেষ দেখা যায় না।

মুঘল চিত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনার আগে তাহলে আরেকবার বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর নাম ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তৈমুরিদ রীতির শিল্পী সুলতান মহম্মদের নাম আগেই করেছি। তিনি বিহজাদের সাকরেদি করেন। তাঁর হাতের একটি ছবি কলকাতায় আছে। ভারতে মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রের প্রাচীন বিবরণ যা পাওয়া যায় তাতে দেখি অধিকাংশ বড় বড় শিল্পীই ছিলেন হিন্দু, যেমন ভগবতী ও হুনার। ষোল শতকে যে সব শিল্পী প্রথম নাম করেন ভগবতী তাঁদের মধ্যে একজন। হুনার কিছু পরে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চিত্রশিল্পীর বংশে তাঁদের জন্ম, অথবা মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁরা চিত্রবিদ্যা অধিগত করে খ্যাতিলাভ করেন, ঠিক জানা নেই। ভগবতী প্রায় পুরো পারসীক রীতিতে আঁকতেন, এমন কি লোকে বলে হিন্দু হয়েও তিনি যেন বিদেশী রীতির পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে হুনার ছিলেন রাজপুত রীতির শিল্পী। বস্তুত, হুনারের ছবি রীতিতে, আবেগে এতই ভারতীয় যে মনে হয় তাঁর শিরায় নিশ্চয় শিল্পীর বংশের রক্ত ছিল, শুধু কার্য-বিপাকে তিনি মুঘল রীতিতে আঁকতে শুরু করেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে বিখ্যাত হিন্দু শিল্পী ছিলেন বসাওঅনের ছেলে মনোহর।

এই সব নজিরের জোরে, আগে যা বলেছি, তার প্রমাণ আরও দৃঢ় হয় যে মুঘল প্রতিকৃতির রীতি হিন্দু ও পারসীক নীতির মিশ্রণের ফল, আর তার চলন হয় ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তার পর থেকে মুঘল দরবারের কৃপায় এর দ্রুত বিকাশ হয়। আকবর বাদশা পোর্ট্রেটের কি রকম ভক্ত ছিলেন বলেছি, জাহাঙ্গীর ও স্যার টমাস রো'র কথাও বলেছি। বিদেশীদের মধ্যে শুধু বের্ণিয়েরই এদেশের শিল্পীদের পোর্ট্রেট আঁকার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজলের করা বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের তালিকা আগেই দিয়েছি। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে, অনুমান ১৬০০ খৃষ্টাব্দে, বাবরের জীবনী, বা ভকিয়ত-ই-বাবরী বলে পুঁথিটি তৈরি হয়। একা

এই পুঁথিতেই বাইশজন বিখ্যাত শিল্পীর ছবি আছে, আরও দুএকজনের ছবি থাকতেও পারে। যতগুলি তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে যে তাদের অধিকাংশই হিন্দু নাম। যথা, ভকিয়ত-ই-বাবরীর বাইশটি নামের মধ্যে উনিশটি হিন্দু, মাত্র তিনটি মুসলমান। তেমনি আবুল ফজলের তালিকায় সতেরোটি নামের মধ্যে তেরোটি হিন্দু। চারজন মুসলমান শিল্পীর নাম হচ্ছে (১) মীর সয়ীদ আলি, হামজানামার জন্যে যিনি ছবি আঁকেন, (২) খাজা আবদুস সামাদ, (৩) ফররুখ কলমাক, আর (৪) মিশকিন। ফররুখ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আকবরনামার অনেক ছবি তিনি আঁকেন, তাছাড়া তিনটি দৃশ্য সম্বলিত তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি আছে। মিশকিন আর ওস্তাদ মিশকিন বোধহয় একই ব্যক্তি, এর আঁকা দুটি স্কেচ আছে, উত্তম মেষপালক বলে একটি ছবিও তিনি আঁকেন, তাছাড়া এক ভদ্রমহিলার ছবিও আঁকেন। সব কটিই মুঘল রীতির প্রথম যুগের ছবি।

আবুল ফজলের তালিকার তেরোটি হিন্দু নাম হচ্ছে (৫) দশ্বন্ত ; (৬) বসাওঅন ; (৭) কেশু (কেশব) ; (৮) লাল ; (৯) মুকুন্দ ; (১০) মাধো ; (১১) জগন (জগন্নাথ) ; (১২) মহেশ ; (১৩) খেমকরণ ; (১৪) তারা ; (১৫) সন্‌ওলান ; (১৬) হরিবাস ; (১৭) রাম। হরিবাসের আঁকা ছবি এখনও পাওয়া যায়নি। দুজন মাধো ছিলেন, একজন বড় (কলন), একজন ছোট (খুর্দ)। কেশু এবং আরও দুএকজন বোধহয় একাধিক ছিলেন। আবুল ফজল বোধহয় ওদের মধ্যে বড়দেরই নাম করেছেন। রজমনামায় আটাশজন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে কুড়ি কি একুশটি নাম হিন্দুর।

দশ্বন্তের কাহিনী আবুল ফজল থেকে আগেই তুলে দিয়েছি। জয়পুরের রজমনামায় তাঁর ছবি আছে। রেখা বা নক্সা তাঁর হাতের ; রঙ করেন বড় মাধো আর কান্হা (কান্হাই)। বিষয়গুলি মহাভারতের, পারসীক রীতিতে চিত্রিত, কিন্তু তফাৎ আছে। প্রধান চরিত্রগুলির মুখাবয়ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীরের গড়ন ভারতীয় ; এমন কি গৌণ চরিত্রের প্রতিকৃতিও তাই, যদিও সেগুলিতে পারসীক চিত্রসুলভ ট্যাবটেবে গাল এসেছে, কিন্তু পারসীক ছবিতে দেহগুলি যেমন লম্বা করে দেওয়া হয়, এতে অত লম্বা করা নয়। রঙও অনেক নরম, পারসীক ছবির অত তীব্রতা নেই। দেবতাদের দেহের রঙ কিন্তু জ্বলজ্বলে নীল। বসাওঅনের একটি ছবি রজমনামায় আছে। উপাখ্যানটি হচ্ছে এক রাজা ব্যাঙরাজার মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর কনে ভাল ভাল বসন ভূষণ ছেড়ে, ব্যাঙ হয়ে গেলেন। বর রেগে অস্থির হয়ে ঠিক করলেন, সব ব্যাঙ মেরে শেষ করবেন, ফলে বধূ ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ছবিটির মুখ্য রঙ হচ্ছে নানা পর্দার সবুজ। পাখী, ব্যাঙ, গাছ, ফুল সবই খুব সূক্ষ্ম, সুকুমার রেখায় আঁকা, রঙও খুব নরম ও পেলব। কিন্তু লেখার বড় বড় অংশ ছবির মধ্যে ঢুকে গিয়ে ছবির চেহারাটা কিছুটা নষ্ট করে দিয়েছে। পারস্পেক্‌টিভের রীতি প্রাচীন ভাস্কর্যের বেস-রিলিফের রীতিতে। যদি মনে করা যায় ছবিতে যা কিছু আছে, অর্থাৎ মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, সবই তলায় কব্জা দিয়ে

আঁটা, আর তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে কব্জার উপর ঘুরিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করান যাবে, তাহলে প্রত্যেক জিনিষই তখন যথাস্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। চিত্রকর সব জিনিষই মনে মনে দাঁড়ান অবস্থায় কল্পনা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আঁকার বেলায় এমনভাবে আঁকলেন যেন সবাই কাত হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত ছবিটি যেন উপরে, শূন্যে কোন জায়গা থেকে দেখে আঁকা, সব জিনিষের উপরই যেন সমানভাবে প্রখর আলো পড়েছে, সে আলো আবার কোনও বিশেষ দিক থেকে আসছেনা। ফলে ছবিতে কোন ছায়া নেই, কোন ছায়াতপ বা রঙের গাঢ়-ফিকে করাও নেই। বড় গাছের পিছনে এক সোনালি পোঁচড় টেনে কড়া সূর্যের আলো বোঝান হয়েছে। নক্সা বসাওঅনের, রঙ ভবানীর। এ ছবিটিতে অন্তত দশ্বন্তের চেয়ে বসাওঅনের হাত ভাল বলে মনে হয়।

দুইজন কেশুই (কেশব), দশ্বন্তের মত, জাতে কাহার বা পাল্‌কি-বেহারা ছিলেন। বড় কেশু অর্থাৎ কেশব দাস কয়েকটি ছবির একটি অ্যালবাম আকবরকে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে উৎসর্গ করেন। এর মধ্যে খৃষ্টিয়ান বিষয়ক ছবির কিছু কপি ও অনুকরণ আছে।

জাহাঙ্গীরের শিল্পী মন্‌সুরের কথা আগেই বলেছি। জাহাঙ্গীরের দরবারে আরেকজন শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম নান্থা। তাঁর আঁকা একটি বিখ্যাত পোর্ট্রেট আছে। ছবিটিতে জাহাঙ্গীরের শীল-মোহর আর সম্ভবত তাঁরই হাতে লেখা আছে : "অমরসিংহের পুত্র সুরজমলের ছবি, শিল্পী নান্থা।" ছবিটি একটি রত্ন। যেমন বিশিষ্ট সুশিক্ষিত নক্সা, দৃঢ় হাতে চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, তেমনি রঙের অপূর্ব আভাস, আবেগ, যার ফলে পরুষ দেহে অপরূপ অসামান্যতা ফুটে উঠেছে। হোলবাইনের মত যেমন নক্সার হাত, তেমনি হোলবাইনের মত শিল্পী ছায়া বাদ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসামান্য নৈপুণ্যে সূক্ষ্ম মড্‌লিং এনেছেন, নক্সায় এনেছেন জোর, যার ফলে ছবিতে এসেছে ওজন, ঘনত্ব, গভীরত্ব, পরিপূর্ণতা। প্রত্যেকটি অবয়ব ফুটে উঠেছে। তেমনি সুন্দর ছবির পাড়। প্রথমে দুটি সরু পাড়, তাদের মধ্যে একটি পারসী কবিতা ছোট ছোট খোপে আঁকা, চারিদিকে ফুলের নক্সা। তাদের চারদিকে মোটা চওড়া পাড়ে অপূর্ব ডায়মণ্ড কাটা ফুলের নক্সা ; ঠিক তাজমহলে শ্বেত পাথরের উপর রঙীন পাথরের নক্সার মত। যিনি ছবি আঁকতেন আর যিনি পাড় আঁকতেন তাঁরা সাধারণত দুজন আলাদা শিল্পী হতেন। কিন্তু তবুও ছবির সঙ্গে পাড়ের সর্বদাই অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকত। এই ছবিটির শিল্পীর নাম নান্থা। এঁর নাম জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে নেই, তবুও ইনি নিশ্চয় প্রথম দরের শিল্পী ছিলেন।

দারা শিকো আর শাহজাহানের সময়ের শিল্পীদের নাম অল্প আগেই করেছি।

মুঘল চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য কত ছিল তার কিছুটা আন্দাজ দিয়েছি। তবে এ সম্বন্ধে আরেকটু আলোচনা বোধ হয় ক্লান্তিকর হবে না। এটা ঠিক, মুঘল চিত্রকলা এত তাড়াতাড়ি যে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় ওঠে তার একটা কারণ রাজানুগ্রহ। আকবরের কঠোর সমালোচক ছিলেন বদাওঅনি,

তাঁর মতে বাদশার পাত্র মিত্র অমাত্যরা যে সকলে খুব চিত্রকলার ভক্ত ছিলেন তা নয়, তবে "যখন যেমন তখন তেমন" নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, যেহেতু বাদশা ছবি ভালবাসেন অতএব যে যেমন পারলেন চিত্রকলায় নিজ নিজ রুচি ও ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়াসে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ফলে চিত্রিত পুঁথি বাড়ীতে রাখা একটা রেওয়াজ হয়ে গেল, চিত্র শিল্পীরাও কাজ পেয়ে উৎসাহিত হলেন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের উন্নতি হল, অতএব রুচিরও হল। দামও উঠতে লাগল খুব। একটু আগে একটি ছবির হিসাব দিয়েছি; স্যর জশুয়া রেনল্ড্‌স্ ছবিটির খুব তারিফ করেন; বিষয়, সম্রাট শাহজাহান দরবার করছেন। এর মূল্য ধরা ছিল তখনকার দিনে ২০০৲ টাকা, অর্থাৎ তখনকার হিসাবে অন্তত ২৫ পাউণ্ড। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে জন্‌সন্ সংগ্রহে (রিচার্ড জনসন ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংসের মহাজন) ঔরঙ্গজেবের সময়ের ওমরা সায়েস্তা খাঁয়ের একটি ছবি আছে, তার দাম ১৭০৲ টাকা। আরেকটি খণ্ডে কয়েকটি মোটামুটি মামুলি ছোট প্রতিকৃতি আছে, তাদেরও এক একটির দাম ২৫৲ টাকা।

পুঁথির চিত্র ভারত পারসীক চিত্রকলার একটি অঙ্গ মাত্র। তাও যে প্রধান বা সবচেয়ে ভাল অঙ্গ ছিল বলা যায় না। ভারতীয় নক্সাবিদ বা রঙের চিত্রকররা সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেন নানা আকারের আলাদা আলাদা ছবিতে। এগুলি প্রায় একসঙ্গে একটি অ্যালবামে বাঁধান থাকত। একটি অ্যালবাম যেমন দারা শিকো তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেন। বৃটিশ মিউজিয়মে এইরকম অনেক অ্যালবাম আছে। তার মধ্যে কয়েকটি শুধু ইতিহাসের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের প্রতিকৃতির অ্যালবাম; এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী, এই রকম একটি অ্যালবাম হাফিজ রহমতের নামে প্রসিদ্ধ। আর দিল্লীর দরবারে যা রেওয়াজ একবার হল, সে ফ্যাশন ছোট বড় সব দরবারেই ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি আঠারো শতকে ইংরেজ 'নবাব'রাও এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পেলেন না। তাঁরা লক্ষ্ণৌএ, পাটনায়, আরও অন্যান্য জায়গায় একদিকে যেমন চিত্রশিল্পীদের দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকাতে শুরু করলেন, অন্যদিকে তেমনি পুরনো চিত্র সংগ্রহে মেতে গেলেন, এবং যোগাড়যন্ত্র, লুটপাট করে দেশে পাঠালেন। তবে এই সব অ্যালবামে একটা বড় জিনিষ প্রমাণ হয়। মুঘল চিত্র আখ্যান ধর্মী না হয়ে ক্রমেই বিশুদ্ধ চিত্রধর্মী হয়ে পড়ল। এক একটি ছবি নিজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে, স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে, চিত্র বিচারে সাজন ও চিত্রত্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দিকে মন দিল। আখ্যান বা গল্পের লাঠি ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ছেড়ে দিল। চিত্রবহির্ভূত সাহিত্যিক প্রসাদরূপ ঠেকনো বা খুঁটির উপর নির্ভর করল না। এমন কি রাজপুত রাগমালা ইত্যাদির মত চিত্রমালাও হলনা। ফলে এইদিক থেকে ভারত পারসীক বা মুঘল চিত্রের মূল্য আধুনিক ভারতীয় শিল্পীর কাছে রাজস্থানী বা পাহাড়ী চিত্রের মূল্যের চেয়ে বেশী হতে বাধ্য।

মুঘল ছবিতে যখন সাজন এবং অলঙ্কারই হল মূল অম্বিষ্ট, তখন আবশ্যিকভাবেই বিষয়াবলম্বনের

বৈচিত্র্য এল খুব, যাকে অবলম্বন করে চিত্রের বিভিন্ন গুণ, নৈপুণ্য ও প্রসাদপরীক্ষার তাগিদ এল। নানাধরনের জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতির কথা আগেই বলেছি। চতুষ্পদ আর পাখীর ছবি বিস্তর। আকবর নামার ছুটি বিখ্যাত শীকারের চিত্র মনসুরের কাজ। মনসুর সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন চতুষ্পদ আর পাখী এঁকে। ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে ওয়ান্টেজ সংগ্রহে তিনটি ছবি আছে, একটি বড় ফেজেন্ট, একটি টার্কি মোরগ, আর একটি নীলকণ্ঠ বার্বেট। কলকাতায় মনসুরের আঁকা একটি অপূর্ব সারস আছে, আগেই বলেছি। শাহজাহানের রাজত্বে আঁকা পশু পক্ষী চিত্রের কথা উল্লেখ করেছি। নিখুঁত ভাবে আঁকা হাতীর ছবিও বহু আছে। একটি ছবির উল্লেখ ইতিমধ্যেই করেছি। হাতী ভারতের বৈশিষ্ট্য, সেই হিসাবে ভারতীয় ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী এই বিরাট জন্তুটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন ; এর স্বভাব, রীতি, রূপ তাঁরা খুব ভাল জানতেন, এঁকেছেনও অসংখ্য বিচিত্র ভঙ্গীতে। জন্সন সংগ্রহের ৬৭তম খণ্ড প্রায় গোটাটাই হাতীর ছবিতে ভর্ত্তি, তার মধ্যে কয়েকটি অতুলনীয়। জাহাঙ্গীরের শিল্পী আবুল হাসান ওরফে নাদিরুজ্জমানের আঁকা একটি আশ্চর্য্য হাতী আছে। ৬৭তম খণ্ডে ১৫নং ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাসাদের আঙ্গিনার দৃশ্যে প্রধান চরিত্র হচ্ছে একটি বিরাট জমকালো হাতী, সঙ্গে আরও হাতী, একটি ষাঁড়, অন্যান্য জন্তু। নক্সাটি ছাই রঙে আঁকা, শুধু অল্প ব্রাউন ঘেঁষা সেপিয়ার আমেজ, আর কোন রঙ নেই, শুধু হাতীর সোনার জলের সাজে আছে হলুদে।

চতুষ্পদের ছবির মতই সুন্দর পাখীর ছবি, সেগুলির কাজ আরও সূক্ষ্ম, আরও পেলব, রঙের বাহারও অপূর্ব। দারা শিকোর অ্যালবামে তিনটি অপূর্ব রঙীন পাখী আছে সম্ভবত মনসুরের তুলির। একটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারস জাতের লম্বা ঠ্যাঙওলা ব্রাউন পাখী, জলের পাশে দাঁড়িয়ে, জমিতে ঘাস, ফুল, বাঁশ ; পারস্পেকটিড এসেছে। কেবল নীল আকাশটা একটু কাঁচা হাতে আঁকা। এটি দারা শিকোর অ্যালবামের ৮নং ছবি। ১০নং ছবিটিও চমৎকার, পাহাড়ের পাদদেশে জলের ধারে একটি বুনো হাঁস সচকিত চোখে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি অতি আশ্চর্য্য সুন্দর ছবি। পাহাড়ের বুকে সূর্যের আলো দেখান হয়েছে সাপ্টা সোনালি রঙ লেপে দিয়ে, ফল হয়েছে অতি সুন্দর। জাহাঙ্গীরের আদেশে যে টার্কি মোরগ আঁকা হয় তার উল্লেখ আগেই করেছি, এই ছবিটির মত কাজ চীনে ছবিতেও বোধ হয় নেই।

পাঁচমিশেলি বিষয়ের ছবিও অনেক, তার মধ্যে আখ্যানমূলক ছবিও অনেক। রূপকথাও নানা রকম আছে। একটি বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল মালোয়ার রাজা বাজবাহাদুর আর তাঁর প্রণয়িণী রূপমতীর উপাখ্যান। এঁদের দুজনকে নিয়ে কয়েকটি ছবি আছে, অন্ধকারে একত্রে মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। লয়লা-মজনু, খসরু শীরীন, কামরূপ-কান্তা, নল দময়ন্তীর উপাখ্যানের চিত্রও অনেক।* অনাবৃত, অর্ধাবৃত শরীর আঁকা ব্যাপারেও মুঘল চিত্রশিল্পীরা ছিলেন

বিশেষ দক্ষ।* ই-বি হ্যাভেল একটি ছবি ছাপিয়েছেন। সেটি বিষয়ের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। প্রাসাদে দেয়াল গাঁথা হচ্ছে, অনেকগুলি রাজমিস্ত্রী কাজ করছে, কেউ ইট গাঁথছে, কেউ পুলুম (প্লাম লাইন) ফেলে দেখছে, কেউ কর্ণিক দিচ্ছে, কয়েকজন ঝুড়ি করে চূণ সুরকি বইছে, মাঝখানে চূণ সুরকি মাখা হচ্ছে, ভিস্তি জল নিয়ে আসছে। ছবির মধ্যে মজুর, রাজমিস্ত্রী, মুটের মধ্যে অনেকেরই খালি গা, খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে আঁকা, যাকে যেমন রোগা, মোটা বলিষ্ঠ দেখান দরকার ঠিক সেইভাবেই দেখান হয়েছে, সুতরাং যথাযথ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুকও যথেষ্ঠ। জনসন্ সংগ্রহের ৯, ১০ আর ১১ খণ্ডে অধিকাংশ ছবিই মহিলাদের, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয় স্নান নয় প্রসাধন-রত, ফলে অর্ধাবৃত। ১১ খণ্ডের ছবিগুলি বিশেষ ভাল ; একটি ছবি আছে, এক মহিলা উঁচু তে-কোণা পাগড়ীর মত পরেছেন। ছবিটির রঙ চমৎকার ভাবে গাঢ়-ফিকে করা। ছবিটির একটি নিকৃষ্ট নকল আছে, তার থেকে মহিলাটির নাম জানা যায় : মাল্‌কা জমানিয়া।

* হিন্দু মুসলমান সাধু সন্তদের চিত্রও আছে অনেক। এর মধ্যে অনেকগুলি একক পোর্ট্রেট, আবার অনেকগুলি গ্রুপ। এই বিষয়ের দুটি ছবি আছে, অপূর্ব, দুটিই শাহজাহানের সময়ে আঁকা, দারা শিকোর অ্যালবামে স্থান পেয়েছে। একই বৃদ্ধ ফকিরের দুই অবস্থার দুটি ছবি, একটিতে হাতে বই নিয়ে, অন্যটিতে জপমালা নিয়ে। দুটিতেই ফকিরের দেহের সীমারেখা নরম করে আঁকা, সাধারণত যে রকম সরু আর তীক্ষ্ণ হয় সে রকম নয় ; সীমারেখার পাশাপাশি সরু রেখা এমন ভাবে গোছা করে দেওয়া যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নিটোল ভাব আসে। পাতলা দাড়ির প্রত্যেকটি চুল এমন সুন্দর, নিখুঁতভাবে আঁকা যাতে বোঝা যায় শিল্পী, যাকে বলে একচুলের তুলি (এক বাল কলম) তা ধরার ব্যাপারে কত নিপুণ ছিলেন। রঙ নরম, মোটেই উগ্র নয়, পারস্পেক্‌টিভও মোটামুটি ঠিক। দারা শিকোর অ্যালবামে একই রীতিতে আরেকটি ছবি আছে, বোধ হয় একই শিল্পীর হাতের। বিষয়টি হচ্ছে একজন মোল্লা সমুখে বইদানের উপর কোরাণ শরীফ খুলে পাঠ করছেন। পাশে দুজন সঙ্গী নিবিষ্ট মনে শুনছেন, সমুখে আরেকজন লোক, মোল্লার বাঁ পায়ের চেটোটি হাতে তুলে ধরে আঙ্গুলের উপর জল ঢালছেন। এই লোকটির ঘোরান-পেঁচান শরীরের অবস্থা এঁকে দেখান বেশ শক্ত, কিন্তু শিল্পীর নৈপুণ্যে বেশ অক্লেশে সম্ভব হয়েছে।

অধিকাংশ অ্যালবামেই জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের ছবি আছে। অসীম ধৈর্যে যেমন বিশদভাবে আঁকা, তেমনি অসম্ভব খুঁটিনাটিতে ভর্তি, সমস্তটা খুব সুসমঞ্জভাবে রঙ দেওয়া, প্রায়ই সোনার জলের কাজ করা। রঙ আর সোনার বাহার দেখলে অবাক হতে হয়। তার উপরে অত ছোট ছবিতে দরবারের প্রত্যেক আমীর ওমরার ছবির মুখ আলাদা। তাতেই বোঝা যায় সত্যিকারের দরবার চোখে দেখে, কে কোথায় বসে, সম্রাটের থেকে কতদূরে কার স্থান, শিল্পীর ভাল করে জানা ছিল, এবং সব জিনিষ খুঁটিয়ে হিসাব করে প্রত্যেক পাত্রমিত্রের পোর্ট্রেট আঁকা হত। তা না হলে বোধ হয়

শিল্পীরও রক্ষে থাকত না। এসব দরবারের ছবির আসল রঙ বজায় রেখে বইয়ে ছাপা অসম্ভব ; উপরন্তু সাদা-কালো ছাপালে ছবির কিছু ধরা যায় না, কারণ কে কোথায় বসে আছেন তার যথাযথ্য রক্ষা করতে গিয়ে কম্পোজিশন প্রায়ই আবশ্যিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। তাই রঙ না থাকলে এসব ছবি খোঁড়া হয়ে পড়ে। কর্ণেল হান্নার সংগ্রহে দুটি জগদ্বিখ্যাত ছবি আছে, দুটিই "পার্সিয়ান ড্রয়িংস" খণ্ডে। ১ আর ২নং ছবি। ২নং ছবিটি বোধ হয় ভারত পারসীক রীতিতে আঁকা সবচেয়ে বড় ছবি, ২৩ ইঞ্চি লম্বা ১৭½ ইঞ্চি চওড়া। এক হামজা-নামার প্রথম দিকের ছবি কিছু কিছু এর চেয়ে আকারে বড়। ২নং ছবির বিষয় হচ্ছে, হাতীর পিঠে চড়ে শাহজাহান যমুনার ধারে সজ্জিত অশ্বারোহী সেনা অবলোকন করছেন। প্রধান প্রধান সেনাপতি কর্মচারীদের নাম ছবিতেই লেখা আছে।

১৮১৫ সালে যিনি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ত'ার উপহারদত্ত একটি পু'থি এখন বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। তার নম্বর বি-এম এ-ডি-ডি ২০৭৩৪। তাতে অতি উৎকৃষ্ট রীতিতে আঁকা নয়টি ছবি আছে। তার মধ্যে এখানে দুটির উল্লেখ করা যায়। একটিতে মায়ের কোলে শিশু শাহজাহান (তখন রাজপুত্র খুর্‌রম), চারদিকে অনুচরবর্গ ঘিরে প্রশংসাবাদ করছে (ঠিক কতকটা যীশুর জন্মবিষয়ক ছবির মত, ইংরেজিতে যাকে বলে নেটিভিটির চিত্র)। রঙ-এর জমকে, আলোর দীপ্তিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় এত ব্যঞ্জনাঢ্য হয়েছে, যে ছবিটি নকল করা অসম্ভব। আরেকটি ছবিতে শাহজাহান পূর্ণগৌরবে ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন, আসফ খাঁ তাকে বহুমূল্য একছড়া মুক্তার মালা উপহার হিসাবে নিবেদন করছেন। মুঘল দরবার যখন গৌরবের সপ্তশীর্ষে তখন তার কি প্রতাপ, জ'াকজমক ছিল এই ছবিটিতে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়।

ভারত-পারসীক চিত্ররীতিতে ইওরোপীয় রীতি অবলম্বনের প্রয়াস হয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তা সফল হয়েছে। মুঘল সম্রাটরা এ বিষয়ে যত না চেষ্টিত ছিলেন, পারস্যের রাজাদের আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। পারস্যের দরবারে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) স্যর রবার্ট শার্লি যখন রাজদূত, তখন রাজা প্রথম শাহ-আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) চিত্রকলা শেখার উদ্দেশ্যে রোমে একদল শিল্পী ছাত্র পাঠান। এদের মধ্যে একজন খৃষ্টিয়ান হয়ে যান এবং ডন জন অভ পারসিয়া নাম নিয়ে একটি বই লিখে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় শাহ-আব্বাস (১৬৪২-৬৭) আরেকটি দল পাঠান। এদের মধ্যেও একজন খৃষ্টিয়ান হয়ে যান ; পারস্য থেকে যখন যান তখন নাম ছিল মহম্মদ জামান ; যখন ফিরে এলেন তখন নাম হল পাওলো জামান। কিন্তু তাঁকে দেশত্যাগ করতে হল, ফলে শাহজাহানের দরবারে আশ্রয় নেন। সেই সময়ে আরও কয়েকজন পারস্য থেকে বিতাড়িত হন, তাঁদেরও শাহজাহান আশ্রয় দিয়ে মন্‌সবদার পদে বাহাল করে কাশ্মীরে পাঠান। ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে এসেই এইসব বিদেশী মন্‌সবদারদের খোঁজ নেন, ফলে কাগজপত্র দেখানর জন্য তাঁদের দিল্লীতে ডাক পড়ে। তখন মানুচ্চির সঙ্গে মহম্মদ ওরফে পাওলো জামানের পরিচয় হয়। জামান নিজেকে খৃষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিতেন

অথচ সাধারণ মুসলমান রীতিতে সংসার করতেন। বৃটিশ মিউজিয়মের একটি পুঁথিতে (এ আর ২২৬৫) ইওরোপীয় রীতিতে জামানের তিনটি ছবি আছে। পারস্যে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ইওরোপীয় রীতিতে আঁকার বাসনা বরাবর আছে। এখনও প্রাচীন রাজধানী ইস্পাহানে, নতুন রাজধানী টেহেরানে, অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের জীবনের লক্ষ্য হল, "র‍্যাফেইলের মত" আঁকবেন ; এখনও তাঁরা এই বলে গর্ব করেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা রোমে চিত্রশিল্প শিক্ষা করতে গেছলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইওরোপীয় ও প্রাচ্যরীতির জোটকে যে সব ছবি হয়েছে তার কোনটিই কোন কালে খুব রসোত্তীর্ণ বা রুচিসিদ্ধ হয় নি। বড়জোর কয়েকটি ফিকে চটকদার 'সুন্দর' ছবি হয়েছে, আর কিছু হয় নি। অনেকে প্রশ্ন করেন মুঘল চিত্রের প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে ছায়াতপ বা 'কিয়ারসক্যুরো' এসেছিল তা ইওরোপীয় শিক্ষার ফলে না চীনে রীতির প্রভাবে। এ সম্বন্ধেও সন্দেহের বিশেষ কারণ নেই। কারণ চীনে ছবিতে ছায়াতপ বা কিয়ারসক্যুরো বহু শতাব্দী ধরে বিদ্যমান, যার ফলে চীনে ছবিতে যে ব্যাপ্তি, অসীম বিশ্বের চিত্রপ্রতিমার আমেজ আসে তা অন্যত্র বিরল। পারসীক রীতির মাধ্যমে চীনে শিল্পশাস্ত্র ও রীতির প্রভাব মুঘল, তথা রাজপুত চিত্রে, বিলক্ষণ ছিল ; কিন্তু একথাটি আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। ফলে ভারতীয় চিত্রে প্রকৃতির প্রতিপ্রকাশ বা বাস্তবরীতির সামান্য নিদর্শন দেখলেই আমরা তাকে ইওরোপীয় প্রভাবের ফল বলে কল্পনা করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় জাহাঙ্গীরের দরবারশিল্পী গোবর্ধন দাসের চিত্রিত জনৈকা বাইজীর অনাবৃত প্রতিকৃতির। এটি এখন বানারসের শ্রীসীতারাম সাহুর সংগ্রহে আছে, নানালাল চমনলাল মেহতা তাঁর "স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান পেন্টিং"-এ পুরো মাপে ছাপিয়েছেন। (লম্বায় ৬ ইঞ্চি চওড়ায় ৪$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি)। চিত্রটি প্রায় পুরো মড্‌ল করা, পরিপূর্ণ নিটোল, মনে হয় মহিলা যেন শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে, রক্তমাংস পেশীমজ্জা নিয়ে বসেছেন, ছবিতে এতই গভীরত্ব, ঘনত্ব এসেছে। মাথা, ঘাড়, গলা, বাহু, শরীর, বুক সবই নিটোল। মুখটি যদিও মুঘল রীতিমতে একপাশ করে, অর্থাৎ প্রোফিল করে আঁকা, তবুও মোটেই চ্যাপটা নয়, নীরক্ত তনুতাদুষ্ট নয়। অনেকে বলবেন এটি ইওরোপীয় রীতির ছবি। অথচ শরীর যেভাবে কালচে ব্রাউন গাঢ়-ফিকের উপর আশ্রয় করে আঁকা, তাতে মানতে দ্বিধা হয় না যে এই ধরনের চিত্রবিন্যাস, দেশজ মেজাজ ও ঐতিহ্য অজন্তার উত্তরাধিকারসূত্রে রক্তের মধ্যে দিয়ে গোবর্ধন দাস পেয়েছেন।

•সতেরো শতকে মুঘলচিত্রে ইওরোপীয় বিষয়বস্তুও আসে।' দারা শিকোর অ্যালবামে দুটি কাঠ খোদাই আছে, একটি সিয়েনার সেণ্ট ক্যাথারিনের (১৫৮৫) আর একটি সেণ্ট মার্গারিটার (একই সময়ে আঁকা)। তৃতীয় ছবিতে ইওরোপীয় পোশাক পরিহিত এক দম্পতির প্রতিকৃতি। শিল্পীরা বাইবলের গল্প অবলম্বন করেও ছবি আঁকতেন ; ফতেপুর সিক্রি বা লাহোরের প্রাসাদে সেগুলি স্থান পেত তার প্রমাণ আছে। অবশ্য আঁকার রীতি হত অদ্ভুত। যেমন, 'শ্রেষ্ঠ মেষপালকে'র একটি ছবি আছে, তাতে মেষপালক হচ্ছেন মোটা সোটা মধ্যবয়সী থপ থপে একটি লোক, মুখে প্রকাণ্ড কালো

দাড়ি, গায়ে মুসলমানী আলখাল্লা, মাথায় সোনার জরির কাজ করা পাকান কাপড়ের পাগড়ী। জন্‌সন্‌ সংগ্রহের 'শ্রেষ্ঠ মেষপালক'টিতে ওস্তাদ মিশকিনের সই আছে। বোধ হয় ইনিই আকবরের দরবারের মহম্মদ মিশকিন, যাঁর নাম আবুল ফজলে আছে। আরও অনেক বাইবলের ছবি আছে, তবে কোনটাই দেখে বিশেষ তৃপ্তি হয় না। পূর্ব-পশ্চিম রীতি ঠিক মেলেনি, মেশেনি।

১৫৮০র পর আকবরের দরবারে জেস্যুইটরা তিনবার আসেন। প্রথম ১৫৮০-৮৩তে, দ্বিতীয়বার ১৫৯১তে, তৃতীয়বার ১৫৯৫-১৬০৫ সালে। প্রথমবারে জেস্যুইটরা ক্রিস্টোফর প্ল্যান্টিনের আটটি বড় বড় খণ্ডে সম্পূর্ণ একাধিক ভাষায় রচিত বাইবল আকবরকে উপহার দেন। তার সঙ্গে দেন দুটি বড় চিত্র। আরও অন্যান্য চিত্র ও এনগ্রেভিং নিশ্চয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন জেস্যুইটরা আসেন তখন নিশ্চয় কিছু চিত্রিত ধর্মপুস্তক আর পুঁথি রেখে যান, কারণ ১৫৯৫ সালে তৃতীয়বার যখন জেস্যুইটরা আসেন তখন আকবরের গ্রন্থালয়ে তাঁরা অন্তত কুড়িটি ইওরোপীয় বই দেখতে পান।

প্ল্যান্টিনের বাইবলে মার্টিন ভান হীম্‌স্‌-কার্কের আঁকা সেণ্ট ম্যাথ্যুর একটি এন্‌গ্রেভিং দেখে কেশু ১৫৮৭ সালে একটি নক্সা আঁকেন। তার পর চল্লিশ বছর ধরে খৃষ্টিয়ান বিষয়ে অনেক ছবি আঁকা হয়, কেশুর ছবিটি তাদের অগ্রজ ; তাছাড়া মুঘল ছবিতে ইওরোপীয় ধর্মবিষয়ক ছবির প্রভাব অন্যভাবেও এল। চীনে কিয়ারস্‌ক্যুরো নীতির সঙ্গে ইওরোপীয় কিয়ারস্‌ক্যুরো ও পারস্পেকটিভ নীতিও নিশ্চয় ভারতীয় ছবিতে অনেক প্রভাব রাখে। ফলে দেশী শিল্পীরা অনেকেই ইওরোপীয় রীতিতে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার চেষ্টা করলেন। তার ফলে পারসীক মিনিয়েচরসুলভ উঁচু দিকচক্রবাল রেখার সঙ্গে ভারতীয় ছবির পিছনের মামুলি সমান জমি চলে গিয়ে এল দূর থেকে আরও দূরের আভাস। সুতরাং বসাওঅন, মধু, মিশকিন, নরসিং, মনোহর শুধু যে ইওরোপীয় এনগ্রেভিং দেখেছিলেন তা নয়, ফ্লেমিশ রীতিতে আঁকা বিখ্যাত 'বুক অভ আওয়ার্স' বইয়ের চিত্ররাজিও নিশ্চয় এঁকে আয়ত্ত করেছিলেন। এঁদের কাজের ফলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম যুগে মুঘল চিত্রে পশ্চাদ্‌পটে দূরের পারস্পেকটিভ প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ কাজে বোধ হয় চীনে রীতির দান, ইওরোপীয় রীতির দানের চেয়ে বেশী মূল্যবান।

আরেকটি বিষয়ে অনেক ছবি আছে, সেটি অনেকে ভুল করে বলেন 'স্বর্গদূতগণ খৃষ্টের শুশ্রূষা করছেন'। কিন্তু আসলে এটি সম্পূর্ণ মুসলমানী বিষয়, এবং ইসলামীয় রীতিতে আঁকা। লোকচক্ষুর অন্তরালে এক সংসারত্যাগী সাধু ধ্যান করে দিন কাটান, তাঁকে দেবদূতরা রোজ খাইয়ে যান, এই হচ্ছে ছবির বিষয়। দেবদূতদের পিঠের পাখা প্রায় গ্রীক রীতিতে আঁকা বলে অনেকে এটিকে খৃষ্টিয়ান বিষয় বলে মনে করেন। প্রায় সব ছবিতেই একজন দরবেশকে ছবির এককোণে হয় কোন গুহা, না হয় ঘরের সমুখে, ব্যাজার মুখ করে বসে থাকতে দেখা যায়। ডব্লিউ-জি-আর্চার তাঁর 'ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং ইন দা পাঞ্জাব হিল্‌স' বইটির 'পুঞ্চ' অধ্যায়ে এই বিষয়ের একটি ছবি তুলে দিয়েছেন, সেটি পুঞ্চে পাওয়া

গেছে। আসল আখ্যানটি হচ্ছে বল্খের বাদশা, আদমের ছেলে, ইব্রাহিম রাজত্ব ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। যে বনে গেলেন সেখানে আগে থাকতেই এক দরবেশ থাকতেন, দেবদূতরা নিয়মিত ভাবে তাঁকে খাওয়াতেন। কিন্তু বাদশা আসার পর থেকে বাদশাকেই দশজন দেবদূত দশ ব্যঞ্জন দিয়ে রোজ খাওয়াতে শুরু করে দিল, আর দরবেশকে নিতান্ত প্রাণ ধারণের পক্ষে যথেষ্ট একথালা করে খাবার একজন মাত্র দেবদূত দিয়ে আসত। ফলে দরবেশ যেতেন বেজায় চটে। এই বিষয়ক ছবিতে এইটুকু কৌতুক প্রায় বাদ দেওয়া হত না।

ই-বি হ্যাভেল কতিপয় ছবির উল্লেখ করেছেন যেগুলি লোকের গ্রুপের ছবি, ছবির একপাশে বা মধ্যস্থলে ভীড় করে আছে। প্রত্যেকেরই মুখ, শরীর, চরিত্র, ভঙ্গী আলাদা। যেমন একটি ছবি ছাপিয়েছেন, তাতে চারজন মুসলমান মোল্লা, অর্ধচন্দ্রাকারে ছাতের উপর বসে আছেন, পিছনে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দূরে প্রাসাদ। কম্পোজিশনটি খুবই ভাল, যদিও পারস্পেকটিভ তেমন ভাল নয়, কতকটা পনেরো শতকের ইটালিয়ান ছবির মত। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে, নাটকীয় বর্ণনায়, বর্ণাঢ্যতায়, রেখার বলিষ্ঠ নিশ্চিন্ততায়, বিন্যাসরীতিতে ছবিটি অপূর্ব। প্রাসাদে রাজমিস্ত্রীর কর্ম্মরত ছবির উল্লেখ আগেই করেছি। সেটিও অতুলনীয়।

কী অপূর্ব নৈপুণ্য ও দক্ষতায় ভারতীয় চিত্রকর একদিকে আলকাতরার মত কালো রাত্রি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ অথবা মশালের উদ্ভাষের বৈষম্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তার উল্লেখ ই-বি হ্যাভেল করেছেন। রাজপুত রীতিতে অভিসারিকা চিত্রগুলি সবই এই নীতিতে সফল। রাত্রে মশাল জ্বেলে, আলো ফেলে শীকার ; মশালের আলোয় নায়ক নায়িকার পলায়ন, আগুনের কুণ্ড করে তার চারিদিকে পথিকদের আগুন পোহান ; এই সমস্ত ছবিতে আলো অন্ধকারের বিরোধ খুব আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জনসন্ সংগ্রহে কয়েকটি এই ধরনের ছবি আছে, কর্ণেল হান্নার সংগ্রহেও আছে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ রেম্ব্রাণ্ট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান বাদশা'র সমসাময়িক ছিলেন। রেম্ব্রাণ্ট ছবিতে এমন এক আলোর সৃষ্টি করেন যা আগে কখনও কেউ জলে স্থলে দেখেনি। বৃটিশ মিউজিয়ম, লুভর্ ও অন্যত্র রেমব্রাণ্টের কালি কলমে আঁকা অনেক নক্সা আছে। এগুলির অনেকগুলি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি যে ভারত-পারসীক মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবির নকল তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়েছে। রেমব্রাণ্টের ছবি আর মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবি বা নক্সা পাশাপাশি সাজিয়ে জার্মাণ অধ্যাপক সার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রেম্ব্রাণ্টের ছবির উৎস কী। রেম্ব্রাণ্টের একটি ছবি আছে, সেটি "সিংহাসনে আসীন আকবর" নামে একটি ক্ষুদ্রকায় মুঘল ছবির হুবহু নকল। রেম্ব্রাণ্টের আরেকটি ছবি আছে, সেটিও 'অশ্বপৃষ্ঠে জনৈক ভারতীয় রাজপুত্র' বলে ছবির নকল। আসলটি আছে বার্লিনে, রেমব্রাণ্টের নকলটি বৃটিশ মিউজিয়মে। 'সিংহাসনে আসীন তৈমুর' বলে রেম্ব্রাণ্টের নকল করা আরেকটি ছবি লুভরে আছে, আসল মুঘল ক্ষুদ্রকায়টি আছে বার্লিনে।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে রেম্‌ব্রাণ্ট ছিলেন আমস্টারডামে। তখন আমস্টারডাম ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেন্দ্র। সুতরাং সেখানে প্রাচ্য থেকে অনেক বহুমূল্য শিল্পবস্তু আসত। ১৬৪২ সালে রেমব্রাণ্ট ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর এব্রাহাম ভিল্‌মার ডক্সের একটি পোর্ট্রেট আঁকেন। ভিলমার ডক্স্‌ এশিয়া থেকে বহু মহার্ঘ শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করেন। রেম্‌ব্রাণ্টের নিজেরও বহুমূল্য জিনিষ সংগ্রহের বাতিক ছিল (যার ফলে শেষ বয়সে তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় মরতে হয়)। ১৬৫৬ সালে যখন রেম্‌ব্রাণ্ট দেউলে বলে ঘোষিত হ'ন, তখন তাঁর সম্পত্তির মধ্যে একটি বই পাওয়া যায়; সরকারী নথিতে সেটিকে উল্লেখ করা হয় 'অদ্ভুত ধরনের ক্ষুদ্রকায় নক্সার সংগ্রহ' বলে। এগুলিই হয়ত মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবির সংগ্রহ হবে, যার থেকে রেম্‌ব্রাণ্ট তাঁর কালি কলমের নক্সা নকল করতেন।

রেম্‌ব্রাণ্ট এতবড় জগজ্জয়ী প্রতিভা ছিলেন, তাঁর কাজ স্বকীয় প্রতিভায় এত সমুজ্জল, ছবিতে তিনি এমন অভূতপূর্ব আলোর সৃষ্টি করেন, যে তাঁকে নকলনবীশ মনে করা ভুল হবে। তবুও একথা নিতান্ত ঠিক যে জগজ্জয়ী প্রতিভাও স্বয়ম্ভু নয়। রেম্‌ব্রাণ্টের ছবি আর মুঘল ছবি দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের, তবুও এটা মানতেই হয় যে রেম্‌ব্রাণ্টের ছবির সঙ্গে রীতি ও বিষয় নির্বাচনে মুঘল ছবির আশ্চর্য মিল আছে। দুই ধরনের ছবিতেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের হঠাৎ একজায়গায় তীক্ষ্ণ, প্রখর আলোয় গম্ভীর, কুহেলিকাময় বিস্ময়কর খেলার প্রমাণ পাওয়া যায়, যার রীতি প্রায় একরকম। রাত্রির অন্ধকারে মশাল বা কুণ্ডের আলো যে বর্ণবিন্যাসের, যে কবিত্বময় ব্যাপ্তি ও উদাত্ত দীপ্তির সৃষ্টি করে তা মুঘল শিল্পী ও রেম্‌ব্রাণ্ট উভয়েই খুব ভালভাবে দেখিয়েছেন।

কিন্তু মুঘল ক্ষুদ্রকায় চিত্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটে। এবং পুরো মডলিং-এর অভাবে, পোর্ট্রেটের মুখ প্রায় সব সময়ে একপাশ বা প্রোফিল করে দেখানর দরুণ প্রায় সব সময়েই ছবিগুলিতে ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরত্ব-জনিত ভল্যুমের অভাব সত্ত্বেও, ছবিগুলি সাধারণত চ্যাপটা বা ফ্ল্যাট হওয়া সত্ত্বেও, এটা স্বীকার করতেই হয় যে আলেখ্যগুলিতে প্রতিপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরূপও হয়েছে সফল, চরিত্রও ফুটে উঠেছে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে।[৫] আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) এবং কিছুটা জাহাঙ্গীরের সময়েও (১৬০৫-২৭) পোর্ট্রেট হত প্রায় সব সময়েই দাঁড়ান অবস্থায়, মুখটি প্রথামত একপাশ বা প্রোফাইল করা, ডান হাত বুক পর্যন্ত তোলা, তাতে হয় একটি ফুল না হয় কোন দুর্মূল্য মণি, এক পা পদক্ষেপের ভঙ্গীতে সমুখে বাড়ান। আস্তে আস্তে এই রীতিদুরস্ত কাঠের পুতুলের মত ভঙ্গী ত্যাগ করে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক ভঙ্গীর রেওয়াজ হল। যে ছবিগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, সে সব ভারত-পারসীক ছবিতে, তাদের মূল পারসীক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হত। সে রীতিতে পরিপূর্ণতা বা

নিটোলভাব একেবারে থাকত না, প্রত্যেক বিষয়ই একেবারে চ্যাপটা, ফ্ল্যাট বা চিত্রের জমির সঙ্গে সমান লেপা অবস্থায় দেখান হত, বিষয়ের চারিদিকের শূন্যের পরিপ্রেক্ষিত হত বর্জন, টোন বা রঙের আভার বিন্যাসে কোন গভীরতা থাকত না, এমন কি বর্ণচ্ছটার স্বর বিন্যাসও থাকত খুব কম। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে এবং তারপর থেকে, ভারতীয় শিল্পীরা এই সমান, চ্যাপটা, ফ্ল্যাট রীতি বদলালেন। তার পরিবর্ত্তে খুব সংযত ভাবে সরু সরু রেখার গোছা দিয়ে সীমারেখার তীক্ষ্ণতা নরম করে দিয়ে আনলেন রঙের গাঢ়-ফিকের আভাস। ফল হল অভাবনীয়। আশ্চর্য কম রেখায় তাঁরা ফিগরকে দিলেন যথেষ্ট পরিমাণে নিটোল পরিপূর্ণতা ; যে জিনিষটি আগে ছিল নিতান্ত দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে চ্যাপটা, সেটি হল গভীর, আর তার চারপাশ দিয়ে হাওয়া খেলে গেল। গোবর্ধন দাস কৃত বাইজীর ছবির উল্লেখ করেছি। এই পরিবর্ত্তনে ছবিতে এল ঘনত্ব, গভীরত্ব, ভল্যুম। ফলে আধুনিক চোখে সতেরো শতকের পোর্ট্রেট হল বিশেষ আদরের বস্তু। অনেকে বলেন এ রীতি এল বিদেশ থেকে, এবং ছায়াতপ বা কিয়ারস্ক্যুরো এল রঙ আর রেখার ক্ষতি করে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ছায়াতপ হয়ত চীন থেকে এসেছিল, কিন্তু প্রকৃত ছায়াতপ বরাবরই ভারতীয় শিল্পীর রঙে ছিল ও আছে ; তার প্রমাণ সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীর ভাস্কর্য ও অজন্তার ছবি থেকে আরম্ভ করে, ফতেপুর সিক্রি ও বাংলার মন্দির পর্যন্ত। অনেকের মতে কিয়ারসক্যুরো আসায় সুকুমার সূক্ষ্ম কাজ এল কিন্তু তার পরিবর্ত্তে বেগবান রেখা গেল স্তিমিত হয়ে, বলিষ্ঠতা গেল দুর্বল হয়ে। পোর্ট্রেট শিল্পে একদিকে যেমন এল অসাধারণ নৈপুণ্য, অন্যদিকে নক্সা আর আল্পনার প্রতিভা গেল ম্লান হয়ে।

পারস্যেও পনেরো শতকের শেষের দিকে তৈমুরিদ চিত্রকলার পরুষ রেখা আর জোরালো রঙ নরম হয়ে ষোল শতকের সাফাবিদ যুগে হল সুকুমার, তনু, মিষ্টি। সতেরো শতকে এই সাফাবিদ রীতিই ভারতবর্ষে আদর পেল, রঙ হল আরও নরম, হিন্দু শিল্পীর হাতে হল আরও পেলব, মার্জিত। ব্লশে নামে একজন ফরাসী সমালোচকের মতে হিন্দুদের রঙ সম্বন্ধে আরও নিখুঁত জ্ঞান ছিল, তাদের তুলিতে সূক্ষ্ম টোন বা রঙের আভার বিন্যাস আসত, রঙ সম্বন্ধে ছিল আরও শুদ্ধ চেতনা। তাঁর মতে হিন্দু শিল্পীরা আবার অনেক সময়ে রঙ বড় বেশী নরম করে দিতেন। তবে তাঁরা এক ধরনের ছাই রঙের আমেজের জমিতে একরঙা ছবি আঁকায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত ; অনেক সময়ে সে রঙ হত খুব ফিকে সেপিয়া, তাতে গোলাপীর সূক্ষ্ম আমেজ। ফল হত যেমন নয়নাভিরাম তেমনি স্বকীয়তার গৌরবে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে চরিত্রচিত্রণে তাঁরা পেলেন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। অনেকের মতে এই ক্ষমতা এল পারসীকদের কাছ থেকে, কারণ এই রীতিতে শ্রেষ্ঠ ছবি হতে আরম্ভ হয় সতেরো শতকের প্রথমার্ধে, তার আগে নয়। পারসীক রীতির কাছে এ বিষয়ে ভারতীয় শিল্পী নিশ্চয় খুব ঋণী, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে যে যেমন নানা রক্ত না মিশলে কোন জাতি বরাবর বলিষ্ঠ, তেজোময়, তীক্ষ্ণধী থাকতে পারে না, তেমনি নানা রীতির নিয়ত আদান প্রদান না

ঘটলে কোন বিশিষ্ট চিত্ররীতিরও অবনতি ঘটে, ক্ষয় হয়। তবুও এই সূত্রে মনে রাখতে হবে যে ছাই-রঙের আমেজের জমিতে একরঙা ছবি আঁকায় ভারতীয় চিত্রশিল্পী অজন্তার যুগ থেকে আরম্ভ করে যামিনী রায় পর্যন্ত বরাবর আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন, এবং এই রীতিই আবহমানকাল ধরে ভারতের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। আর প্রতিকৃতি আঁকায় প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারেও ভারতীয় শিল্পী চিরকালই নিপুণ বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এই নৈপুণ্য সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পায়, মুঘল ক্ষুদ্রকায় পোর্ট্রেটে। ভারতীয় চিত্ররীতিতে চ্যাপটা ফ্ল্যাট নক্সায় প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অবয়ব নিঃসংশয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা কম কৃতিত্বের কাজ নয়। রাজ পরিবারের প্রতিকৃতি দিয়েই মুঘল পোর্ট্রেট শুরু হয়। প্রতিটি পোর্ট্রেটের মাথার পিছনে থাকত জ্যোতি আর অন্যান্য রাজচিহ্ন। কখনও কখনও দু তিন পুরুষ বাদশার ছবিও একত্রে আঁকা হত, একই চৌহদ্দির আলাদা আলাদা খোপে। কিন্তু প্রায়ই একক ছবি হত, রাজা ফুলফোটা সবুজ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে, পিছনে আকাশ বাতাসের রঙে পশ্চাদপট। পরণের কিংখাবে, রত্নখচিত পোশাকে, বহুবর্ণ জামাকাপড়ে শিল্পী পেতেন রঙ ফলানর অকুণ্ঠ স্বাধীনতা, ফলে রঙে যেমন আসত বৈচিত্র্য তেমনি আসত জৌলুস। তাদের প্রসাদগুণ আরও উচ্চকিত করার জন্য মাঝে মাঝে শিল্পী দিতেন মাজা সোনার তবক। গরমের দেশের উপযোগী স্বচ্ছ অভ্রের মত মসলিনের পোশাক আঁকতে তাঁরা ছিলেন অদ্বিতীয় (এক ধরনের মসলিন ছিল তার নামই ছিল চাঁদিনী ফট্‌কা, অর্থাৎ চন্দ্রালোকের তীব্রতা যে কাপড় সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়); সে কাপড়ের স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোত শরীরের অবয়ব আর গায়ের রঙ। সাঁচি, ভারুত, কুশান, অজন্তা আমল থেকেই এই ধরনের কাপড় খোদাইয়ে বা আঁকায় ভারতীয় শিল্পী ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইওরোপীয় চিত্রে প্রথম স্বচ্ছ কাপড় দেখা যায় বতিচেল্লির ছবিতে, যদিও তার বহু আগে থেকেই ঢাকা ইত্যাদি বন্দর থেকে ইওরোপে মসলিন রপ্তানি হত। প্রায়ই পশ্চাদপট হত পাতলা বর্ণহীন আকাশ বাতাসের রঙ, তার সমুখে প্রতিকৃতিটি গাঢ় রঙ আমেজে দাঁড় করান হত। কয়েকটি পোর্ট্রেটে আবার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়: পশ্চাদপটটি গাঢ় কালোয় সমান করে লেপা। কোন আলো ছায়া নেই, কোন ছায়া নেই। চীনে শিল্পীর মতই ভারতীয় শিল্পী ছায়াকে কোনদিনই আয়ত্ত করতে পারেন নি; যেখানেই ছায়া আঁকতে গেছেন সেখানেই বড় অবাস্তব হয়েছে: বস্তুর আকারের সঙ্গে সম্বন্ধ আসেনি, মনে হয় আচমকা কয়েক জায়গায় ধপ ধপ করে গাঢ় রঙ যেমন তেমন ভাবে পড়ে গেছে। রঙের আভার সূক্ষ্ম বিন্যাসে আর সামান্য মডলিংএর ফলে পোর্ট্রেটটি পিছন থেকে জেগে ওঠে। আসলে ছবিটি দাঁড়ায় তার বর্ণাঢ্যতায়, সংবেদক সীমারেখার নৈপুণ্যে আর আলপনার দক্ষতায়।

এ সব হল সাধারণ গুণ বর্ণনা, কিন্তু মুঘল চিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিত্রের যথাযথ্যে, জীবন্ত মানুষটির সমস্ত অবয়বের দক্ষ প্রতি-প্রকাশে। এখানেই শিল্পীর কৌশল দেখা যায় সবচেয়ে বেশী।

মুখ আর মাথার প্রতিকৃতির সুকুমার সম্পূর্ণতায় মুঘল রীতির জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু সেই সঙ্গে এতখানি চরিত্র, ভিতরের মানুষটির মনের ছাপ ঐটুকু ছবির মধ্যে অত ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে অনেক ইওরোপীয় শিল্পীও পারেন নি। চ্যাপ্টা, ফ্ল্যাট, ভল্যুমবিহীন ছবি বলে ইওরোপীয় রীতিতে অভ্যস্ত চোখ সাধারণত প্রথম থেকেই একটু বিমুখ হয়, এসব ছবি মিষ্টি মিষ্টি, নির্জীব, নিছক সুন্দরপানা বলে মনে হয়। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায় মুঘল শিল্পী মনুষ্য চরিত্র কত ভাল বুঝতেন। যেহেতু বাদশার ছবি, সেহেতু শিল্পী হয়ত তাঁর প্রতিকৃতিতে মহান দেবভাব, সর্ববিধ সুলক্ষণে ভূষিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তবুও মনের অগোচরে তাঁর তুলিতে বেরোত আসল চরিত্রের রূপ। কোথাও কোন সূত্রে বেরিয়ে আসত কৃতকর্মের স্বরূপ, কোথাও বা মহান, কোথাও নিতান্ত হেয়, উদার বা নিষ্ঠুর, মুক্তহস্ত বা কৃপণ, সত্যনিষ্ঠ বা মিথ্যাচারী, দৃঢ়স্বভাব অথবা দীর্ঘসূত্রী। অন্বেষী রেখাপাতে পাতে আস্তে আস্তে অমোঘভাবে বেরিয়ে আসত আসল মানুষটি, ধামা চাপা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও।

অধিকাংশ মুঘল পোর্ট্রেটেই মুখ একপাশ করে আঁকা, যাকে বলে প্রোফিল করা। এই ধরনের রীতি-দুরস্ত বিন্যাসে স্বকীয়তা বা বৈচিত্র্য আনা শক্ত, এবং মাঝে মাঝে মুখের $\frac{১}{৩}$ ভাগ বা $\frac{৩}{৪}$ ভাগ যে না এসেছে তা নয়। শরীরটি প্রায় সমুখ থেকে দেখে আঁকা, কিন্তু মুখ ও মাথা প্রোফাইল করা, অর্থাৎ শরীরটি একভাবে দেখে আঁকা, মুখ আর মাথা আরেকভাবে দেখে আঁকা ; দুই ধরনের দুইভাবে দেখা, ছবিতে এসে কাঁধের উপরে ঘাড় মিলিয়ে মিশে গেছে। এই ধরনের রীতি বহু প্রাচীন। ঈজিপশনরা বা অসিরিয়রা যখন রাজা রাজড়ার ছবি আঁকতেন তখন এইভাবে আঁকতেন। আবার যখন সাধারণ লোকের ছবি আঁকতেন তখন মুখের $\frac{১}{৩}$ ভাগ বা $\frac{৩}{৪}$ ভাগ আনতেন। প্রোফাইল আঁকার রীতি বিশেষ করে মুদ্রায় বা পদকে বেশী চলন। অর্থাৎ যেখানেই বিষয়মর্যাদায়, যথা রাজ-রাজড়ার ছবিতে মানুষী মুখে মনুমেণ্টালিটি বা দেবসুলভ অতিকায়ত্ব আনা দরকার, সেখানেই প্রাচ্যশিল্পী ও প্রতীচ্য পদককার প্রোফাইল আঁকতেন, যে রীতির ফলে অবয়বে আসত কাঠিন্য, দুর্নমনীয়তা, দেব-সুলভ অতিকায়ত্বের ব্যঞ্জনা, সম্ভাবনা। তা ছাড়া আর একটি কারণে প্রোফাইল বেশী গ্রাহ্য ছিল। প্রাচ্য ছবির রীতি হচ্ছে মুখ্যত চ্যাপটা, সমান, দৈর্ঘ্য প্রস্থে সম্পূর্ণ, 'অগভীর,' 'ঘনত্বহীন'। তার মধ্যে মড্‌ল করা, চারপাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বা আন্দাজ করা যাচ্ছে এ রকম মুখ বসালে অনেক ক্ষেত্রে ছবির ছন্দ কেটে যাওয়া অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। দৈর্ঘ্য প্রস্থ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমান জমিতে যেমন ভল্যুম বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা অসঙ্গত, তেমনি ভারতীয় ছবির স্তরবিহীন চ্যাপটা ছকে সমুখ থেকে দেখা মুখ অসঙ্গত ঠেকে। তাছাড়া আগেই বলেছি মুঘল ছবিতে আছে ক্যালিগ্রাফি বা লিপি কৌশলের গুণ। ক্যালিগ্রাফির রেখার সঙ্গে খাপ খায় কাটা কাটা, পাশ থেকে দেখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের অবয়ব, সেগুলির সীমা হয়ে দাঁড়ায় রেখা। সেখানে ছবির জ্যামিতিসুলভ রেখানির্ভর মেজাজে প্রাকৃত রূপ

ঠিক খোলে না, অপ্রাকৃত বিন্যাসই ভাল লাগে বেশী। তা না হলে, তার কেটে যাবার মত হয়। কিন্তু মুঘল পোর্ট্রেটে শিল্পীর বাহাদুরিই এই যে যা হতে পারত নেহাতই একটা আবেগহীন নীরক্ত ঢঙ বা অধ্যাত্মবিলাস, তা হল রক্ত মাংসে পুষ্ট একান্ত স্বাধীন চরিত্র।

প্রতিকৃতি হিসাবে চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হত ত বটেই; কিন্তু সেই সঙ্গে এই সব চিত্রের বর্ণিকা-ভঙ্গ বা আঁকার রীতি পদ্ধতির তারিফ না করে পারা যায় না। যাকে বলে ছবির জমি, বা পারসীতে 'তার', সেই প্রস্তুতির ব্যাপারে; রঙের শেডিং বা গাঢ় ফিকে করার ব্যাপারে; এবং রঙ দেওয়া অর্থাৎ পারসীতে যাকে বলে রঙ আমেজি করার ব্যাপারে এই ছবির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। মুঘল ছবিতে সীমারেখা অঙ্কন সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধির ফল। পারসীতে সীমারেখা আঁকার একটি প্রতিশব্দ আছে তাকে বলে তার-কশ করা, অর্থাৎ নক্সা আঁকা। মুঘল ছবি 'তার-কশ' ব্যাপারে অদ্বিতীয় বলা যায়, এবং এতে কতখানি নৈপুণ্য ছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কতকগুলি 'কোরা' ছবি দেখলে। শিল্পী শুধু মাথাটা কালি কলমে খুব মনোযোগ দিয়ে নিখুঁত করে এঁকে, ছবির বাকিটা সামান্য রেখা মাত্র করেই ছেড়ে দিয়েছেন, এ রকম ছবি মুঘল চিত্রের দলিলে অনেক আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত প্রারম্ভিক স্কেচ; আবার অনেকগুলি অসমাপ্ত নক্সা, শেষ পর্যন্ত 'রঙ-আমেজ' করা হয় নি। কিন্তু দুই অবস্থার ছবিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রথম দিকের নক্সার কাজে শিল্পী কতটা যত্ন নিতেন ও পরিশ্রম করতেন। এই সব অতি উৎকৃষ্ট 'কোরা' নক্সায়, যাকে চলতি কথায় বলা যায় আঙ্গুলের নখ দিয়ে আঁকা স্কেচে, স্পষ্ট বোঝা যায় রেখা কত অভ্রান্ত হতে পারে, মডলিং হতে পারে কত উদাত্ত, ব্যাপ্তিময়, অথচ সূক্ষ্ম, সমগ্র কাজই কত উৎকৃষ্ট। এদের যে কোনটিকে কয়েক গুণ বড় করলেও এদের বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব একটুও খর্ব হয়না।

পরিপাটি করে সম্পূর্ণকরা ছবিগুলিতে, উপরদিকে পালক আর রত্নখচিত উষ্ণীষ আর তলার দিকে মনিমুক্তার হার শোভিত গলার উপরে সূক্ষ্ম কাজ করা মুখ আশ্চর্যভাবে খোলতাই হত। সম্রাট বা রাজপুত্রদের ছবির বেলায় মাথার পিছনে আঁকা হত সোনালি জ্যোতি, তাতে সমস্ত ছবিতে আসত গাম্ভীর্য আর সম্ভ্রম। শরীরের পশ্চাদপট সাধারণত হত সাপটা সোনালি-সবুজ রঙের লেপ, উপরের দিকে সেটি আস্তে আস্তে আকাশের নীল বা তামাটে রঙের সঙ্গে মিশে যেত। ছবির নীচের দিকে প্রতিকৃতিটি ছোট বাগানের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড় করান হত। পায়ের চারপাশে কয়েকটি ফুল ছড়িয়ে দিয়ে কম্পোজিশনের কঠোরতা একটু ভেঙ্গে দেওয়া হত। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে শিল্পীর আসল উদ্দেশ্য থাকত খুব সাধারণ মামুলি সাপটা পটভূমির উপরে সাজ সজ্জার বর্ণাঢ্যতা ও দেহের বিভূতি ফুটিয়ে তোলা। ঋজু, কঠোর, সরল ভঙ্গিমা ও রীতির মধ্যেও চিত্রশিল্পী ছবির মধ্যে হাতের স্বাভাবিকত্ব, কোমলতা, ফুটিয়ে তুলতেন আশ্চর্যভাবে। ছবিতে হাত এঁকে তাকে যেন কথা কওয়াতে পারতেন। হাত আঁকার কথা অজন্তার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি। তাতেই মনে হয় একেক দেশে

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা শক্তি, শিল্পীরা যেন রক্ত ও জল হাওয়ার মধ্যে দিয়ে পুরুষ পরম্পরায় পান।

অধিকাংশ মুঘল প্রতিকৃতিই মনে হয় চোখে দেখে আঁকা। এ সমস্ত ছবির সংগ্রহে সম্রাট, বিদূষক, রাণী, বাইজী, রাজপুত্র, সাধু সন্ত ফকির, পীর, সৈনিক, পাত্র অমাত্য, ভিস্তি, সহিস, সব যেন ভীড় করে চিত্রশালায় স্তম্ভিত হয়ে আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদিকে যেমন চরিত্রচিত্র নেই বললেই হয়, অন্যদিকে মুঘল চিত্রশিল্পীর হাতে তার অভাব ঘুচে গেছে। চিত্রশিল্পে এসেছে চরিত্র-চিত্রের অসীম বৈচিত্র্য। শুধু তাই নয় শিল্পীর প্রতিভা অন্য বিষয়েও সাফল্য সিদ্ধি লাভ করে। পূর্বযুগে কোন বিখ্যাত বীর কি রকম দেখতে ছিলেন, মুঘল শিল্পী হয়ত তাঁর বর্ণনা শুনে অথবা পুরনো ছবি নকল করে সেই বীরকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতেন, লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে যার সস্তা নকল চল হয়ে যেত। আধুনিক কালের হেতুয়ার রেলিংএ ঝোলান ওলিওগ্রাফের চেয়ে সেগুলি নিশ্চয় চিত্র হিসাবে হত অনেক উৎকৃষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় পারস্যের স্বর্ণযুগের রূপকথার যুবরাজ ঈরেজের ছবির অথবা চেঙ্গিজ খাঁর ; অথবা হজরৎ মহম্মদের জামাই ইমাম আলির। শিল্পীর হাতে আঁকা এঁদের ছবি অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাওয়া যেত। এমন কি অল্প কিছু বছর আগে পর্যন্তও পাঞ্জাবে মাথায় গ্রীক শিরস্ত্রাণ পরা আলেকজাণ্ডারের ছবি হরদম পাওয়া যেত।

মুঘল সম্রাট, আমীর ওমরাদের ছবি বহু আছে। দারা শিকোর অ্যালবামে জাহাঙ্গীরের কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি আছে। একটি ছবিতে শিল্পী মহম্মদ খাঁয়ের সহি আছে। জাহাঙ্গীর বাদশার দরবারে কিরকম মদ্য পান ও আমোদ আহ্লাদ চলত তা এই ছবিটি থেকে বোঝা যায়। ছবিটির বিষয় হচ্ছে একটি যুবক, পরণে উজ্জ্বল হল্‌দে পোষাক, মাথায় বড় সবুজ পাগড়ী, একটি ফুলের পাত্র আর তার পাশে সোনার থালার উপর চারটি মাটির পাত্রের সমুখে হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতের রত্নখচিত মদের পাত্র থেকে বাঁ হাতের বাটিতে মদ ঢালছে। ছবিটিতে রঙের কোন রকম গাঢ় ফিকে করা নেই। আকবরের ছবি এত আছে যে গুণে শেষ করা শক্ত। বৃটিশ মিউজিয়মের একটি ছবিতে সম্রাট আকবর পাশে শিশুপুত্র সলীম (জাহাঙ্গীর) কে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে দরবারে সমাসীন আকবর একটি নারীর আবেদন শুনছেন। এই ছবিটিতে আকবরের সব বিখ্যাত অমাত্যদের প্রতিকৃতি আছে, উপরে খুব ছোট অক্ষরে প্রত্যেকের নাম লেখা। ১৮১৬ সালে

ডাক্তার বুকানন হ্যামিলটন জন্সন সংগ্রহে একটি খণ্ড (৫৭ নং) উপহার দেন। তাতে রাজপুরুষ, আমির ওমরাদের তিপ্পান্নটি ছবি আছে। তার মধ্যে আকবরের দরবারের আবুল ফজল, বীরবল, মানসিংহের ছবিও আছে; চিত্রগুলি মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি করে আঁকা। ঐ সংগ্রহেই ৫৮ খণ্ডের ছবিগুলি আরও সম্পূর্ণ করে আঁকা; এর মধ্যে ১৮নং ছবিটি মিশকিনের তুলির। ই-বি হ্যাভেল তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিং' বইয়ে কয়েকটি ছবি দিয়েছেন, একটি একজন ওমরার, নাম ইতিকাদ খাঁ; দ্বিতীয়টি একটি বৃদ্ধের; তৃতীয়টি শিরাজের কবি সাদীর (কিংবদন্তী অথবা খুব পুরনো কোন ছবির উপর নির্ভর করে আঁকা); চতুর্থটি শিল্পী নাহ্নার আঁকা, অমর সিংহের ছেলে সুরজমলের প্রতিকৃতি। শেষোক্ত ছবিটির সামান্য উল্লেখ আগেই করেছি।

মুঘল রাজত্বের প্রথম দিকে পোর্ট্রেট শিল্প ছিল অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ তাঁরাই খরচ জোগাতে পারতেন। কিন্তু শীঘ্রই জনসাধারণের মধ্যে এর বহুল প্রচার হল। অল্প দামের প্রতিকৃতির চাহিদা খুব বাড়ল। ফলে পোর্ট্রেটশিল্প ব্যবসায়ে দাঁড়াল। কারিকররা কোন বিখ্যাত ছবির সীমারেখাটি কাগজে নকল করে নিতেন এবং সেই নকলটি নতুন ছবি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করতেন। নতুন নকল করতে হলে তাঁরা আঁকা কাগজটি নতুন কাগজের উপর ফেলতেন, তারপর তার সীমারেখার উপর সরু কাঠি দিয়ে হাতের জোরে তলাকার কাগজে রেখায় রেখায় বুলিয়ে দাগ ফুটিয়ে দিতেন। তারপর সেটি ভাল করে এঁকে রঙ করে দিতেন। এইভাবে 'শিল্পীর' কাজ হয়ে গেল, হাজারে হাজারে ছবি তৈরি হতে লাগল। দাগ বুলিয়ে বুলিয়ে নকল করতে করতে আসল ছবির রেখায় রেখায় ফুটো ফুটো হয়ে যেত। কিন্তু যেগুলি জীর্ণ হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে যায়নি তাদের সুকুমার, সূক্ষ্ম কাজ আর রেখার স্বাচ্ছন্দ্য দেখলে অবাক হতে হয়।

সাধারণত মুঘল পোর্ট্রেটে চিত্রিত লোকের নাম লেখা থাকত। অনেক লোকের ছবিতে, যেমন দরবারের চিত্রে, প্রত্যেক লোকের মাথার উপরে তার নাম লেখা হত। অনেক সময়ে ছবির উল্টো পিঠেও লেখা থাকত। কিন্তু সব সময়ে যে ঠিক ঠিক লেখা হত তা নয়। যেমন ঔরঙ্গজেবের কিছু ছবি আছে যাতে লেখা আছে জাহাঙ্গীর, যদিও দুজনের অবয়ব সম্পূর্ণ আলাদা। কোন কোন ক্ষেত্রে ছবির দর বাড়াবার জন্য ইচ্ছা করেই ভুল নাম লেখা হত।

এখন ছবি কিভাবে কিসের উপর আঁকা হত তা সংক্ষেপে আলোচনা করার আগে মুঘল প্রাসাদে বা সরকারী বেসরকারী সৌধগুলির কাঠে বা পাথরে কী সুন্দর তেল রঙ অথবা নানারঙের দামী পাথর খচিত করে নক্সা বা ছবি করা হত, তার সামান্য উল্লেখ দরকার। এই সব নক্সা বা ছবির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন মেলে ফতেপুর সিক্রিতে, আগ্রা দুর্গে, আর তাজ মহলে। ফতেপুর সিক্রির কাঠের কাজে বা কাঠের গায়ের চিত্রে, আগ্রার দরবার-ই-আমে এবং অন্যান্য বাড়ীতে, ইতিমাদ দৌলায় বা তাজমহলে, কাঠে বা পাথরে যে সব রঙীন নক্সা বা ছবির কাজ আছে তার আল্পনার বাহাদুরি,

চিত্রের ভাস্বর ব্যঞ্জনা, রঙের বিচিত্র জৌলুস অবিশ্বাস্য রকমের নিপুণ ও সুন্দর। স্পষ্টই বোঝা যায়, নিশ্চয় কোন চিত্রশিল্পী সমস্তটা আগে রঙে এঁকে দেখে নিয়েছিলেন চিত্র হিসাবে সেগুলি কি রকম দেখাবে, তারপর সেগুলি তুলে দিয়েছিলেন কাঠের মিস্ত্রী বা পাথরের মিস্ত্রীর হাতে, সেগুলি করে দেখানর জন্য। প্রথম যুগে তুলোর কাপড়ের উপরে আঁকা, দেয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো, বা খুব পাতলা চামড়ার (ইংরেজিতে যাকে বলে পার্চমেণ্ট বা ভেলাম) উপরে আঁকা ছবি বা আধুনিক যুগে হাতীর দাঁতের উপর আঁকা ছবি ছাড়া, বাকি মুঘল ছবির প্রায় সবই কাগজের উপর আঁকা। সিল্কের উপরে চীনে রীতিতে আঁকা ভারতীয় ছবি প্রায় নেই বললে ভুল হয় না। সীমারেখার গণ্ডীর মধ্যে সব বস্তু-বিষয়ের রূপই আবদ্ধ, সব প্রাচ্য চিত্রশিল্পীর মত ভারতীয় শিল্পীও এ ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ বলে মানতেন, ফলে তাঁদের প্রথম কাজই হত আগে বিষয়ের সীমারেখাটি ভাল করে এঁকে নেওয়া। সাধারণ পুঁথির জন্য ছবি আঁকতে হলে আগে ছবির জমি তৈরি অর্থাৎ ফারসীতে যাকে বলে 'তার' করে নেওয়া হত। তারপর ব্রশে'র মতে সীমারেখাটি সরাসরি লাল বা কাল খড়ি দিয়ে আঁকা হত। একে ফারসীতে বলত 'তার কশ' করা, অর্থাৎ রেখাচিত্র করা। তারপরেই অংশগুলিতে রং দেওয়া হত, তাকে বলত রঙ আমেজ করা। এইভাবে চিত্রনির্মাণের সম্পূর্ণ কাজটিকে ফারসীতে বলত 'আমল' করা। বহুমূল্য পুঁথির ছবি আরও বিশদভাবে আঁকা হত। আগে ছবিগুলি আলাদা কাগজে সম্পূর্ণভাবে আমল করে পরে আঠা দিয়ে পুঁথির খালি জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হত। যে কাগজে ছবি হবে সেটিতে বাব্‌লার আঠা জাতীয় গঁদ মিশিয়ে খুব মিহি করে একটি আস্তর বা প্লাস্টার লাগান হত। এইভাবে হত কাগজ তার করা। এই রকম করে তৈরি মসৃণ জমির উপর ছবির সীমা রেখা আঁকা হত, বা তার কশ করা হত। তারপর ছবির সীমারেখার অংশে অংশে, জলে অস্বচ্ছ রঙ মিশিয়ে, লেপের উপর লেপ লাগিয়ে ছবিতে রঙ করা হত, ঠিক তেল রঙের কাজের মত ; তবে তফাৎ এই যে তেল রঙে ভুল হলে চেঁচে ফেলে দিয়ে ফিরে ফিরতি রঙ লাগান যায়, কিন্তু মুঘল রীতিতে একবার রঙ লাগানয় ভুল হলে আর উপায় থাকত না। ছবিতে যেখানে মণিমুক্তা বা অন্য অলঙ্কার দেখাতে হবে সেখানে অল্প গর্ত গর্ত করে ছুঁচের মুখে করে সোনার তবক অথবা মুক্তা বা হীরাচূর্ণ লাগিয়ে দেওয়া হত। সমস্ত কাজটি অতি নরম সূক্ষ্ম, কাঠবেড়ালীর লোম দিয়ে তৈরি তুলিতে করা হত। তার মধ্যে আবার যে সব কাজ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হত সেগুলি এক লোমের তুলি দিয়ে করা হত : একে বলত এক-বাল্ কলম। এই এক-বাল্ কলম দিয়ে রঙ দেওয়া কত কঠিন ধৈর্যের কাজ তা আজকের দিনে শুধু অনুমানই করা যায়। পুরাকালের গ্রীক শিল্পী অপেলিজের সূক্ষ্মরেখাসৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতার গল্প 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্র-কলা'য় করেছি, জার্মান শিল্পী ডিউরর সাধারণ তুলিতে কত সূক্ষ্ম চুল বা দাড়ি একটি একটি করে আঁকতে পারতেন তাও সে বইয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবিতে একবাল কলমের রেখার কাছে ডিউররের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাও দড়ি বা কাছির মত মোটা দেখায়। সুতরাং আন্দাজ করা

শক্ত এই তুলি চালাতে গেলে হাত কত স্থির, চোখ কত তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। লণ্ডনে যে সব সংগ্রহ আছে তাতে অনেক ছবি অসম্পূর্ণ বা কোরা অবস্থায় পরিত্যক্ত দেখা যায়, সেই সব পুরো 'আমল'-না করা ছবি খুব শিক্ষার বিষয়, সেগুলি খুঁটিয়ে দেখলে ধারণা হয় ছবি কি ভাবে প্রথম থেকে ধাপে ধাপে নির্ম্মাণ করা হত।

একটু আগেই বলেছি অনেক পোর্ট্রেটের এক বা ততোধিক নকল প্রায়ই পাওয়া যায়। হত কি, শিল্পী একটি কাগজে বা চামড়ার উপর প্রতিকৃতিটি এঁকে রাখতেন, এবং তার প্রতিটি অংশে কোথায় কি রঙ পড়বে তা হয় সেই সেই রঙ দিয়ে চিহ্ন করে রাখতেন না হয় খুব ছোট ছোট অক্ষরে লিখে রাখতেন। তাতেই বোঝা যায় নকলগুলি কত সযত্নে, নিখুঁতভাবে তৈরি হত। অনেক শিল্পীর বাড়ীতে এই রকম গোছা গোছা ট্রেসিং (ঠিক যেমন আজকাল ছুঁচের কাজের বই পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছবির কোথায় কোন রঙের সুতা ব্যবহার হবে তারও নির্দ্দেশ থাকে) কাগজ বা চামড়া বংশ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। এই রকম নক্সা করা চামড়াকে বলত চর্‌বা ; চামড়া থেকে অন্য কাগজে নক্সাটি তোলা হত সীমারেখা পাতে পাতে ছুঁচ দিয়ে ফুটো ফুটো করে ; ঠিক যেমন জন্তুজানোয়ারের খাবার নখে ফুটো হয়, একে ইংরেজিতে পাউন্স করা বলে। তারপর সেই ফুটোর উপর মিহি করে গুঁড়োন কাঠ কয়লা ঘষে তলার কাগজে দাগ ফুটিয়ে তোলা হত।

এইভাবে সীমারেখাটি ভাল করে আগে এঁকে নিয়ে, পরে তার অংশে অংশে সুপরিকল্পনা-মত রঙ দেবার রীতির ফলে শিল্পীরা শীঘ্রই নিজেদের কাজ ভাগ করে ফেললেন। একদলের কাজ হল বুলিয়ে বুলিয়ে কাগজে সীমারেখা তোলা, আরেক দলের কাজ হল সেগুলিতে রঙ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের আকবর-নামায় অধম খাঁর মুণ্ডচ্ছেদ চিত্রে, রেখা আঁকেন মিশকিন, রঙ দেন শঙ্কর। অনেক সময়ে একই ছবি তিনজন শিল্পী হাত মিলিয়ে 'আমল' করতেন। আবার অনেক ছবিতে চারজনও থাকতেন। যেমন আকবর-নামায় একটি দরবার চিত্রে 'তার কশ' করেন মিশকিন, রঙ আমেজ করেন সারওয়ান ; মুখাবয়ব আঁকেন (চিরা-নামি করা বলত) তৃতীয় এক শিল্পী তাঁর নাম ঠিক পড়া যায় না ; প্রতিকৃতিগুলির মুখ ছাড়া শরীরের বাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (ফারসীতে বলত সুরত) আঁকেন মাধো। ঠিক কি ভাবে বা ধরনে কাজ ভাগ হত, আন্দাজ করা শক্ত। তবে মনে রাখলেই হয় যে র‍্যাফেইল বা রুবেন্সও অনেক সময়ে ছবির মুখগুলি আঁকতেন নিজে, বাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আঁকত তাঁদের ছাত্ররা। কিন্তু এটা ঠিক যে একই ছবিতে একাধিক শিল্পী কাজ করলে সে ধরনের চিত্ররীতি দ্রুত কারিগরির পর্যায়ে নেমে আসে, নিছক স্বয়ম্বশ সৃষ্টির তাগিদ বা প্রাণ তাতে থাকে না। আস্তে আস্তে প্রাণহীন নিপুণ কারিগরি হয়ে দাঁড়ায়। আর হয়েছিলও তাই। অধিকাংশ মুঘল ছবি নিছক নৈপুণ্যের প্রমাণ বয়ে বেড়ায় ; তাতে প্রাণ নেই, দর্শকের মনে নাড়া দেয় না ; আবেগহীন, সুষ্ঠু, ঠুনকো, সুন্দরপানা অলঙ্কার বা গৃহসজ্জাতেই তার মূল্য শেষ হয়।

লিপিশৈলী বা ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে ক্ষুদ্রকায় ছবির যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা এক কথায় বলে শেষ করা যায় না। অতি বিচিত্র, সুন্দর, চিত্রপ্রায় অক্ষর লিখে লিখেই যে চীনে শিল্পীরা রেখায় রূপ, চিত্রের অবশ্যম্ভাবিতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি অক্ষরের চিত্ররূপ, সংহত বেগবান গতি কি করে অক্ষরের রেখার মধ্যে স্তব্ধ রাখতে হয়, কি করে লেখার স্রোত চিত্রের আবর্ত সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান হস্তলিপির চর্চা থেকেই আসে ; চীনে যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে মধ্যপ্রাচ্যে, তিব্বতে, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী উড়িষ্যায় এবং কিছুটা বাংলাদেশে। ইওরোপেও চিত্র ও লিপিশৈলীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। এমনকি আধুনিক যুগে নন্দলাল বসুর সুনিপুণ সৌকুমার্য ক্যালিগ্রাফির গুণাগুণের উপর একান্ত নির্ভর একথাও বলা যায়। একথা বোধ হয় অনস্বীকার্য যে যেজাতির বর্ণলিপি যত চিত্রপ্রায় ও চিত্রধর্মী সেজাতির পক্ষে সার্থক চিত্র নির্মাণ তত সহজ হয়েছে, যেমন সম্ভব হয়েছে চীনেদের, এবং আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী উড়িয়াদের। উড়িয়া বর্ণলিপি এত চিত্রানুগ বলেই বোধ হয় উড়িয়ার পক্ষে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষে সব চেয়ে বড় শিল্পীর জাতি হওয়া সম্ভব হয়। ঠিক যেমন হয়েছে তিব্বতীরা, তাদের বর্ণলিপির সাহায্যে।

আবুল ফজল ক্যালিগ্র্যাফি আর চিত্রাঙ্কণের মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ ভাল মত বুঝতেন, তাই তিনি তাঁর ৩৪নং আইনে দুই বিষয়েরই আলোচনা একত্রে করেন। এমন কি তিনি ক্যালিগ্রাফির আলোচনাকেই বেশী প্রাধান্য দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে যেখানে তিনি আলোচনা করলেন সাত পৃষ্ঠা ধরে, চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে সেখানে তিনি লিখলেন মাত্র দুই পৃষ্ঠা। লিপিশিল্প সম্বন্ধে তাঁর ভূমিকাটি খুব হৃদয়গ্রাহী :

"আমরা যাকে রূপ বলি তাকে ধরে আমরা দেহে পৌঁছই ; দেহ আবার আমাদের শেখায় কাকে বলে ধ্যান, কাকে বলে ধারণা। যথা, আমরা অক্ষরের রূপ দেখে অক্ষরটিকে, কথাকে চিনি, তার থেকে ধারণায় পৌঁছই। লোকে যাকে ছবি বলে তার বেলায়ও একথা খাটে। কিন্তু যদিও এটা ঠিক যে চিত্রশিল্পীরা, বিশেষ করে ইওরোপীয় শিল্পীরা, এমন ছবি আঁকতে পারেন যার থেকে মানুষ কি ভাবছে, চিন্তা করছে, অনুভব করছে তার মনের অবস্থা কী রকম, স্পষ্ট বোঝা যায়, যার ফলে ছবিকেই বাস্তব বলে মনে হয়, তবুও এটা স্বীকার করতেই হয় যে চিত্র অক্ষরের চেয়ে নিকৃষ্ট, কারণ অক্ষরের মাধ্যমে আমরা যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানের হদিশ পাই। অক্ষর জ্ঞানের আকর।

"আমি প্রথমে লিপিশিল্পের কথা বলব, কারণ লিপি আর চিত্রের মধ্যে লিপিই বেশী মূল্যবান। সম্রাট দুটি শিল্পের উপরই খুব নজর রাখেন, কারণ তিনি নিজে রূপ ও ধ্যান ধারণা দুইয়েরই উৎকৃষ্ট বোদ্ধা।

"সত্য কথা বলতে, শুদ্ধ সুন্দরের যাঁরা উপাসক, তারা অক্ষরে আলোর জ্যোতি দেখতে পান,

আর যাঁরা দার্শনিক তাঁরা—জমশেরের বাটিতে যেমন সৃষ্টির ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান ধরা পড়ত—অক্ষরের মধ্যে সব দেখতে পান। অক্ষরের মধ্যে থাকে জাদু, যেন আবিষ্কারের কলম থেকে অধ্যাত্মরূপী জ্যামিতির মত বেরোয়, অদৃষ্টের হাত থেকে স্বর্গের বাণীর মত, এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে বীজমন্ত্র ; অক্ষর হাতের জিভ। যারা কাছে থেকে শোনে তাদের হৃদয়ে মুখের কথা ঢুকতে পারে ; কিন্তু যে যেখানেই থাকুক সকলের কাছেই লেখার অক্ষর জ্ঞানের কথা পৌঁছে দেয়। অক্ষর জ্ঞানের প্রতিকৃতি এঁকে যায় ; ধ্যান আর ভাবজগতের যেন স্কেচ করে দেয় ; কালো রাত্রির মধ্যে দিয়ে আনে দিন ; এ যেন জ্ঞানগর্ভ কালো মেঘ ; অন্তর্জগতের ধনদৌলতের চাবিকাঠি ; বোবা অথচ মুখর, নিশ্চল অথচ ভ্রাম্যমান ; কাগজের উপর ছড়ান, অথচ উর্দ্ধ গগনে উড্ডীয়মান।"

চীনে ও জাপানী ক্যালিগ্রাফির গুণেই যে চীনে বা জাপানী চিত্রে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত রেখার স্রোত ও স্বচ্ছন্দ গতি, রেখাচিত্রে এসেছে অসীম বৈচিত্র্য, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। চীনে কত রকমের রেখাচিত্রের ধারা আছে চট করে বলা শক্ত, কিন্তু জাপানে সচরাচর দশটি বিভিন্ন ধারা অনায়াসে নজরে পড়ে, আর প্রত্যেকটি ধারাই এক একটি বিশেষ রূপসৃষ্টির বাহক। ঠিক এইভাবে পারসীক আর মুঘল লিপিশিল্পের সঙ্গে মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবিতেও এসেছে এক বিশেষ চরিত্র। সে চরিত্রে হয়ত চীনে ছবির স্বচ্ছন্দ স্রোত ও সাবলীল গতি নেই, কিন্তু আছে সুকুমার পেলব স্পর্শ, নিশ্চিন্ত, নিখুঁত রেখা।

ছবি আঁকার বিষয়ে মুঘল চিত্রশিল্পী উপকরণ ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে হতেন। মধ্য যুগে ভারতবর্ষে ছবি আঁকার উপযোগী কয়েক রকম দামী কাগজ তৈরি হত। এক রকম কাগজের নাম ছিল হরিরি (ওরফে রেশমী)। এটি সিল্কের মত কাগজ হত, কিন্তু কিছুদিন পরে ফেটে যেত। হায়দ্রাবাদের দৌলতাবাদে দৌলতাবাদী বলে এক রকম বিখ্যাত কাগজ হত। হিন্দী বলে সাধারণ কাগজেরও বেশ চলন ছিল। পরবর্তী যুগে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে তৈরি শিয়ালকোটী কাগজও খুব চলত। দক্ষিণ ভারতে মুঘলী বলে এক ধরনের কাগজ খুব চলত, নাম শুনে বোঝা যায় উত্তর রীতির কি রকম চলন ছিল। আরেকটি ভাল কাগজ হত মহীশূরে, তাকে বলত কার্‌দে। বাঁশ থেকে যে সব কাগজ হত তাকে বলত বাভসাহা বা ভাঁশি কাগজ। পাট বা টাট থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত টাটাহা। তূলা থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত তূলোট কাগজ। আরেকটি কাগজ শণ থেকে হত, তাকে বলত শুন্নি কাগজ। ঈরাণী আর ঈস্পাহাণী বলে দুটি বিদেশী কাগজের খুব নামডাক ছিল। এর মধ্যে অবশ্য কোন কাগজই ধবধবে সাদা হত না, একটু হলদেটে হত। কাগজ পছন্দ হবার পর শিল্পী দুই বা ততোধিক কাগজ একের উপর আরেক আঠা দিয়ে জুড়ে পুরু করে নিতেন। অবশ্য পুঁথিচিত্র এক তা কাগজেই আঁকা হত। কাগজের জমিটি গোল নুড়ি দিয়ে মসৃণ করে নেওয়া হত, ফলে মিনে'র মত পালিশ উঠত। এইভাবে জমি 'তার' করে নিয়ে রেখার সাহায্যে নক্সা করা হত, অর্থাৎ 'তার কশ' করা হত। রাজপুত ছবিতে যে ভাবে নক্সা করা হত বলেছি সেই ভাবেই হত।

গেরু দিয়ে প্রথম রেখাচিত্রটি হত ; ইচ্ছে করলেই এটি মুছে ফেলা যেত। তারপর ভুসোকালি দিয়ে রেখাটি ভাল করে আঁকা হত। ভুসোকালি তৈরি হত শর্ষেতেলের প্রদীপের উপর কর্পূরের কাজল করে। চিত্রশিল্পীরা নিজেদের রঙ নিজের হাতে তৈরি করে নিতেন, আজও অনেক শিল্পী যেমন করেন। নানারকম গাছগাছড়া বা মাটি পাথর থেকে রঙ তৈরি হত। গালা থেকে হত আল্‌তা রঙ ; হেনার পাতা থেকে হত কালচে ব্রাউন রঙ ; মুলতানী মাটি থেকে হত হলুদ রঙ ; সাদা হত কাশগর থেকে আনা একরকম মাটি থেকে ; লাল হত হরম্‌চি বা গেরু থেকে ; সিঁদুরে রঙ হত সিঁদুর মাটি থেকে ; আশমানি রঙ হত বাদাক্‌শান থেকে আনা ল্যাপিজল্যাজুলাই বা লজওয়ার্দ থেকে, বা নীল থেকে ; হলুদ হত হরতেল, মূলতানী মাটি, পিউরি বা ঢাক ফুলের রস থেকে (ঢাক ফুলের রসকে বলত নক্‌লী পিউরি)। সবুজ জাঙ্গাল বা জাঙ্গার গুঁড়ো থেকে, অথবা নীল আর হরতেল মিশিয়ে, জলপাই সবুজ, অথবা মুগ সবুজ, অথবা তরমুজি সবুজ হত ভুসো, হরতেল আর নীল মিশিয়ে। বেগ্‌নে বা পার্পল হত সিঁদুর আর নীল মিশিয়ে। গাঢ় পার্পল হত ভুসো আর হরমুজি মাটি মিশিয়ে (হরমুজি মাটি পারস্যোপসাগরের হরমুজ দ্বীপ থেকে আসত)। সোনার তবক খুব ব্যবহার হত। পারসীকরা তিসির তেলের সঙ্গে সন্দরক মিশিয়ে একরকম স্বচ্ছ বার্নিশ করতেন।

মুঘল বা রাজপুত চিত্রের নির্মাণ রীতি প্রায় একরকম। প্রথমে হত মধ্যস্থলের প্যানেলটি, যেখানে ওস্তাদ শিল্পী মূল ছবিটি আঁকতেন। ছবির পাড় আঁকতেন আরেকজন শিল্পী, সে সম্বন্ধে আগেই বলেছি। মধ্যস্থলের প্যানেলটি, অর্থাৎ যাকে বলে আসল 'তসবীর'টি, একটু একপাশ করে দেওয়া হত, যাতে ছবিটিতে বিশেষ মাধুর্য ও স্বাভাবিক ভঙ্গী আসে। তসবীরের চারপাশের পাড়কে বলত হাশিয়া। যেখানে হাশিয়া এসে তসবীরের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে সরু নক্সা করা একটি পটি হত, তার সঙ্গে হত দুটি রঙীন রেখা। পটিকে বলে ফুলকারি বা বালে ; রঙীন রেখা দুটিকে বলত যাদবাল বা খাট। ফুলকারি বললে বুঝতে হবে এখানে ওখানে ফুল দিয়ে অলঙ্কৃত করা, কিন্তু বালে বললে বুঝতে হবে একটি নক্সা একটানা ঘুরে ঘুরে গেছে। হাশিয়ার সমস্ত প্রস্থটি সাধারণত ফুটকি ফুটকি সোনা দিয়ে ভর্তি হত। এই সোনার ছিট যখন ঠিক নিয়ম করে একের পর এক পড়ত তখন তাকে বলত টিক্কি (কপালের টীকা থেকে কথাটা এসেছে) আরও ছোট ছোট সোনার ফুটকিকে বলত শাফাক, আর খুব মিহি ছিট ছিট সোনাকে বলত গুবারা। এই ধরনের সোনার চুমকির কাজ হত দুই উপায়ে ; হয় কড়া তুলি দিয়ে ভিজে সোনা রঙ ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে, না হয় একটি ছোট্ট ন্যাকড়ার থলিতে মিহি করে গুঁড়োনো সোনা ভরে তাই ছবির উপর থুপে থুপে। তবে থোপবার আগে ভাতের পাতলা মাড় জল দিয়ে জমিটি তৈরি করে নিতে হত। হাশিয়া যখন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরে দেওয়া হত (এ হত সব চেয়ে দামী ছবিতে) তখন এর নাম হত ঝাড়।

ছাগল, উট, কাঠবেড়ালী, নেউলের লোম থেকে তুলি তৈরি হত (সিংহলে টেলিটানা বলে

একরকম ঘাস দিয়ে তুলি তৈরি হত।) ছবিতে মণি মুক্তা চূর্ণও দেওয়া হত। একে বলত 'জারা' করা। মণি মুক্তা সাধারণত লাগান হত উষ্ণীষে, সাজসজ্জায় বা অলঙ্কারে। শুধু জলের ব্যাপারও ছিল নানা রকম। এক ধরনে জল দেওয়া হত, তাকে বলত আবিনা; শুধু জল বুলিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হত, কাগজে জলের দাগ থেকে যেত। সেই দাগ ধরে নক্সা আঁকা হত। কাশ্মীরী চিত্রশিল্পীরা একটি পাত্রে জল রেখে, সেটি শুকিয়ে গেলে তলায় যে সাদা লবণ পড়ে থাকত, তাই দিয়ে চিরা-নামি করার সময়ে ছবির মুখে রঙের এক অদ্ভুত আমেজ আনতেন। প্রায় সব রঙই জল রঙ হত তবে জলের সঙ্গে গঁদ, কষ, আটা, গুড় বা তিসির জলও মেশান হত। সাধারণত কাগজে ছবি আঁকার রীতি থাকলেও ক্যানভাস বা চটেও ছবি আঁকা হত। ক্যানভাসে আঁকার রীতি বেশ প্রাচীন ছিল; চটে আঁকা হামজা-নামার ছবি এখনও ইওরোপের নানা জায়গায় রক্ষিত আছে। কিন্তু চটে আঁকার রেওয়াজ খুব বেশী ছিল না, উপরন্তু তেল রঙের ব্যবহার ছিল না বললেই হয়।

মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা একটু বড় হয়ে গেল। অনেকে বলেন মুঘল চিত্ররীতি ভারতীয় ঐতিহ্যে একটি উপাখ্যান; দেশজ শিল্পের পাকা সড়ক নয়। এটা বোধহয় বলা নিতান্ত ভুল। কারণ আমরা দেখেছি কি করে মুঘল চিত্রনীতির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পী এক বিদেশী নীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও পরিপাক করে, আত্মসাৎ করে নিলেন। মুঘল রীতিকে উপাখ্যান বলা আর মুসলমান যুগকে বিদেশী যুগ বলা একই রকমের ভুল হবে। মুঘল চিত্র নিতান্ত ভারতীয় চিত্র। অন্নজল যখন শরীরে রক্ত হয়ে যায় তখন ত আর তা অন্নজল থাকে না।

এখন আমরা সংক্ষেপে মুঘল চিত্রকলা পরবর্তী যুগে ভারতের চতুর্দিকে কি রকম অপভ্রংশে পরিণত হল তার সামান্য বিবরণ দেব। প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে পাণ্ডিত্য দেখাবার জায়গা এটা নয়। কারণ পরবর্তী যুগে, আগে যা ছিল শিল্পপ্রতিভা তা অনেকাংশে হয়ে গেল নিছক ঠাট, বা রীতিপদ্ধতি বা কারিগরি নৈপুণ্য। চিত্রগুণ গেল কমে, স্থানীয় গৌণ বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু এল স্থান-মাহাত্ম্যের মুদ্রাদোষে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যের জরায় প্রতিভা গেল স্তিমিত হয়ে। তা সত্ত্বেও আঠারো শতকে মুঘল চিত্রে বন্ধ্যাত্ব এল বলা যায় না, কারণ এই শতকের চিত্রে এক ধরনের কাব্য রস দেখা যায় যাকে রোমান্টিসিজ্‌ম্ বলা যায়। এই গুণ বোধ হয় আসে রাজপুতানা থেকে। সম্রাট বাহাদুর শাহের শীকার চিত্র কতকগুলি আছে, সেগুলি স্পষ্টই রোমান্টিক, তার মধ্যে একটি যে তার বছর পনেরো আগের আঁকা বিকানীরের একটি ছবি থেকে নেওয়া তা বেশ বোঝা যায়। নুরজাহানের কয়েকটি মাথা ও আবক্ষ পোর্ট্রেট এবং অন্যান্য মুঘল রাজপুরুষের ছবিও কিছু কিছু এ সময়ে হয়; এগুলিরও কিষণগড়ের চিত্রধারার সঙ্গে কিছু মিল আছে, বিশেষ করে এদের বিষয়ের গীতিকাব্যধর্মী রসে। কিন্তু তবুও স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুঘল চিত্ররীতির নাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ল, কারণ এই শতকের প্রধান কাজই হল পুরনো ছবি নকল করা। নকলের কাজ দিল্লীতে যথেষ্ট হয়, আবার লক্ষ্ণৌ এবং

আউধেও হয়। এই সময়ে মুঘল চিত্ররীতির একটি অপভ্রংশ দাক্ষিণাত্যের একটি জায়গায় যথেষ্ট কাজ করে। স্থানটি হচ্ছে আর্কট; সেখানে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে গোলকুণ্ডা চিত্ররীতির প্রসার হয়। চাঁদিনী রাতের আধোছায়াময় প্রেমের চিত্রগুলিতে সত্যিই একটি মধুর রোমান্টিক কাব্য-গুণ ফুটে ওঠে, এবং এই সব দক্ষিণী ছবিতে নক্সার কাজ যে বেশ ভাল তা সুরাপুর বা কার্ণূলের ছবি থেকে বোঝা যায়। হায়দ্রাবাদের আশ্রফ সংগ্রহে কতকগুলি খুব ভাল ছবি আছে। এমন কি হায়দ্রাবাদের নিজামী রীতিও, খানিকটা নিষ্প্রাণ, ঊষর হলেও, একেবারে খেলো নয়।
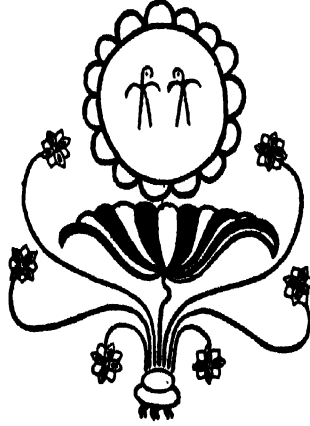
মুঘল চিত্রকলার অপভ্রংশ

প্রথমে দক্ষিণী বা ডেকানী চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা দরকার। ষোল শতকে দাক্ষিণাত্যে চারটি মুসলমান রাজত্ব ছিল : আহমদনগর, বিজাপুর, বিদর, আর গোলকুণ্ডা। তাদের দক্ষিণে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে রাজাদের অনুগ্রহে হিন্দু চিত্ররীতি ও স্থাপত্যের ঐতিহ্য চলিত ছিল। কিন্তু ১৫৬৫ সালে চারটি মুসলমান রাজ্যের মিলিত আক্রমণে বিজয়নগর ধ্বংস হয়। এর পরে বিজয়নগর নগর থেকে রাজধানী সরে যায় এবং দাক্ষিণাত্য খসে যায়। আহমদনগরের বাদশা হুসেন শাহ আর বিজাপুরের বাদশা ইব্রাহিম আদিল শাহ দুজনেই বিভিন্ন কলা রীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে বিজয়নগর ধ্বংসের পর সেখানকার পরিত্যক্ত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরজ্ঞদের তাঁরা নিজের নিজের দরবারে সসম্মানে আশ্রয় দেন।

বিজাপুরে সুন্দর, সুচারু স্থাপত্যের অভাব নেই, কিন্তু বিজাপুরী চিত্ররীতির উৎকর্ষ স্বীকার মাত্র হালে হয়েছে। বিজাপুরী রীতি যেটুকু বা স্বীকৃতি পেয়েছে, আহমদনগরী রীতি সম্বন্ধে আমরা জানি আরও কম। বলতে গেলে একমাত্র পুনার ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডলের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পুঁথির ছবিতেই যা কিছু আহমদনগরী চিত্ররীতির চিহ্ন আছে। এটি পদ্যে লেখা হুসেন শাহের একটি জীবনী, লেখার সময় ১৫৬৫ থেকে ১৫৬৮। ডাঃ স্টেলা ক্রামরিশ এর থেকে দুটি ক্ষুদ্রকায় ছবি ছাপিয়েছেন। বিকানীর প্রাসাদের সংগ্রহে রাগিণীমালার বারোটি উল্লেখযোগ্য ছবি আছে। ডাঃ গোয়েট্‌সের মতে এগুলি আহমদনগরে আঁকা হয়েছিল। এগুলির রঙ যেমন উজ্জ্বল, নক্সাও তেমনি প্রাণবন্ত, উচ্ছল ; তাদের ভাবের সুরও তেমনি গীতিকাব্যে ভরা। হিন্দু প্রভাব খুবই প্রকট, যদিও পুরুষদের পোষাকে আর ঘরবাড়ীর স্থাপত্যে মুসলমানী রুচি স্পষ্ট। এগুলি যে বিজয়নগর রাজ্যের সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ বিশেষ নেই। উপরন্তু, বোধ হয় আহমদনগরের। কারণ বিজাপুরী কাজে পারসীক প্রভাব সাধারণত আরও বেশী। এই সব ছবি বোধ হয় ১৫৭০ সাল নাগাদ আঁকা। বানারসের ভারত কলা ভবনে দীপক রাগের একটি ছবি আছে, তাতে পারসীক প্রভাব যথেষ্ট। মুঘল প্রভাবও আছে, মনে হয় ছবিটিতে মুঘল আর ডেকানী রীতি যেন বেশ মিলে গেছে। দক্ষিণী চিত্র-রীতিতে পরণের কাপড়ের ভাঁজের পারিপাট্য, সৌন্দর্য, ও দক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই ডেকানী রীতির মোটেই সব কিছু বলা হয় না। দক্ষিণী চিত্ররীতির বৈচিত্র্য ও বিস্তার দেখা যায় বিজাপুরী পোর্ট্রেটে আর পুঁথিচিত্রে। ১৯৪৭-৮ সালে লণ্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমিতে একটি প্রদর্শনী হয়, তাতে বিজাপুরী চিত্রশিল্পের বহুধা প্রতিভার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। নুজুম-অল-উলুম নামে একটি পুঁথিতে নানা রীতিতে আঁকা অনেক ক্ষুদ্রকায় ছবি আছে। সেগুলি দেখলে বোঝা যায় দক্ষিণী চিত্রকররা কত বিচিত্র ছবি আঁকতে পারতেন। প্রায় একটি গোটা বিশ্বকোষের মত তার বিষয় ও রীতি বৈচিত্র্য, অথচ সমস্ত ছবিতেই একটি বিশিষ্ট ঐক্যের ছাপ সুস্পষ্ট, দেখে বুঝতে দেরি

হয় না যে ছবিগুলি একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, একটি বিশেষ প্রভাবের ছায়ায় আঁকা। রঙের স্বর বিন্যাসও প্রায় এক ধরনের, প্রায় পারসীক ; কারণ সব ছবিতেই নীল, সোনালি আর সাদার প্রাদুর্ভাব। এই পুঁথির কয়েকটি মিনিয়েচরে আবার বিকানীর সংগ্রহের রাগিণীমালার মহীয়সী মহিলাদের পুনরায় দেখা যায় : অঙ্গে রাশি রাশি জড়োয়া অলঙ্কার, দেহে হাওয়ায় ওড়া হাল্‌কা ওড়না। কতকগুলিতে পারসীক পটভূমির মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর ছবি। আবার অন্য কতকগুলিতে পুরোপুরি মুসলমানী পুঁথির উদ্ভাসচিত্রসুলভ বিশদ ফুলকারি কাজ, অথবা দুদিকে সমানভাবে মিলিয়ে অলঙ্কারবহুল আল্‌পনার কাজ।

অন্যান্য ডেকানী মিনিয়েচরে অবশ্য বিজয়নগরের প্রভাব কম, স্পষ্ট বোঝা যায় দক্ষিণপ্রান্ত-দেশের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু তবুও দক্ষিণী হিন্দু চিত্ররীতি ডেকানী ছবিতে বরাবরের জন্য কতক-গুলি চিহ্ন রেখে যায় : সেগুলি হচ্ছে ছবিতে চমৎকার গতির ব্যাপ্তি, সবই যেন দরাজভাবে যথেষ্ট জায়গা নিয়ে নড়ছে, চলছে ; হাওয়ায় ভাসা হালকা ওড়না ও অন্য দেহসজ্জা ; ছবিতে সাদা আর সোনালির প্রাদুর্ভাব। স্বচ্ছ, হাওয়ায় ভাসা, ওজনহীন বসন আঁকা ব্যাপারে ডেকানী ছবির জুড়ি মেলা ভার। ষোল শতকে আঁকা দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের একটি ক্ষুদ্রকায় পোর্ট্রেট ব্রিটিশ মিউজিয়মে

আছে। ছবিটি আদিল শাহের যুবা বয়সের, দরবারে সিংহাসনে বসা অবস্থায় আঁকা। ছবিতে পারসীক ছাপ সুস্পষ্ট, কারণ পারসীক রীতি অনুসারে ছবিটির দুদিক একেবারে মিলিয়ে, যাকে ইংরেজীতে বলে সিমেট্রিক্যাল করে, আঁকা। ছবিটিতে একটি জিনিষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য: সিংহাসনের তলায় একপাশ দেখে আঁকা এক সার সোনার পাত্র। এই ধরনে আঁকা সারবন্দী সোনার পাত্র প্রথম যুগের এমন কি শেষের দিকের রাজপুত ছবিতে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়।

রন্ধন প্রণালী সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ মিউজিয়মের একটি পুঁথিতে কতকগুলি ক্ষুদ্রকায় ছবি আছে। বইটির নাম নিমত-নামা। তাতেও দ্বিতীয় আদিল শাহের দুটি পোর্ট্রেট আছে। এ দুটি খুব ছোট্ট। একটিতে রঙের জৌলুস বিশেষ উল্লেখযোগ্য; অন্যটি অসমাপ্ত কিন্তু তাতে বিজাপুরী রীতির নক্সার আশ্চর্য উৎকর্ষ বেশ বোঝা যায়। এই বাদশারই মধ্য বয়সের যে সব পোর্ট্রেট আছে তাতেও এই ধরনের আশ্চর্য দৃঢ় নক্সাই ছবির কাঠামোর সৃষ্টি করেছে। ইব্রাহিম আদিল শাহের সভাসদদেরও কয়েকটি ছবি আছে, তাতেও নক্সার প্রসাদগুণ অনস্বীকার্য। ১৬১০ সাল নাগাদ তৈরি ফলাও করে আঁকা দুটি নক্সার ছবি বার্লিনে ও প্যারিসে আছে। এ দুটিতে ডেকানী চিত্রের বৈশিষ্ট্য খুব ভাল ফুটেছে; স্পষ্ট বোঝা যায় ভারতীয় চিত্রধারায় দক্ষিণী ধারার দান কতখানি। মুঘল রীতি যে শুধু দক্ষিণে এসে দক্ষিণী ধারাকে সমৃদ্ধি করেছে তা নয়; তার চেয়ে বড় কথা এই যে, দক্ষিণী ধারাও উত্তরে গিয়ে এক নতুন রীতি, নতুন চালের সৃষ্টি করে, যেটি মূল উত্তর ধারার থেকে তফাৎ হলেও তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে, এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে মুঘল দরবারে সম্রাটদের কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করে।

চিত্রকলার ইতিহাসে কোন্ ধারা যে গুরু কোন্ ধারাই বা শিষ্য, জোর করে বলা যায় না, অল্পদিনের মধ্যে বিভিন্ন রীতি এত ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ধারাও যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে মুঘল চিত্ররীতিরও বহুধা প্রচার হল। শাহজাহানের সময়ে মুঘল চিত্র-রীতি যখন চরম বৈশিষ্ট্যলাভ করল তখন রাজধানীর নামে নামকরণ হল, দিল্লী কলম, অর্থাৎ দিল্লীর রীতি। এখনও দিল্লী কলমের কাজ কিছু কিছু হয়। কিন্তু শাহজাহানের পর ঔরঙ্গজেবের সময়ে চিত্রকলার দ্রুত অবনতি শুরু হল, কারণ রাজানুগ্রহ গেল কমে। তবুও ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করায় মুঘল বা দিল্লী কলম দক্ষিণে হায়দ্রাবাদে গেল এবং সেখানে তার নাম হল দক্ষিণী বা ডেকানী কলম। হায়দ্রাবাদ থেকে ভারত পারসীক ক্ষুদ্রকায় ছবির কলাকৌশল গেল বিজাপুরে, আর্কটে, আহমদনগরে, গোলকুণ্ডায়, মহীশূরে, সুরাপুর বা কার্ণুলে, তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লীতে। প্রত্যেক দরবারেই কয়েকজন

করে ভাল শিল্পী হলেন, এবং ওরই মধ্যে স্বকীয় ও স্থান মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টিত হলেন। কিন্তু একথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে চিত্র শিল্প কখনও সরাসরি রপ্তানি হয় না, এবং এমন কোন দেশ নেই যেখানে দেশজ চিত্ররীতি নেই বা ছিল না। যেমন একটু আগেই বলেছি, দিল্লী কলম দক্ষিণে প্রভাব বিস্তার করার আগে বিজাপুর রাজ্যে খুব ভাল ভাল চিত্রকর এবং চিত্রশিল্প ছিল। ষোল শতকের কিছু বিজাপুরী ছবি এখনও আছে যাতে স্পষ্টই পূর্বতন যুগের গুজরাটী পুঁথিচিত্রের সঙ্গে মিল সুস্পষ্ট। পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রের বিচিত্র প্রভাবের কথা পরে আরও বলব। গুজরাট অঞ্চল পুঁথিচিত্রের উৎপত্তিস্থল এবং পশ্চিমভারতের মধ্যে দিয়ে চোদ্দ, পনেরো, ষোল শতকে দক্ষিণী ও রাজস্থানী প্রভাব যে বেশ যাতায়াত করত, তা একদিকে ষোল শতকের বিজাপুরী, আহমদনগরী ছবি, অন্যদিকে মুঘল ছবি দেখলে বুঝতে দেরি হয় না। দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দেশজ রীতি সম্বন্ধে অনেক রকম গবেষণা হয়েছে এবং অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতই প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট রীতির নিজস্ব লক্ষণ বার করে যে-কোন ছবির উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে প্রামাণ্য অভিমত দিতে পারেন। কিন্তু সে সব বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনা এই ছোট বইয়ে অবান্তর হবে, কারণ সেগুলির মূল্য পণ্ডিতদের কাছেই বেশী। ভারতের চিত্রকলার মূল রীতি, নীতি, অন্বিষ্টের ছোট ঐতিহাসিক আলোচনায় তাদের ছোট ছোট বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য খুবই গৌণ এবং অকিঞ্চিত। বিষয়, রীতি, নক্সা, কম্পোজিশন, রঙ, সবেরই মূল এক : অর্থাৎ প্রাচীন দাক্ষিণাত্য রীতির উপরে দিল্লী কলমের প্রভাব ; যে দিল্লী কলমের আবার মূল হচ্ছে ভারত-পারসীক রীতি, এবং তারও আগের ঈরাণী কলম। অবশ্য ঔরঙ্গজেবের আগেই ষোল শতকে এবং তারও আগে বাহমনী বাদশাদের আমলে পারসীক চিত্ররীতি দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়। প্রথম যুগে তৈমুরিদ প্রভাব বেশ আসে, পরে আসে দিল্লীর প্রভাব। কিন্তু দিল্লী কলমও দক্ষিণে এসে বদলে গেল। ঔরঙ্গাবাদ বা দৌলতাবাদের চিত্রশিল্পীদের ছবি দিল্লী কলমের ছবির চেয়ে সচরাচর আকারে ছোট হত, এবং সে সব ছবিতে ব্যাপ্তি বা প্রসারের অভাব চোখে বড় পীড়া দেয়। চিত্রের বিষয়ও সাধারণত ঐতিহাসিক হত, যথা রাজাবাদশার ছবি। এই সব পুরনো শিল্পীদের বংশধরদের কেউ কেউ এখনও হায়দ্রাবাদ বা নেকোণ্ডায় জীবিত আছেন। তবে দক্ষিণী কলমে দিল্লী কলমের দুটি বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট চর্চা হয়। একটি হচ্ছে খুব সুকুমার, পেলব, মিহি গাঢ়-ফিকের মধ্যে দিয়ে প্রতিকৃতির মডলিং বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-ঘনত্ব আনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দেশজ রীতিতে এক মৌলিক ধরনে পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্‌টিভের সৃষ্টি করা। প্রথম দিকে ছবির জমিতে রঙের স্তরের সাহায্যে মডলিং প্রায়ই হতই না। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন মুঘল রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল তখন ঈরাণী কলমের চ্যাপ্টা, ফ্ল্যাট সতরঞ্চ নক্সার আভাস দূরে গিয়ে ছবি হল আরও প্রাকৃত ও গভীর। ছবির পিছন বা পশ্চাদ্‌পট আঁকার মধ্যেও পরিবর্তন এল। ঈরাণী কলমের নিছক চ্যাপটা, ছকে-ফেলা আল্‌পনা চলে গিয়ে এল গাছপালা, প্রকৃতি, দূরত্ব এবং দূরে-কাছের স্পষ্ট, প্রাকৃত বোধ ; এমনভাবে ছবি আঁকা শুরু হল যাতে

বুঝতে পারা যায় যে প্রতিটি বস্তুর চারদিকে হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে। শূন্যের মধ্যে বিষয়বস্তুদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পরিপ্রেক্ষিতের বোধ এল, আর তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিভিন্ন স্তরের কম্পোজিশনও ভালমত এল। কয়েকটি মুঘল ও ডেকানী ছবিতে সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া বা ফোরশর্টনিং সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ; এটা বেশ বোঝা যায় যে ইওরোপীয় চিত্রের মত ফোরশর্টনিং ভারতীয় শিল্পীর অভ্যস্ত নীতি না হলেও দরবারী শিল্পী ফোরশর্টনিং বিলক্ষণ বুঝতেন, এবং ভারতের আলোয় এবং টেম্পেরা বা মিশ্র রঙে কি করে ফোরশর্টনিং করতে হয় তাও জানতেন। কলকাতার যাদুঘরে এই রীতিতে আঁকা একটি আশ্চর্য ছবি আছে। বিষয়টি হচ্ছে, একজন অশ্বারোহী সৈন্য ছবির সমুখের জমির উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে যাচ্ছে। ছবিটিতে লোকের ভিড়ের কম্পোজিশন এবং ফোরশর্টনিংএর এমন নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে যে অবাক হতে হয়। এসব ছাড়াও দক্ষিণী কলমের আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের ছোট্ট সাইজ এবং সেই অনুপাতে তুলির ব্যাপ্তির অভাব। দক্ষিণী কলমে সোনা প্রচুরভাবে ব্যবহার হত, ফলে ছবি এমন জমকালো হত যে আসল দিল্লী কলমের ছবি এর কাছে জমকালোত্বয় হার মেনে যায়।

দিল্লী কলমের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায়, এবং চিত্ররসিকরা বলেন যে এর মধ্যে চিত্রশিল্পের ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী রীতি সবচেয়ে বেশী। এই কলমের কাজে একটা ঝরঝরে, তরতরে, পরিচ্ছন্ন দরবারী ভাব সবসময়েই পাওয়া যায়। এর অপভ্রংশ হয় জয়পুরী কলম। জয়পুরী কলমের কাজ বেশীর ভাগই একটু গোলগাল, নরম জাতের। জয়পুরী কলমে রঙের গাঢ়-ফিকের সাহায্যে মড্‌লিংএর যথেষ্ট চেষ্টা আছে ; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জয়পুর কলমের কথা যখন বলছি তখন জয়পুরের মুঘল রীতিতে আঁকা চিত্রের কথাই বলছি, রাজপুত বা পশ্চিম ভারতীয় রীতিতে আঁকা জয়পুরী চিত্রের কথা নয়।

দিল্লীর কাছের দেশ, যাকে ইংরেজরা বলত আউধ সেই আউধ রাজ্যের নবাবদের মধ্যে দিল্লী কলমের খুব প্রচলন হয়। সেই সঙ্গে আরেকটি বিদেশী চিত্ররীতি জনপ্রিয় হয়, তাকে বলে রুমী বা ইওরোপীয় কলম। ইওরোপীয় পোর্ট্রেট রীতি অনুসরণ করে আউধে যে সব মিনিয়েচর সৃষ্টি হত তাকে বলত রুমী কলম। রুমী কলম বলতে ইওরোপীয় চিত্রবিষয় বোঝায় না। খৃষ্টিয়ান বা ইওরোপীয় চিত্রবিষয় কিভাবে মুঘল চিত্রে স্থানাধিকার করে তার বিষয় অল্প আলোচনা আগেই করেছি। রুমী কলম বলতে কিন্তু ইওরোপীয় বিষয় বোঝায় না, মিনিয়েচরে ইওরোপীয় চিত্রশিল্পের টেকনিক বোঝায়, যেমন মড্‌লিং, ফোরশর্টনিং ও পারস্পেকটিভ। এই ধরনের ইওরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি দিল্লী বা জয়পুর কলমে অনেক দেখা যায় এবং সেই হিসাবে মুঘল চিত্রশিল্পে রুমী কলমের একটি বিশেষ স্থান আছে। রুমী কলমে ছবি সাধারণত বাদশার হুকুমে দরবারের জন্য আঁকা হত। ঐগুলি প্রায়ই ইওরোপীয় ছবির নকল হত, কিংবা বিদেশী মিশনারীদের ফরমায়েস মত হত।

লক্ষ্ণৌর নবাবরা যখন আঠারো শতকে প্রতাপশালী হলেন তখন দিল্লী কলমের এক অংশ

লক্ষ্ণৌ দরবারে গিয়ে লক্ষ্ণৌ কলম হল। বলা বাহুল্য দিল্লীর বাদশার তুলনায় লক্ষ্ণৌর বাদশারা যেমন হীনতেজ হলেন, লক্ষ্ণৌ কলমের ছবিও তেমনি দিল্লী কলমের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট হল। চিত্ররীতি-পদ্ধতিও অনেক তফাৎ হল। যথা লক্ষ্ণৌ কলমের ছবির রঙ হল প্রায় স্বচ্ছ, এমন কি অনেক সময়ে জলরঙে আঁকা হত, যদিও অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পটে ছবির খোল বা জমি হত সাদা। ক্রমশ লক্ষ্ণৌ কলম আঠারো শতকে তরল হতে হতে যখন নিছক খারাপ হয়ে গেল তখন ইওরোপীয় ছবির প্রভাবে তার মোড় ঘুরে গেল। আঠারো শতকের শেষে ওয়ারেন হেস্টিংস্ আউধ জয় করার পর, এবং উনিশ শতকে, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজদের মারফৎ বহু ইওরোপীয় মিনিয়েচর ছবি আমদানি হল। লক্ষ্ণৌর অনেক ঘরোয়ানা চিত্রশিল্পী ইওরোপীয় রীতি চটপট নকল করে জন্ কোম্পানির সাহেবদের ছবি যোগাতে লাগলেন ; তাদের পোর্ট্রে ট করতে লেগে গেলেন। সাহেবরাও সে সব ছবি আগ্রহ করে নিলেন ; হাতীর দাঁতের পাতে বা পাটায় আঁকা নিজেদের এবং পরিবার পরিজনবর্গের ছবি, দেশে পাঠাতে লাগলেন। এই সব মিনিয়েচরে ইওরোপীয় রীতি সুস্পষ্টভাবে এল ; এবং মুখ সাধারণত একপাশ করে আঁকার দরুণ তাদের সঙ্গে ইওরোপীয় রীতিতে তৈরি মেডালিয়ন বা মুদ্রার ছবির খুব মিল দেখা গেল।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ থেকে আবার কয়েকটি শিল্পী পরিবার ইংরেজদের কাছে কাজ পাবার আশায় পাটনায় এসে বসবাস আরম্ভ করে। এইভাবে উনিশ শতকে পাটনায় একটি শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, তার নাম হয় পাটনাই কলম। পাটনাই কলমের ছবি যে বিশেষ উৎকৃষ্ট কিছু তা নয়, এগুলি প্রায় আড়ষ্ট, ভাবাবেগহীন নীরস ছবি হত, যদিও নক্সায় ও রঙে যথেষ্ট বাহাদুরি থাকত। পাটনাই কলমের চিত্রে বোধ হয় সর্বপ্রথম বাস্তব ছায়া দেখা দেয়। কোম্পানির আমলে পাটনাই কলমের একটি মজার জারজ বৈশিষ্ট্য হয়, যা দেশীয় নয়, আবার ইওরোপীয়ও নয়, দুইয়ের মিশ্রণ। যাকে বলে ইঙ্গ-বঙ্গ। পাটনাই কলম সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

কাশ্মীরে মুঘল রীতির এক ধরনের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে, তাকে বলা যায় কাশ্মীরী কলম। এগুলি প্রথম দিকে কাশ্মীরেই হত। শেষে কাশ্মীরী শিল্পীরা পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর, প্রভৃতি জায়গায় এই রীতির প্রচলন করেন।

কিন্তু এই সব বিভিন্ন কলমের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। সেগুলি হচ্ছে কল্পনার সংকোচ এবং বলিষ্ঠতার অভাব, অলঙ্কারবাহুল্য, যৌবনসুলভ দীপ্তি ও দুঃসাহসের বদলে বাহ্যাড়ম্বর এবং গতানুগতিকতা। অত বড় এক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়ে যখন টুকরো টুকরো রাজত্ব হয়, তখন সেগুলি যেমন হীনবল অথচ মিথ্যা আড়ম্বর জাঁকজমকে ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি মুঘল রীতির গাণ্ডীব তোলা আর সম্ভব হল না। নানা জায়গায় সেগুলি ছোট ছোট স্বকীয়তার অহঙ্কারেই ডুবে রইল, নেহাৎ ঠুনকো, সুন্দরপানা ছবি হল ; দরবারের সামান্য অনুগ্রহ ভিক্ষার আশায় মহান লৌকিক চিত্র-ধারার কাছে শিখবার সাহস হারিয়ে ফেলল ; ভারতীয় মূল চিত্রধারার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পশ্চিম ভারতীয় ও রাজপুত চিত্র

মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হল। এখন সাধারণত যাকে রাজপুত চিত্র বলা হয় তার সম্বন্ধে কিছু বিচার দরকার। রাজপুত চিত্র কথাটা আমরা সচরাচর খুব ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার করি ; ফলে রাজপুত চিত্ররীতি আর ভারতবর্ষের হিন্দু চিত্ররীতি কতকটা একই জিনিষ বোঝায়, সে রীতি দাক্ষিণাত্যেরই হোক আর গুজরাটেরই হোক, বা আসল রাজস্থানের অথবা পাঞ্জাবের পার্বত্য-দেশ, বা পূর্বদেশের বুন্দেলখণ্ডি ছবিই হোক। প্রথমেই কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্থান-মাহাত্ম্য অনুসারে চিত্ররীতির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট থাকলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র সর্ব্বদা চিত্ররীতি-নীতির আদানপ্রদান অত্যন্ত বেশী রকম হয়েছে। ফলে একথা কোন রীতিবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা যায় না যে সেটি নিতান্তই দেশজ, তাতে অন্য কোন রীতির ছাপ নেই। তাছাড়া যুগধর্ম অনুসারেও রীতিনীতি ঘনঘন বদলাচ্ছে। সুতরাং রাজপুত চিত্রের ক্ষেত্রেও কোন রীতি কোনও বিশেষ স্থানে বা রাজ্যে স্থাণু বা অজড় অনড় হয়ে ছিল না, স্থান কাল পাত্র ভেদে চিত্ররীতি অনেকক্ষেত্রে বেমালুম বদলেছে। কিছু আগেই বলেছি যে নিছক মুঘল বা ভারত-পারসীক চিত্ররীতি বলে কিছু নেই, পারসীক রীতি ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে ভারতীয় শিল্পীর হাতে, পুনর্জন্ম নিয়ে যেমন এক বিশিষ্ট ভারতীয় ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি যুগে যুগে, রাজ্যে রাজ্যে, ভারতীয় লোকচিত্র ও প্রাচীর বা গুহাচিত্ররীতি স্থান কাল পাত্র ভেদে, নানা শিল্পীর হাতে, নানা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নানা রকম বিচিত্র রূপ নিয়েছে। বিশুদ্ধ রাজপুত রীতি বলে কিছু বোধ হয় নেই, এবং সেই হিসাবে আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর রাজপুত চিত্রকলা বইয়ে মুঘল ও রাজপুত চিত্রনীতি রীতির মধ্যে যে আকাশ-পাতাল, অর্থাৎ দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের বৈষম্য, পার্থক্য এমনকি নীতিগত বিরোধের কথা বলেছেন তা বোধহয় কতকটা মনগড়া বা কাল্পনিক, নিদেনপক্ষে কষ্টকল্পিত। কারণ, কি ঐতিহাসিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক, সব ক্ষেত্রেই যখন মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে দেশীয় হিন্দুরাজ্যগুলির ঘনিষ্ঠ, ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল, যখন চিত্র-শিল্পীদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ আদান প্রদান ছিল, এমন কি হিন্দু শিল্পী মুসলমান দরবারে, এবং মুসলমান শিল্পী হিন্দু দরবারে বিশেষ সম্মান পেতেন তখন এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে হিন্দু ও মুঘল চিত্ররীতির মধ্যে দুর্ভেদ্য পাঁচিল থাকা কখনও সম্ভব নয়। অতএব হিন্দুচিত্রে মুসলমান রীতি যেমন দেখা যায়, মুসলমান চিত্রেও হিন্দুরীতি তেমনি দেখা যায়।

রাজপুত রীতি আলোচনার আগে খৃষ্টীয় সাত থেকে পনেরো শতক পর্য্যন্ত কোথায় কি চিত্র-রীতির নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে তা আরেকবার চট করে ঝালিয়ে নেওয়া যাক। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে সিরীয় চার্চের একটি বড় কেন্দ্র আমাদের দেশে আছে। খৃষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস ভারতে আসেন। সিরিয়ান চার্চের যখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে ছিল তখন এটুকু অনুমান করা যায় যে গ্রীক এবং পরে খৃষ্টীয় বা বাইজানটাইন চিত্ররীতিও এখানে নিশ্চয় কিছু কিছু বহুদিন

থেকে বর্তমান। কিন্তু এই ঐতিহ্যের বিশেষ কিছু নিদর্শন নেই। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভ মন্দিরে সতেরো শতকের আঁকা কিছু প্রাচীরচিত্র এখনও আছে; ত্রিবাঙ্কুর চিত্রালয়ের অধ্যক্ষ্যকে লিখলে এইসব ছবির ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায়; তাতে নক্সা ও রেখার কাজের অপূর্ব নৈপুণ্য থাকলেও বিদেশী ছাপ বিশেষ নেই। অজন্তা, ইলোরা, বাঘের পর যে গুহাচিত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার নাম সিত্তন্নভাসল। এটি একটি জৈন মন্দির; কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে পুদুকোট্টাই থেকে নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিত্তন্নভাসল বলে গ্রামে। পহ্লব রাজবংশের একেবারে কেন্দ্রস্থল বললেই হয়। পাহাড় থেকে কেটে বার করা মন্দিরটি এককালে সবটাই চিত্রিত ছিল। এখন শুধু ভিতরের ছাত, থামের উপরদিক ও মাথাগুলিতে ছবির অবশিষ্ট আছে। মন্দিরের বারান্দার ছাতে একটি বিরাট ফ্রেস্কো আছে: বিষয় হচ্ছে একটি বিরাট পদ্ম সরোবর, পদ্মে ভর্তি, তার মধ্যে মাছ, হাঁস, মোষ, হাতী আর তিনটি পুরুষ, তাদের হাতে পদ্ম। দুজন লোকের গায়ের রঙ গাঢ় লাল, তৃতীয়টির রঙ উজ্জ্বল হল্‌দে। তাদের যেমন মধুর ভঙ্গী, তেমনি রঙ, তেমনি সুন্দর মুখের ভাব। নক্সার কাজের বৈচিত্র্য যেমন, তেমনি সুন্দর বর্ণবিন্যাস, আর ছায়াতপ। থামের কাজেও নৈপুণ্য অপূর্ব, যে কয়টি ছবি আছে অধিকাংশই নর্তকীদের হাতে পদ্ম। এখন থেকে বোধহয় দেবদাসীদের চলন হয়। গুহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি অবশ্য অর্ধনারীশ্বরের। কিন্তু দুটি অপ্সরাদেরও তুলনা মেলা ভার।

সিত্তন্নভাসলের ছবি বোধ হয় পহ্লব রাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ এবং তাঁর পরবর্তী রাজা নরসিংহ বর্মণের সময়ে আঁকা। অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬২৫ থেকে ৬৫০ সনের মধ্যে। এই সময়ে অজন্তায় ও বাঘেও সেরা সেরা প্রাচীরচিত্র আঁকা হচ্ছিল। আর ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, ঠিক এই যুগে সুদূর উত্তর পশ্চিম চীনের টুন হুয়াং গুহাগুলিতেও শিবিরাজের উপাখ্যান, হাওয়ায় ভেসে যাওয়া অপ্সরাদের অপূর্ব গুহাচিত্র সব আঁকা হয়।

পশ্চিম বাঙলার ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কিছুদিন আগে কেঁওঝড় রাজ্যের কাছে কতগুলি গুহাচিত্র আবিষ্কার করেন। এগুলি ইতিহাসের আগের যুগের ছবি কিনা জোর করে বলা যায় না।

খৃষ্টীয় দশ শতকে তাঞ্জোরের মন্দির স্থাপিত হয় এবং ১০০৯ সাল নাগাদ এই মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত ফ্রেস্কো আঁকা হয় তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অজন্তার চিত্ররীতির প্রভাব দক্ষিণ ভারতে তখনও বেশ প্রবল। নায়ক রাজবংশের সময়ে এইসব ফ্রেস্কোর উপর আবার নতুন করে টেম্পেরায় ছবি আঁকা হয়। কিন্তু সম্প্রতি উপরকার টেম্পেরাগুলি চেঁচে ফেলায় ভিতরের ফ্রেস্কো বেরিয়েছে। কিন্তু বাঘের চিত্ররীতির থেকে এইসব ফ্রেস্কোর বিশেষ প্রভেদ নেই।

দক্ষিণ ভারতে দশ শতক থেকে আশ্চর্য ভাস্কর্যের যুগ শুরু হয়, শেষ হয় পনেরো ষোল শতকে। অধিকাংশ ভাস্কর্যে কিন্তু চিত্রগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদুরার মন্দিরে কিছু কিছু প্রাচীরচিত্র

এখনও আছে, সেগুলি কত প্রাচীন বলা শক্ত। আনেগুণ্ডির প্রাচীর চিত্রগুলিও যথেষ্ট প্রাচীন। কিন্তু তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরমের ছাতে যে সব চিত্র আছে তার থেকে বুঝতে দেরি হয় না যে বাংলার জড়ান পটের আদি নজির হিসাবে এইসব ছবিকে অনায়াসে ধরা চলে।

উত্তর ভারতে মধ্যযুগের ছবির নিদর্শন প্রায় নেই বললেই হয়, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই সময়ে চিত্রশিল্পের নিশ্চয় বিশেষ চর্চা ছিল। তারানাথের লেখায় দক্ষিণ দেশের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অল্প উল্লেখ পাওয়া যায়। তারানাথ দাক্ষিণাত্যের তিনজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম করেন : জয়, পরাজয় ও বিজয়। প্রত্যেকের আবার অনেক শিষ্য ছিলেন। এঁদের তারিখ জানার উপায় নেই, এঁদের হাতের কাজও কিছু পাওয়া যায় নি। এই বিশিষ্ট দক্ষিণী রীতি পরের যুগে ছুটি ভিন্ন রীতিতে ভাগ হয়ে যায়, একটি তাঞ্জোরী, অন্যটি মহীশূরী। কিন্তু এসব হয় সতেরো শতকের শেষে, আঠারো শতকে।

ইতিহাসের প্রথম যুগে যে আন্দোলন চিত্রশিল্পে সবচেয়ে বেশী প্রাণের সঞ্চার করেছে, সেই বৌদ্ধধর্ম মধ্যযুগে উত্তর ভারতে চিত্রকলার কি কি নিদর্শন রেখে গেছে তার সামান্য উল্লেখ দরকার। পালবংশের অনুগ্রহে খৃষ্টীয় নয় থেকে বারো শতকের মধ্যে উত্তর ভারতে বৌদ্ধ চারুশিল্পের সবচেয়ে বেশী উন্নতি ঘটে। তখন উত্তর ভারতের কলাকেন্দ্র ছিল নালন্দা। সাহিত্যের নানা লেখা থেকে জানা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী ঘর দোর সব চিত্রিত ছিল। সে সবের অবশ্য এখন কিছু নেই। নালন্দার চিত্রকলার অবশিষ্ট এখন যা কিছু আছে, তার কথা শুনলে কষ্ট হবে। জীর্ণ ছুয়েকটি তালপাতার পুঁথির পাতার কয়েক ইঞ্চি জুড়ে কয়েকটি ছবি মাত্র আছে, আর আছে সেই সব পুঁথির চিত্র করা কয়েকটি কাঠের পাটা। আর সবই ১১৯৯-১২০০ সনে ছুবছরেরও কম সময়ে মুসলমানদের ধ্বংসকাজে নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তার হিসাব ছু লাইনেই দেওয়া যায়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একজোড়া চিত্রিত কাঠের পাটা আর অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির ছুটি চিত্র করা তালপাতা আছে। এদের বয়স বোধহয় খৃষ্টীয় ১০১৫ সন। অক্সফর্ডের বডলিয়ান গ্রন্থাগারে রাম পালের ১৫ বছর রাজত্ব কালে (অর্থাৎ এগারো শতকে) লেখা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির একটি চিত্রিত কাঠের পাটা আর ছুটি চিত্রকরা তালপাতা আছে। কাঠের পাটাটিতে আছে প্রজ্ঞাপারমিতা আর তারার চিত্র। একটি তালপাতায় আছে বুদ্ধের ছবি, ইন্দ্র তাঁর আরাধনা করছেন, ছুপাশে সূর্য চন্দ্র। আরেকটি তালপাতায় আছে বুদ্ধের জীবনী থেকে কিছু কিছু দৃশ্য। এই তিনটি ছবিই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় এখনও আছে। পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা বলে হরিবামন রাজার আট বছর রাজত্বকালে একটি পুঁথি লেখা হয়, তার সমস্তটা পাওয়া যায় নি। এরই তিনটি পাতা এখন বরোদা রাজ্যের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এগুলি এগারো শতকের শেষের দিকের। তিনটি ছবি আছে, একটি মঞ্জুশ্রীর, দ্বিতীয়টিতে আছে রক্তলোকেশ্বর আর হয়গ্রীব ; তৃতীয়টিতে অবলোকিতেশ্বর। বানারসের ভারত কলা ভবনে রাম পাল দেবের নয় বছর রাজত্বকালে লেখা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির

একটি তালপাতা আছে, তাতে তারার ছবি আছে। পাটনার দেওয়ান বাহাদুর রাধাকিষণ জালানের কাছে একটি প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির ছুটি চিত্রিত কাঠের পাটা আছে। গোবিন্দ পালের আঠারো বছর রাজত্বকালে (বারো শতকের শেষ দিকে) লেখা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির একটি তালপাতা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে, এতে তারা আর কালীর রঙীন ছবি আছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতেই বারো শতকে লেখা একটি অসম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি আছে তাতে তিনটি অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রকায় ছবির সীমারেখার নক্সা আছে। পালযুগের ছবি যা কিছু আছে তার প্রায় পুরো তালিকা বলতে এইটুকুই, এর মধ্যে কাঠের পাটার চিত্রগুলি তালপাতার ছবির চেয়ে অনেক বেশী ফলাও করে আঁকা এবং ছবি হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। তবে তান্ত্রিক সূত্র অনুযায়ী ভাস্কর্য বা ধাতু ঢালাই মূর্তির মত করে আঁকার দরুণ ছবিগুলিতে চিত্রকরের স্বাধীনতা যে কম ছিল তা বোঝা যায়। আগেই বলেছি ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারানাথ চিত্রকলা ভাস্কর্য আর ধাতু ঢালাই মূর্তির কাজ সম্বন্ধে একসঙ্গে একই জায়গায় আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনটি শিল্পের মধ্যে সে যুগে শুধু যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তা নয়, তাদের শিল্পগত অম্বিষ্টও বোধ হয় এক ছিল। ডাঃ কঞ্জে বলেন যে সে যুগের বৌদ্ধ প্রভাবের যথাযথ পরিচয় এই ছবিকয়টিতে পাওয়া যায়। ছবিগুলির পশ্চাদপট মামুলিভাবে আঁকা, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা গাছপালার শুধু নামমাত্র ইঙ্গিত আছে বলা যায়, দেবীরা যে সব সিংহাসনে বসে আছেন সেগুলি নিতান্ত ধাতু ঢালাই করা সিংহাসনের মত দেখায়। ছবিগুলি প্রথম দেখলে মনে হয় যেন ভাস্করের আঁকা নক্সা, যা দেখে দেখে মূর্তি গড়া হবে, সুতরাং ছবিতে মডলিং এবং প্ল্যাস্টিক রূপের দিকে বেশী ঝোঁক। ঠিক এই ধরণের গুণ সমসাময়িক পশ্চিম ভারত অথবা দক্ষিণ ভারতের ছবিতে নেই। সে সব অঞ্চলের ছবিতে আছে রেখার প্রাধান্য ; ছবিগুলি মুখ্যত আখ্যানমূলক, চিত্রধর্মী। পাল যুগের পুঁথিচিত্রের রীতি ভারতের অন্য কোথাও ঠিক দেখা যায় না ; এ রীতি নিশ্চয় নেপাল থেকে এসেছিল। রঙের জমক যদিও খুব আছে, তবুও পরের যুগের ভারতীয় চিত্রের প্রাণবন্ততা এতে নেই, অথবা আগের যুগের গুহাচিত্রের মানবিক আবেগ নেই।

গত ত্রিশ বছরে গুজরাটী চিত্রনীতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রথম গুজরাটী ছবি হলেই জৈন বলা হত, কিন্তু একই রীতিতে আঁকা বৈষ্ণববিষয়ক ও সামাজিক ছবি পাওয়াতে এখন আর গুজরাটী চিত্রনীতিকে নিছক জৈন বলা হয় না। এখন অনেকে গুজরাটী ছবিকে পশ্চিম ভারতীয় ছবি বলেন, কিন্তু এরও বিপদ আছে, কারণ 'পশ্চিমভারতীয়'র মধ্যে রাজপুতানাও পড়ে যায়। গুজরাট আর রাজপুতানা পাশাপাশি হলেও এবং ছুটি দেশের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ থাকলেও আরাবল্লীর উত্তরে রাজপুতানা আর দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাটের মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর এত তফাৎ, রাজপুতানা এত সামন্ততান্ত্রিক, আর গুজরাট চিরকাল এত বাণিজ্য-নির্ভর, যে ছুই দেশের চিত্রনীতিকে একই নামে ডাকলে অন্যায় হবে।

ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে গুজরাটী রীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেটি হচ্ছে, অজন্তা বাঘের যুগ আর পনেরো শতকের পরের রাজপুত, মুঘল, ডেকানী যুগের ছবির মধ্যে যে মধ্যযুগ, গুজরাটী চিত্রের সাহায্যেই শুধু এই মধ্যযুগের চিত্ররীতির হদিশ মেলে, এবং গুজরাটী চিত্রই এই ছুটি যুগের, ছুটি বিশিষ্ট ধারার, যোগসূত্র মিলিয়ে দেয়। তাঞ্জোর, আনেগুণ্ডি বা তিরুপতি তিরুমাল'র ফ্রেস্কো ছাড়া মধ্যযুগের ছবির নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। এক যেটুকু আছে পালবংশের ছবিতে ; যার উল্লেখ এখনই করেছি। কিন্তু পাল চিত্ররীতি রপ্তানি হয় নেপালে, ভারতে তার প্রভাব খুবই কম দেখা যায়।

অনেকে তর্কের খাতিরে অনুমান করেন যে মধ্যযুগে সারাভারতময় হয়ত কোন বিশিষ্ট চিত্রধারা ছিল, যার একটি অঙ্গ দেখি গুজরাটে, অন্যটি নালন্দায়। হয়ত ছবির পশ্চাদপটে বা অন্য ভঙ্গীতে সামান্য কিছু মিল থাকতেও পারে কিন্তু আসলে ছুটি রীতি সম্পূর্ণ তফাৎ। কোন সম্বন্ধই বিশেষ নেই। এর কারণ সোজা। একদিকে বাঙলার ছবিতে নিতান্ত আশ্রমসুলভ কঠোর তনুতা ; অন্যদিকে গুজরাটী চিত্রকলায় ব্যবসাবাণিজ্যস্ফীত মধ্যশ্রেণীর প্রগল্‌ভ বিস্তার।

গুজরাটে চিত্রকলার যে প্রসার সম্ভব হল, তার জন্যে দায়ী গুজরাটের ব্যবসাবাণিজ্য। বরোচের বন্দর আর ক্যাম্বে উপসাগরে বাণিজ্যের কল্যাণে গুজরাটে পুরাকাল থেকেই প্রভূত বিত্তশালী বণিক-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই বাণিজ্যের প্রভাব গুজরাটের সমাজে ও সংস্কৃতিতে গভীরভাবে দেখা যায়। উত্তরভারতে যখন মুসলমান আক্রমণে রাজদরবারগুলির অবস্থা একে একে খারাপ হয়ে যায় তখন বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেই গুজরাটের ধনীসমাজ বরাবর চিত্রশিল্পীদের পোষণ করে যান। এইসব ভোগলিপ্সু ধনী মধ্যশ্রেণীরা যে বৌদ্ধধর্মের আশ্রমানুবর্তিতার পরোয়া করবেন না, বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কঠোর নিয়মানুগতার তোয়াক্কা রাখবেন না, এটুকু সহজেই আন্দাজ করা যায়। লৌকিক ধর্মের জোয়ার আসার আগে, চৈতন্যদেবের অনেক আগেই, গুজরাটে বাউলজাতীয় গান গেয়ে বেড়ান কবিরা এক দেশজ সংস্কৃতির ধারার প্রবর্তন করেন। এই যুগের চিত্রশিল্পের নিদর্শন কিছু নেই। কিন্তু এইযুগের পরে আসে জৈন প্রভাব যার ফলে আসে জৈন পুঁথি আর ঋজু, আড়ষ্ট পিতলের মূর্তি। এদের জের সতেরো শতক পর্যন্ত চলে।

ওরই মধ্যে মূর্তির চেয়ে পুঁথিচিত্রে প্রাণবন্ততা বেশী। এই জাতীয় ছবিতে পারসীক ক্ষুদ্রকায় চিত্ররীতির প্রভাব গোড়া থেকেই দেখা যায়। পারস্য থেকে ল্যাপিস্‌ল্যাজুলাই পাথরের আমদানি হত এবং ল্যাপিসল্যাজুলাই গুঁড়ো করা রঙএর দরুণ গুজরাটী ক্ষুদ্রকায় ছবির জৌলুষ খুলত খুব। ল্যাপিসল্যাজুলাই চূর্ণের রঙ স্পষ্টতই পারসীক প্রভাবের ফল, এ ছাড়াও সামান্য কিছু পারসীক প্রভাব দেখা যায় ছোটখাটো খুঁটিনাটিতে, মুখের আদলে, পোশাকে। শরীরের ভঙ্গিমা এসেছে হয়শলদের ভাস্কর্য থেকে (১০০৭-১৩৩৬)। নাচের ভঙ্গী শরীরের দোমড়ান মোচড়ান নানা অবস্থা সবেতেই

হয়শল ভাস্কর্যের ছাপ নিতান্ত অবিসংবাদিত। এমন কি ছবির পাড়ে যেসব জন্তুজানোয়ার, হাঁস, হাতী ইত্যাদির পাঁতি দেখি সে সবই বেলুড় হালেবিদ ইত্যাদি হয়শলদের মন্দিরের পটি থেকে ধার করা।

গুজরাটী চিত্ররীতিকে আজকাল পশ্চিম ভারতীয় রীতি বলা রেওয়াজ হয়েছে। এই রীতির সবচেয়ে প্রাচীন দৃষ্টান্ত আমরা পাই এগারো শতকের পরের কিছু পুঁথিতে। এত পুরনো পুঁথিতে আমরা ক্ষুদ্রকায় ছবি খুব কমই পাই, যা আছে তা অতি সরলভাবে আঁকা, সবই একটি করে আকৃতি, একই স্থাপত্যের আভাসের মধ্যে ভাস্কর্যের মত নক্সা। তেরো শতকে এই ধরনের নক্সার সামান্য উন্নতি হয়। পশ্চাদ্‌পটে বা পিছনের জমিতে গাছ আসে। চোদ্দ শতকের শেষ দিকে যখন তালপাতার পুঁথির যুগ গিয়ে কাগজের চলন হয়, সেই সময়ে তালপাতায় ফলাও করে নক্সার কাজ শুরু হল। আর চোদ্দ শতকেই পুঁথির ছুপিঠে কাঠের পাটাতেও একাধিক চিত্র দেখা দিল। অতএব দেশজ রীতির উন্নতি হয়ে যখন জটিল ছবির সূচনা হল ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ সন নাগাদ পারস্য থেকে কাগজ আমদানি হল। কাগজের কল্যাণে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছবি আঁকা সম্ভব হল। রঙও আমদানি হল, বিশেষ করে পারস্য থেকে ল্যাপিস্‌ল্যাজুলাইএর, ফলে রঙের বৈচিত্র্য ও জৌলুষ বাড়ল। সেই সঙ্গে চিত্রবিষয়ে ও রীতিতেও পারসীক প্রভাব এল। দাড়িওলা লোক, পরণে চাদরজড়ানর মত করে পরা লম্বা আলখাল্লা, পায়ে লম্বা বুট, এ সমস্তই যে ইরাণ থেকে এল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পোষাকে ও কাপড়ের ভাঁজে, পাটে এল নানাধরণের চৌখুপি বরফির মত, কিংবা মাকড়সার জালের মত জ্যামিতিক নক্সা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যারাবেস্‌ক। নক্সা হল সমান, চ্যাপটা, ফ্ল্যাট ছবির সব কিছুই একস্তরে সাজিয়ে আঁকা। পুরনো রীতি বলতে রইল শুধু তারের মত সর্পিল অথচ স্পষ্ট, কড়া, সীমারেখা, আর লাল জমি। ১৪১৬ সনের যে ছবি পাই তাতে এই ধরনের রীতি বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

পনেরো শতকে লেখা ও আঁকা কতকগুলি জৈন পুঁথি এখনও আছে। ১৪২৮ সনে রচিত একটি পুঁথি ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে। এই শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত পুঁথি হচ্ছে ১৪৫১ সনে লেখা বসন্তবিলাস। এটি ওয়াশিংটনের ফ্রিয়ার গ্যালারিতে আছে। গুজরাটে আহমদ শা কুতুবুদ্দিনের রাজত্বকালে ১৪৫১ সনে পুঁথিটি প্রস্তুত হয়। এর চেয়ে প্রাচীন ছুটি পুঁথির উল্লেখ আগেই করেছি, একটি পাটান গ্রন্থাগারের কল্পসূত্র, অন্যটি ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের কল্পসূত্র ; প্রথমটির তারিখ ১২৩৭, দ্বিতীয়টির ১৪২৭। বসন্তবিলাস লম্বা একফালি তূলোর জমিতে লেখা ও আঁকা। লম্বায় ৩৫ ফিট ৬ ইঞ্চি, চওড়ায় ৯ ইঞ্চি। রঙগুলি সমান, চ্যাপটা করে লাগান। লাল হলদে খুব বেশী, জমি হলদে। মুখ সাধারণত সমুখ থেকে অর্ধেক করে আঁকা। ফলে দূরের চোখটি মুখের কাঠামো থেকে বেরিয়ে অনেক সময়ে ছবির জমিতে চলে যায়। গাছ সাধারণত বরফির আকারে আঁকা, তাতে শাখাপ্রশাখা আর পাতাও আছে। ভারতীয় চিত্রে এ ধরনের গাছপাতা দেখা যায়, তবে অজন্তা ইলোরার ছবিতে

নয়। সেখানে ফুল-ফল-পাতা বিশদভাবে গভীর উল্লাসে বিস্তৃত করে আঁকা। কিন্তু গুজরাটী চিত্রে, এক কলা আর আম গাছ ছাড়া, আর যে কোন গাছই নিতান্ত আড়ষ্ট, কিছুটা অগোছালো ভাবে আঁকা। মনে হয় সবটাই নিতান্ত বাঁধা ছকে ফেলা। ক্বচিৎ কখনও এর ব্যতিক্রম হয়ে এক স্বচ্ছন্দ-ভাব এসেছে। প্রতিকৃতির রেখা দুর্বল। সেই অনুপাতে পোশাক, অলঙ্কার, হাওয়ায় ভাসা, হাল্কা ওড়না, কোমরবন্ধ সবই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যথাযথ করে আঁকা। মোটামুটি বলতে গেলে, এই যুগের গুজরাটী পুঁথিচিত্রে একটি সরল অকপট ভাব আছে, যা সত্যই হৃদয়গ্রাহী। ছবিগুলি অবশ্য অজন্তা ইলোরার মত একান্তই আখ্যানমূলক। পোশাক সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা উচিত। পুরুষদের পরণে লম্বা অথবা খাটো ধুতি, কাঁধে উড়ুনী। মাথায় নানা ধরনের মণিমুক্তাখচিত উষ্ণীষ দেখা যায়, কিন্তু সাধারণত চুলে বা খোঁপায় ফুলই বেশী। মেয়েদের পাজামা ওড়না, অর্থাৎ মুঘল পোশাক, তখনও আসে নি ; বরং তাদের পোশাক তখনও অজন্তার ছবির মতই। সমসাময়িক অধিকাংশ বৈষ্ণব ছবিতে একই রীতি দেখা যায়। এর কিছু পরে যে সব পুঁথি হয় তাতে ছবির বাহুল্য, বর্ণাঢ্যতা, নিপুণ নক্সা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয় বৈচিত্র্য কম বলে অনেক ছবিই আছে যা দায়সারা করে আঁকা তবুও ইওরোপীয় দরবারী তাসের ছবির মত, জৈন পুঁথিতেও কতকগুলি কম্পোজিশনের বাঁধা ছক আসে যার রঙের বাহাদুরির তারিফ করতেই হয়। পনেরো শতকের শেষভাগে অবশ্য নৈপুণ্য কমে গিয়ে অবান্তর অলঙ্কার বাহুল্য আসে, রেখা হয় অপরিচ্ছন্ন, অনিশ্চিত। এই ধরনের লক্ষণ ষোল শতকে আরও বেড়ে যায়। ষোল শতকের মাঝামাঝি লেখা কল্পসূত্র বলে একটি উল্লেখযোগ্য গুজরাটী পুঁথির ছবিগুলির কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি পাতাতেই একাধিক ছবি এবং তাদের চারধারে পাড় আঁকা ছবি। এইসব পাড়ে হয় মানুষ, পাখী, ফুল, ফল আঁকা, নয় অ্যারাবেসক্ আঁকা। এদের মধ্যে নাচের ভঙ্গীতে নর্তকীদের ছবিগুলি নিতান্তই ভারতীয়, আবার ফুলের নক্সাগুলিতে মুসলমানী আবেগ বেশ স্পষ্ট। বন্দুক হাতে কতকগুলি পদাতিক সৈন্য আর অশ্বারোহী বা হাতীর পিঠে চড়া সৈন্যের ছবির সারিও আছে। এগুলি দেখলেই ১৫৭০ সনে তৈরি নুজম-অল-উলুম পুঁথির অথবা সুলতান হুসেন নামা পুঁথির ছবির কথা মনে পড়ে যায়। সুতরাং গুজরাটী পুঁথির ছবিতে মুসলমানী প্রভাব বোধহয় পারস্য থেকে সরাসরি না এসে দাক্ষিণাত্য থেকে গিয়েছিল। চকমকি ঠোকা বন্দুক ১৫১৪ সনের চালদিরণের যুদ্ধে প্রথম দেখা যায়। অতএব পুঁথিটি নিশ্চয় ষোল শতকের প্রথমার্ধের আগে লেখা হয় নি। সুতরাং গুজরাটী চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ যদি পনেরো শতকের প্রথমার্ধে হয়েছে বলে আমরা মানি, তাহলে পুঁথিটি সে যুগের পরের লেখা। কোন পুরনো প্রথাকে মানুষ কি করে নানাভাবে আঁকড়ে থাকতে চায় তার নানান মজার উদাহরণ দেখা যায়। যেমন রথে বা ঘোড়ার গাড়ীতে ঘোড়া সমুখে থাকত বলে মানুষ যখন মোটর আবিষ্কার করল, তখন এঞ্জিনটা রাখল গাড়ীর সমুখ দিকে, যাতে সেটা ঘোড়ার স্থান নেয়। তেমনি কাগজ চালু হবার পর পুঁথি যখন অচল হয়ে

এল, তার বহুদিন পর পর্যন্ত, অর্থাৎ দু'শ বছর ধরে পুঁথি লেখকরা কাগজে পুঁথি লিখলেও তালপাতার পুঁথিতে যে জায়গা দুটিতে সুতো গলানর জন্যে ফুটো করা হত, সেই জায়গা দুটি আন্দাজ করে তাতে দুটি রঙের ফুটকি বসাতেন, আর ফুটকি দুটির চারপাশে আল্‌পনা করে দিতেন। যে কোন কাগজের পুঁথি তালপাতার পুঁথির যুগের কতদিন পরে লেখা হয়েছে তা বার করার এক সোজা উপায় আছে। সেটা হচ্ছে কাগজের পুঁথি যতই হালের হবে ততই তার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রস্থ হবে বেশী, কারণ তালপাতার পুঁথি লম্বার তুলনায় চওড়া হত খুব কম। পনেরো শতকে গুজরাটী চিত্রকলা চরম উৎকর্ষে পৌঁছনর পর আস্তে আস্তে অবনতি ঘটতে শুরু হল, প্রাণশক্তি গেল কমে। ষোল শতকের শেষের দিকে কেমন শুকনো আড়ষ্ট হয়ে গেল। এই ধরনের অবনতির দরুণ অনেকে মানতে রাজী হন্ না যে রাজপুত চিত্রকলার মূল উৎস হচ্ছে গুজরাটী চিত্রশিল্প। কিন্তু মানা সম্ভব হয় যদি আমরা মনে রাখি যে রাজপুত চিত্রকলা প্রথম ওঠে ষোল শতকে। ডাঃ নর্মান ব্রাউন বলে এক আমেরিকান পণ্ডিত এককথায় এর তত্ত্বটি বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন ষোল শতকের শেষভাগে গুজরাটে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন রীতি রাজপুত রীতিকে স্থান করে দিল, আর যে রাজপুত রীতি এইভাবে জন্মাল তা হল পশ্চিম ভারতের প্রাচীন রীতি আর পারসীক রীতির মিশ্রণের ফল। নর্মান ব্রাউনের এ উক্তিটি আসলে যা ঘটেছিল তাকে বড্ড সোজা করে বলতে গিয়ে বোধ হয় অত্যুক্তির পর্যায়ে পড়ল। কারণ মধ্যযুগের বিশুদ্ধ গুজরাটী রীতি তখনই প্রকৃতপক্ষে ভেঙ্গে যায় যখন সে দেশে মুঘল রীতির প্রভাব রীতিমত আমদানি হয়। গুজরাটী চিত্ররীতিতে মুঘলপ্রভাব সবচেয়ে নজরে পড়ে কতগুলি নিয়ন্ত্রণ পত্রে বা বিজ্ঞপ্তি পত্রে। এইসব বিজ্ঞপ্তি পত্রের উল্লেখ ব্রাউন নিজেই করেছেন, হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রভৃতিরাও করেছেন। ১৫৯০-১ সনে লেখা একটি গুজরাটী পুঁথি পাওয়া গেছে, তার নাম উত্তরাধ্যয়ন সুত্র। নর্মান ব্রাউন এ পুঁথিটির উল্লেখ করেছেন। পুঁথিটির বিশেষ মূল্য আছে, কারণ এটি একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পুঁথিটিতে যে সব চিত্র আছে তাতে একদিকে যেমন পারসীক প্রভাব খুব কম, এমন কি তার এক'শ বছর আগে যে সব পুঁথির ছবি আছে তার চেয়েও কম, অন্যদিকে প্রথম যুগের রাজপুত রীতির প্রভাব বা আবেগ এতে নেই বললেই হয়। এই পুঁথিটি থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে দেশজ লৌকিক রীতির অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার বা উপেক্ষা করে ক্রমাগত এদেশ সেদেশের প্রভাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কত ভুল। কারণ পুঁথিটির চিত্রগুলিই প্রমাণ করে দেয় যে গুজরাটেও ছিল, রাজপুতানাতেও ছিল, এমন একটি সর্বব্যাপী সাধারণ পশ্চিম ভারতীয় চিত্ররীতি যা ষোল শতকের শেষভাগে তৈরি হয় নি। কতকগুলি সুস্পষ্ট দেশজ সংস্কৃতির লৌকিক রীতি নিশ্চয় ছিল। নানালাল চমনলাল মেহতা গীতগোবিন্দ পুঁথির উল্লেখ করেছেন, এটি বোধহয় ষোল শতকের প্রথম দিকে লেখা। উত্তরাধ্যয়ন সুত্র পুঁথির ছবির সঙ্গে গীতগোবিন্দ পুঁথির ছবির খুব মিল আছে। ছবিগুলি সব একপাশ করে আঁকা, যাতে ছবির জমিতে অবয়বের রেখাগুলি পড়ে (ইংরেজিতে যাকে

বলে সিলুয়েট রীতি); গুজরাটী চিত্ররীতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যথা গাছ আর জল আঁকার ধরন। হাওয়ায় ওড়া জামা ও স্বচ্ছ পোশাকে যদিও রাজপুতরীতির আমেজ আছে, তবুও আবেগের টান কষাকষি বা প্রাণবন্ততা এতে নেই। আছে শুধু খুব সরল, গ্রাম্য গীতিধর্মী এক রীতি। বোধহয় গুজরাট আর রাজপুতানার মাঝামাঝি কোন রাজ্যে আঁকা।

প্রাচীন রীতিতে পোশাকে পরিচ্ছদে নক্সার বাহার বৈচিত্র্য খুব ছিল। কিন্তু ষোল শতকের শেষভাগে সেগুলি কমে হল কতকগুলি ফুটকি। অন্যদিকে সীমারেখা হল আরও কড়া, বলিষ্ঠ। যখন আস্তে আস্তে পুঁথির প্রস্থ বাড়তে লাগল তখন এক এক পাতায় দুটি তিনটি ভাগে ছবি আঁকার রেওয়াজ হল, বাড়ী-ঘরদোর, গাছপালা আঁকার রীতিও সরল হয়ে গেল, ছবিতে সেগুলি অনেক কম জায়গা জুড়তে লাগল। যেমন প্রাচীন গুজরাটী নীতির সজল নানা রকমারি গাছপালা ১৫৯১ সনে লেখা উত্তরাধ্যয়ন পুঁথিতে হয়ে দাঁড়াল একটি ছোট পাতা আঁকা গাছের ডাল। মুখ এবং অন্যান্য অবয়বের সাবলীল জোরালো রেখা চলে গিয়ে এল নিতান্ত সাধারণ বর্ণনা রীতি। গুজরাটী রীতির স্বকীয়তা বলিষ্ঠতা চলে গিয়ে আস্তে আস্তে সতেরো শতকে মুঘল প্রভাবের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

গীতগোবিন্দ পুঁথির ক্ষুদ্রকায় ছবিগুলির রীতিও উত্তরাধ্যয়ন পুঁথির ছবির রীতির মতই অদ্ভুত। গাছপালা, জল আঁকার রীতি যদিও একরকম, তবুও ছবিগুলির মধ্যে নতুন প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু গীতগোবিন্দের বিষয় কৃষ্ণলীলা, বোধ হয় সেই কারণেই প্রত্যেকটি ছবি যেন নাচের ছন্দে সংযত, তরঙ্গায়িত, প্রতিটি প্রাণী যেন নৃত্যের ছন্দে জীবন্ত। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পনেরো শতকের শেষভাগে আর ষোল শতকের প্রথমভাগে সারা পশ্চিম ভারতে, বৈষ্ণব ধর্মের যে ঢেউ খেলে যায়, গীতগোবিন্দের ছবি তারই সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। বিখ্যাত ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ স্যর জর্জ গ্রীয়র্‌সনের আজীবন সাধনার ফলে আমরা আজ জানি যে ১৪৫০ থেকে ১৬৫০ পর্যন্ত, দু'শ বছর ধরে ভারতের সর্বত্র লোক সাহিত্যে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটে, এবং সর্বত্র হিন্দু সংস্কৃতি যেন নব নব উন্মেষে বিকশিত হয়ে ওঠে। এবং এই নব জাগরণ, সংস্কৃতি ও চারুশিল্পে আবার-জন্মানো যুগ যে মুঘল রাজপ্রাসাদে সম্ভব হয়েছিল তা মোটেই নয়। এর জন্য দায়ী নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন, যার ফলে সারা দেশের জীবনে যেন এক পুনর্জন্মের যুগ আসে। মুঘল ও রাজপুত দরবারী চিত্রকলায় যেমন মুঘল চিত্ররীতির দান ও প্রভাব খুব, তেমনি ভারতীয় রাজদরবারের বাইরের চিত্রকলায় লোক-সংস্কৃতির পুনর্জন্মপ্রসূত প্রভাবও খুব বেশী। মুঘল ও দেশজ হিন্দু এই দুই প্রভাবের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, ভারতীয় চিত্ররীতিতে কার কতখানি, কি ধরনের দান, সেটুকু নিরূপণের চেষ্টা একটু করা দরকার।

চৈতন্যদেব জন্মান ১৪৮৫ সনে, মারা যান ১৫৩৩ সনে। ষোল শতকে উত্তর ভারতে যে আবার-জন্মানো যুগ এল তার মূলে যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেবের

জন্যই জয়দেব, বিদ্যাপতির আদর হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করে। চৈতন্যদেবই কীর্তনের প্রবর্তন করেন। কীর্তন একাধারে নাচ ও গানের অদ্ভুত সমন্বয়। অবশ্য আগেও নামকীর্তন ছিল, কিন্তু সে ছিল সুর করে রাম ও কৃষ্ণের রকমারি নামোচ্চারণ। কিন্তু চৈতন্যদেব যে লীলাকীর্তনের প্রচার করেন সে হল অনেক বিস্তারিত রীতি : একাধারে এক কণ্ঠের গীত, তার সঙ্গে বহু কণ্ঠের ঐক্যতান, সঙ্গে আবার খোল বা মৃদঙ্গ।

বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রথম যুগে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার ও চিত্রকলার যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল একথা মোটেই বলা যায় না। কারণ বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি বাঙলাদেশে ঠিক এই যুগে বৈষ্ণব চিত্রের কিছু প্রমাণ নেই। আর উড়িষ্যায় যা কিছু পাওয়া যায় তার সঙ্গে মধ্য ভারত আর দাক্ষিণাত্যের সম্বন্ধই বেশী। কীর্তনের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে যে চিত্রবিষয়ের সবচেয়ে বেশী সম্বন্ধ সে হচ্ছে রাগমালা অর্থাৎ ঋতু দিনক্ষণের সঙ্গে সম্বন্ধ মিলিয়ে রাগ রাগিণী বিষয়ক চিত্র। কিন্তু ভারতে কোথাও পনেরো শতকের রাগরাগিণীর চিত্র পাওয়া যায় না, সামান্য একটু অঙ্কুর গুজরাটে দেখা যায়, আর বসন্তবিলাসের মেজাজে কিছুটা আছে। তবে বালগোপালস্তুতি আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ পুঁথির সঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলনের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল বলা যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে দুটিরই যতগুলি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় সবই গুজরাটী রীতিতে লেখা। তার কারণও এমন কিছু আকস্মিক নয়, কারণ একদিকে দক্ষিণে রামানুজ, মাধবাচার্য সম্প্রদায়, অন্যদিকে গুজরাটে কৃষ্ণভক্তি এই দুইয়ের মিলনে গুজরাটে তেরো শতকেই বৈষ্ণব আন্দোলনের ক্ষেত্র বেশ তৈরি হয়ে ওঠে।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার রীতিতে প্রমাণ করার উপায়ের চেয়ে ভাল রীতি খুব কমই আছে। যদি একবার কোন বিশেষ রীতির সন তারিখ ঠিকমত পাওয়া যায় তবে কিসের থেকে কিসের প্রভাবে কিসের উৎপত্তি হল তা বলা শক্ত হয় না, এবং মানতেও বাধে না, কারণ এটা ঠিক যে শিল্পীদের কাছে খবর বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় ; দেশের এককোণে এক শিল্পী কি করছেন, তার সংবাদ দেশের আরেক কোণে অন্য শিল্পীর কাছে হাওয়ায় পৌঁছতে দেরি হয় না। আমরা যা ভাবি তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। এবং এইভাবে চিত্রনীতিতে আজ যেটা আনকোরা নতুন রীতি সেটা দুদিনের মধ্যে চিরপ্রচলিত পুরনো বাসি রেওয়াজ হয়ে যায়। সুতরাং কোন্ রীতি আগে, কোন্ রীতি পরে এসেছে এর হিসাব সংখ্যা দেখে হয় না, হয় নিতান্তই তারিখ দেখে। তাই আজও অনেকে হয়ত এইকথা শুনে চমকে উঠবেন যে রাজপুত চিত্রের উৎস গুজরাটি পুঁথির ক্ষুদ্রকায় ছবি নয়। যাকে পণ্ডিতরা সাধারণত বুন্দেলা রীতি বলেন সেই বুন্দেলা রীতির মতন করে আঁকা কতকগুলি ছবির একান্ত প্রাণবান বলিষ্ঠ রেখা আর দুঃসাহসী নাটকীয় রঙের বিন্যাসের মধ্যে তথাকথিত রাজপুত আদি ছবির উৎস খোঁজা উচিত হবে। প্রথম যুগের অর্ধোচ্চারিত রাজপুত ছবিকে পণ্ডিতরা সাধারণত 'আদিম' রাজপুত ছবি (ইংরেজিতে রাজপুত প্রিমিটিভ) বলেন। ১৫৭০ সন নাগাদ লেখা কবি বিল-হণ প্রণীত

চৌরপঞ্চাশিকার একটি পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কতকগুলি চিত্রের বিষয় আর রীতি দুইই উল্লেখযোগ্য। একটি প্রেমের দৃশ্য ; কবি বিল-হ্ণ তাঁর প্রেয়সীর পদচর্চা করছেন, বাঁ দিকে পালঙ্কের পাশে অলন্ত প্রদীপ, ডানদিকে একটি ফুলফোটা গাছ। দ্বিতীয়টি অভিসার : কবি তাঁর প্রেয়সীর কাছে রাত্রে এসেছেন, চারটি প্রদীপ জ্বলছে, বাঁয়ে পালঙ্ক, ছবির সমুখদিকে পদ্মফুলের সারি। আরেকটি ছবিতে কবি আর তাঁর প্রেয়সী চম্পাবতী বাড়ীর খোলা বারান্দায় বসে, দুটি পরিচারিকা বীণা আর খঞ্জনী বাজাচ্ছে, সমুখদিকে পদ্মের সারি। অন্য একটি ছবিতে খোলা চবুতারায় চম্পাবতী আর তাঁর পরিচারিকা পদ্মপুকুরের উপরে দাঁড়িয়ে, মাথার উপরে চাঁদোয়া, বাঁদিকে হাওয়া আটকানর উদ্দেশ্যে জোড়া পর্দা লাগান। প্রায় একই সময়ে আঁকা কতকগুলি রাগিণী চিত্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি রাগিণী ভৈরব ; মন্দিরে লিঙ্গের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে পূজা দিচ্ছে, সমুখ দিকে পদ্মপাঁতি ; জমির রঙ হলদে, পিছনে গাঢ় সবুজ পাহাড়, দিক্‌রেখা খুব উঁচু করে টানা। নীল আকাশ শুধুমাত্র কোণেই দেখা যাচ্ছে। হল্‌দে, নীল, আর কড়া লালে ছবিটি আঁকা। এ ছাড়া লাহোর মিউজিয়মে কতকগুলি বারমাস্যা ছবি পাওয়া গেছে সেগুলি ষোল শতকের শেষভাগে আঁকা। এগুলির উদ্দেশ্য সাধারণত কোন প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে ঋতু বর্ণনা। এ ছবিগুলিতে পারসীক প্রভাব নিতান্ত স্পষ্ট, এমন কি ছবির মধ্যেই পারসী অক্ষর ছবির সঙ্গে গাঁথা। আনন্দ কুমার-স্বামী ১৯২৩ সনে পোর্টফোলিও অভ ইণ্ডিয়ান আর্ট বলে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন, তাতে ৬৬ ও ৬৭ নং ছবিতে বুন্দেলা রীতিতে আঁকা দুটি রাগিণী চিত্র আছে। এই দুটির কম্পোজিশন ও হাতের দৃঢ় ব্যঞ্জনার মধ্যেও রাজপুতচিত্রের আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব ছবির লাল, হল্‌দে আর নীলের কড়া বর্ণবিন্যাসের ধ্বনিপ্রতিধ্বনির রেশ পাওয়া যায় বিকানীরের রসিকপ্রিয়া ও অন্যান্য রাগিণীচিত্রে। পরে ক্রমে ক্রমে রঙ আর ভঙ্গী কি ভাবে তন্বু ও কোমল হয়ে যায় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় বোস্টন মিউজিয়মের কৃষ্ণলীলা চিত্রে ও অন্যান্য মুঘল রীতিতে আঁকা ক্ষুদ্রকায় ছবিতে।

এই চিত্ররীতির উৎস কী জোর করে বলা শক্ত। ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে হামজা-নামার যে সব চিত্র আছে তার কোন কোন গৌণ অংশের পোষাক, অলঙ্কার, দাঁড়ান-বসার ভঙ্গীর সঙ্গে এইসব ছবিগুলির মধ্যে আবার যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন তাদের রীতির বেশ মিল আছে। এই সব ছবির তারিখ মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে (১৫৫৫ থেকে ১৫৭৯) এবং যেহেতু এইসব শিল্পীদের অনেকেই মুঘল দরবারে কাজে ভর্তি হন, সেহেতু এদের তারিখ আরও একটু আগে হতে পারে। সুতরাং এদের তারিখ মোটামুটি ১৫৭০ সন ধরা যায়। কিন্তু ঠিক কোন্ দেশে যে আঁকা হয়েছিল বলা শক্ত। চৌরপঞ্চাশিকা পুঁথি সংস্কৃতে লেখা। কাব্যটি গুজরাটে খুব লোকপ্রিয় ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু গুজরাটী ভাষায়, সংস্কৃতে নয়। কৃষ্ণলীলা পুঁথির ভাষা খানিকটা মাড়োয়ারি, খানিকটা গুজরাটী।

ইতিহাসের আগেরযুগের গুহাচিত্র

মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া, জি সেকশন, তলার স্তর : ষাঁড়ের সীল

হরপ্পা পটারি : মানুষ ও জীবজন্তু লতাপাতার ছবি (হরপ্পার ঢিপি)

মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া, জি সেকশন, তলার স্তর : চিত্রিত পটারির টুকরো
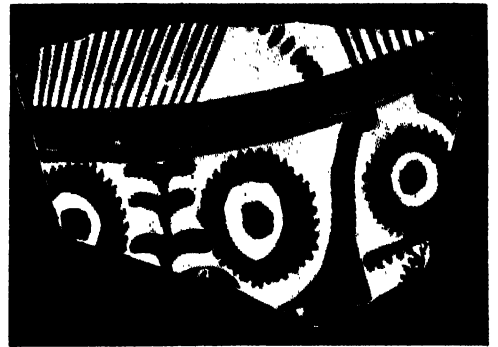
এই পৃষ্ঠার ছবিগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত

হরপ্পায় প্রাপ্ত মানুষের ছোট মূর্তি

হরপ্পায় প্রাপ্ত দুটি ছোট মূর্তি

মহেঞ্জোদারো ডি-কে এরিয়া, জি সেকশন, নীচের স্তর : বাঘের সীল

হরপ্পায় প্রাপ্ত ছেলে-কোলে মাতৃমূর্তি

মহেঞ্জোদারো, ডি-কে এরিয়া, জি সেকশন, নীচের স্তর : হাতীর সীল

হরপ্পায় প্রাপ্ত বসা অবস্থায় ছোট মূর্তি

মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত নানা জন্তুর সীল

এই পৃষ্ঠার ছবিগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত

সিগিরিয়ার একটি ফ্রেস্কো
আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

বাঘ : ৩নং গুহার প্রকোষ্ঠে দরজার ছবি

বাঘ : ৩নং গুহার প্রকোষ্ঠে
দরজার ছবি
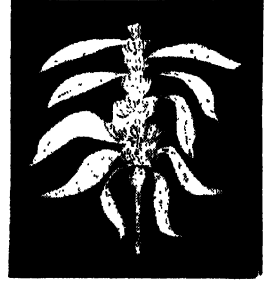
বাঘ : ৪নং গুহার সমুখের
বারান্দার ছবি

বাঘ : ৪নং গুহার উত্তর-পূর্ব
প্রকোষ্ঠের ফ্রিজের অংশ

এই পৃষ্ঠার ছবিগুলি দি ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকার অগাস্ট ১৯১০ সংখ্যার সৌজন্যে মুদ্রিত

দণ্ডন-উলিখ : কাঠের চিত্রিত পাটা
ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্র অথবা সাধুসন্ত

দণ্ডন-উলিখ : চীনে রাজকুমারী

এণ্ডেরে : কাগজের উপর ইণ্ডিয়ান
ইঙ্কে আঁকা ব্যাকট্রিয়ার উট

এই পৃষ্ঠার ছবিগুলি ভি-এ স্মিথের ফাইন আর্ট ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোনের সৌজন্যে মু

দণ্ডন-উলিখ : পারসীক বোধিসত্ত্ব (কাঠের পাটায় চিত্রিত : ডি-৭, ৬

ভি-এ স্মিথের ফাইন আর্ট ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোনের সৌজন্যে মুদ্রিত

তিব্বতী ধ্বজা : বুদ্ধ অমিতাভ

ই-বি হ্যাভেলের ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিং এর সৌজন্যে মুদ্রিত

মহাবীরের জন্ম

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের পুঁথিচিত্র : ষোল শতক (১৫৯০-১)

ডব্লিউ নর্মান ব্রাউনের ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইলাস্ট্রেশনস্ অভ দি উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের সৌজন্যে মুদ্রিত

আমীর হামজা (১৫৫০—৭৫): কাপড়ের উপর চিত্র

ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার সৌজন্যে মুদ্রিত

ফতেপুর সিক্রির দেয়ালচিত্র : একটি নৌকায়
আটটি যাত্রী (ষোল শতকের শেষভাগ)

ই-ডব্লিউ স্মিথের বই ও আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি
পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত
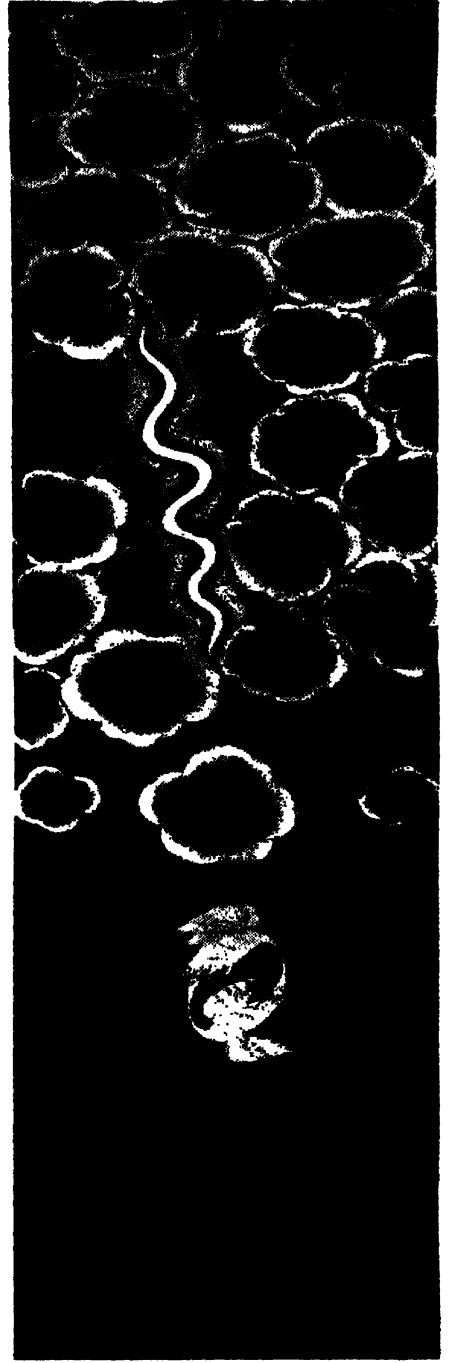
জয়পুর প্রাসাদের দেয়ালচিত্র
(চীনে প্রভাব সুস্পষ্ট)
সতেরো শতক
আনন্দ কুমারস্বামীর রাজপুত পেন্টিং-এর সৌজন্যে মুদ্রিত

ঝিলম নদীর উপর নৌকাসেতুতে
হাতীর পিঠে আকবরের যুদ্ধ।
আকবরনামা হইতে : বসাওআন
ও ছতরের কাজ।
ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট
মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার সৌজন্যে মুদ্রিত

আকবরনামা (অনুমান ১৬০২)
রাজপুত্র সলীমের জন্মসংবাদ
(কেশুর রেখা, ছতরের রঙ)
ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট
মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার
সৌজন্যে মুদ্রিত

যুধিষ্ঠিরের নরকে অবরোহণ : চিত্রকর মুকুন্দ
(জয়পুর রজমনামা) ষোল শতক : জয়পুর
প্রদর্শনী ১৮৮৬। জার্নাল অভ ইণ্ডিয়ান
আর্টের (১৯১৩) সৌজন্যে মুদ্রিত

ষাড়ের একা (চিত্রকর আবুল হাসান নাদিরুজ্জমান। নামসহি : রকিম আবুল হাসান)
এন-সি মেহতার স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান পেন্টিং-এর সৌজন্যে মুদ্রিত

যুবরাজ সলীম হিসাবে জাহাঙ্গীর
(দারা শিকো অ্যালবামের ১৮নং ফোলিও)
ভি-এ স্মিথের ফাইন আর্ট ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোনের সৌজন্যে মুদ্রিত

প্রাণীহত্যা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের ফর্মান
সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিপত্র (সতেরো শতক)
হীরানন্দ শাস্ত্রীর এনশেণ্ট বিজ্ঞপ্তি-
পত্রজের সৌজন্যে মুদ্রিত
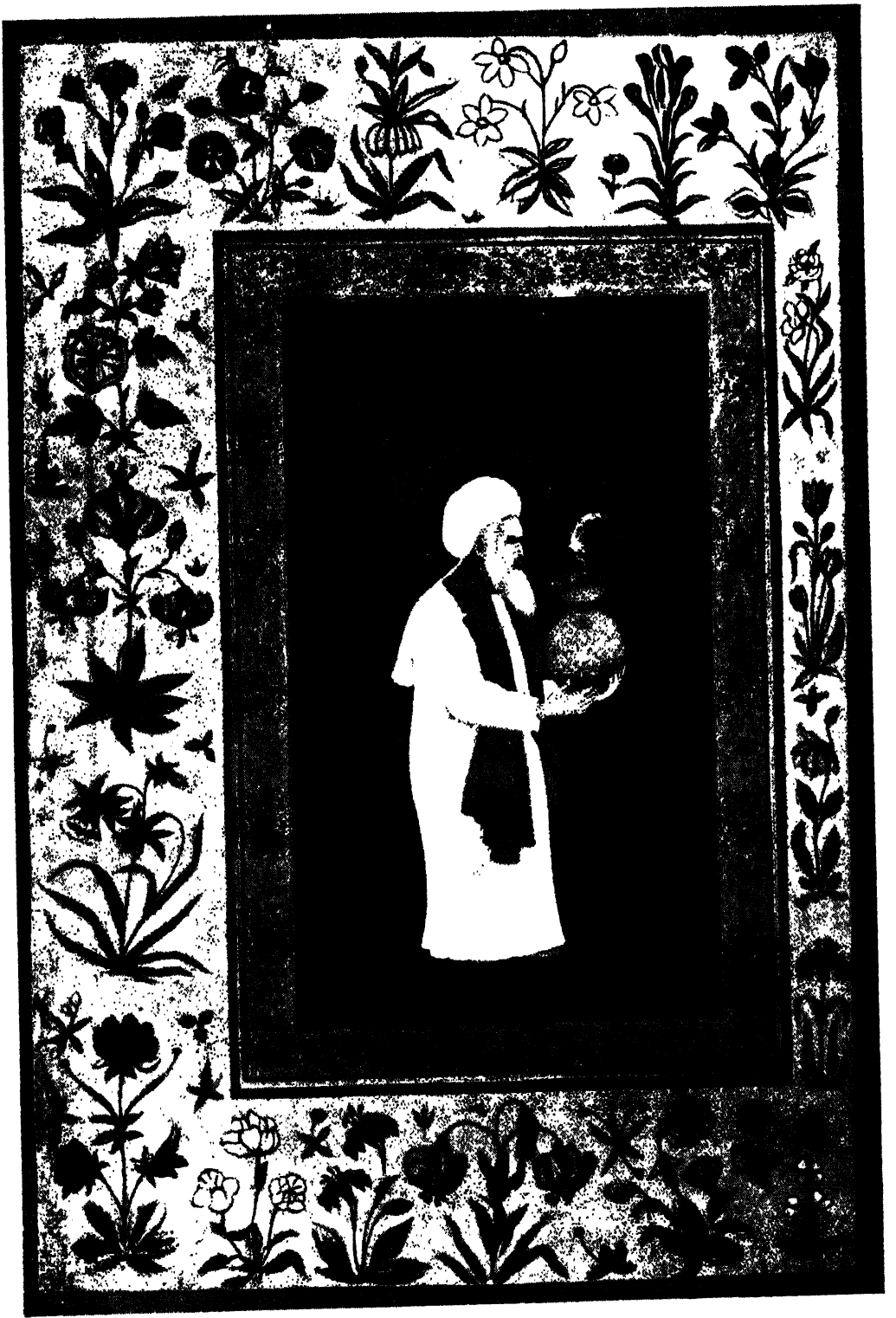
শা দৌলতের প্রতিকৃতি (চিত্রকর বিচিত্র)
চেস্টার বিয়াটি সংগ্রহের সৌজন্যে মুদ্রিত

রাত্রে পথিকদের আগুন পোহান
ই-বি হ্যাভেলের ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিং এর সৌজন্যে মুদ্রিত
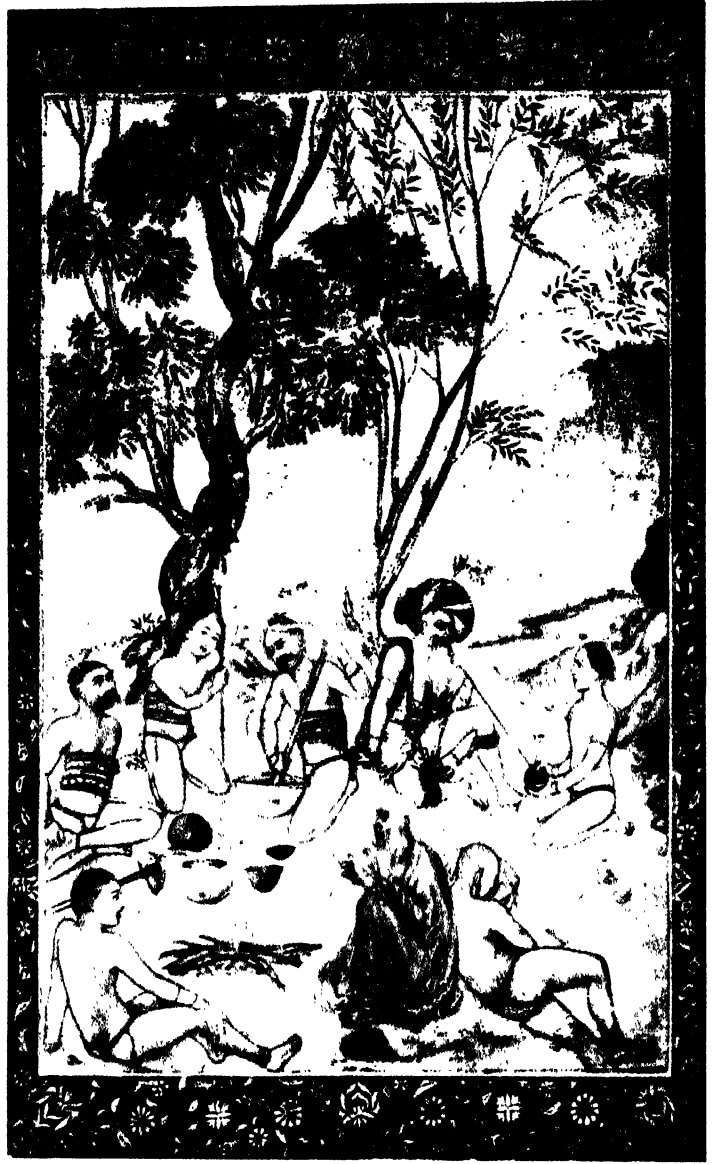
গাছতলায় বিশ্রামরত ফকীরের দল (অনুমান ১৬৫০ খৃঃ)
ব্যারন মরিস রথ্‌স্‌চাইল্ডের (প্যারিস) সংগ্রহের
সৌজন্যে মুদ্রিত

রাজান্তঃপুরের দৃশ্য : কাপড়ের উপর আঁকা

[চারপাশের পাড় ছাপা (অনুমান ১৬১৫-৪০)

নিউ ইয়র্কের মেট্রপলিটান মিউজিয়ম ও আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

ধনশ্রী রাগিনী (অনুমান ১৫৭০)
ব্যাজল গ্রের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্সের সৌজন্যে মুদ্রিত

কৃষ্ণলীলা : দানলীলা (রাজপুত, অনুমান ১৫৮০)
ভাগবত পুরাণ পুঁথিচিত্র
এইচ গোয়েটসের দি আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিটেক্‌চার অভ বিকানীর
স্টেটের সৌজন্যে মুদ্রিত

রসিকপ্রিয়া পুঁথিচিত্র, মালোয়া, মধ্যভারত (সতেরো শতকের তৃতীয়াংশ) স্টেলা ক্রামরিশের আর্ট অভ ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে মুদ্রিত
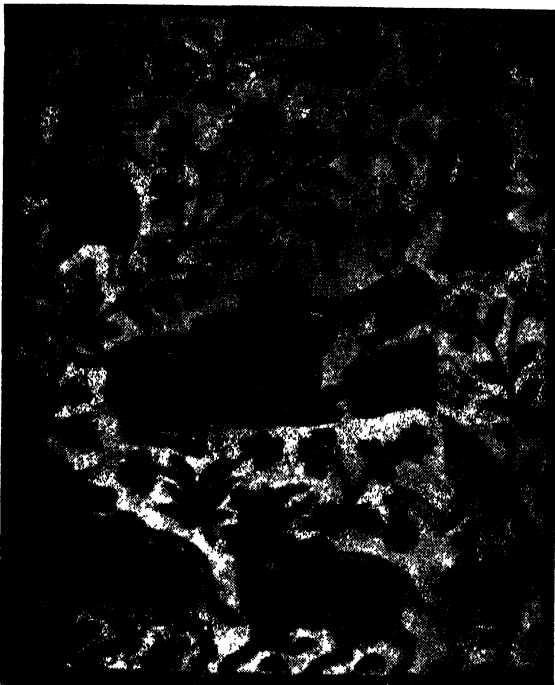
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা : ভাগবত পুরাণ পুঁথিচিত্র, মারোয়াড় (যোধপুর), সতেরো শতকের মাঝামাঝি। তুলারাম সংগ্রহের সৌজন্যে মুদ্রিত

খণ্ডিতা নায়িকা : মধুমালতী পুঁথিচিত্র
রাজস্থানী, অনুমান আঠারো শতক
আশুতোষ মিউজিয়ম ও আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

মহারাজ রাজসিংহের কন্যা : চিত্রকর, ওস্তাদ হামিদ আহমদের পুত্র (অনুমান ১৭৯৮-৯৯)
লালগড় প্রাসাদ
এইচ গোয়েটসের দি আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিটেকচার অভ বিকানীর স্টেটের সৌজন্যে মুদ্রিত

মহারাজ সুরং সিংহ (রাজত্ব ১৭৮৭-১৮২৮), কোলে টোঁকল সিংহ (চিত্রকর ওস্তাদ কাশিম, ১৮০৯) লালগড় প্রাসাদ। এইচ গোয়েটসের দি আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিটেকচার অভ বিকানীর স্টেটের সৌজন্যে মুদ্রিত

রাধাকৃষ্ণ লীলা, কাংড়া (আঠারো শতকের শেষভাগ)
ভি-এ স্মিথের ফাইন আর্ট ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোনের সৌজন্যে মুদ্রিত

রাজান্তঃপুরিকা, কাংড়া (আঠারো শতকের শেষভাগ)
ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার সৌজন্যে মুদ্রিত

:গাপনী, কাংড়া
মান ১৮০০)
-জি আর্চারের
। পেন্টিং-এর
:ন্য মুদ্রিত

কাণামাছি খেলা (চিত্রকর মানক)
এন-সি মেহতার স্টাডিজ ইন
ইণ্ডিয়ান পেন্টিং-এর সৌজন্যে মুদ্রিত

প্রেমের তুফান, কাংড়া (অনুমান ১৮২০)
ডব্লিউ-জি আর্চারের কাংড়া পেন্টিংএর সৌজন্যে মুদ্রিত
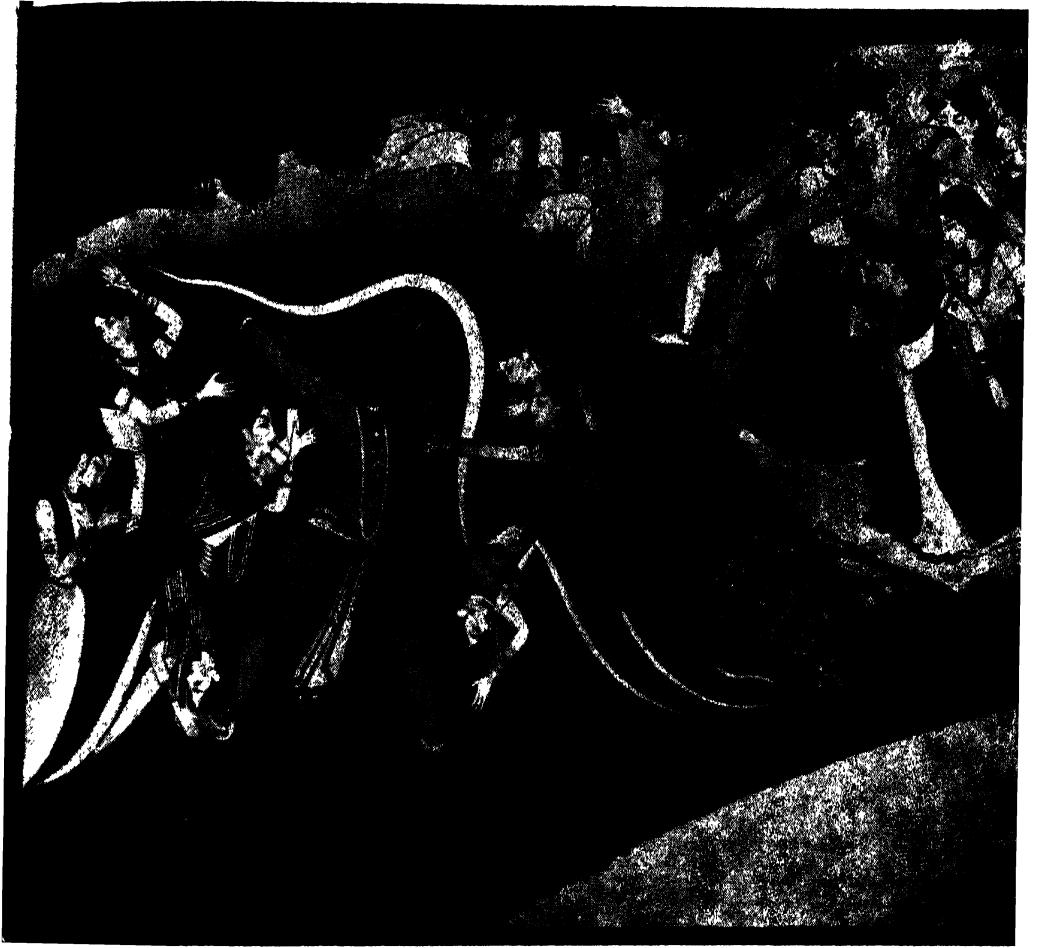
কালীয় দমন (তেহরি-গাঢ়োয়াল ?)

আনন্দ কুমারস্বামীর রাজপুত পেন্টিং-এর সৌজন্যে মুদ্রিত
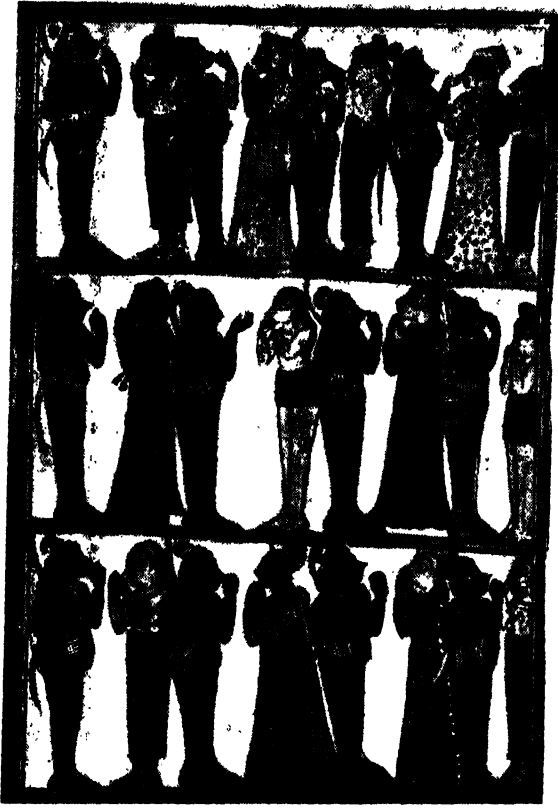
রাম ও ভরতের মিলন : তুলসীদাস রামায়ণের পুঁথিচিত্র, মুর্শিদাবাদ, অনুমান ১৭৭২-৭৫। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে মুদ্রিত

যশোহরের পুরনো কাঁথা
আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ওমর খৈয়াম চিত্র
আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবি

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত
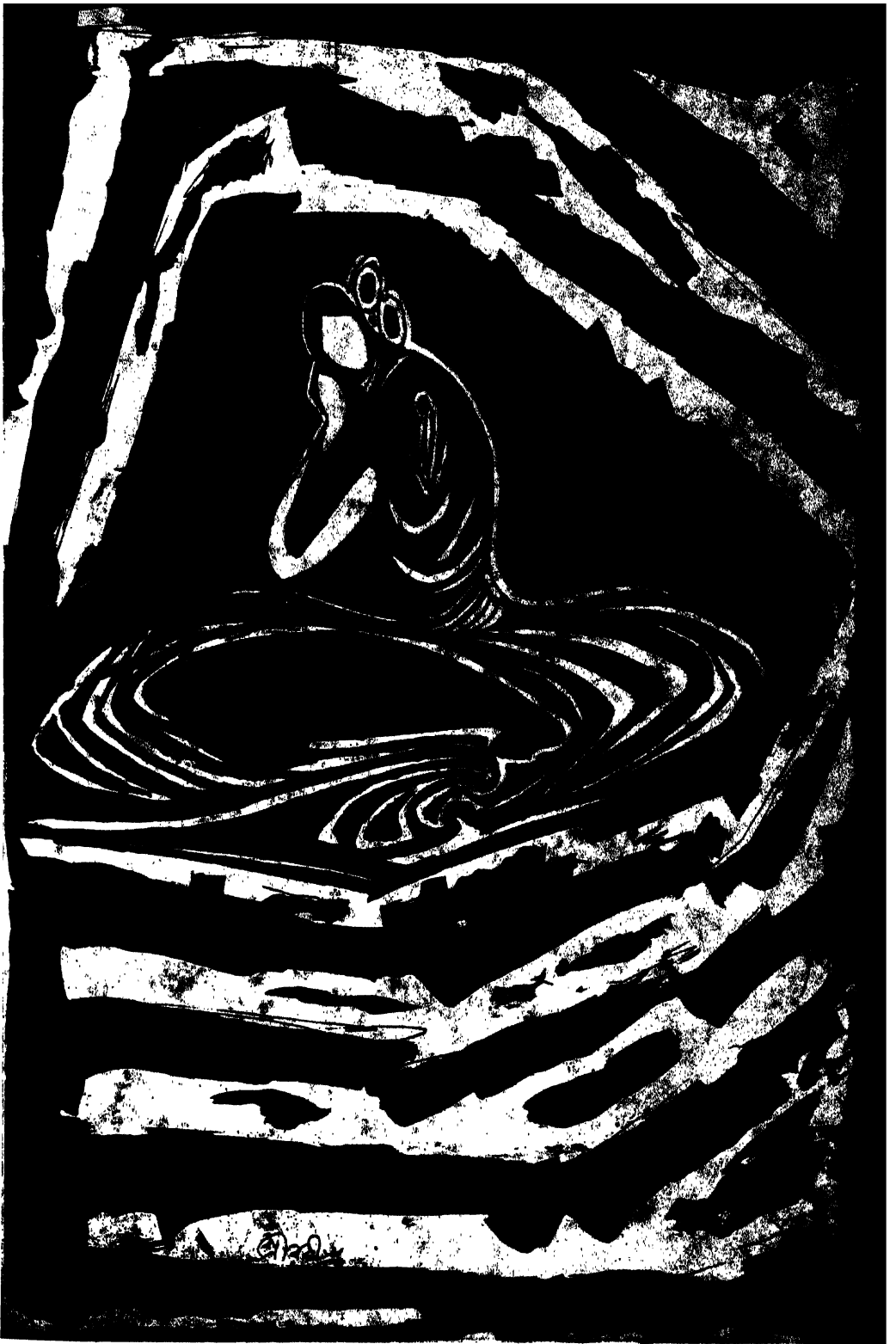
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবি
বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত

যামিনী রায় : ছবি
শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অভ ওরিয়েণ্টাল আর্টের সৌজন্যে মুদ্রিত।

বারমাস্তা পুঁথি যদিও ফারসী হরফে লেখা, কিন্তু ঠিক কী শুভাষায় লেখা বোঝা যায় না। এই রীতিটি ঠিক আসল গুজরাটী চিত্রের বিভিন্ন রীতির মধ্যে পড়ে না। অন্যান্য নানা লক্ষণের সাহায্যে, যেমন বাড়ীঘর দোরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে, ভারতের ঠিক কোনস্থানে এ রীতির জন্ম তার নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু তাতে বিপদ আছে। যেমন ধরা যাক ছাদের খুব চওড়া কার্নিশ, আর তা ধরে রাখার জন্ত পাতলা সরু ব্র্যাকেট : আকবরের ফতেপুর সিক্রিতে এটি খুব নজরে পড়ে, কিন্তু এটি নিতান্তই প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য রীতি। পুরনো রাজপুত স্থাপত্যে ত বটেই ; মানসিংহের তৈরি (১৪৮৬-১৫১৬) গোয়ালিয়রের মানমন্দিরে ও গুর্জরী মহলেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অম্বরের অতি প্রাচীন ঠাকুরজী (কৃষ্ণ) মন্দিরেও দেখা যায়। তা ছাড়া সবচেয়ে বেশী দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে কাকটীয়দের তৈরি মন্দিরগুলিতে, যেমন ওয়ারাঙ্গলে, হাম্পিতে, রামাপ্পায়। সেগুলির তারিখ খৃষ্টীয় তেরো চোদ্দ শতক। মাণ্ডুতেও পনেরো শতকে তৈরি বাড়ীতে দেখা যায়। ষোল শতকে রাজপুতানায়, মধ্যভারতে এই স্থাপত্যরীতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ছবিতে স্থাপত্যরীতির উপর নির্ভর করে জোর করে কিছু মত দেওয়া যায় না। তবে এই ছবিগুলির উল্লেখ করে মধ্য যুগের প্রাচীর চিত্র আর পুঁথি চিত্রের মধ্যে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ টানা যায়। সেই সঙ্গে এই কথাও বলা যায় আকবর বাদশার কিতাবখানার শিল্পীদের মুঘল কলমে ভারতীয় প্রভাব কিভাবে এসেছিল। এই সময়ে ষোল শতকের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে যে চিত্ররীতি বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে তার কথা আগেই বলেছি। সে রীতিও নিশ্চয় মুঘলরীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একটি ভুল ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করার পরই সে দেশে যা কিছু চিত্রকলার উন্মেষ হয়; যার ফলে একটি বিশিষ্ট ডেকানী কলম হয়। আসলে ব্যাপারটি আরও অনেক জটিল। বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের পর দক্ষিণী শিল্পীরা নানাদিকে ছড়িয়ে গিয়ে ষোল শতকে উত্তর ভারতে দক্ষিণী রীতি রপ্তানি করে, আবার সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতের রীতি দক্ষিণ ভারতে এসে দক্ষিণী রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

আকবর বাদশার রাজত্বকালের সবচেয়ে পুরনো চিত্রিত পুঁথি যা পাওয়া যায় সেটি ১৫৭০ সনে রচিত একটি জন্তু জানোয়ারের কাহিনীর বই বা কথামালা। নাম আনোয়ার-ই-সুহায়লি। পুঁথিটি এখন লণ্ডনের স্কুল অভ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজএ আছে।

পুঁথিটিতে মানুষের ছবি খুব কম ; গাছপালা, জলের ছবিতে পারসীক রীতি সুস্পষ্ট, হাম্জানামার সঙ্গে খুব মিল। কিন্তু জন্তু জানোয়ারের ছবিগুলি একান্ত ভারতীয় : যেমন সমবেদনা দিয়ে আঁকা, তেমনি জন্তু চরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও ধারণা। কিন্তু তবুও নক্সার রীতি, মুখের ভাবভঙ্গীতে পারসীক প্রভাব স্পষ্ট। আকবরের রাজত্বের প্রথম অংশে, অর্থাৎ ১৫৮৫ সনের আগে আঁকা, আরও দুটি পুঁথির উল্লেখ করা উচিত। দুটিই ১৫৮০ সন নাগাদ রচিত, একটির নাম তুতিনামা, অন্যটির

দরাবনামা। দুটিই চিত্রবহুল, মানুষের ছবিও অনেক। ছবির বর্ণবিন্যাসে পারসীক প্রভাবের চেয়ে ভারতীয় আমেজ বেশী: লাল আর গাঢ় সবুজের ছড়াছড়ি, মাঝে মহিলাদের স্বচ্ছ ওড়নায় সাদা। মহিলাদের মুখ ও পোশাক স্পষ্টই ভারতীয়। কিন্তু বাড়ীঘরদোর আবার হামজানামার রীতিতে আঁকা, অর্থাৎ কিছুটা মুসলমানী। বাড়ী ঘরের অ্যারাবেস্‌ক করা টালির কাজেও এই মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করার মত। ঠিক এই সময়ে পারস্যে মহম্মদী রীতির খুব চলন ছিল তাতে সোজা সোজা রেখার খুব রেওয়াজ হয়। দরাবনামায় এই রীতির প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়। এই রীতি অবশ্য মুঘল দরবারে বেশী স্পষ্ট হয় ষোল শতকের একেবারে শেষভাগে। কিন্তু ১৫৭০ সনে আঁকা আনোয়ার-ই-সুহায়লিতে অথবা ১৫৮০ সন নাগাদ আঁকা তুতিনামাতে মামুলি মুঘল চিহ্ন সুস্পষ্ট: তার প্রমাণ, জমাট, গাঢ় কালো জমিতে আঁকা গাছে, হাল্কা রঙে আঁকা গাছের পাতায়। কিন্তু প্রেমের চিত্রগুলিতে যে আবেগ এসেছে তা নিতান্তই ভারতীয়, তাতে না আছে মুঘল দরবারের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমিকবীরের ভাব, না আছে পারসীক রোমান্টিক ভাব। এই ছবিগুলিতে ভারতীয় রীতিনীতি নিতান্ত কায়েম হয়ে, পরে বাবরনামা, আকবরনামার সমৃদ্ধি সাধন করে। ১৫৮১ সনে আঁকা গুলিস্তান বলে একটি পুঁথির অলঙ্কার নক্সার কাজে একদিকে যেমন গুজরাটী পুঁথির হাত খুব স্পষ্ট, অন্যদিকে সেটি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকের কাজ হাফিজ-নামার কথা খুব স্মরণ করিয়ে দেয়। গুলিস্তানের শেষ ছবিটি একটি অল্পবয়স্ক যুবার, বোধ হয় শিল্পী মনোহরের আঁকা নিজের ছবি। যা কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় মনোহর ১৫৬৫ সন নাগাদ জন্মেছিলেন। মনোহর বসাওনের ছেলে ছিলেন।

আকবরের রাজত্বের মধ্যযুগে জয়পুরের রজমনামা তৈরি হয়। ১৫৮২ সনে বাদশা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মহাভারতের পারসী অনুবাদের পুঁথিতে ছবি আঁকার হুকুম দেন। বইটিতে ১৬৯ পৃষ্ঠার পুরো মিনিয়েচর ছবি আছে। সেগুলির প্রগল্‌ভ ঐশ্বর্য, ভীড় করা কম্পোজিশনের বাহাদুরিতে ভারতীয় চিত্রের লক্ষণ অদ্ভুতভাবে ফুটে ওঠে। বইটিতে রাজপুতানা ও গুজরাটের রীতি ত দেখা যায়ই, উপরন্তু দাক্ষিণাত্যের রীতির ছাপও সুস্পষ্ট। কয়েকটি ছবির একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বইটিতে চোদ্দটি ছবি আছে যা বইয়ের বাঁধানো শিরদাঁড়ার সঙ্গে সমান্তরাল করে এবং ফারসী লেখার সঙ্গে সমকোণ করে আঁকা। পুরনো তালপাতার পুঁথিতে ঠিক এইভাবে ছবি আঁকা হত। ফলে পুরনো ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ছবিগুলি বেশ খাপ খায়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে রজম্‌নামার অন্য ছবির থেকে এই ছবিগুলির রীতিগত পার্থক্য নেই। ফলে স্বীকার করতেই হয় যে রজম্‌নামার ছবি ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যধারার মধ্যে পড়ে।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে কি করে এক বিশিষ্ট মুঘলরীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল তার কথা আগেই সংক্ষেপে বলেছি। ১৫৭৯ সনের আগে রচিত চোদ্দশ' চিত্রসম্বলিত হামজানামা ১৫৮২ থেকে

১৫৮৪র মধ্যে রচিত। জয়পুরী রজম্‌নামা ১৫৮৯ সনে রচিত, তারিখ-ই-আলফি ১৬০২ সনে রচিত, আকবর নামা, বহর-অল হয়াত, যোগবাশিষ্ঠ, হরিবংশ, কথাসরিৎসাগর, ইত্যাদি বিরাট বিরাট চিত্র সম্বলিত পুঁথির মধ্যে দিয়ে পারসীক, ভারতীয়, ইওরোপীয়, দক্ষিণী, বিভিন্ন রীতি মিলে কি করে আশ্চর্য ধনাঢ্য মুঘল রীতির প্রসার হল তার সামান্য উল্লেখ করেছি। এইভাবে মুঘল বাদশা আকবরের একান্ত চেষ্টায় বহু নিপুণ, যশলোভী চিত্রশিল্পীর একত্র সমাবেশ সম্ভব হয়, যার ফলে হয় বিশাল ও বহুমুখী সৃষ্টি। দেশজ ও পারসীক, হিন্দু ও মুসলমান, সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সমন্বয়ের যে চেষ্টা আকবর বাদশা করেন, নতুন এক সংস্কৃতি সৃষ্টির যে একান্ত আগ্রহ তাঁর মধ্যে আসে, তার শ্রেষ্ঠ ফল হয় এক নতুন ভারতীয় চিত্রনীতি, যার উপযুক্ত নাম হচ্ছে মুঘল। আকবর বাদশার রাজত্বকালেই এই নতুন রীতি এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে এই রীতি ফিরেফিরতি ভারতের অন্যান্য দেশীয় রীতি, বিশেষ করে রাজপুতানার রাজ্যগুলির দেশজ রীতির উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম যে দুটি রাজ্যে দেশজ চিত্ররীতিতে মুঘল প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে তাদের নাম বিকানীর ও অম্বর। বিকানীরের রাজা ছিলেন রায় সিংহ (১৫৭১—১৬১১) আর অম্বরের রাজা মানসিংহ (১৫৯২—১৬১৪)। দুজনেই আকবরের সেনাপতি ছিলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে এ সময়ে আকবরের দরবারও ক্রমাগত এ জায়গা ও জায়গা ঘুরে ঘুরে বেড়াত ; কিছু কিছু শিল্পীও নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন ; যেমন সঙ্গে থাকতেন আকবরের সভাকবি রাজা বীরবল, যিনি যুদ্ধে মারা যান। মুঘল দরবারে আরেক হিন্দু কবি ছিলেন, তিনি বুন্দেলখণ্ডের রাজ্য অর্চ্ছার লোক, রসিকপ্রিয়ায় স্রষ্টা, কেশব দাস। বিকানীর, অম্বর, বুন্দেলা রীতিতে মুঘল প্রভাব কি ভাবে আসে সে সম্বন্ধে ডাঃ হার্মান গোয়েটজ খুব মূল্যবান কাজ করেছেন।

রাজপুত চিত্রের অবতারণা করতে গিয়ে ভূমিকা বড় হয়ে গেল। তার একটু কারণ আছে। ১৯১৬ সনে আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর বিখ্যাত বই 'রাজপুত পেন্টিং' দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। রাজপুত চিত্রকলা বিষয়ে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক, তার উপরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যে বইয়ের প্রতিটি ছত্র উজ্জ্বল। এই বইয়ে তিনি মুঘল চিত্রনীতি আর রাজপুত চিত্রনীতি যে নিতান্ত দুটি ভিন্ন জগতের, দুইয়ের মধ্যে না ভাবে না রীতিতে কোন সম্বন্ধই নেই, সে কথা দৃঢ়ভাবে বলেন। এ ব্যাপারে 'রাজপুত পেন্টিং' বইটির প্রথম খণ্ডের ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা থেকে তাঁর বক্তব্য তর্জমা করে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল, তাতে তাঁর বক্তব্য আমরা শুনতে পাব : "মুঘল চিত্রকলা আসলে মিনিয়েচর চিত্ররীতি, যেমন পারসীক চিত্রকলা উদ্ভাসরীতি। কদাচিৎ যেখানে দেয়ালে মুঘলচিত্র দেখা যায় স্পষ্টই বোঝা যায় মিনিয়েচরকে গুণ করে বাড়িয়ে আঁকা হয়েছে। রাজা ওমরা সমঝদারদের গ্রন্থাগারের বইয়ের মধ্যেই মুঘল চিত্রকলা মানায় ভাল ; কিন্তু হিন্দু চিত্রকলা মন্দির, প্রাসাদ, সাধারণের ব্যবহার্য হর্মের দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার চিহ্ন সে সব জায়গায় এখনও বর্তমান। মুঘল চিত্রকলা জাগতিক, বর্তমান মুহূর্তের উপর

নির্ভর, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে প্রগাঢ়ভাবে কুতূহলী। জীবনকে আদর্শ ছাঁচে ফেলে না, কিন্তু তবুও জীবনের মহান ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি দিকের সুকুমার, সুচারু প্রতিচ্ছবি। স্তব্ধ নয়, নাটকীয় ; যৌবনোচ্ছল, পরীক্ষা ভালবাসে, পরিপাক করতে প্রস্তুত। যেমন জৌলুষ তেমনি মনোহারী কিন্তু ক্বচিৎ জীবনের গভীর উৎস পর্য্যন্ত যায়। মুঘল চিত্রের সবচেয়ে সাফল্য প্রতিকৃতিতে, দরবারের জমকালো জাঁকজমকে। সবকটি বিষয়ই জাগতিক, এবং যদিও অবশ্য নিছক পর্যবেক্ষণের তীব্রতায়, গভীর আবেগময় নক্সার জোরে, কিছু কিছু একক ছবি,—যেমন অক্সফর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'মুমূর্ষু লোকের' ছবিটি —মহত্বের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে অক্লেশে পৌঁছেছে, তবুও মুঘল শিল্পের চিত্রবিষয় মুখ্যত নিতান্ত রাজা উজিরের পক্ষে ভাল লাগার কথা। অন্যপক্ষে রাজপুত চিত্রের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে প্রথমটি অভিজাত ও জাতশিল্পীর দরবারী কাজ : দ্বিতীয়টি দেবদেবীর স্তরভেদে যুগপৎ আপ্লুত অথচ লৌকিক ; এবং প্রায়ই দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত সাধারণ ঘটনার মধ্যে অনন্ত অর্থের মরমিয়া রসে সিক্ত। মুঘল সভাসদদের যেমন রাখাল ও গোপিনীদের চিত্রে উৎসাহ পাবার কথা নয়, তেমনি বৈষ্ণবদেরও হাতীর লড়াই ভাল লাগার কথা নয়। এটা মনে রাখা দরকার যে মুঘল চিত্রকলা নিতান্তই রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর ছিল; ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর আর টিকল না : আকবরের রাজত্বের সঙ্গে তার জন্ম, আর মোটামুটি ১৭০৬ সনে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেই তার মৃত্যু। এখন আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই : আছে শুধু হাতীর দাঁতের উপর কিছু ক্ষুদ্রকায় ছবি, যা নাকি মুখ্যত পর্যটকদের উদ্দেশ্যেই আঁকা। সাধারণ লোকের এ ছবি ভাল লাগার কথা নয়। হিন্দু দোকানে, বাড়ীতে, মুঘল বাদশাদের প্রতিকৃতি পাওয়া যাবেনা, পাওয়া যাবে প্রাচীন নক্সার অবলম্বনে জার্মান ওলিওগ্রাফে ছাপা রাজপুত ঐতিহ্যে আঁকা খেলো ছবি। রবিবর্মার ঝুটো ভারতীয় চিত্রকলার কথা নাই বললুম।...মুঘলচিত্র যে নিতান্তই বিদগ্ধদের উদ্দেশে পোষাকী শিল্প, তার আরেক প্রমাণ এই যে অধিকাংশ ছবিরই শিল্পীর নাম জানা যায়, অনেক ছবিতে নামসই আছে। তাছাড়া মুঘল চিত্ররীতিতে এক খুব সুস্পষ্ট দ্রুত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, উত্থান ও পতন, পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যার লগ্ন শেষ হয়ে গেল। এই কারণে ইওরোপীয় নীতি অনুযায়ী মুঘল চিত্রশিল্পেরও নাম তারিখ অনুসারে ইতিহাস গড়া যায়। কিন্তু রাজপুত চিত্রকলার পক্ষে এ কখনও সম্ভব হবে না। সমস্ত প্রাচীন, একান্ত ভারতীয় চারুশিল্পের মতই রাজপুত চিত্রকলা নিতান্ত অনামী ও রক্ষণশীল, গতি প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন। স্বল্প আয়ুতে মুঘল চিত্রকলা যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, তবুও সে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে একটি ঘটনা বা উপাখ্যান মাত্র। অন্যপক্ষে, অন্যান্য প্রাকৃত শিল্পের মত, রাজপুত চিত্রকলা ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব ধারার একটি অংশ"।

কুমারস্বামীর মত বিদগ্ধ, রসজ্ঞ, মহাপণ্ডিত যখন এই ধরনের মত প্রকাশ করেন তখন সাধারণ বিচারে তা অকাট্য, অলঙ্ঘনীয় হতে বাধ্য। কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় একান্ত বিনীত চিত্তে এই অংশটি পড়লেও এটুকু স্বীকার করতেই হয় যে কুমারস্বামী মুঘল চিত্ররীতিকে অযথা দুষেছেন, রাজপুত

রীতিকে অযথা সম্মান দিয়েছেন। কারণ দুই চিত্ররীতিই নিতান্ত রাজানুগ্রহনির্ভর ছিল; কোনটাই কামার, কুমোর, চাকুরিয়া, ছোট ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতার উপর আস্থা রাখত না। দ্বিতীয়ত মুঘল চিত্ররীতিকে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে একটি ঘটনামাত্র কোনমতেই বলা যায় না, যেহেতু মুঘল চিত্রকলা নিতান্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট এবং এইভাবে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হবার পর ফিরেফিরতি সে আবার রাজপুত চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করে। তৃতীয়ত বিষয়বস্তুর দিক থেকেও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার প্রতি, জীবজন্তুর প্রতি মুঘল ও রাজপুত চিত্রের সমান দরদ

দেখা যায়, এবং একদিকে যদি আমরা মুঘল চিত্রে দরবারের জাঁকজমকের প্রতি পক্ষপাত দোষ দেখি, অন্যদিকে তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্বে হিংসামাৎসর্যের ঘাতপ্রতিঘাতে ছিন্নভিন্ন রাজপুত শৌর্যবীর্যময় যুদ্ধবহুল জীবনে মধুর, পেলব, সুকুমার, গীতধর্মী, কাব্যময় তন্নু প্রেমের প্রতি পক্ষপাতও আমরা রাজপুত চিত্রে বিশেষভাবে দেখি। একদিকে যেমন জীবনে নিত্য যুদ্ধবিগ্রহের আগুন, অন্যদিকে তার তাপ জুড়োনর তৃষ্ণায় বৈষ্ণব বিষয়ক চিত্রের প্রতি রাজপুতদের একান্ত আগ্রহ। চতুর্থত কি মুঘল কি রাজপুত, দুয়েতেই প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট সমান স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চমত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কুমারস্বামীর মতেই ষোল শতকের আগের রাজপুত চিত্রের চিহ্ন বিশেষ নেই। অর্থাৎ নানাস্থানের লৌকিক রীতির সংমিশ্রণে ও মধ্যযুগের তথা গুজরাটী পুঁথি ও দাক্ষিণাত্যের রাজদরবারের প্রভাবাপ্লুত হয়ে রাজপুতানায় যদি বা কোন দেশীয় রীতি বিশেষ সাফল্যলাভ করে থাকে, তবুও তার

পূর্ণ স্বীকৃতি রাজপুত রাজারা ঠিকমত দেননি যতক্ষণ না মুঘল বাদশা তাদের বহু সমাদরে নিজের দরবারে স্থান দেন, এবং সেই সমাদরে উচ্চকিত হয়ে রাজপুত রাজারা নিজেদের দেশের অনাদৃত শিল্পীদের খুঁজে পেতে বার করে সম্মানের আসনে পুনরধিষ্ঠিত করেন। মুঘল চিত্র ও রাজপুত চিত্রের সন তারিখ মেলালেই একথার যুক্তিযুক্ততা স্বতঃপ্রমাণ হয়। পঞ্চমত, আজ ১৯৫৫ সনে স্বীকার করতে আর বাধা নেই যে মুঘল ও রাজপুত চিত্রের চিত্ররীতি বা নক্সা ও রঙের টেকনিক মুখ্যত একই, বিষয়বস্তু যতই অবৈষ্ণব হোক না কেন ; এবং রাজপুত চিত্র না হলে মুঘল চিত্র যেমন সম্ভব হত না, তেমনি মুঘল চিত্র না হলে রাজপুত চিত্র হত অসম্ভব।

তবে রাজপুত চিত্রকলার বিশিষ্ট গুণ সম্বন্ধে কুমারস্বামী যা লিখেছেন তাতে কেউই আপত্তি করার কিছু পাবেন না। তাঁর মতে রাজপুত চিত্র ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার একান্ত প্রতিচ্ছবি, যার এখনও কিছু কিছু আমরা চোখের সামনে লুপ্ত হয়ে যেতে দেখছি। রাজপুত চিত্রের নীতিদর্শন তার একান্ত নিজস্ব। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষেত্রে চীনে ছবি যা করেছে, মানুষী প্রেমে রাজপুত চিত্র তাই করেছে। মানুষী প্রেম বিশ্বজগতের সর্বসৃষ্টির মধ্যে কি ভাবে ব্যাপ্ত-চরাচর, শ্রীমদ্ভাগবতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে রাজপুতচিত্রে পারসীক প্রাকৃতিক দৃশ্যগত মাধুর্য নেই, মুঘল পোর্ট্রেটের ঐতিহাসিক মূল্যও নেই। তার বদলে যা আছে,তার তুলনা মেলা ভার। সে হচ্ছে সুকুমার কোমলতা ও ভাবের গভীরত্বের পরাকাষ্ঠা, যা গাম্ভীর্য, শ্রদ্ধায় ও বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিতে অতুলনীয়। আরেকটি গুণের উল্লেখ করে কুমারস্বামী নিজেই নিজের মত খণ্ডন করেছেন। কুমারস্বামী বলেন "রাজপুত শিল্প এমন এক ইন্দ্রলোকের সৃষ্টি করে যেখানে সব পুরুষই বীর, সব নারীই রূপবতী, আবেগময়ী, ব্রীড়াময়ী ; কি ঘরের পালিত জন্তু, কি বনের পশু সকলেই মানুষের বন্ধু ; নায়ক বঁধু যখন পদক্ষেপ করে চলে যান, তখন গাছপালা, ফলফুল সবই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এই ইন্দ্রলোক মোটেই অবাস্তব বা অলীক নয় ; এ কল্পনা ও অসীমের জগৎ ; এ দেখা দেয় তাদেরই কাছে যারা প্রেমাঞ্জনমাখা চোখে দেখতে আপত্তি করে না।"

তবে রাজপুত চিত্রের বিষয়বস্তু যে শ্রীমদ্ভাগবতের উপরে একান্তনির্ভর তা নয়, তার রস যে সবসময়েই গীতিকাব্যধর্মী ও কোমল তা নয়। মহাকাব্য থেকেও বিষয়বস্তু এসেছে, যেমন ভীষ্মের শরশয্যা, দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা, অথবা দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। শৈব বা শাক্ত বিষয়ও এসেছে, যেমন শিব পার্ব্বতীর বিবাহ, গার্হস্থ্য জীবন, দুর্গার সিংহ, শিবের নন্দী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ। দেবাসুরের যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, ভীমা বিকটদশনা কালী, ইত্যাদি নানা বিষয়ই রাজপুত চিত্রে ভীড় করে এসেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় লৌকিক ধর্মকে রাজপুতচিত্র কতখানি আশ্রয় করে ছিল। এ ছাড়াও রাজপুত চিত্রে ভাল ভাল পোর্ট্রেট আছে, যদিও কুমারস্বামীর মতে রাজপুত পোর্ট্রেটে মুঘল পোর্ট্রেটসুলভ চরিত্রচিত্রণের চেয়ে বীরোচিত পৌরাণিক ভাব বেশী।

ছবিতে বীরোচিত পৌরাণিক ভাবের কথা বলতে গিয়ে নরনারীর কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করা উচিত। নারীর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষণাদর্শ রাজপুতচিত্রে ফোটানর প্রয়াস আছে। নায়িকার চোখ হবে বড়, আয়ত, পদ্মফুলের মত ; আগুল্‌ফ কেশভার গুচ্ছে গুচ্ছে ঘন মেঘের মত পড়বে ; স্তন হবে সুঠাম, সুউচ্চ ; উরুদেশ হবে পূর্ণ, মসৃণ ; হাত হবে গোলাপবর্ণ ফুলের মত ; গতি হবে গজেন্দ্র-গমন ; মুখের ও দেহের ভাব হবে একান্ত ব্রীড়ানত। রাধা যখন কৃষ্ণের বাণী শুনবেন তখন নক্সা দেখে খৃষ্টীয় অনান্‌সিয়েশনের কথা মনে পড়বে ; যখন কৃষ্ণের চোখে চোখ পড়বে তখন তাঁর চোখ হবে আনত, ঘোমটা ঢাকা, যখন স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তখন তিনি চলৎশক্তি রহিত হয়ে, চিত্রার্পিতার মত অথবা স্বর্ণমূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে যাবেন, এক মুহূর্তে বিশ্বজীবনের সব কিছু তাঁর কাছে প্রতিভাত হবে। তিনি নিতান্ত মানবী, নারী, নিজের কোমলতা সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ, কৃষ্ণের চটুলতা ও লাম্পট্যের প্রতি একান্ত বিরক্ত। অথচ তিনি কৃষ্ণের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেন, প্রতিদানে কিছু চান না।

যেহেতু লৌকিক ধর্মের সঙ্গে রাজপুত চিত্রের গভীর সম্বন্ধ আছে, সেহেতু রাজপুত ছবি ভারতীয় আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, পোশাক, স্থাপত্য ধর্মবিষয়ক তথ্যের আকর বলা যায়। বিশেষ করে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মে এমন কিছু লোকপ্রসিদ্ধি নেই যা রাজপুত ছবিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে গোটা শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান রাজপুত ছবিতে অনায়াসে মেলে একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না।

কুমারস্বামী তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' বইয়ের প্রথম খণ্ডে খুব বিশদভাবে রাজপুত চিত্রকলার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও বিভিন্ন বিষয় বস্তুর সংক্ষিপ্ত অভিধান হিসাবে বইটির ২৬ থেকে ৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নিবন্ধটি অমূল্য। নিবন্ধটি মুখ্যত বিদেশী পাঠকের জন্য লেখা। উল্লেখ করলেই যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বিষয় ভারতীয় পাঠকের মনে পড়বে এই আশায় আমি শুধু বিষয়গুলির শিরোনামা কয়টি কুমারস্বামীর বই থেকে তুলে দিলুম।

(ক) কৃষ্ণলীলা। ভক্তি : প্রেমসাগর : স্বকীয়া নায়িকা : কুলমানলজ্জাত্যাগ : পরকীয়া প্রেম : অভিসার : ভাবসম্মিলন : স্বরূপ।

জন্মলীলা : গোষ্ঠলীলা : গিরিগোবর্ধন ধারণ : কালিয়দমন : গোপিনীকুল : রাস মণ্ডল : বসন্তলীলা ও দোল : বৃন্দাবনলীলা : রসিকনাগর : রাধাকৃষ্ণলীলা।

জন্মলীলা : কংসগৃহে দেবকী ও বাসুদেব : কৃষ্ণের চতুর্ভুজ আবির্ভাব : বৃন্দাবন যাত্রা : শৈশব : ননীচুরি : নল কূবরের বৃক্ষপাশ মোচন : বকাসুর ও অন্যান্য দৈত্যনিধন : রাখালী : গোধূলি : কানাই বলাই, নন্দ, যশোদা, গোপ গোপী।

বংশীবাদন : ঘাটলীলা : কদম্বমূলে চীরহরণ : মথুরার ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ

(বরোদা সরকারী মিউজিয়মে এই বিষয়ে একটি ছবি আছে। বোধহয় সতেরো শতকের একেবারে প্রথমদিকে আঁকা। খুব কড়া তপ্ত রঙে আঁকা, হল্‌দের প্রাচুর্য যথেষ্ট। মুখগুলি মোটা লাল রেখায়

আঁকা। মথুরার ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছেন। একজন দুধের বাটি ধরে, একজন পিঠা। ছাতে বসে, হাঁটুদুটি বাঁধা।)

গোবর্ধনধারণ : দুগ্ধদোহন।

রাসলীলা : রাধামিলন : রাসমণ্ডল : যোগমায়া।

দানলীলা।

শঙ্খাসুর বধ।

উষা অনিরুদ্ধ উপাখ্যান : বাণাসুর বধ : অনিরুদ্ধের বিবাহ।

যমুনা প্রয়াণ।

পার্থসারথি।

কৃষ্ণসুদামা।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধ আখ্যান : ব্রহ্মার জন্ম : গজেন্দ্র মোক্ষ : গজগ্রাহ।

সমুদ্র মন্থন : মান্দারদণ্ড : বাসুকীরজ্জু : দেবাসুরের যুদ্ধ : অমৃতভাণ্ড : মোহিনী মূর্তি ধারণ : অসুরের অমৃত পান : রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ।

হৃৎপদ্ম : লক্ষ্মী নারায়ণ : পদ্মাসন লক্ষ্মী।

গীতগোবিন্দ।

(খ) শ্রীনাথজী : শ্রীবল্লভাচার্য (জন্ম ১৪৭৯ সন) : বল্লভাচারী সম্প্রদায় : গোবর্ধন দর্শন : শ্রীনাথজী ও রাধা : দাউজী বা বলরাম : দ্বারকানাথ।

(গ) রসচিত্র : শৃঙ্গার।

অষ্টনায়িকা। রসিকপ্রিয়া রচয়িতা কেশবদাসের মতে অষ্টনায়িকার নাম :

স্বাধীনপতিকা : যাঁর পতি তাঁর ইচ্ছার একান্ত বশ।

উৎকা, উৎকলা, উৎকণ্ঠিতা, বা বিরহোৎকণ্ঠিতা : যিনি প্রিয়জনের পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে আছেন।

বাসক শয্যা বা শয্যিকা : যিনি প্রভুর আগমন প্রত্যাশা করে শয্যা প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছেন।

অভিসন্ধিতা বা কলহান্তরিতা : মানভঞ্জন করতে এলে যিনি প্রভুকে তাড়না করেন, এবং প্রভু চলে গেলে অনুতপ্ত হন।

খণ্ডিতা : যাঁর প্রভু অন্যত্র নিশাযাপন করে, প্রত্যুষে গৃহে এলে নায়িকা তীব্র ভৎর্সনা করেন।

প্রোষিতপতিকা বা প্রোষিতপ্রেয়সী : যাঁর প্রভু প্রত্যাবর্ত্তনের লগ্ন স্থির করে বিদেশ গিয়েছেন ; লগ্ন পার হয়ে গেছে অথচ ফেরেন নি।

বিপ্রলব্ধা বা লব্ধবিপ্রা : যিনি কাল গুণে বসে আছেন, অথচ যামিনী যায়, প্রভু আসেন না।

অভিসারিকা : যিনি নিশাকালে কোন কিছু বাধাবিপত্তি না মেনে প্রভুর উদ্দেশে পথে বেরিয়ে পড়েন।

অভিসারিকার আবার শ্রেণী বিভাগ আছে : যেমন কামাভিসারিকা (সাধারণ রক্ত মাংসে গড়া স্ত্রীলোক) ; কৃষ্ণাভিসারিকা (আধ্যাত্মিক) ; গর্ভাভিসারিকা (মানুষী), ইত্যাদি।

পাহাড়ী চিত্রশিল্পীরা (যথা কাংড়া, কুলু ইত্যাদি, এঁদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে) অষ্টনায়িকার প্রত্যেকের সাধারণ লক্ষণ মোটামুটি বাঁধাধরা ছকে ফেলে আঁকতেন, যেমন :

স্বাধীন পতিকা, নিশ্চিন্তে আরাম করে বসে থাকবেন, প্রভু পদচর্যা করবেন।

উৎকা, অভিসারস্থলে অপেক্ষারতা গাছের তলায় বা কুঞ্জবনের ধারে পত্রশয্যার উপর বসে বা

দাঁড়িয়ে। সমুখদিকে জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম, একপাশে বুনো হরিণ ঘাস খাচ্ছে অথবা মুখ তুলে হাওয়ায় ঘ্রাণ নিচ্ছে।

বাসকশয্যা, দরজার পাশে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছেন অথবা প্রভুকে অভ্যর্থনা করছেন, পরিচারিকারা ভিতরে শয্যা প্রস্তুত করছে। মাঝে মাঝে একটি কাক থাকে, এটি প্রেমিকের প্রত্যাবর্ত্তনের লক্ষণ। যদি পতি সত্যই প্রত্যাবর্ত্তন করে থাকেন, তবে আগতপতিকা বলা হয়।

অভিসন্ধিতা, প্রভুকে তাড়না করছেন, নিতান্ত হতাশায় গভীর শোকে ভূমিতে বসে। প্রভুর পিঠ দেখা যাচ্ছে, তিনি চলে যাচ্ছেন।

খণ্ডিতা নায়িকা, প্রত্যূষে আগন্তুক প্রেমিককে দেখে তীব্র ভর্ৎসনা করছেন।

প্রোষিতপতিকা, সখিমধ্যে বসে, প্রভুর অনাগমনে কিছুতেই সান্ত্বনা মানছেন না।

বিপ্রলব্ধা, উৎকার মতই পত্রশয্যার পাশে অপেক্ষা করছেন ; ভোর হয়েছে তবুও প্রভুর দেখা নেই। নায়িকা ক্ষোভে লজ্জায় রাগে ভূষণ অলঙ্কার ছিঁড়ে খুলে ফেলে দিচ্ছেন।

অভিসারিকা তমসাচ্ছন্ন প্রলয়রাতে বেরিয়েছেন, কিছু অলঙ্কার পথে খসে পড়েছে, পায়ে মলের মত গোখ্‌রো সাপ জড়িয়ে ধরেছে ; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ; মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে ; পথে ভূতপ্রেত ভীড় করে ভয় দেখাচ্ছে। কখনও কখনও অভিসারিকা সবেমাত্র প্রেমিকের ঘরে অথবা অভিসারস্থলে পৌঁছেছেন।

এর মধ্যে উৎকা আর অভিসারিকাই কেবল রাত্রির ছবি।

নায়িকা তিন রকম : স্বকীয়া (যিনি নিজের পতিকে ভালবাসেন) ; পরকীয়া (যিনি পরপুরুষে প্রেম করেন) ; সামান্যা (যাঁর নিজপতি ও পরপুরুষে ভেদজ্ঞান নেই)। স্বকীয়ার আবার অভিজ্ঞতা অনুসারে শ্রেণীভেদ আছে। যিনি নিতান্ত কাঁচা অনভিজ্ঞা, তিনি মুগ্ধা, মুগদিনী বা নবোঢ়া।

বিরহ। বিরহে অর্থাৎ প্রেমবিচ্ছেদে তিন ভাগ। প্রথম পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রেমারম্ভ, প্রথম চোখে চোখে দর্শন। দ্বিতীয় মান। মান তিন প্রকার : লঘু, মধ্যম, গুরু। গুরু মানের অভিব্যক্তি মাননী। তৃতীয় প্রভাস অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকার দূরদেশে প্রয়াণ, যেমন কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরা প্রয়াণ করেন। এর প্রথম লক্ষণ প্রোষিত প্রেয়সী। তারপরে আসে ব্যাধি। দর্শনশাস্ত্রে প্রভাস হচ্ছে আত্মার কালরাত্রি।

বায়স লক্ষণ : কাকের গতিবিধি লক্ষ্য করে প্রভু কখন ফিরবেন তার অনুমান নির্ণয়।

সংযোগ। মিলন। প্রেমপাশ বা প্রেমডোর। লীলাভাব। কৃষ্ণ মনচোরা।

(ঘ) শিবপার্বতী। শিবপার্বতীর হিমালয়ে বাস। শিবের নৃত্য। শিবপার্বতীর সিংহাসনে অভিষেক। হৃৎপদ্মে শিব ও শক্তি। গঙ্গার উৎপত্তি। শক্তি। অসুর সংহারিণী শক্তি। তামসী।

(ঙ) পুরাণ ও মহাকাব্য।

(১) রামায়ণ : লঙ্কার অবরোধ ; বনবাস ; রামের অভিষেক।

(২) মহাভারত : দ্যূতক্রীড়া ; ভীষ্মের শরশয্যা।

(চ) কাহিনী

হাম্বীর হাথ।

নল দময়ন্তী।

সোহনী—সহীঁয়াল।
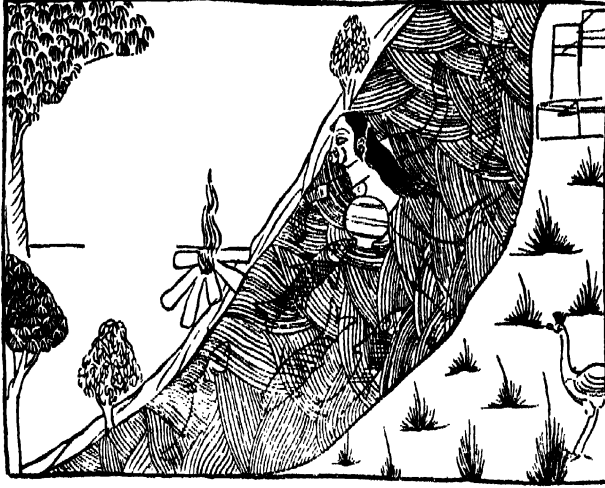
পদ্মাবতী।

লয়লা-মজনু।

সস্মী-পুন্নন।

(ছ) রাগমালা

ভারতীয় সঙ্গীতের মূল শাখা প্রশাখাকে বলে রাগ রাগিনী। অষ্টপ্রহরের প্রতিটি ভাব ও মুহূর্তের উপযোগী একটি রাগ আছে। রাগরাগিনীর উৎপত্তির চারটি উৎস আছে (১) লোক বা মার্গসঙ্গীত (২) কাব্য (৩) ভজন বা যোগীর গান, কীর্তন (৪) ওস্তাদী বা দরবারী সঙ্গীত। রাগ-মালার নামে এদের প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন পাহাড়ী, হিন্দোলা, যোগী, সারঙ্গ (তেরো শতকের গাইয়ে সারঙ্গদেব)। অন্যান্য নামে ভাব বা মুহূর্তের সঙ্গে যোগ আছে, যেমন বসন্ত, দীপক। এইভাবে সব রাগ রাগিনীরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি বা ব্যঞ্জনা আছে।

রাগগণ যেন মন্ত্রের দেবতা। অশুদ্ধভাবে রাগ রাগিনী গাওয়াও যা আর দেবদেবীর অঙ্গচ্ছেদ একই ধরনের পাপ। রাগিনীরা রাগদের স্ত্রী। হনুমান মতে ছয়টি রাগ আছে, প্রত্যেকের পাঁচজন করে রাগিনী। কিন্তু একটিমাত্র মত ত নেই। আছে নানা মত। কোনও মতে রাগরাগিনী ছাড়া

আবার আছে পুত্র। ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে (পাঁচ শতকে লেখা) এর বিশদ আলোচনা আছে। প্রাচীন রচনা সবই সংস্কৃত। কিন্তু যোল শতক থেকে হিন্দীতে রাগমালা কাব্য লেখা চলন হল। আর রাগমালা কাব্যের পুঁথিতে রাগরাগিনীর ছবি এঁকে দেখানও রেওয়াজ হল। সব ছবিই শুদ্ধ হল না, অনেক ছোটখাট পুঁথিতে যার যেমন ইচ্ছা হল সেইমত আঁকল। তবে প্রাচীন ছবিগুলি প্রায়ই শাস্ত্রসম্মত যথাযথ। যেমন গীতগোবিন্দের প্রতিটি গান একটি বিশেষ রাগিনীনির্ভর, এবং সেই গানের বিষয় অনায়াসে সেই রাগিনীর বিবরণী ছবি হতে পারে।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ রাগের ছবি বরাবরই প্রায় এক। যেমন ভৈরব রাগ বলতে শিবের ছবি। ভৈরবী রাগিনী হবে শিবপূজা। খম্বাবতী হবে ব্রহ্মপূজা। হিন্দোলা হবে ঝুলন। তোড়ি হবে একটি বীণাবাদনরতা মহিলা, সঙ্গীত শুনে হরিণ কাছে এগিয়ে আসছে। দেশাখ্য হচ্ছে কুস্তির চিত্র। ধনাশ্রীতে একটি সখি একটি পুরুষের ছবি এঁকে নায়িকাকে দেখাবে ; ছবিতে নায়িকা বঁধুকে চিনবেন ; ঠিক যেমন ঊষা অনিরুদ্ধের আখ্যানে চিত্ররেখা অনিরুদ্ধের ছবি এঁকে ঊষাকে দেখান। বসন্ত হচ্ছে নাচ, হোরি খেলার নাচ। মেঘমল্লার হচ্ছে বর্ষায় কৃষ্ণের নাচ। গুর্জরীতে একটি নারী ময়ুরকে সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। বিভাস প্রেমের দৃশ্য, পুরুষটি প্রেমের ধনুক থেকে পুষ্পবান ছুঁড়ছে।

অন্যান্য রাগ রাগিনীর ছবি সবসময়ে একরকম হয় না। রাগিনীদের ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু নানারকম হয়। অধিকাংশই প্রেমের দৃশ্য, অথবা নৃত্যগীতাদিপ্রমোদবিষয়ক। রাগচিত্রমালার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ আছে বৃটিশ মিউজিয়মের পুঁথি ও-আর ২৮২১ নম্বরে।

নীচে রাগরাগিনীর তালিকা দেওয়া হল। রাগগুলির নামের সামান্য রকমফের পাওয়া যায়, রাগিনীদের অন্য নামও আছে।

ভৈরব রাগ : রাগিনীর নাম, ভৈরবী, নট, মালবী, পটমঞ্জরী, ললিতা।

মালকোষ রাগ : রাগিনীর নাম, গৌরী, খম্বাবতী, মালশ্রী, রামকেলী, গুণকেলী।

হিন্দোল রাগ : রাগিনীর নাম, বিলাবল, তোড়ি, দেশাখ্য, দেবগন্ধারী, মধুমাধবী।

দীপক রাগ : রাগিনীর নাম, ধনাশ্রী, বসন্ত, কানাড়া, বরাড়ী, পূরবী।

মেঘমল্লার রাগ : রাগিনীর নাম, বাঙ্গালী, গুজুরী, গৌড়মল্লার, ককুভা, বিভাস।

শ্রীরাগ : রাগিনীর নাম, পঞ্চম, আসাবরী, সেতমল্লার, কেদারা, কামোদিনী।

এই নামগুলি বৃটিশ মিউজিয়মের ও-আর ২৮২১ নং পুঁথিতে আছে। এটি সতেরো শতকের রাজস্থানী রীতি। বৃটিশ মিউজিয়মের আরেকটি পুঁথিতেও (এ-ডি-ডি ২৬৫৫০) প্রায় এক নামই আছে।

জম্মুর ডোগ্‌রী পাহাড়ী রাগমালা চিত্রে আরেকটু বেশী আছে। তাতে আছে রাগ, রাগিনী (ভার্য্যা), আর পুত্র। এদের বিন্যাস প্রচলিত বিন্যাস থেকে বেশ তফাৎ। উদাহরণ হিসাবে বলা

যায়, দীপক রাগের স্ত্রী গুজরী রাগিনীর ছবিতে বীণা হাতে কুঞ্জবনে একটি নারী (আরেকটি ছবিতে দ্বিতীয় নারী ও ছুটি হরিণ আছে) ; শ্রীরাগের স্ত্রী রামকেলী রাগিনী চিত্রে একটি নারী ছুটি চন্দনগাছ থেকে নির্গত কয়েকটি গোখরো সাপকে ছুধের বাটি ধরে দিচ্ছে। মালকোষ রাগের পুত্র রাগ ভমরানন্দ
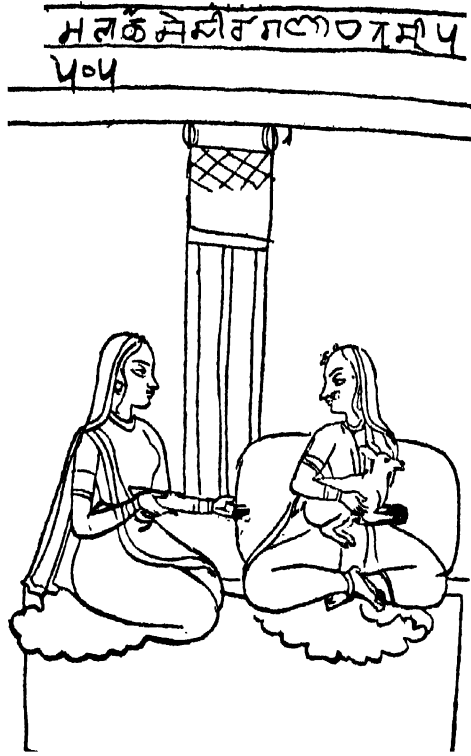
চিত্রে একটি যোগী তাণ্ডবনৃত্য করছে, পাশে একটি রমণী তারের যন্ত্রে বোল তুলছে। হিন্দোল রাগের স্ত্রী অহীরী রাগিনী চিত্রে দেখান হয়, একটি বাড়ীর সমুখে কয়েকটি মেয়ে মাটির পাত্র থেকে নির্গত কয়েকটি গোখ্‌রো সাপকে ছুধ দিচ্ছে। হিন্দোল রাগের স্ত্রী দেবগী (দেব গন্ধারী) রাগিনী চিত্রে শিবপূজা হচ্ছে।

রাগরাগিনী চিত্রমালা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ও-সি গাঙ্গুলী ১৯৩৪-৩৫ সালে রাগজ অ্যাণ্ড রাগিনীজ নামে প্রামাণ্য ছুই খণ্ড বই প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ডটি বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যাপৃত, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ছয়টি রঙীন ছবি ও ৩৩৭টি ফোটোগ্রাফ আছে। রাগরাগিনীর বর্ণনামূলক বই ও ছবি হিসাবে গ্রন্থটি অমূল্য, স্পষ্ট বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পী শ্রবণ ও দর্শনের দ্বিত্ব ঘোচাবার কত প্রয়াস করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি অবশ্য ইতিহাস, উৎপত্তি বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে ছবিগুলিকে ভাগ করার কোন চেষ্টা করেনি, রাগরাগিনী অনুসারে গ্রন্থকার ছবিগুলিকে এইভাবে ভাগ করেছেন :

(ক) রাগ : ভৈরো, ভৈরোঁ বা ভৈরব

রাগিনী : ভৈরবী, মধ্যমাদি, বংগাল (বংগালিকা বা বংগালি, বংগালিনী), ভরাটিকা (ভরাটী, ভৈরটী, ভৈরাদি), দেশভরাটি, সৈন্ধবী

(খ) রাগ : মালব-কৌশিক (মালব বা মালকোষ)

রাগিনী : তোড়ী, তুরুস্ক তোড়ী, তুড়িকা (তুড়ি, তুড়িয়া), গৌরী, গুণকলী (গুণকেলী, গুণক্রী, গুণকিরী), খম্বাবতী, কুকুভ (ককভ, ককুভা, ককুম্ভিকা)

(গ) রাগ : হিন্দোলা (হিদোরা)

রাগিনী : রামকেলি (রামকৃতি, রামকিরী বা মানবতী), দেশাখ্য (দেশাখি, দেশাখ), ললিতা, বেলাবলী (বিলাওল), পটমঞ্জরী

(ঘ) রাগ : দীপক

রাগিনী : দেশী, নট, নাটিকা, কেদার, কেদারিকা, কামোদ, কানড়া (কানড়ো, কর্ণাটক)

(ঙ) রাগ : শ্রী

রাগিনী : মালশ্রী, মারু, ধনাশ্রী, বসন্ত, আসাবরী

(চ) রাগ : মেঘ (মেঘমল্লার)

রাগিনী : মল্লারিকা (মল্লারি, মল্লার), মায়ুরিকা, সেত-মল্লার, গোড়-মল্লার, গুজ্জরী (গুর্জরী, গুজরী), শ্যামগুজরী, দক্ষিণগুজরী, দেশকারী (দেশকার), ভূপালী, তঙ্কতিঙ্কা, তকু, তঙ্ক), রাগ (?) রাগিনী (?) : পঞ্চম

(ছ) রাগ : নট-নারায়ণ (নট্ট-নারায়ণ)

রাগিনী : মালবী, মধুমাধবী, পটমঞ্জরী, বিভাস

(জ) রাগ : সারঙ্গ

রাগিনী : সারঙ্গী, দেবগান্ধার, ত্রিবণী (ত্রিবণা, ত্রাবণী, ত্রাবণিকা), গৌণ্ড-করী, পূরবিকা, পাহাড়ী, শাবিরী, শাবেরিকা, হাম্বিরী, কৌমারিকা, কল্যাণ, নট-কল্যাণ

রাগ : ভমরানন্দ, গম্ভীর

রাগিনী : গুজরী, দেবগিরি, দেবকলী, অহীরী, কেদার, দেবগন্ধরী। কামোদ। সুরত।

বিবিধ রাগ : মেঘ। কুন্দ-মল্লার। বসন্ত। ককুভ। বেহাগ। পরজ। সোহিনী। ভৈরো। রাগিনা-কাংলি। রাগ মালকোষ। কবজ্রি রাগিনী। পূরবী রাগিনী। শ্যামকল্যাণ। খামাজ রাগিনী। মুঘদয়ী রাগিনী। শঙ্করাভরণ। খোক্কর রাগিনী।

মুঘল চিত্রেও রাগমালা চিত্রের নমুনা আছে।

(জ) ঋতু, পশুপক্ষী, প্রাকৃতিক দৃশ্য।

রাজপুত চিত্রে বিশেষ প্রিয় বিষয় হচ্ছে বারমাস্যা বা বারোমাসের বর্ণনাচিত্র। ষড়্ঋতুর চিত্রও অনেক আছে।

গজকুমীরের লড়াই রাজপুত ছবিতে এক বিশেষ প্রিয় বিষয়। তেমনি প্রিয় হচ্ছে মৃগজল বা মৃগতৃষ্ণা। চকোর সারসের ছবি বহু আছে। গাভী নন্দী ত আছেই। সাপ, হরিণ, ময়ূরও যথেষ্ট। পশুর মানুষী ভাব দেখাতে ভারতীয় ছবি অদ্বিতীয়, অত বোধ, পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান আর অন্য কোন দেশের ছবিতে নেই। এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হনুমান।

তাছাড়া আছে ফুল, ফল, গাছপালা, মধুকরের গুঞ্জন, বাতাস, সারা বিশ্বপ্রকৃতি, যা ভারতীয় ছবিতে যুগে যুগে ভীড় করে আসে ; ইতিহাসের আগের যুগের গুহা, মহেঞ্জোদারো থেকে আরম্ভ করে বিশ শতক পর্যন্ত যার শোভাযাত্রার বিরাম নেই।

(ঝ) প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট। মুঘল চিত্রকলায় চরম উৎকর্ষ লাভ করার পর এই রীতি যায় জয়পুরে। পরে জম্মুতে, কাংড়ায় আর অন্যান্য পাহাড়ী রাজ্যে, শিখ দরবারে।

তালিকা লম্বা হয়ে গেল, তবুও রাজপুত চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য হয়ত পরিষ্কার হল না। রাজপুত চিত্রে শুধু যে অজন্তার প্রাচীরচিত্রের ধর্মপ্রবণতা এল তা নয়, হিন্দুধর্মসুলভ এক অস্থির কুতূহলী জিজ্ঞাসাও এল। শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রবল আবেগ এল তা নয়, সেই সঙ্গে এল দেশের জীবনের দৈনন্দিন সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ, ঔৎসুক্য, রূপকথা ও লোক সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা। এইভাবে রাজপুত চিত্র হল নিতান্ত লৌকিক চিত্র, দেশের লোকের একান্ত আপন সম্পদ। সাধারণ

গ্রামবাসীর কাজ, খেলা, ধর্ম, কর্ম, সামাজিক আচার পদ্ধতি, গার্হস্থ্য জীবন, সমস্তই চিত্রে ফুটে উঠল দুই ভাগে ; এক সাধারণ ভারতীয় গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্যে, দ্বিতীয়ত তার ধর্মসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও পৌরাণিক গল্পের ছবিতে।

প্রথম ভাগটির কথাই ধরা যাক। রাজপুত চিত্রশিল্পীর তুলিতে দৈনন্দিন কোন বিষয়ই বাদ পড়ল না। সব সময়ে যে নিখুঁত পুরো ছবি হল তা নয়, তবুও নক্সা বা রেখাচিত্র রয়ে গেল ; যেমন সাধারণ বাজারের দৃশ্য, কারিকরদের কাজের ছবি। কার্পেট বোনার ছবিই কি সুন্দর : তাঁতের নক্সার উপর নানা রঙের পশম গিঁটবাঁধা অবস্থায় জটপাকান রয়েছে, চারিদিকে ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি ছড়ান, ওদিকে একপাশে জুতো খুলে রাখা, পায়ের আঙ্গুল দিয়ে পোড়েনের সুতো টান করে ধরা হয়েছে। যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই সব যথাযথভাবে আঁকা, কারণ এটা বুঝতে দেরি হয় না যে চিত্রকর নিজের জানালা থেকে রোজ তার ঘর দেখে দেখে এঁকেছেন। কাপড় ছাপাইকর রঙরেজি, সূতোচিকণের কারিকর, শ্যাকরা, তাদের ছোটখাটো টুকিটাকি কাজ সবই রাজপুত শিল্পীর তুলিতে অপূর্ব উৎরেছে। একটি ছবিতে দেখি বাড়ীর ছোটছেলে বড় ছেলের কাছে সবে কাজ শিখতে নেমেছে। ছবিটি ভাবের অভিব্যক্তিতে অপূর্ব। এই ছবিটিরই পিছনদিকে দুটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে, একটির কোলে শিশু আহ্লাদে কলবল করে মায়ের বড় মাকড়ি নিয়ে টানাটানি করছে, অন্যটি নিজের ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে প্রথম নারীটির শিশুর খেলা সস্নেহ নয়নে দেখছে। বোধ হয় দুই ভাইয়ের দুই বউ।

অথবা আরেক ধরনের ছবির কথা ধরা যাক, যে বিষয়টি জোব, রাণা ঘুগুাই, কুল্লী থেকে শুরু করে ভারতীয় সব ছবিতেই ঘুরে ফিরে এসেছে। বিষয়টি হচ্ছে রাস্তার অতি সাধারণ দৈনন্দিন দৃশ্য। ভারতে চিরকালই বড় বড় রাজপথের অভাব নেই, তাতে লোকচলাচলেরও বিরাম নেই। যান বাহন যে যুগে মন্থর ছিল সে যুগে পাথকের অন্তত কয়েকদিনের জন্য রাজপথই হত ঘর। দুপুরে খাওয়া ও বিশ্রাম, রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে বসা, সরাই বা চটিতে থাকা এসব হল চিত্রের বিষয়। এ বিষয়ে কত যে ছবি আছে হিসাব নেই, এখনও বিষয়টি শিল্পীদের টানে, যদিও মোটর রেলের যুগে বিষয়টি আজকাল রোমান্টিক ঠেকে। দুপুর সময়ে রাস্তায় বিশ্রামের চিত্র রাজপুত শিল্পীর একটি প্রিয় বিষয়। কূয়া, তার পাশে বৃদ্ধ বট, চারিদিকে যাত্রীরা বসে, সমুখদিকে ক্লান্ত মুটে মাল নামিয়ে জীর্ণ বিছানার উপর এলিয়ে পড়েছে, দূরে আরেকটি মুটেরও একই অবস্থা। বল্লম হাতে এক পাইক কূয়ার ধারে আলগোছে হাতে অঞ্জলি করে জল খাচ্ছে, একজন স্ত্রীলোক ঘটি থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে। তারই তলায় ভৃত্য প্রভুর জন্য হুঁকো সাজছে। প্রভুটি বিরাট বপু নিয়ে গদাইলস্করি চালে বিছানায় আরাম করে শুয়ে হাতে আরশি ধরে প্রসাধন করছেন, পাশে দুজন স্ত্রীলোক বসে, তার মধ্যে একজন বাতাস করছে, আরেক জন পা টিপে দিচ্ছে। ছবিটা অবশ্য কাংড়ার, কিন্তু এইসূত্রে না উল্লেখ করে পারা যায় না।

আরেকটি রীতিতে রাজপুত চিত্র সিদ্ধহস্ত, সেটি চিত্রকলার নিতান্তই অসামান্য নৈপুণ্যের ফল।

এর উল্লেখ মুঘল চিত্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে করেছি। রীতিটি হচ্ছে ছবিতে দুরকম আলো আনা, প্রকৃতির উপর চাঁদের আলো, আর তারই মধ্যে আগুনের আলো। ছোট্ট কুঁড়ে বা গাছের চারধার ঘিরে কাঠের আগুনের চারপাশে লোকজন ঘিরে বসে, দূরে প্রকৃতির প্রায় সবটাই অন্ধকারে মগ্ন, যা কিছু আলো কেবল তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদের—ছবিতে এই ধরনের আলো আনা ব্যাপারে রাজপুত শিল্পীর তুলনা মেলা ভার। দুটি বিভিন্ন আলোর মিশ্রণ রাজপুত শিল্পী এক অদ্ভুত কৌশলে আনতেন। কাগজের জমি সবটা প্রথমে সোনার জল লাগিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রাইম' করা, (পারসীতে 'তার' করা), অর্থাৎ জমি তৈরি করে নিতেন। তার উপরে পড়ত অন্যান্য রঙ। এইভাবে যেখানটা আলো সেখানটা এত উজ্জ্বল আর যেখানে ছায়া সেখানটা এমন এক স্বচ্ছ, টলটলে, ঝিকঝিকে ভাব আসত যে অন্য কোন দেশের ছবিতে এরকমটি হয় কিনা সন্দেহ। সোনার তার করার বদলে অনেক সময়ে রূপোর তার-আফগন্ধনও হত, বিশেষত যেসব ছবিতে স্থির জলের উপর পদ্ম ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের ছবি আঁকা হত; কিন্তু সোনার তার করা জমির মত রূপোর তার করা জমি তত খুলত না।

রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, নানা বিষয়বস্তুর উল্লেখ আগেই করেছি; সবেরই বর্ণলিপি হচ্ছে ভারতের বহু প্রাচীন প্রাণবন্ত রেখা, যা তারের মত এঁকে বেঁকে গেছে, স্পষ্ট তীক্ষ্ণ তীব্র; যেমন আবেগময় তেমনি সংযত, কোমল অথচ দৃঢ়, স্বয়ম্বশ অথচ নম্র প্রশান্ত। কৃষ্ণলীলার মধ্যে দিয়ে রাজপুত শিল্পী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, ভারতীয় জীবনের প্রায় সবদিকই আলোকিত করেছেন। সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে পশুপক্ষীর চিত্রে। মুঘল চিত্রেও পশুপক্ষী আছে, কিন্তু সে ছবি নিতান্তই প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি, যেমন বনের পশু শিকার, হরিণ, হাতী। কিন্তু রাজপুত চিত্রে পশু হয় সহচর, বিপদে বন্ধু এমনকি ছদ্মবেশী দেবতা। হনুমানের ধ্যানধারণা বোধহয় কোন দেশের ধর্মে বা চিত্রে নেই। ঠিক একই কথা বলা যায় গরু ষাঁড় সম্বন্ধে। বস্তুত পশুপক্ষী আঁকতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পী যে নিখুঁত জ্ঞান, সমবেদনা, অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ, ধৈর্য ও যথাযথ্যের পরিচয় দিয়েছেন, এমন বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন শিল্পীগোষ্ঠী পারেন নি।

রাজপুত চিত্র সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়: বিষয় হিসাবে, দেশ বা উৎপত্তিস্থল অনুসারে, যুগ অনুসারে। বিষয় হিসাবে ভাগ করা খুব সোজা কিন্তু চিত্রপদ্ধতি বোঝবার পক্ষে তাতে সুবিধা হয় না, কারণ যদিও অধিকাংশ ছবিই বৈষ্ণব-বিষয়ক তবুও রাজপুত ছবিকে যে কোন একটা বিষয়ের অন্তর্গত করে সম্প্রদায়ভুক্ত করা ভুল হবে, কারণ রাজপুত চিত্রকলার বৈচিত্র্য প্রায় আশ্চর্যজনক। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া স্থান হিসাবে রাজপুত ছবিকে ভাগ করাও বেশ সহজ, তবে এইভাবে ভাগ করলে চিত্রপদ্ধতির ক্রমোন্নতি বা পরিণতি বোঝার সুবিধা হয় না। সময় যুগ ও শতক হিসাবে ভাগ করাই প্রকৃষ্ট রীতি; তার সঙ্গে অবশ্য ভৌগোলিক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে টীকাও কিছু দরকার। কারণ

ঐতিহাসিক বা যুগানুসারে ধারাবাহিক আলোচনাতেই শুধু একটা সমগ্রতার আভাস পাওয়া যায় ; উত্থান, উন্নতি ও ক্ষয়ের বিবরণ মেলে। দুঃখের বিষয় ভারতীয়, বিশেষ করে রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের তথ্য ও জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খ ত নয়ই, সম্পূর্ণও নয়। ফলে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রীতিতে অথবা বিশুদ্ধ ভৌগোলিক রীতিতে এমন বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় যাতে কেউ পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন। তবুও ভূগোলের উল্লেখ থাকবেই, কারণ যে কোন ভাষার স্থানীয় টানের মত ছবির ভাষাতেও স্থানীয় ছাপ স্পষ্টভাবে থাকতে বাধ্য।

ভূগোল অনুসারে রাজপুত ছবি দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে রাজস্থানী, দ্বিতীয় হচ্ছে পাহাড়ী। রাজস্থানী রীতির মধ্যে পড়ে, পূর্বদেশের বুন্দেলা (ডাটিয়া ও অর্চা রাজ্য), উদয়পুর, বুঁদি, জয়পুর, অম্বর, আজমীর, বিকানীর। রাজস্থানী রীতির কিছুটা কক্ষচ্যুত হয়ে যায় উড়িষ্যায়, যদিও উড়িষ্যার পুঁথি ও পুঁথির পাটায় রাজস্থানী রীতির চেয়ে গুজরাটী এবং দক্ষিণী প্রভাবই বেশী। পাহাড়ী রীতির মধ্যে পড়ে বাশোলী, কাংড়া, কুলু, গুলের, চাম্বা, জম্মু, পুঞ্চ, মাণ্ডি, রামপুর, তেহরি-গাঢ়োয়াল।

রাজস্থানী চিত্র রাজস্থানের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। যতদূর নজীর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় প্রথম যুগে রাজপুত চিত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়পুর, অর্চা, বিকানীর, সম্ভবত উদয়পুর ও উজ্জয়িনীও ; তারও আগে বোধ হয় মথুরা। প্রত্যেক ছোট রাজ্যেরই নিজস্ব দরবার ছিল, চিত্রকর ছিল ; তাছাড়া অনবরত অন্তর্যুদ্ধ প্রচলিত থাকার দরুণ স্থানীয় রীতি ও বৈশিষ্ট্যও নিশ্চয়ই প্রবল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজপুত চিত্রের খুব পুরনো নিদর্শন কিছু বর্ত্তমান নেই। যা কিছু আছে কোনটাই ষোল শতকের আগের নয়। প্রকৃতপক্ষে সতেরো শতকের আগের আঁকা রাজপুত ছবি একান্ত বিরল। ফলে যে সমস্ত রাজপুত ছবি আমরা পেয়েছি তার অধিকাংশতেই মুঘল প্রভাব দেখা যায়। এমন কি হিন্দী হরফে ষোল শতকের আগের লেখা রাজপুত পুঁথিও ক্বচিৎ পাওয়া যায়, খুবই দুষ্প্রাপ্য। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' বইয়ে সংগৃহীত তেইশটি রাগমালা চিত্রের উল্লেখ করেন ; তাঁর মতে এগুলি প্রাচীনতম রাজপুত ছবির মধ্যে গণ্য করা যায়। এদের মধ্যে চিত্র-গুণের চেয়েও ভাবচ্ছবি প্রকাশের দিকে লক্ষ্য বেশী। রাগিনী গৌরমল্লার ছবিতে পাকান কাছির মত মেঘের সার আর লাল সাপের মত বিদ্যুতের নক্সা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হচ্ছে বৃষ্টি বোঝানর জন্যে পটির উপর সাদা মিহি ঝালর আঁকা নক্সার। নক্সার সংযমের মধ্যে এমন আশ্চর্য দ্যোতনা দুর্লভ।

এই রাগমালা চিত্রগুলির তুলনা মেলা শক্ত, আর রাজপুত চিত্রের বিশেষত্বগুলিও এদের মধ্যে খুব স্পষ্ট। যেমন নক্সার নৈপুণ্য তেমন নিত্য নতুন বিস্ময়কর উদ্ভাবনা, দুর্মর বন্য প্রাণশক্তি, উদ্ভট বিচিত্র বিন্যাস। যেসব বৈশিষ্ট্যগুণ মুঘল চিত্র রাজপুত চিত্রের কাছে ধার করে, সে সব গুণগুলি অত

আগে থাকতেই বেশ প্রকট ; যেমন হাওয়ায় ভাসা হাল্কা স্বচ্ছ পরিধেয় বাস ; হলদে অথবা সাদা একেবারে স্বচ্ছ মসলিনের জামা অথবা ঘাঘরার মধ্যে দিয়ে ভিতরের অস্বচ্ছ পরিধেয় বস্ত্রের রঙ বা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চামড়ার রঙ। প্রাচীন রাজপুত ছবির একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি কুমারস্বামী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যে বৈশিষ্ট্যটি পরের যুগের রাজপুত ছবিতে দেখা যায় না ; সে হচ্ছে যখনই ছবিতে পুরুষের শরীরের উপর অংশ শুধু স্বচ্ছ মসলিনে আবৃত দেখান হত তখনই বগলের উপর দিয়ে ছায়া আঁকা হত। কুমারস্বামী এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলেন, কারণ ঠিক এই রীতিটি আকবর জাহাঙ্গীর বাদশার সময়ে মুঘল চিত্রের পোর্ট্রেটে পুনরায় দেখা দেয়। ঠিক এই ধরনের ছায়া এবং মসলিনের মধ্যে দিয়ে বর্ণবিন্যাস দেখানর চেষ্টা এই সময়ের মুঘল পোর্ট্রেটে বিশেষ করে আসে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের এ-ডি-ডি ১৮৮০১নং পুঁথির মানসিংহের পোশাক আর কুমারস্বামী সংগৃহীত তেইশটি রাগিনীচিত্রের পুরুষদের পোষাক প্রায় হুবহু এক।

কিন্তু এই তেইশটি রাগমালা চিত্রে মুঘল প্রভাব নেই। এদের স্থান তারিখ সঠিক নির্ণয়ের কোন উপায় নেই, তবে এটা নিশ্চিত যে এগুলি বোধ হয় ১৬০০ সন নাগাদ তৈরি। পোশাক, অলঙ্কার আর অন্য উপকরণও এই তারিখের সঙ্গে খাপ খায় না। নিশ্চয় এমন জায়গা থেকে ছবিগুলি পাওয়া গেছে যেখানে মুঘল প্রভাব তেমন যেতে পারেনি। সম্প্রতি আরও কয়েকটি মিনিয়েচর পাওয়া গেছে যার সঙ্গে কুমারস্বামীর রাগমালা চিত্রের খুব মিল, বিশেষ করে অদম্য প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনায়। কোমরবন্ধের ঝালর ও ঝুমকো আঁকার রীতিও একরকম। অনেকে বলেন কুমারস্বামীর রাগমালা চিত্রগুলি বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল থেকে এসেছে। কারণ বুন্দেলখণ্ডের ডাটিয়া আর অর্চা তখন খুব দুর্গম রাজ্য ছিল আর সেখানের রসুনের কোয়াকাটা গম্বুজ আর হাতের অঞ্জলির ঢঙ্গে খিলান করা জানালার সঙ্গে ছবিগুলির বাড়ী ঘরের খুব মিল দেখা যায়।

রাজপুত চিত্রে একটি আল্পনা ঘুরে ফিরে খুব আসে, সে হচ্ছে ছবির সমুখদিকে জল আর পদ্মের ছবি। রাজপুত ছবির গাছ কিন্তু জয়পুরের এক আধটি ছবি ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। রাগিনী চিত্রগুলির পাড় গোলাপী, উপরনীচে হলদের পটি, ছবির অংশ প্রায় গণ্ডী অতিক্রম করে পাড়ের মধ্যে ঢুকে যায় (ঠিক যেমন পূর্ববঙ্গের লক্ষ্মীর সরার ছবিতে ছবির অংশ প্রায়ই কানার পাড়ের মধ্যে চলে যায়)। ছবিতে দিক্‌রেখা উঁচু করে টানা, তার উপরে থাকে কালো আকাশের পাড়, তার উপর সীমায় থাকে ছেঁড়া খোঁড়া মেঘের পটি। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে থাকে সোনালী লাল বিদ্যুতের সাপ আর ঝালরের মত পড়ন্ত বৃষ্টির রেখার সারি। বিকানীর প্রাসাদের প্রাচীর চিত্রেও এরকমটি দেখা যায়।

বাড়ীঘরের স্থাপত্য প্রাচীন এবং একটু অদ্ভুত। রাজপুতানায় এখনও যে সব ঘরবাড়ী বা প্রাসাদ আছে তার সঙ্গে মেলে না। তবে স্থাপত্যরীতি খুব সরল, ভিতরের রঙ হয় লাল নয় সবুজ, দেয়ালে কোন আল্পনা নেই।

ছবিগুলি বর্ণাঢ্যতায় অদ্ভুত জমকালো। কালোর ছিটের খেলাও অসামান্য, বিশেষ করে মাথার বিনুনী বা কোমরবন্ধের ঝালরে ও ঝুমকোয়। অন্যপক্ষে সোনারূপোর ব্যবহার খুব কম। জম্মুর চিত্রকলার প্রথমযুগের ছবিগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই বর্ত্তমান, ফলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুঘল সাম্রাজ্য কায়েম হবার আগে পর্যন্ত রাজপুতানা আর জম্মুর মধ্যে চিত্ররীতির খুব আদান প্রদান ছিল।

বিকানীর প্রাসাদের প্রাচীরচিত্রের উল্লেখ আগেই করেছি। কিন্তু এগুলি সবই সতেরো শতকের। ইতিমধ্যে রাজপুত চিত্র ও মুঘলচিত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, রাজপুত শিল্পী মুঘল দরবারে সসম্মানে ভর্তি হন, মুঘলদরবারে সম্মানিত রাজপুত রাজারাজড়ারা নিজের রাজ্যে চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হন, ফলে উভয়পক্ষেই যথেষ্ট আদান প্রদান চলে।

বিকানীর ও অম্বরের চিত্ররীতিতে মুঘলপ্রভাব যে বেশ তাড়াতাড়ি আসে তার প্রমাণ আছে। ১৬৪০ সনে ইংলণ্ডের আর্চবিশপ লড বডলিয়ান গ্রন্থাগারে রাগিনীচিত্রমালার একটি অ্যালবাম উপহার দেন। আর্চবিশপ বিলিয়ম লড তখন ছিলেন অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। এই অ্যালবামটির সঙ্গে তিনি আরও আশিটি পুঁথি দেন। লরেন্স বিনিয়ন অনুমান করেন স্যর টমাস রো যখন মুঘল দরবারে ১৬১৫-১৯ সনে দৌত্যকার্য শেষ করে ইংলণ্ডে ফেরেন তখন অ্যালবামটি সঙ্গে নিয়ে যান। যতই দেরি হোক ১৬৩৯ সনের পর নিশ্চয়ই অ্যালবামটি ইংলণ্ডে যায় নি। অ্যালবামটির মধ্যে যে ছবি দুটি সবচেয়ে হালের, তার একটি হচ্ছে ১৬১০-১১ সন নাগাদ আঁকা একটি হস্তলিপির নমুনা, জাহাঙ্গীর আর তাঁর ছেলে পরভিজের পোর্ট্রেট। পরভিজ জন্মান ১৫৯০ সনে। মারা যান ১৬২৬ সনে। ছবিতে তাঁর বয়স কুড়ির কম নয়। সুতরাং অ্যালবামটি ১৬১০ এর কিছু পরে তৈরি হয়েছিল বলে ধরা যায়। তাছাড়া অ্যালবামটির রাগমালাচিত্রগুলিতে মুঘল প্রভাব স্পষ্ট। বর্ণবিন্যাসরীতিতে আকবরের চেয়ে জাহাঙ্গীরের সময়কার প্রভাবই বেশী, গতিও অনেক মন্থর। উড়ন্ত পাখীর সার ছকে ফেলে আঁকা, পশ্চাদপটের সাইপ্রেস গাছে আর বাড়ীঘরের স্থাপত্যে সতেরো শতকের প্রথম যুগের ছাপ সুস্পষ্ট। ইংলণ্ডের সারে'র অধিবাসী ডব্লিউ-বি ম্যানলি বলে এক ভদ্রলোকের কাছে চৌত্রিশটি রাগমালা চিত্র আছে। চিত্রগুলির আশ্চর্য উজ্জ্বল রঙ আর সরল ছন্দোময় কম্পোজিশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলি ১৯৪৭-৪৮ সনে লণ্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমিতে যে প্রদর্শনী হয় তাতে দেখান হয়। বোস্টনের রসিকপ্রিয়া মিনিয়েচরগুলিতে মুঘল প্রভাব যত দেখা যায় এগুলিতে তার চেয়ে কম। ছবিগুলি বোধ হয় ১৬১০-২০ সনে আঁকা। আগেই বলেছি ষোল শতকের চৌরপঞ্চাশিকা ও বারমাস্যা চিত্রগুলিতে মুঘল প্রভাব একেবারেই নেই। এই পুঁথিগুলির ছবি চোখের সামনে থাকলে পরবর্তী যুগে রাজস্থানী ছবিতে কতখানি মুঘল প্রভাব এসেছিল বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তখন মুঘল দরবার আর রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে এত আদান প্রদান ছিল, এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈচিত্র্য, প্রাণ ও ঐশ্বর্য এত বেশী ছিল যে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয় অনেক রকমের মিশ্রিত রীতির উদ্ভব হয়। তবে মুঘলরীতির অবিসংবাদিত

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হতে এবং তার প্রভাব চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে যেতে আরও একশ বছর লাগে। তবে বিস্ময়ের কথা এই যে সুদূর উদয়পুরেও ১৬১০ সনের মধ্যেই মুঘল রীতির প্রতিপত্তি বেশ দেখা যায়। রাণা সংগ্রাম ও তাঁর ছেলেদের একটি পোর্ট্রেট আছে ; এটি ১৬১০ সনের খুব বেশী পরে আঁকা নয়। এর মধ্যে চরিত্র চিত্রণের যে নৈপুণ্য দেখা যায় তা নেহাৎই মুঘল দরবারে শিক্ষানবিশীর ফল। কালো জমির উপরে সিলুয়েট বা একপাশ করে দেখা শাদা পোষাক পরা প্রতিকৃতি ভারতীয় ঐতিহ্যরীতিসিদ্ধ যদি হয়ও তবুও তা নিতান্ত জাহাঙ্গীরের দরবার থেকে ধার করা।

বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রীতি আঠারো শতকে কিরকম পরিণতি লাভ করে তার আলোচনা একটু পরেই করব। কিন্তু রাজপুত রীতির প্রথম যুগের নিদর্শনও যে বুন্দেলা রীতিতে পাওয়া যায় তার উল্লেখ প্রথমেই করেছি। লাহোরের এরিক ডিকিন্‌সন্ বলে এক ভদ্রলোকের সংগ্রহে শিল্পী মাধবদাসের হাতের কাজ পাওয়া গেছে। এঁর দেশ ছিল বুন্দেলখণ্ডের রাজগড় ও ভূপালের মধ্যবর্ত্তী উমতওয়ারা রাজ্যের রাজধানী নরসিংহগড়ে। ডিকিন্‌সন্ সংগ্রহের ছবিগুলির অধিকাংশই ১৬৩৩ থেকে ১৬৮০ সনের মধ্যে আঁকা। ডাঃ গোয়েট্‌স্ মনে করেন যে ষোল শতকের প্রথমার্ধে রাজা বীরসিংহ দেওর অধীনে বুন্দেলখণ্ড শিল্পকলার বোধ হয় বড় কেন্দ্র ছিল। বুন্দেলা ছবির তুলনায় সমসাময়িক উদয়পুর বা বিকানীরের চিত্ররীতিতে মুঘলপ্রভাব অনেক বেশী। পরে বুন্দেলারীতি বড় অলঙ্কারবহুল হয়ে পড়ে, ফলে তার শক্তিমত্তা যায় কমে, কিন্তু তবুও রীতিটি থেকে যায়।

বীরসিংহ দেও ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ। জাহাঙ্গীর আবুল ফজলের উপর ভয়ানক রেগে যান এবং আকবরের জীবদ্দশাতেই আবুল ফজলের খুনের ব্যবস্থা করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন কেমন করে তিনি আবুল ফজলকে খুন করবার জন্যে বীরসিংহ দেওকে নিযুক্ত করেন, কেমন করে "ঈশ্বরের কৃপায় শেখ আবুল ফজল যখন বীরসিংহ দেওর এলাকার মধ্যে দিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরছিলেন তখন রাজা বীরসিংহ তাঁর পথরোধ করে হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে, তাঁর লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে, হঠাৎ তাঁকে হত্যা করেন এবং আবুল ফজলের কাটা মুণ্ড এলাহাবাদ থেকে জাহাঙ্গীরকে পাঠিয়ে দেন"। এইভাবে ১৬০২ সনের ১২ই আগষ্ট আবুল ফজল প্রাণ হারান ও দস্যুরাজ বীরসিংহ দেও বাদশা জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে ডাটিয়া ও অর্চায় বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বড় বড় নগর প্রাসাদ পত্তন করেন। বীরসিংহ দেও যখন ১৬২৭ সনে মারা গেলেন তখন ডাটিয়া নগর মধ্যভারতে একটি বিখ্যাত শহর। বীরসিংহ দেওর সময়ে লেখা হাফিজের দেওয়ানের একটি নকল প্রাচ্যদেশের একটি অমূল্য পুঁথি বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। এই বংশেই ১৭৬২ থেকে ১৮০১ পর্যন্ত রাও শত্রুজিৎ বলে রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত পোর্ট্রেট আছে, তার দুটি নানালাল মেহতা তাঁর বইতে ছেপেছেন।

আগেই বলেছি আঠারো শতকে যে জয়পুরী কলমের কথা আমরা শুনি তাতে আদি বা প্রাচীন

রাজপুত রীতি প্রায় লোপ পেয়েছিল বললেই হয়। আঠারো শতকের জয়পুরী চিত্র অধিকাংশই পোর্ট্রেট এবং তাতে রঙের গাঢ়ফিকে করে মড্লিংএর গুণ এল। অবশ্য জয়পুরী পোর্ট্রেট বড় বেশী রীতি বা কানুনদুরস্ত, একপাশ থেকে দেখা ছবি আড়ষ্ট করে আঁকা, রঙ এত পান্‌সে যে সেগুলি ভীরুতা-দুষ্ট বলা চলে। অধিকাংশ পোর্ট্রেটই রেখায় আঁকা, যেন শেষ করা হয় নি। রেখা অবশ্যই খুব উল্লেখযোগ্য, যেমন প্রখর, তেমনি পরিষ্কার, চুলের মত সরু, কিন্তু তারই মধ্যে প্রাণের আবেগ ও স্পন্দনে পূর্ণ। নক্সা এত সুকুমার ও কোমল যে মনে হয় প্রসিদ্ধ ইওরোপীয় 'সিলভার-পয়েন্ট' টেক্‌নিকে বুঝিবা সেগুলি আঁকা হত, তারপরে জমিটা মোটা সাদা রঙে তার করা হত। এইরকম অস্বচ্ছ জমির মধ্যে দিয়ে নীচের রেখা অল্প ফুটে উঠত। তখন সেই প্রথম রেখার উপর আবার খুব সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে অতি নরম সুকুমার ছাইরঙের রেখা দিয়ে পুনরায় নক্সাটি আঁকা হত। অন্য যদি কোন রঙ প্রয়োজন মনে হত তবে সামান্য অল্প কয়েকটি রঙের ওয়াশ দিয়ে ছবিটি শেষ করা হত। শিল্পী রঙের বদলে ছবিতে আনতে চাইতেন হাতীর দাঁতের রঙের জমির উপর ছাইরঙের নক্সা, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রিজেইল। এ টেকনিক অবশ্য কাংড়ার পোর্ট্রেট টেকনিক থেকে আলাদা।

কুমারস্বামী যদিও প্রথমে রাজপুত ও মুঘল ছবি আকাশ পাতাল তফাৎ ঘোষণা করেন তবুও তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' বইয়ে রাজস্থানী রীতির আলোচনায় তিনি স্বীকার করেন যে রাজপুত চিত্রে মুঘল প্রভাব যথেষ্ট। জয়পুর কলমের পোর্ট্রেট শিল্পে তিনি মুঘল প্রভাবের কথা স্পষ্টভাবে বলেন। জয়-পুরের পোর্ট্রেটে যদিও মুঘল ছবির মত গভীরভাবে চরিত্র ফুটে ওঠেনা তবুও পোষাক ও অলঙ্কার লক্ষ্য করার মত। কুমারস্বামীর মতে কেশব দাসের রসিকপ্রিয়া পুঁথির কৃষ্ণের নৃত্য ছবিটির বিষয়বস্তু যদিও হিন্দু তবু মেঘ আঁকার রীতি ও নক্সার অন্যান্য খুঁটিনাটিতে মুঘল প্রভাব সুস্পষ্ট। স্ত্রীলোকদের স্নান বিষয়ক চিত্রেও, তাঁর মতে, মুঘল প্রভাব যথেষ্ট। কুমারস্বামীর মতে সতেরো শতকের শেষদিকে ও আঠারো উনিশ শতকে রাজপুত ও মুঘলরীতি অনেক ক্ষেত্রেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, কোন স্থানে রাজপুত ভাবের সঙ্গে মিলেছে মুঘলরীতি, কোনও স্থানে আবার মুঘল মেজাজের সঙ্গে রাজপুত রীতি। কিন্তু এখানে ওখানে শুদ্ধ রাজপুত নীতিতে যথেষ্ট ছবি আঁকা হত। হীরানন্দ শাস্ত্রী ও খাণ্ডালাবালা কিছু বিজ্ঞপ্তিপত্র বা নিমন্ত্রণ পত্রের উল্লেখ করেন। এগুলি আবু পাহাড়ের কাছে সিরোহীর জৈনদের মধ্যে আঠারো শতকের প্রথমভাগে চলিত ছিল: তাতে পশ্চিমভারতীয় চিত্ররীতি খুব স্পষ্ট। পরে যেসব বিজ্ঞপ্তিপত্র হয় তাতে কিন্তু চিত্রগুণ স্তিমিত হয়ে যায়। আঠারো শতকের শেষদিকে উত্তর রাজপুতানায় আবার কিছু কিছু ভাল ছবি আঁকা হয়। কিন্তু আঠারো আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে রাজপুত চিত্র উৎকর্ষের যে সীমায় ওঠে তার কাছে সমসাময়িক রাজপুতানী চিত্রের মূল্য অনেক কম।

পাহাড়ী চিত্র

প্রাচীনকাল থেকেই জাজপুর, ভুবনেশ্বর, পুরী হিন্দু তীর্থস্থল। উত্তর ভারতের তীর্থযাত্রীদের পুরীতে যাবার রাস্তা ছিল তখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পরেশনাথ পাহাড় ; পরেশনাথ থেকে দামোদর পেরিয়ে পারা, তেলকুপি ; সেখান থেকে পঞ্চকোটের পাশ দিয়ে, বাঁকুড়ার মধ্যে দিয়ে, মেদিনীপুরের জঙ্গল মহালের ভিতর দিয়ে দাঁতন, অন্যদিকে ময়ুরভঞ্জ। তারপর জাজপুর, ভুবনেশ্বর, পুরী। উত্তর ভারতের যাত্রীদের মধ্যে রাজপুতও থাকতেন। অতদূর রাস্তা চলতে চলতে আহার পথ্য জলের অভাবে অনেকের রাস্তায় অসুখ বিসুখ হত। যাত্রীরা অসুস্থ সঙ্গীর জন্যে বড়জোর কয়েকদিন অপেক্ষা করতেন, তারপর তাঁকে পথিমধ্যে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে তীর্থপথে চলে যেতে বাধ্য হতেন। এইভাবে পরিত্যক্ত যাত্রীদের মধ্যে অনেকে মারা যেতেন, কেউ কেউ আবার বেঁচে উঠতেন। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে। যার মধ্যে রাজার রক্ত আছে সে রাজা হবার চেষ্টা করবেই। বেঁচে ওঠার পর তাঁরা চরিত্রগত স্বভাবের জোরে অনুচরের দল খাড়া করে নিজেদের জন্যে ছোট বড় জমিদারী তৈরি করে নিতেন। তারপর রাজা উপাধি নিতেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে এইভাবে অনেক জমিদার রাজা মধ্যযুগের পরে উদ্ভুত হন : যথা, বর্ধমান, উখড়া, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম ইত্যাদি। এঁরা প্রায় সকলেই রাজপুত, বিবাহাদি এখনও রাজস্থানে বা পাঞ্জাবের রাজপুতদের সঙ্গে ছাড়া হয় না।

ঠিক এঁদের মতই, মধ্যযুগে পাঠান, মুঘলেরা আসার পর, রাজস্থান থেকে কিছু রাজপুত বংশ রাজস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে, নিজেদের বাহুবলে, প্রথমে জমিদারী, তারপরে রাজত্ব তৈরি করে নেন। কুমারস্বামীর মতে এঁদের অধিকাংশই রাজস্থানের চারিদিকের সমতল ভূমির লোক ছিলেন। বারোশতকের শেষে দিল্লী, আজমীর, মাহোবার পতনের পর চৌহান ও চাণ্ডেলরা উত্তর ভারতের সর্বত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। জম্মু থেকে আলমোড়া পর্যন্ত এঁরা ছোটখাটো অনেকগুলি রাজ্যের সৃষ্টি করেন। 'পাঞ্জাব পাহাড়' বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার রাজ্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগ হচ্ছে সে সব রাজ্য যেগুলি রবি নদীর পশ্চিম পাড়ে। দ্বিতীয়ভাগে পড়ে রবি নদীর পূর্বপাড়ের রাজ্যগুলি। প্রথমভাগে বাইশটি রাজ্য ছিল, তাদের নাম, আখনুর, বাঁধ্রালৃতা, বাশোলি, ভদ্রাওয়া, ভাতু, ভাউ, ভিম্বার, ভোটি, চাহ্নেনি, দলপতপুর, জম্মু, জস্রোতা, কস্তোয়ার, খরি-খরিয়ালি, কোট্‌লি, লখনপুর, মানকোট, পুঞ্চ, রাজোড়ি, রিয়াসি, সাম্বা, তিরিকোট। দ্বিতীয়ভাগে ছিল ষোলটি, তাদের নাম, বাঙ্গাহাল, বিলাসপুর, চাম্বা, দাতারপুর, গুলের, জস্‌ওয়ান, কাংড়া, কোট্‌লা, কুট্‌লের, কুলু, মাণ্ডি, নুরপুর, শাহপুর, সিবা, সুকেত, তেহরি-গাঢ়োয়াল।

কিভাবে রাজ্যগুলি এক এক করে হত তা এই ছোট্ট বিবরণটুকু পড়লে বোঝা যাবে। "তৈমুরের আক্রমণের কিছু বছরের মধ্যেই হরিচাঁদ কাংড়ার সিংহাসনে এলেন (অনুমান ১৪০৫)। তখন কাংড়ার দক্ষিণে সারা দেশ ঘন জঙ্গলপূর্ণ ছিল, লোকজনের বসতি ছিল না বললেই হয়, কাংড়ার

রাজাদের শিকার খেলার জায়গা ছিল। একদিন রাজা সদলবলে বেরোলেন শিকার খেলতে। গুলের রাজ্যে এখন যাকে হারসার বলে সেদিকে শিকার খেলতে খেলতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কুয়া বা গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। বাঘভাল্লুকের হাতে রাজা প্রাণ হারিয়েছেন ভেবে পারিষদরা রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তাঁর যথোরীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। এমন কি তাঁর রাণীরা শুদ্ধ সতী হলেন। হরিচাঁদের পুত্র না থাকায় রাজার ছোট ভাই করমচাঁদ তখন রাজপদে অভিষিক্ত হলেন এবং লোকে ধরে নিল হরিচাঁদ মারা গেছেন। হরিচাঁদ কিন্তু মারা যান নি। ঐ অবস্থায় গর্তে বাইশ দিন থাকার পর একজন ব্যবসাদার পথে যেতে যেতে তাঁকে দেখতে পায় এবং উদ্ধার করে। তারপর কাংড়ার খবর শুনে হরিচাঁদ আর কাংড়ায় ফিরলেন না। তার পরিবর্তে তিনটি নদীর ত্রিমোহানায় একটি গড় আর হরিপুর নগর পত্তন করে গুলের নামে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যে একবার কোন উত্তরাধিকারী রাজপদে অভিষিক্ত হলে, তাঁর আর রাজপদ যাবে না। এইভাবে বড় ভাই হলেন গুলেরের রাজা, আর ছোট ভাই উত্তরাধিকার সূত্রে কাংড়ার রাজাই রইলেন। কিন্তু যেহেতু হরিচাঁদ ছিলেন বড় ভাই আর করমচাঁদ ছোটভাই সেহেতু যে কোন উৎসবে গুলেরের সম্মান ও স্থান এখনও সবসময়ে কাংড়ার উপরে।”

পাহাড়ী রাজপুত রাজ্যগুলি কিভাবে স্থাপিত হয় মনে রাখলে পাহাড়ী চিত্রের চরিত্র ও ও উদ্দেশ্য বুঝতে সুবিধা হয়। মুঘল চিত্রের রীতি ও চরিত্র থেকে পাহাড়ী ছবির ঐতিহ্য সম্পূর্ণ তফাৎ। অবশ্য কিছু কিছু বিষয়ে মিল আছে : যেমন পাহাড়ী ছবির মধ্যেও দরবার দৃশ্য আছে ; রাজা রাজড়ারা খোলাছাতে আরাম করে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন, সমুখে নর্তকী কিংবা ওস্তাদ গান করছে, সে ধরনের দৃশ্যের ছবিও আছে। কিন্তু আসল পাহাড়ী চিত্রসম্ভারের মধ্যে এই সব বিষয়ের ছবি সামান্য অংশমাত্র জুড়ে আছে। পাহাড়ী চিত্রের বিষয়বস্তু আলাদা, সে হচ্ছে মুখ্যত পুরাণ বা মহাকাব্য থেকে আখ্যান-মূলক দৃশ্য আঁকা। এর মধ্যেও আবার বিশেষ ভাগ আছে। কারণ রাজপুত চিত্রেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের দৃশ্য কিছু কম নেই। রাজপুত চিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন রাগমালা চিত্র, পাহাড়ী চিত্রের বৈশিষ্ট্য তেমনি গীতিকাব্য, প্রেম বিষয়ক কাব্য সাহিত্য, বিশেষ করে জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের প্রতি এরকম আগ্রহ; টান, প্রেমবিষয়ক চিত্রের প্রতি এত আকর্ষণ বিস্ময়কর। এর কৈফিয়ৎ শুধু পাহাড়ী রাজপুত সমাজব্যবস্থায় মেলে। রাজপুতানা থেকে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী রাজপুতরা চিরকালই রাজস্থানকে নিজেদের প্রকৃত দেশ বলে স্বীকার করেছে। পাঞ্জাবের পাহাড়কে প্রবাস বলে মনে করেছে। সুতরাং প্রবাসীর যেমন সর্বদা দেশের জন্য মন হু হু করে, পাহাড়ী রাজপুতের মধ্যেও বরাবর ছিল ইংরেজিতে যাকে বলে নস্ট্যাল্‌জিয়া, দেশের জন্য মন কেমন করা, ছল-ছলে ভাব। তার উপর ছিল সদাসর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ, আত্মরক্ষার প্রয়াস, শত্রুর ছলবল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। ফলে দৈনন্দিন জীবনের রুক্ষতা, তিক্ততা, নিরন্তর সংগ্রাম, ক্লেদ থেকে মন নিশ্চয় মুক্তি

চাইত সুকুমার, পেলব, কোমল, প্রেমের চিন্তায়, প্রেমের চিত্রে ; যুদ্ধের জন্য গড়া স্থূল, প্রকাণ্ড পেশী-মণ্ডিত শরীরে নিশ্চয় আসত একান্ত কোমল, লজ্জানত, ক্রীড়াশীল, পেলব, শান্ত, শীতলদেহের ও মনের আসঙ্গ কামনা। পাহাড়ী রাজপুত সমাজের চাপা অতৃপ্ত কামনা, বাসনা, ভাবাবেগের ক্ষুধা, গীতি-কাব্যের প্রতি টান, অতি সহজে পাহাড়ী চিত্রকলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে। কাজে কাজেই এই সব চাহিদার ফলে পাহাড়ী চিত্রে আসে এক বিশিষ্ট গুণ, যা হয় নিজের স্বকীয়তায় মহীয়ান। চিত্রের মধ্যে পাহাড়ী রাজপুত আখ্যানধর্মী বাস্তবতা না খুঁজে, চাইল এক তদ্গত স্বপ্ন। সে চাওয়ার ফলে রেখার একান্ত ছন্দোময় গুণের মধ্যে এল কাব্যের ধ্বনির রেশ। এমন কি কখনও কখনও রঙেরও ব্যবহার হল প্রতীক হিসাবে, যেমন টকটকে লাল বোঝাল প্রেমের দুরন্ত আবেগ। এমন কি ল্যাণ্ডস্কেপও ব্যবহার হল প্রতীকের অরণ্য হিসাবে, তার প্রতিটি গাছ, ফুল, নদী, বৃষ্টি, পাখী, জন্তু হয়ে দাঁড়াল এক একটি কাব্যিক প্রতীক, আলাদা আলাদা ভাবানুষঙ্গ। ভারতের অন্য সর্বত্র চিত্রে রঙ আর রেখা হল নানা বিচিত্র প্রকাশের বাহক। একমাত্র পাঞ্জাব পাহাড়েই শুধু ছবি হল রোমান্সের বিশুদ্ধ নির্যাসের আধার। প্রেমের অধরারূপের এমন অপূর্ব প্রতিচ্ছবি আর অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ।

সতেরো শতকে আঁকা রাজস্থানের রাজপুত ছবি যে খুব কমই আছে তা আগে বলেছি। সুতরাং মুঘল রীতির প্রভাবমুক্ত রাজপুত ছবি খুব কমই আছে। বিকানীর আর জয়পুরের চিত্ররীতিতে এত বেশী মুঘল প্রভাব আছে যে এ দুটি রাজ্যে আঁকা ছবির মধ্যে কোনটি মুঘল কোনটি রাজপুত ঠিকমত বলতে পারা সময়ে সময়ে বেশ শক্ত হয়। অবশ্য উদয়পুরের রীতিতে মুঘল প্রভাবের রেশ মাত্র দেখা যায়। এক মধ্য ভারতের রাগমালা চিত্রগুলি ছাড়া (যার উল্লেখ আগে করেছি) সতেরো শতকের শেষভাগে আঁকা রাজপুত ছবি একমাত্র পাওয়া যায় বাশোলি বলে ছোট্ট এক পার্বত্য রাজ্যে। বাশোলি রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এগারো শতকে। ১৫৮৬ সনে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে যায়। তার ঠিক পরেই পাঁচশ বছরের উপর স্বাধীনতা ভোগের পর ১৫৮৯ সনে বাশোলি মুঘল আধিপত্য স্বীকার করে। জাহাঙ্গীরের আমলে বাশোলির রাজা ভূপত পাল ১৬১৪ থেকে ১৬২৭ সন পর্যন্ত কারা-বাসে কাটান। ১৫৯৮ থেকে ১৬৩৫ পর্যন্ত ভূপত পাল রাজত্ব করেন ; ১৬৩০ সনে নতুন বাশোলি সহর স্থাপন করেন। তারপর থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাশোলির রাজারা মোটামুটি স্বাধীন ছিলেন, পরে জম্মুর অধীনে যান। ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী ১৯৩৬ সালে ভারতীয় চিত্রিত পুঁথি সম্বন্ধে একটি বই লেখেন। তাতে চিত্তরসমঞ্জরী নামে একটি পুঁথির উল্লেখ করেন। পুঁথিটির চিত্র-করের নাম দেবীদাস ; চিত্রের পাঠে জানা যায় পুঁথিটি রাজা কিরপাল সিংহের বদান্যতায় ১৭৫২ বিক্রম সংবতে প্রকাশিত হয়। ১৭৫২ বিক্রম সংবত হচ্ছে খৃষ্টীয় ১৬৯৪-৯৫ সন। রাজা কিরপাল সিং রাজা ছিলেন ১৬৭৮ থেকে ১৬৯৩ সন পর্য্যন্ত। সুতরাং ১৬৯৪-৯৫ সন লেখাটি হয় ভুল, নয় রাজা মারা যাবার পর পুঁথির চিত্রগুলি শেষ হয়।

ঠিক কতগুলি ছবি এই তারিখের আগে আঁকা জানার বিশেষ উপায় নেই। হীরানন্দ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে বলেছেন যে পুঁথিটিতে প্রথমে ১৩০টি চিত্র ছিল। বলা বাহুল্য এখন আর ১৩০টি চিত্র একত্রে নেই। কিছু আছে হীরানন্দ শাস্ত্রীর সংগ্রহে, কিছু লাহোর মিউজিয়ম সংগ্রহে, কিছু কলকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে, বাকি নানা জায়গায়। ১৯২৯ সনের রূপম পত্রিকার ৩৭নং অর্থাৎ জানুয়ারি সংখ্যায় অজিত ঘোষ 'দা বাশোলি স্কুল অভ রাজপুত পেন্টিং' বলে একটি ছোট কিন্তু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এই দুটি জায়গায় বাশোলি চিত্র যেটুকু ছাপা হয় তার রঙ যেমন জমকালো, নক্সা তেমনি শক্তিমান, ভাবাবেগ তেমনি বলিষ্ঠ। কুমারস্বামী ১৯১৬ সনে যখন 'রাজপুত পেন্টিং' প্রকাশ করেন তখনো বাশোলি চিত্ররীতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হয় নি; তাই তাঁর বইয়ের ২৭নং চিত্রটি বাশোলির হলেও তিনি ষোল শতকের জম্মু চিত্র বলে লেখেন। অবশ্য আঠারো শতকে বাশোলি জম্মু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছু বছর আগে পর্যন্ত বাশোলির নাম এত কম চলিত ছিল যে অজিত ঘোষ লিখেছেন অমৃতসরে বাশোলি চিত্র তিব্বতী ছবি বলে চলত। অধিকাংশ বাশোলি ছবি হয় কৃষ্ণলীলা নয় নায়িকা বিষয়ক। প্রেমিক প্রেমিকার ভাব-বিকার বৈচিত্র্যই তাদের উপজীব্য। চিত্রের পোশাক সতেরো শতকের প্রথমভাগের, পুরুষদের বেলায় মুঘল, নারীদের বেলায় রাজপুত। বাড়ীঘরের স্থাপত্যে পশ্চিম ভারতীয় রীতি অনুযায়ী চওড়া কার্নিশ আর ব্র্যাকেট। এসব লক্ষণ সম্ভবত রাজপুতানা থেকে আমদানি, এবং এটা বোধ হয় ঠিক যে কি পাহাড়ে, কি আসল রাজস্থানে একটি রাজপুত রীতি সর্বত্র চলিত ছিল। এটা স্বীকার করতে বাধে না যে সে-সময়ে রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে চিত্ররীতিনীতির আদান প্রদান যথেষ্ট ছিল, যার ফলে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত। বাশোলি চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এইভাবে আশপাশের রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বাশোলির বলিষ্ঠ প্রাণবন্ততা রাজস্থানের ছবিতে নেই। সৌকুমার্যের অভাব থাকলেও বাশোলির চিত্র লৌকিক চিত্র নয়, সাধারণ পটুয়ার ছবি নয়, এ নিতান্তই রাজদরবারের পেশাদার শিল্পীর আঁকা ঐতিহ্যবহ চিত্র।

সতেরো শতকের শেষে এবং আঠারো শতকের প্রথমভাগে বাশোলি চিত্রকলার কেন্দ্র ছিল বলা যায়। একটি গীতগোবিন্দ চিত্রমালা পাওয়া গেছে, তাতে বাশোলির রাজা মেদিনী পালের উল্লেখ আছে, তারিখ ১৭৩০ সন। এর কিছু ছবি লাহোর মিউজিয়মে আছে। ১৬৯৪র রীতি থেকে এ রীতি অনেক কোমল, কিন্তু রঙের বিন্যাসে আগের রীতিই বর্তমান: হলদে আর গাঢ় সবুজের প্রাদুর্ভাব। প্রেমবিষয়ক পুঁথিচিত্র হিসাবে খুবই ভাল, কিন্তু একঘেয়ে। আঠারো শতকের দ্বিতীয়-ভাগেও বাশোলির যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, কারণ অমৃতপাল (১৭৫৭-৭৬) যদিও জম্মুর অধীনতা স্বীকার করেন, তবুও ১৭৩৯ সনে নাদির শা'র দিল্লী লুটের পরে তল্লদেশে অরাজকতার বিভীষিকা আসায় ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন পথগুলি বাশোলি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাশোলি

চিত্ররীতিও ছড়িয়ে পড়ে এবং কাংড়া রীতির বিকাশকে সাহায্য করে। মাণ্ডির রাজা সিদ্ধ সেনের (১৬৮৪-১৭২৭) পোর্ট্রেটে বাশোলি রীতির ছাপ সুস্পষ্ট।

বাশোলির প্রভাব সব পার্বত্য রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কুলু উপত্যকায় একটি বিশিষ্ট সরল চিত্ররীতি গড়ে ওঠে, কিন্তু তাকেও স্থানীয় লৌকিক রীতি ভাবা ভুল হবে, তার মধ্যে বাশোলি প্রভাব যথেষ্ট। সেই রকম রাজা ঘমণ্ডচাঁদের (১৭৫১-৭৪) সময়ে কাংড়াতেও বাশোলি প্রভাব আসে।

কাংড়া কলম বা কাংড়া চিত্ররীতি এত প্রসিদ্ধ যে চলিত কথায় পাহাড়ী চিত্র মানে কাংড়া চিত্র বোঝায়। সাধারণ মনে বাশোলি, ভদ্রাওয়া, জম্মু, জস্রোতা, পুঞ্চ, মাম্বা, গুলের, কুলু, মাণ্ডি, নুরপুর, তেহরি গাঢ়োয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য কিছু ছাপ রাখেনা। সবকটি নামকে ছাপিয়ে ওঠে কাংড়া কলমের নাম। অর্থাৎ কাংড়া নামের তলায় অন্য সব নাম চাপা পড়ে।

অনেকদিন ধরে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে কিছু মুঘল চিত্রকর আশ্রয়লাভের আশায় পালিয়ে কাংড়ায় যান এবং সেখানে বাস করে ছবি আঁকা শুরু করেন। যদি এ ধরনের কিছু হয়ে থাকে তা দারা শিকোর মৃত্যু অথবা ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হয়নি, হয় বোধহয় ১৭৩৯ সনে নাদিরশা'র দিল্লী লুঠ এবং আহমদ শাহের আক্রমণের পরে। ১৭৮৩ সন পর্য্যন্ত কাংড়া গড়ে মুঘল সৈন্যের ছাউনি ছিল, ফলে কাংড়ায় মুঘল দরবারের শিল্পীদের থাকা খুবই সম্ভব। এটা ঠিক যে কাংড়া চিত্রশিল্পের প্রথম যুগে এমন কি উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও, নক্সার কৌশল ও নৈপুণ্য ছিল অসামান্য ; আর তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের উদাত্ত বিস্তার গুণ যে মুঘল চিত্র থেকে পাওয়া তাও বুঝতে দেরি হয়না। কাংড়া চিত্র সম্বন্ধেও একথা মনে রাখা দরকার যে তা কোনমতেই লৌকিক শিল্প নয়, নিতান্তই দরবারী, পেশাদার শিল্পীর কাজ। মোটেই অখ্যাত, অনামী কারিকরের সৃষ্টি নয়।

সম্প্রতি এম-এস-রন্ধাওয়ার লেখা 'পেন্টিং ইন দা কাংড়া ভ্যালি' বলে একটি সুন্দর বই বেরিয়েছে। তাতে কতকগুলি অপূর্ব ছবি আছে। ইংরেজ সমালোচক জে-সি ফ্রেঞ্চের একটি সুন্দর উক্তি আছে। তাঁর মতে কাংড়া ছবি হচ্ছে, 'মুঘল রেখা ও হিন্দুমনের অপূর্ব মহিমামণ্ডিত মিলন'। সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ইন দা পাঞ্জাব হিল্‌স্' বইয়ে ডব্লিউ-জি আর্চার কাংড়া রীতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী গবেষণা করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসেন। তাঁর যুক্তি রধারা এই রকম। কাংড়ার রাজা ঘমণ্ড চাঁদের (১৭৫১-৭৪) সময়ে উৎকৃষ্ট কাংড়া চিত্র ছিল বলে জানা নেই। ঘমণ্ড চাঁদের পর মাত্র এক বছরের জন্য রাজা হন তাঁর ছেলে তেগচাঁদ (১৭৭৪-৭৫)। তাঁর পর, দশ বছর বয়সে রাজা হন তাঁর ছেলে সংসার চাঁদ (১৭৭৫-১৮২৩)। ১৮২০ সনে সংসার চাঁদের দরবারে মুরক্রফ্‌ট্ বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বেড়াতে যান। তাঁর লেখায় জানা যায়, রাজা সংসার চাঁদ নিজের দরবারে বহু প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী রেখেছিলেন। একথা এক পাঞ্জাবী মুসলমান ঐতিহাসিকও স্বীকার করেন।

কিন্তু দশবছর বয়সে রাজা সংসার চাঁদ নিশ্চয় চিত্রশিল্পের এমন কিছু বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। অথচ ১৭৮৫-৯০ সনের মধ্যে কাংড়া চিত্ররীতি এমনভাবে খ্যাতির মধ্যাহ্নসূর্যে ওঠে যে সংসার চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী চাম্বার রাজা রাজসিংহ এসময়ে লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের পোর্ট্রেট কাংড়া কলমে আঁকান। সুতরাং মাত্র দশ পনেরো বছরের মধ্যে (১৭৭৫—৮৫) কি করে এই বিখ্যাত কাংড়া কলম হল ?

তার একটি কারণ উপরে দিয়েছি। অন্য সন্ধান দিয়েছেন ডব্লিউ-জি আর্চার। তাঁর মতে কাংড়া কলমের স্থানীয় উৎস হচ্ছে গুলের রাজ্যের চিত্রশিল্প। এই তথ্যটি তিনি এমন সুন্দর ভাবে 'গুলের' প্রবন্ধটিতে পরিবেশন করেছেন, যে চিত্রশিল্পের ছাত্রমাত্রেরই লেখাটি পড়া উচিত।

গুলের রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার গল্প আগে করেছি। কাংড়ার শাখারাজ্য হিসেবে ১৪০৫ সনে গুলেরের প্রতিষ্ঠা হয়। গুলেরের প্রথম রাজা হন কাংড়ার রাজার বড় ভাই। সুতরাং পরে পত্তন হলেও গুলেরের পদমর্যাদা কাংড়ার চেয়ে বেশী হল। এই পদগৌরব বরাবরই থেকে গেল। ফলে সবকিছু বিষয়েই, কাংড়ার কাছে গুলের নয়, উল্টে গুলেরের কাছে কাংড়া নির্দেশের আশায় চেয়ে থাকবে এই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। এই বিশেষ সম্বন্ধের ফলে ছোট রাজ্য হলেও গুলেরের কাছ থেকে কাংড়া তার বিশিষ্ট চিত্রনীতি পায়। আঠারো শতকে পাহাড়ী চিত্রের ইতিহাসে গুলেরের স্থান তাই খুব বড়। শুধু যে গুলেরেই চিত্রশিল্পের চরম লাবণ্য, উৎকর্ষ আসে তা নয়, গুলের রীতি যখন শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় ওঠে, তখন তা ১৭৮০ সন নাগাদ কাংড়ায় রপ্তানি হয়ে সেখানে কাংড়া কলম নাম নেয়। কাজে কাজেই শুধু আটত্রিশটি পাহাড়ী রাজ্যের মধ্যে একটি বললে গুলেরের আসল পরিচয় মোটেই হয় না। পাহাড়ী চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ রীতি, কাংড়া কলমের জনক ও পালক হিসাবে গুলেরের স্থান স্বীকার করতেই হয়। ভূগোলের দিক থেকেও গুলেরের অবস্থান উল্লেখযোগ্য। কারণ কাংড়ার দক্ষিণে বিয়াস নদীর ধারে গুলের, সমতল ভূমি থেকে যাওয়া যেমন সোজা, পাহাড়ের সঙ্গে সম্বন্ধও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। তলভূমিতে থাকার দরুণ গুলেরের রাজারা পাহাড়ী রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দূরে থেকে কলাচর্চা করতে পারতেন। এবং ঠিক একই কারণে বাইরের শিল্পীদের গুলের আসা সহজ হত। সতেরো আঠারো শতকে যেখানে যা স্থানীয় চিত্ররীতি ও চিত্রপ্রতিভা ছিল, সকলের সঙ্গেই মুঘল দরবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, আদান প্রদান ছিল। সেই মুঘল দরবার যখন আঠারো শতকের মাঝামাঝি ভেঙ্গে গেল তখন মুঘল চিত্ররীতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, এমন কি শিল্পীদের মধ্যেও অনেকে নিশ্চয় নানা-দিকে চলে গেলেন। এটা ঠিক যে খোদ মুঘল দরবারের শিল্পীরা যত না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন, আশপাশের রাজ্য থেকে যে সব শিল্পী রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন তাঁরা পুনরায় মফঃস্বলে ফিরে গেলেন। অতএব কাংড়ার স্থানীয় চিত্রভাষায় মুঘল সৌকুমার্য ও স্বাভাবিকত্ব আসার ফলে যে উন্মেষ ও উন্নতি হয় তার মূলে গুলেরের ভৌগোলিক অবস্থান একটি বড় কারণ বলে ধরা যায়।

তৃতীয় ও সবচেয়ে বড় কারণ (যার জন্য গুলেরকে আমরা কাংড়া রীতির জনক বলে মানব)

হচ্ছে যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে আঁকা উৎকৃষ্ট ছবি গুলেরেই কেবল পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ বিশ শতকের প্রথম দিকে গুলেরে যান। তিনি লিখেছেন, "এখনও লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে রাজা রঘুনাহ সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত গুলেরের রাজধানী হরিপুর কাংড়া চিত্রকলার খুব বড় কেন্দ্র ছিল।" জে-সি ফ্রেঞ্চ গুলেরের রাজা বিক্রম সিংহের (১৬৬১-৭৫) একটি পোর্ট্রেটের উল্লেখ করেন। হাতীর পিঠে বসা প্রতিকৃতিটি বোধহয় কোন মুঘল শিল্পীর আঁকা হবে। গুলেরের রাজা গোবর্ধন সিং (১৭৩০-৭৩) ছিলেন ইতিহাসে যাকে 'অশ্বযুদ্ধ' বলে উল্লেখ করে তার নায়ক। প্রবাদ আছে গোবর্ধন সিংহের একটি খুব সুন্দর যুদ্ধের ঘোড়া ছিল। তার উপর পাশের রাজ্যের মুঘল সুবাদারের নজর পড়ে, ফলে তিনি ঘোড়াটি চান। রাজা ঘোড়াটি দিতে অসম্মত হওয়ায় যুদ্ধ বাধে। রাজা জেতেন, মুঘলরা হেরে যায়। ফ্রেঞ্চ মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক চোখে ঘোড়াটার গড়ন খুব অদ্ভুত ঠেকবে ; শরীরটা যেমন ভারি তেমনি প্রকাণ্ড, বুক আর পিঠ খুব চওড়া, ঘাড় মোটা, হাড় মোটা মোটা।" কিন্তু জন্তুটি গোবর্ধন সিংহের এত প্রিয় ছিল যে এই ঘোড়ার সঙ্গে একসাথে আঁকা তাঁর অনেকগুলি পোর্ট্রেট আছে। এতেই প্রমাণ হয় যে রাজা গোবর্ধন সিংহের সময়ে গুলেরে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ররীতি ছিল।

তার প্রথম প্রমাণ আছে রামায়ণ বিষয়ক চোদ্দটি ছবিতে। কুমারস্বামী যদিও এগুলিকে জম্মুর ছবি বলে গেছেন, তবুও এ বিষয়ে অজিত ঘোষের মতই বেশী গ্রাহ্য। অজিত ঘোষ বলেছেন ছবিগুলি 'আসলে গুলেরেই পাওয়া গেছে'। তিনি নিজে হুবহু ঐ রীতিতে আঁকা অনেকগুলি নক্সা পান। বাশোলিচিত্রের সঙ্গে এগুলির অবশ্য যথেষ্ট মিল আছে। মিল আছে সমান লালচে কমলা রঙের জমিতে, নীল জটপাকানো ফালির মত আকাশে, একই ধরনের আঁকা গাছে, এবং একটু বেশী আয়ত-চোখে। কিন্তু এই ধরনের মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। এই রামায়ণ চিত্রগুলিতে প্রথম যে অমিল সে হচ্ছে ছবিগুলিতে অনেক প্রাণীর ভিড়, দ্বিতীয়ত ঢেউখেলানো টুকরো টুকরো ল্যাণ্ডস্কেপের মধ্যে এসেছে জ্যামিতিক আকারে আঁকা বাড়ী ঘর ; ফলে ছবি দেখে মনে হয় যেন ঘাস ফুলফল লতাপাতা গাছ চতুর্দিকে ছেয়ে ফেলেছে, আর তার মধ্যে চারিদিকে প্রাণীদের অস্থির গতি কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। উপরন্তু আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে যা বাশোলি চিত্রে একেবারেই দেখা যায় না। গুলেরের ছবিতে পাহাড়ের গায়ে শ্যামলিমার মধ্যে সাইপ্রেস আর কলাগাছ থাকবেই। লাল, সাদা আর গম্ভীর নীল প্রায়ই পাশাপাশি দেখা যায়, তাছাড়া ভিতরে লম্বা সোজা সোজা রেখা দিয়ে ছবিগুলি অনেক সময়ে খোপে খোপে ভাগ করা হয়। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি বেশী দেখা যায় লঙ্কা অবরোধ চিত্রগুলিতে।

পোর্ট্রেট চিত্রেও গুলের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য আছে। আর্চার রাজা গোবর্ধন সিংহের দুটি পোর্ট্রেটের উল্লেখ করেন এবং দুটিতেই রাজা গোবর্ধন পারিষদবর্গ বা নর্তকী গায়িকাদের মাঝখানে বসে, গৌণ চরিত্রগুলির প্রত্যেকেরই মুখ ভিন্ন, স্পষ্টই বোঝা যায় প্রত্যেকটি ভাল করে দেখে আঁকা, অর্থাৎ যথাযথ চরিত্র চিত্রণ।

১৭২০ থেকে ১৭৫৫ সনের মধ্যে নানা বিষয়ে আঁকা গুলের চিত্র অনেকগুলি আছে; যেমন দুর্গা, চণ্ডী, কৃষ্ণ, মহাভারতের নানা উপাখ্যান, ভাগবত পুরাণ, শিবপার্বতীর দৃশ্য। নানা বিষয়বৈচিত্র্যময় বহু চিত্রের মধ্যে দিয়ে আঠারো শতকের তৃতীয়ভাগে গুলেরের বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রঙের প্রতীকমূলক ব্যবহার। নায়িকার শাড়ীর লাল, সবুজ হাতপাখার টকটকে লাল মধ্যস্থল, মাঠের লাল ফুল, এ সবই প্রেমের অভিব্যক্তি ও বিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত।

এটা বোঝা যায় যে ১৭৪০ নাগাদ গুলের চিত্ররীতি যথেষ্ট মার্জিত ও কাব্যময় হয়। ১৭৫৫ সনের মধ্যে গুলের চিত্রে এক অপূর্ব সৌকুমার্য আসে, ফলে আগেকার খোঁচা খোঁচা অপরিণত রেখা চলে গিয়ে আসে পেলব পূর্ণ রেখা, শান্ত নিটোল মুখ, সহজ লীলায়িত ছন্দ। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রাকৃতরূপ সম্বন্ধে আসে একান্ত মমত্ববোধ, যেন দেহের রূপ নিজের মহিমায় একান্ত আদরের বস্তু।

বিশেষ করে যেখানে নারীচিত্র এসেছে সেখানেই তাদের দেহের তরঙ্গগতিতে, 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণিতে', যেন শিল্পী বিশেষ আনন্দ পান। তা বলে নারীদেহের সৌন্দর্যবোধ কখনও শিল্পীর তুলিকে কামপ্রবণ, স্থূলবৃত্তি করে দেয়নি। সর্বদাই ছবির এক সর্বময় সাধারণ ছন্দের কাছে নারীদেহের সাব-

লীল রেখা হয়েছে গৌণ। ফলে ১৭৫৫ সনের পরের গুলের ছবিতে যে রোমান্টিক স্বাভাবিকত্ব আসে, যার ফলে দেহের সৌন্দর্য ছন্দের মহিমায় আরও বেশী মণ্ডিত হয়, দেহের সাবলীল ভাবভঙ্গীর মধ্যে আসে সন্থ প্রস্ফুট, নিশ্চিন্ত, স্বচ্ছন্দভাব, সে সব গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে সংসার চাঁদের সময়ে কাংড়া চিত্রে পরিণতরূপে দেখা দেয়। গুলের চিত্র দেখলেই কাংড়া চিত্রের ভবিতব্যতা বেশ বোঝা যায়। স্পষ্ট দেখা যায় গুলের চিত্রে যা অপরিণত, অস্ফুট কাংড়া চিত্রে তা পারিণত, উচ্চারিত, উজ্জ্বল।

একটি গুলের চিত্র আছে তার বিষয় একটি নারী ছাতে খাটের উপর বসে, হাতে বাজ পাখী। পিছনে পরিচারিকা। মধুর রোমান্টিক প্রেমের এমন অপূর্ব ছবি দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ছুটি নারীরই চোখের চাউনি নম্রভাবে নীচের দিকে করা। রঙের ব্যবহার নিতান্তই কাব্য ও আবেগের তাগিদ মেনে নিয়েছে। যেমন কালো সাইপ্রেস ছুটি সরু বর্শার আকারে আঁকা, পিছনের জমি সিঁছুরে লালে লেপা। সাইপ্রেস ছুটি যেন ছবির বিষয়টিকে তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে। একটি নায়ী প্রবাসী বঁধুর চিন্তায় বিভোর, বর্শার মত সাইপ্রেস ছুটি যেন তারই তীক্ষ্ণ, তীব্র কামনার প্রতীক। পিছনের লাল জমিও যেন সমস্ত আবেগ ও বাসনাকে মূর্ত করেছে। সমুখের পাপড়ি খোলা ফুলগুলি যেন মেয়েটির পূর্ণ যৌবনকে সমৃদ্ধ করেছে। ওদিকে শক্ত করে ধরে রাখা বাজপাখিটি প্রত্যাগত প্রেমিকেরই প্রতীক। এসব রোমান্টিক প্রতীকগুলিকেও পিছনে ফেলে ছাপিয়ে গেছে ছবিটির মেজাজ, কারণ গুলেরের যত-কিছু কৌশল সবই নিযুক্ত হয়েছে মেয়েটির অপূর্ব, কোমল, সুকুমার, পেলব তনুদেহের রেখায়। এর থেকে কাংড়ার বিখ্যাত "ঝড় উঠেছে" (যাতে একটি মেয়ে নত দেহে, ঝড় থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ছাত থেকে বেগে সিঁড়ির ঘরের দিকে যাচ্ছে) ছবিটি, অথবা প্রাসাদের রাজমহিলা ছবিটি মোটেই দূর নয়। কারণ সব ছবিতেই দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ঘটনার আড়ালে আছে রোমান্টিক, আত্মবিস্মৃত প্রেম নিয়ে একান্ত বিভোর তন্ময় ভাব। এর পরে কাংড়ার বিখ্যাত ভাগবত পুরাণ চিত্রমালা আসা নিতান্ত স্বাভাবিক।

গুলেরের রাজা গোবর্ধন সিংহ ছিলেন চিত্রকলার বড় সমঝদার। ১৭৭৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে প্রকাশ সিংহ অতটা উৎসাহী ছিলেন না। ঠিক সে সময়ে কাংড়ার রাজা হলেন সংসার চাঁদ। ১৭৮৬ সনে কাংড়া গড় যখন তাঁর হাতে এল তখন তিনি নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য দরাজ হাতে সব শিল্পীকে আহ্বান করলেন। পাঞ্জাবের ঐতিহাসিক গোলাম মহিউদ্দিন লিখেছেন সংসার চাঁদের "দরবারে জ্ঞানী, গুণী শিল্পীরা সকলে ভীড় করে এল……"। সুতরাং গুলেরের শিল্পীরাও নিয়ে এলেন তাঁদের অপূর্ব কোমল রেখা। তাছাড়া ঐতিহ্য অনুসারে গুলেরের কাছে ধার করতে কাংড়ার লজ্জা হল না। বরং গুলেরের শিল্পীরা সংসার চাঁদের দরবারে বিশেষ সম্মান পেলেন। এইভাবে পাহাড়ী রাজ্যগুলিতে গুলের রীতি ছড়িয়ে পড়ে অনেক বিখ্যাত ও সেরা সেরা ছবির জন্ম দিল।

এইভাবে কাংড়ার রাজা সংসার চাঁদের সময়ে একটি পাহাড়ী রীতি রূপ নেয়, যার সর্বত্র

সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একান্ত পেলব, সুকুমার, মধুর কাব্যভাব, যার রোমান্টিক প্রেমের পরিবেশের শুচিতা ও শুভ্রতা অন্যত্র দুর্লভ। চিত্র বিষয় সাধারণত একদিকে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত বা নায়িকা চিত্রমালা ; অন্যদিকে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট। কাংড়াকে কেন্দ্র করে নূরপুর, চাম্বা, মাণ্ডি সর্বত্র চিত্রকলা এক স্বর্ণযুগে উপস্থিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে সমতল ভূমির বড় বড় সহর থেকে বহুদূরে এইসব পাহাড় ও উপত্যকায় বড় বড় শিল্পী ছোট ছোট রাজদরবারে কাজ করে জীবনপাত করেন। আর সে সব কাজ সমাদৃত হয় তাঁরা মারা যাবার বহু পরে, রেল ও রাস্তা খোলার পর। সুতরাং তাঁদের কাজের রেখার সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, রঙের জৌলুষ, অলঙ্কারের বিশদ পারিপাট্য মনকে খুব বিস্মিত করে।

কুমারস্বামী কাংড়া চিত্রকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম যুগের ছবিতে গাছপালার নক্সা ইম্প্রেশনিস্টভাবে আঁকা, কালো গাছ থেকে সাদা ফুলওয়ালা লতা নেমে আসে। ছবিতে মানুষের চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত, আবেগময় ; রেখা স্বল্প, চোখের উপরের পাতা সোজা ; রঙের কাজ অদ্ভুত কোমল, যেন কোন আবরণ দেওয়া ; তীব্র উজ্জ্বল রঙের চেয়ে ছাই, মভ, ব্রাউন আর পুরনো পাতার রঙই (সেজ গ্রীন) বেশী। তার পরের যুগের কাংড়া ছবিতেও অসামান্য সৌন্দর্য দেখা যায়। এদেরও রঙ যেন ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, অথচ নরম, আগের চেয়ে অনেক জমকালো, কিন্তু পরের যুগের মত মিনে-করা বোধ হয় না। মানুষের চলা ফেরা আরো ধীর, সংযত, আত্মস্থ, লাবণ্যময়, ছন্দশীল। তৃতীয় যুগ আসে সংসার চাঁদের সময়ে। এ সময়ে কাংড়া চিত্র হয় যেমন চিত্র-ধর্মী তেমনি গীতিকাব্যধর্মী। ছবিতে নরনারীর জীবজন্তুর চলাফেরা হয় আরও প্রাণবন্ত, রেখা হয় দৃঢ় দীপ্ত, প্রগল্‌ভ। নারীদেহ সম্বন্ধে আসে বিনম্র বোধ, তাদের শরীর হয় বেতসের মত, তন্বী, চোখ অত্যন্ত টানাটানা আর বাঁকানো ; মেহেন্দি রঙ করা আঙুল 'চাঁপার কলি'র মত পেলব। রঙ আশ্চর্য জ্বলজ্বল করে, যেন তলার থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে ; যেমন গভীর তেমনি দীপ্ত। তুলির কাজ যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সাবলীল। ছবির গাছ বড় মজার। যাঁরা কাংড়া অঞ্চলে গেছেন তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন কাংড়া চিত্রে অমন আলোকময় গাছ কোথা থেকে এল। পাঠানকোট ছাড়িয়ে নূরপুর থেকে কাংড়া, মাণ্ডি পর্যান্ত কেলু বলে এক রকম গাছ পাওয়া যায়, খানিকটা আমাদের ঝাউ আর বিলেতী ফারের মাঝামাঝি। সরু সরু লম্বা লম্বা কাঁটার মত পাতার রঙ জলজ্বলে সবুজ, আর যে সব গাঁট থেকে ঐ পাতার থোকাগুলি বেরিয়েছে সেগুলি গাঢ় সবুজ। সুতরাং দূর থেকে খানিকটা ফুলঝুরি গাছের মত দেখায় ; বিশেষ করে হাল্কা পাহাড়ে হাওয়ায়। এই ধরনের হাল্কা পাহাড়ী হাওয়া আর কেলু, কলা ইত্যাদি গাছ বোধ হয় কাংড়া চিত্রের মধ্যে এক অসামান্য স্থানীয় মনোরমত্ব আনতে সাহায্য করেছে। ঠিক যেমন করেছে হিমালয় পর্বতের হিমতুষার মেঘ আর হাল্কা হাওয়া তিব্বতী টাংকা চিত্রকে। তিব্বতী টাংকা চিত্রে একটি বিশেষ গুণ আছে তা আর কোন দেশের চিত্রে নেই। সে হচ্ছে

নীলের নানা পর্দার সাহায্যে অসীম ব্যাপ্তচরাচরের আভাস আনা, এবং বোধিসত্ত্বদের মহাশূন্যে নিরালম্ব-ভাবে ভাসিয়ে রাখার অপূর্ব কৌশল। এই ধরনের হাল্কা হাওয়ার স্বচ্ছ গুণ বেশ কিছুটা আছে কাংড়া চিত্রে। একদিকে বাড়ীঘরের স্থাপত্য যেমন অলঙ্কারবহুল এবং কিছুটা জ্যাবড়া, অন্যদিকে মেঘ আর সূর্যাস্তের ছবি তেমনি চিত্রময়। প্রায়ই মহাকাশে দেবদেবীরা রথে করে উড়ে যান। এও কাংড়া চিত্রে, বোধ হয় দেশের পাহাড়ে মাটির গুণে, স্থূল দেহকে তিব্বতী টাংকার মত মহাশূন্যে বিলম্বিত করার চেষ্টা। অনেক সময় ছবির পাড়ে এসেছে বিচিত্র অলঙ্কার, কখনও হাল্কা গোলাপী জমির উপর গাঢ় গোলাপী রঙে আড়ে রেখা কাটা, কখনও ফুলের গুচ্ছ, কখনও চকোর। কখনও কখনও ছবিগুলি ডিমের আকারে আঁকা, বাঁকগুলি অ্যারাবেস্‌ক্ করা। গীতিকাব্যের সুর সর্বত্র অনবদ্য, নক্সার কাজ নিখুঁত, গ্রুপগুলির কম্পোজিশন অতুলনীয়। তবে ভারতীয় ছবির সাধারণত যা খুঁত বা ত্রুটি তা এসব ছবিতে আছে। সে হচ্ছে, ছবিগুলি নিছক সুন্দর, সর্বদা বড় বেশী মধুর; নারীদেহ, এমনকি পুরুষদেহ, বড় বেশী সুন্দরপানা করে আঁকা। যদিও ভাবালুতা দোষ খুব নেই, তবুও বড় বেশী পেলব, সুকুমার। তবুও শৌর্যবীর্যের অভাব নেই, যথা দেবী চিত্রে অথবা কালিয় দমন চিত্রে। কাংড়ার বিশেষত্ব হচ্ছে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্র। শিল্পীদের নাম জানার বিশেষ উপায় নেই। দু'জনের নাম অবশ্য আমরা পাই, একজন ফত্তু, অন্যজনের নাম কিষণলাল। কিষণলাল আর কুশল বোধ হয় একই লোক। কুশল ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী নয়নসুখের ভ্রাতুষ্পুত্র। এঁদের নাম সই করা কোন চিত্র অবশ্য নেই। তবে অনুমান করা যায় যে এঁরা মুঘল রীতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; ওস্তাদ চিত্রকর হিসাবে বিশেষ নামডাক ছিল এবং এঁদের কাছে আরও অনেক শিল্পী কাজ করতেন। দুজনের মধ্যে একজন কাংড়ার বিখ্যাত ভাগবত পুরাণের চিত্রাবলী নিশ্চয় আঁকেন। এই ছবিগুলিতে মুঘল চরিত্র চিত্রণের প্রমাণ বেশ পাওয়া যায়। ফিগরে মড্‌লিং আছে। প্রেমিক প্রেমিকার মনের ভাবের ব্যঞ্জনার প্রতীক হিসাবে পাখী, নদী, লতা, পাতা, ফুলফোটা গাছ আঁকা। চিত্রের বিষয় যদিও মিলন তবুও চিত্রের মধ্যে কোন ভাবালুতা বা ন্যাকামি নেই। আরেক জন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তাঁর নাম সজ্‌নু। ইনি কাংড়ায় ছিলেন, কিন্তু গুর্খাদের আক্রমণের পর বোধ হয় মাণ্ডি চলে যান।

সংসার চাঁদের সময়েই কাংড়া দেশ ১৮০৫ থেকে ১৮০৯ সন পর্যন্ত গুর্খারা উপর্যুপরি আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে। ১৮২৩ সনে তাঁর মৃত্যুর পর অনিরোধ চাঁদের (১৮২৩-২৯) রাজত্ব কালে শিল্পীরা আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে আশপাশের নানা দরবারে চলে যান। কাংড়া শিল্পীরা লাহোর অমৃতসরে গিয়ে শিখ বিষয়ে ছবি আঁকেন, তাছাড়া ছোট ছোট পাহাড়ী রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে উনিশ শতকে পাহাড়ী রীতির পূর্ণ বিকাশ ও অবক্ষয় আনেন। ১৯২৯ সন পর্যন্ত পুরনো আমলের চিত্রশিল্পীরা কাংড়ায় জীবিত ছিলেন, সুতরাং এটা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে গোটা উনিশ শতক ধরে কাংড়া রীতি পাঞ্জাব

পাহাড়ে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করে, এবং সুদূর লাহোর, অমৃতসর, জম্মু, পুঞ্চ পর্যন্ত কাংড়া-রীতি শিল্পীদের তুলিকে নাড়া দেয়। এই বিষয়ের অল্প উল্লেখ উনিশ শতকের অধ্যায়ে করব।

আঠারো শতকে আরও তিনটি পাহাড়ী রাজ্যে তথাকথিত রাজপুত চিত্রনীতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, সে তিনটি রাজ্য হচ্ছে জম্মু, পুঞ্চ, গাড়োয়াল। তাছাড়া ছোট ছোট রাজ্যেরও খোঁজ মেলে, যেমন নুরপুর, জস্রোতা, চাম্বা, মাণ্ডি, কুলু ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শুধু জম্মু, পুঞ্চ আর তেহরি গাড়োয়ালেরই সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব ; অন্য রাজ্যগুলির উল্লেখ উনিশ শতকের অধ্যায়ে করা যাবে। তার আগে আঠারো শতকে চাম্বার চিত্রকলা সম্বন্ধে একছত্র লেখা দরকার।

ঠিক যে সময়ে রাজা সংসার চাঁদ সিংহাসন আরোহণ করেন, তার কিছু আগে চাম্বায় রাজা রাজসিংহ (১৭৬৪-৯৪) নয় বছর বয়সে ১৭৬৪ সনে রাজা হন। কিন্তু ১৭৭৫ সনের মধ্যে তিনি বাশোলি জয় করে জম্মু সেনাকে পরাজিত করেন। ১৭৮৬ সনে কস্তোয়ার রাজ্য আক্রমণ করেন। এর ফলে অনেক চিত্রশিল্পী রাজানুগ্রহের আশায় চাম্বা দরবারে হাজির হন ও কাজ পান। চাম্বায় সব চেয়ে বেশী উৎকর্ষ লাভ করে পোর্ট্রেট। রাজা, রাণী আর যুবরাজকে একসঙ্গে নিয়ে ছবি অনেক আছে ; এ ধরনের রাজপরিবারের ঘরোয়া ছবি অন্যত্র পাওয়া যায় না। এগুলি সবই মিনিয়েচর, খানিকটা মুঘল মিনিয়েচরের মত, কিন্তু পরিবেশে ও মেজাজে তফাৎ। তার কারণ, চাম্বা রাজ্য হচ্ছে প্রায় বরফে ঢাকা পাহাড়ের কোলে।

১৯১৬ সালে কুমারস্বামীর 'রাজপুত চিত্রকলা' প্রকাশের পর পাহাড়ী চিত্র নিয়ে অনেক
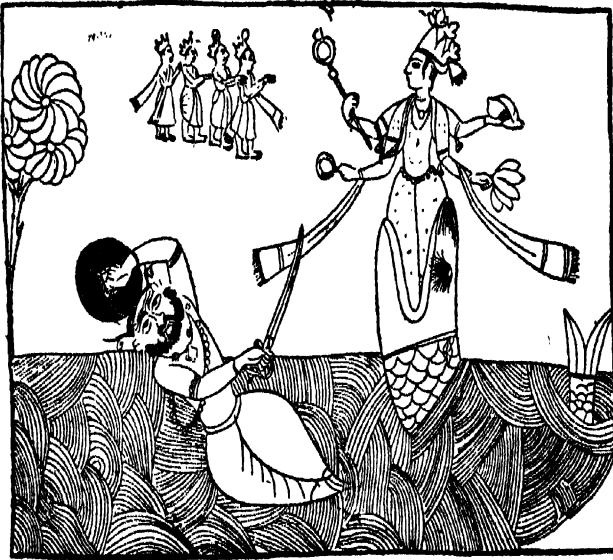
অনুসন্ধান হয়েছে, তার কিছু কিছু বিবরণ ইতিমধ্যে দিয়েছি। ফলে তাঁর সময়ে 'কাংড়া'র নামে যে সব ছবি চলত, পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সমঝদাররা তার অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ করে নানা পাহাড়ী-

রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। এইভাবে জম্মুরাজ্যের নামে যে সব চিত্র চলিত ছিল তারও অনেক বাঁটাবাঁটি হয়েছে। বিশেষ করে, কুমারস্বামীর সময়ে অনেক ছবি যা জম্মু বলে চলত এখন প্রমাণ হয়ে গেছে তার অধিকাংশই বাশোলি বা অন্যান্য ছোটখাটো রাজ্যের। সুতরাং চিত্র-জগতে জম্মুর রাজ্য ছোট হয়ে গেছে। এমন কি ডব্লিউ-জি আর্চারের মতে নিশ্চিন্তভাবে জম্মু বলে খুব কম ছবিই এখন প্রমাণ করা যায়। মধ্যযুগে জম্মুর পতন হয়। ১৬০০ সনের মধ্যে জম্মু উত্তর ভারতের পাহাড়ী রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজ্য হয়। আঠারো শতকে জম্মুর রাজা ধ্রুবদেব (১৭০৩-৩৫) রাজ্যবিস্তারে মন দেন; ফলে তাঁর পরের রাজা রঞ্জিৎদেব (১৭৩১-৮১) ১৭৫০ সনের মধ্যে চিনাব ও রবি নদীর মধ্য স্থলের সমস্ত দেশ জয় করেন। জম্মুর প্রতাপ এসময়ে কস্তোয়ার, ভদ্রাওয়া, মানকোট, বাঁধ্রালূতা, বাশোলি, জস্রোতা পর্যন্ত পৌঁছয়। ১৭৪৮ সনে জম্মুর সঙ্গে আফগানদের সন্ধি হয়, তাতে প্রমাণ হয় আফগানরা জম্মুকে কত খাতির করত। জম্মু নগর দ্রুত সমৃদ্ধিলাভ করে, এবং দিল্লী অঞ্চল থেকে অনেক ধনী ব্যবসায়ী সে সময়ে অরাজকতার ভয়ে জম্মুতে পালিয়ে আসে। আঠারো শতকের শেষদিকে অবশ্য শিখরা প্রবল হয়, এমন কি রঞ্জিতদেব শিখদের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হন। তবুও, রাজ্য হিসাবে প্রতাপশালী হলেই যে সে রাজ্যে সঙ্গে সঙ্গে ললিতকলারও চরম উৎকর্ষ হবে এবং একটি বিশেষ চিত্ররীতির উদ্ভব হবে এমন কথা মনে করা ভুল।

আর্চারের মতে জম্মুচিত্রের একটি লক্ষণ হচ্ছে যে জম্মুতে আঁকা অধিকাংশ চিত্রেই প্রাসাদের দৃশ্য থাকবে এবং ছবিগুলিতে একই লোকের প্রতিকৃতি ঘুরে ফিরে নানা কাজে লিপ্ত দেখা যাবে। যেমন একসার ছবি আছে, তার মধ্যে কোনটিতে রাজা বলবন্তদেব প্রাসাদে বসে তামাক খাচ্ছেন, পিছনে সভাসদরা দাঁড়িয়ে, সমুখে একটি ঘোড়া এনে দাঁড় করান হয়েছে; কোনটিতে বলবন্তদেব প্রার্থনাতে বসেছেন; অন্য একটি ছবিতে একজন চিত্রশিল্পী তাঁকে একটি ছবি দিচ্ছেন (এই ছবিটির পিছনে 'রাজা বলবন্তদেব' লেখা আছে)। চতুর্থ একটি ছবি আছে সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিতে দুটি ভিন্ন কাগজে দুটি ভিন্ন ছবি একসঙ্গে আঠা দিয়ে জোড়া। ছবিটির বাঁদিকে চাঁদোয়া দেওয়া সিংহাসনে বলবন্তদেব বসে, ডানদিকের কাগজে কয়েকটি লোক ও ছেলে নাচের বিভিন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। এই চারটি ছবিই একেবারে এক ছাঁদে আঁকা; সন্দেহ থাকেনা যে সবকটিই একই দরবারী শিল্পীর হাতের কাজ। বলবন্তদেব ছিলেন রাজা ধ্রুবদেবের (১৭০৩-৩৫) চতুর্থ ছেলে। ফলে এটুকু প্রমাণ হয় যে আঠারো শতকেও জম্মুতে অন্তত একটি রীতিভঙ্গীর অস্তিত্ব ছিল। এর সঙ্গে আর একটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিও বলবন্তদেবের পোর্ট্রেট, কিন্তু পিছনে তক্‌রি হরফে একটি লিপি আছে। তাতে জানা যায় যে সেটি জস্রোতার বিখ্যাত শিল্পী নয়নসুখ মাত্র তিনদিনে আঁকেন, পোর্ট্রেটটি 'মহারাজা শ্রীবলবন্ত সিংহে'র। জনৈক ওমরার আদেশে ১৭৪৮ সনে

আঁকা। নয়নসুখের আঁকা বলে আরও দুটি ছবি চেনা যায়, তার একটি কতকগুলি শিঙাবাদকের গ্রুপ, অন্যটিতে একটি পাহাড়ী রাজা শীকারে চলেছেন, সঙ্গে সভাসদবর্গ, সমুখে চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে একটি মহিলা আর দুটি অশ্বারোহী। এর পরে 'মহারাজা শ্রীবৃজরাজদেবে'র একটি প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। তার পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ছবি তার বিষয় হচ্ছে 'মশালের আলোয় রাজা ঘোড়া দেখছেন।' এটিও আসলে দুটি কাগজে দুটি আলাদা ছবি, একসঙ্গে পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন নিপুণ-ভাবে জোড়া হয়েছে, যে তারিফ না করে পারা যায় না। একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় দুটি অংশ আলাদা আলাদা ভাবে আঁকা। কারণ ছবির দুভাগে আকাশের নীল দুরকম; একভাগে রাজার শরীর খুব ফলাও করে, বড় করে আঁকা, অথচ অন্যভাগে সহিস আর অন্য চাকরদের ছবি ছোট। বাঁদিকের অর্ধেকটি একটু জখম হয়েছে, ডানদিকটা খুব ভাল আছে। দুটির রীতিরও তফাৎ। বাঁদিকের ছবিতে সাদা আর খুব কোমল আশমানী নীলের প্রাধান্য; ডানদিকের ছবিটি যে নয়নসুখের আঁকা, তাতে কোন ভুল নেই। ছবি দুটি জোড়ার পর ছাদের আল্‌সেটি খুব কৌশলে ডান দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডানদিকের ছবিতে চাকরদের শরীরের আধাভাগও তেমনি কৌশলে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। ১৭৩০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে এইভাবে বহু পোর্ট্রেট জম্মুতে আঁকা হয়। এর সবগুলিতেই মড্‌লিং, আলোছায়া সম্বন্ধে বোধ আছে। বিষয়বস্তুর মধ্যেও মিল আছে। যেমন অধিকাংশ ছবিই রাজা বা সম্ভ্রান্ত পারিষদ-দের। তাঁরা কখনও একলা, কখনও সভাসদপরিবৃত। কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে কি করে ছবিতে সম্ভ্রান্ত, গমগমে ভাব আনা যায়। আঠারো শতকের মাঝামাঝির পর অবশ্য নানা কাব্যময় বা রোমান্টিক বিষয় আসে। বাশোলির থেকে এ রীতি ভিন্ন। বাশোলির ছবিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক মাপের বিকৃতি দেখা যায়, চোখ হয় অস্বাভাবিক বড়, ছবিতে প্রায়ই আসে উদ্ধত হিংস্র তেজ। তাদের রঙ গরম, উত্তপ্ত; পোষাকে আসে জমকালো হল্‌দে, পশ্চাদ্‌পটে কড়া ব্রাউন। অন্যপক্ষে জম্মুচিত্রের লক্ষণ হচ্ছে কোমল, সুচারু বৈদগ্ধ্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ স্বাভাবিক, সুকুমার ফ্যাকাশে রঙে উষ্ণতা নেই বললেই হয়। যতই দিন যেতে লাগল জম্মুর ছবিতে ততই এসব লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। উত্তপ্ত রঙ আস্তে আস্তে চলে গিয়ে ফ্যাকাশে রঙ সম্বন্ধে আগ্রহ যেন বাড়ল। লোকজনের শরীরে বৃত্তাকার সুডৌল রেখা ও আয়তক্ষেত্র বা রেক্‌টাঙ্গল চলে গিয়ে তাদের আকৃতিতে মূর্তিসুলভ গুণ লুপ্ত হল, ছবি ক্রমশ ফ্ল্যাট হতে লাগল। রোমাণ্টিক বিষয়ের ছবিতে নীরক্ত ফ্যাকাশে রঙ বিষাদ ও হতাশার ভাবভঙ্গী আরও ফুটিয়ে তুল্‌ল। এই রীতির মধ্যে জস্রোতার শিল্পী নয়নসুখের ছবি কিন্তু ভিন্ন সুর আনে। নয়নসুখের রেখার তরল ছন্দ ও জ্যামিতিক ছক দেশজ রীতির পরিপন্থী হয়। তাঁর রঙ কড়া, রেখা স্পন্দিত, প্রাণবন্ত; ছবিতে স্থাপত্যের গড়ন। তাঁর ছবিতে স্তরের পর স্তর পিছিয়ে মিলিয়ে গেছে, স্থানীয় চ্যাপ্‌টা বা ফ্ল্যাট রীতির সঙ্গে বিশেষ মিল নেই। কিন্তু জম্মুতে নয়নসুখের শিষ্য বেশী হলনা, এবং কিছুদিন পরে নয়নসুখও বোধ হয় জম্মু ছেড়ে যান। কারণ ১৭৬৮ সনের পর জম্মুতে নয়নসুখের

কাজ কিছু পাওয়া যায় না। ঠিক এরই পর, অর্থাৎ ১৭৫০ সন থেকে, গুলেরে চিত্রশিল্প হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বোধহয় নয়নসুখ সে সময়ে গুলেরে যান।

জম্মুচিত্রকলার শেষ অধ্যায় আমরা পাই শিখ দরবারে, কারণ ১৭৮৭ সন থেকে ১৮১২ সন পর্যন্ত জম্মুরাজ্য শিখদের অধীনে যায়। এর মধ্যে অবশ্য কাংড়ায় রাজা সংসারচাঁদ গৌরবের শীর্ষে ওঠেন এবং নিশ্চয়ই জম্মু ও শিখ দরবার থেকে অনেক শিল্পীকে নিজের দরবারে নিয়ে আসেন। ফলে একদিকে 'কাংড়া' রীতি জম্মুরীতিকে হজম করে, অন্যদিকে শিখদরবারে অনেক জম্মুশিল্পী যান। ফলে অমৃতসরে ও জলন্ধরে এক 'শিখ' চিত্ররীতি দেখা যায়। এই রীতির সমৃদ্ধি আসে উনিশ শতকে। শিখরীতিতে গুরুগম্ভীর শিখ পোর্ট্রেটের উৎকর্ষ দেখা যায়। অন্যদিকে শিখগুরুদের কিছু কিছু নিকৃষ্ট কাঁচাহাতের পোর্ট্রেটও হয়। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের দেয়ালে কিছু কিছু শিখরীতিতে আঁকা প্রাচীর চিত্র আছে। শিখরীতি কাশ্মীরেও যায়, বিশেষত পুঞ্চে। মহারাজা রঞ্জিৎসিংহের সময়ে (১৮০৩-৩৯) লাহোর ও অমৃতসরের শিখ দরবারে কাংড়া ও জম্মুর অনেক শিল্পী জমায়েত হন। তাঁরা বহু শিখ সভাসদ, সম্ভ্রান্ত অমাত্যদের পোর্ট্রেট আঁকেন। এখনও বহু শিখ পরিবারে পূর্বপুরুষদের ছবি পাওয়া যায়।

আঠারো শতকে গাঢ়োয়াল রাজ্যেও এক বিশিষ্ট চিত্রনীতি গড়ে ওঠে। গাঢ়োয়াল রাজ্য পাঞ্জাব পার্বত্যদেশের দক্ষিণ পূবে। রাজধানীর নাম শ্রীনগর। এখন তেহরি-গাঢ়োয়াল উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ব্যবসাবাণিজ্যের সড়ক থেকে দূরে, অগম্য স্থানে থাকার দরুণ, গাঢ়োয়ালের মধ্যযুগীয় স্বাধীনতা বহুদিন পর্যন্ত ছিল। তরাই থেকে শ্রীনগর যেতে কমপক্ষে সাত দিন লাগত। পাশে কুমায়ুন রাজ্য। ১৬৫৮ সালে এক মুঘল রাজপুত্র পালিয়ে গাঢ়োয়ালে আশ্রয় নেন; সঙ্গে একজন চিত্রকর আর তাঁর ছেলেকে নিয়ে যান। এঁরা দুজনেই ছিলেন একাধারে স্যাকরা, সভাষদ ও চিত্রশিল্পী। গাঢ়োয়াল দরবারে তাঁরা অনেকদিন ভাতা পেয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের কাজ খুব ভাল ছিল বলা যায় না। ১৭৭১ সালে মোলারাম বলে এক শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মোলারাম জন্মান ১৭৫০ সালে, মারা যান ১৮৩৩ সালে। শ্রীযুক্ত মুকন্দীলাল মোলারামকে খুব বড় শিল্পী বলে মনে করেন; মোলারামের উল্লেখ কুমারস্বামী ও ব্যাজল্ গ্রে করেন। কিন্তু আর্চারের মতে মোলারাম ছিলেন অতি সাধারণ দরবারী শিল্পী, এবং মোলারামের নামে যে সব গাঢ়োয়ালী চিত্র চলে তার কোনটাই তাঁর আঁকা নয়। যে সব চিত্রের জন্য গাঢ়োয়ালী রীতি প্রসিদ্ধ, আর্চারের মতে সে সব চিত্র নিশ্চয় গুলের থেকে চিত্রশিল্পী আমদানির ফল। প্রমাণ-স্বরূপ, আর্চার বলেন, যে গাঢ়োয়ালে রাজা ললৎরায় (১৭৭২-৮০) রাজা হবার কিছু পরেই, নিজের ছেলে রাজা প্রধুমন বা প্রদ্যুম্ন শাহের (১৭৮১-১৮০৪) গুলের রাজপরিবারের রাজপুত্র আজব সিংহের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহে গাঢ়োয়াল থেকে অনেকে বরযাত্রী হিসাবে গুলেরে যান, এবং কন্যাযাত্রী হিসাবে অনেকে গুলের থেকে গাঢ়োয়ালে আসেন। রাজপরিবারের কন্যা নিজে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক না হলেও এটা ভাবতে ক্ষতি নেই যে তাঁর সঙ্গে হয়ত কিছু

চিত্রশিল্পী গাঢ়োয়ালে আসে। রাজকন্যার পক্ষে চিত্রশিল্পী প্রতিপালন একেবারে বিচিত্র কিছু নয়, কারণ মনে রাখা উচিত যে বাশোলির রাণী মানাকুর আদেশে বিখ্যাত গীতগোবিন্দ পুঁথির চিত্রাবলী আঁকা হয়। তাছাড়া ছবি দেখার রেওয়াজ রাজঅন্তঃপুরে কম ছিল না। মহিষীরা, রাজকন্যারা পুঁটুলি খুলে খুলে ছবি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন। সুতরাং যে গুলেরে এই বিবাহের সময়ে চিত্রকলার এত উৎকর্ষ ছিল, সেখান থেকে কন্যাযাত্রী হিসাবে কয়েকজন চিত্রশিল্পী যে গাঢ়োয়ালে গিয়ে রয়ে যান এবং বাকী অন্যেরা ফিরে আসে, এটা বেশ কল্পনা করা যায়। হয়ত তার আগে গৌণদরের দু এক জন শিল্পী গুলের থেকে গাঢ়োয়ালে পূর্বেই হাজির হন। ফলে আগন্তুকরা থাকতে ভরসা পান। এর ঠিক পরে, গাঢ়োয়ালে চিত্রকলা হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে এবং মোলারামের ঈর্ষার কারণ হয়। মোলারামের বিষয়ে আর্চার বেশ মজার কথা লিখেছেন। তাঁর মতে মোলারাম ছিলেন একজন নিকৃষ্ট শিল্পী, কিন্তু তিনি ছবি সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। তাঁর সংগ্রহ ১৯০০ সাল পর্যন্ত এক জায়গায় ছিল। মোলা-রামের ছিল অমর হবার বাসনা। ছবি যতই কর্কশ আর কাঁচাহাতের হোক না কেন তিনি প্রতিটি ছবি নিজের হাতে লিখে রাখতেন, কবিতার পদও পিছনে লিখতেন। তাঁর সংগ্রহের কোনও ছবিই খুব উৎকৃষ্ট নয়। তবুও মোলারামের ছিল ভয়ানক অহঙ্কার, নিজেকে বিরাট বড় শিল্পী বলে ভাবতেন। বিশেষ কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা বলে তাঁর সময়টাও মন্দ কাটছিল না। কিন্তু হঠাৎ তাঁর পাকা ধানে মই পড়ল, বিদেশ থেকে কয়েকজন শিল্পী উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। ১৭৬৯ সাল থেকে ১৭৭৫ এর মধ্যে তিনি দুটি কবিতা লেখেন। প্রথমটিতে লেখেন: "দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, এখন বড় দুঃসময়। রাজকর্মচারীরা, সভাসদরা সবাই মিথ্যাবাদী, তাদের চোখ মিথ্যাবাদী। কেরাণীরা মিথ্যাবাদী, কাগজ মিথ্যাবাদী। কালি মিথ্যাবাদী। সবই মিথ্যাবাদী।" ছয় বছর পরে আবার লিখলেন: "হাজার, লাখে কি হয়? সোনাদানা, গ্রাম জায়গীর পেলে কি হয়? মোলারাম তারিফের জন্যে কাঙাল।" এতে বোঝা যায় যে প্রথমে যখন বিদেশী শিল্পী আসে তখন মোলারাম রেগে যান; পরে তাঁর আসে হতাশা আর ক্ষোভ। কিন্তু যে ছবিতে তিনি দ্বিতীয় কবিতাটি লেখেন সেটিও নিতান্তই খেলো ছবি। অর্থাৎ তখন গাঢ়োয়ালে ভাল ছবি আঁকা রীতিমত শুরু হয়ে গেছে।

১৭৭৫ সালের পর গাঢ়োয়ালে যেসব ছবি আঁকা হয় তাদের দুভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে ফেলতে হয় কুড়িটিরও কম ছবি। এগুলি নিশ্চয় কোন অতি মহৎ শিল্পীর আঁকা। তাঁর কাজ মাত্র এ কয়খানি ছবিতে নিশ্চয় শেষ হয়নি কিন্তু আর ছবি পাওয়া যায়না। তাঁর নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর কাজে তিনটি স্তর স্পষ্ট। প্রথম ছবিগুলিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিল্পী গাঢ়োয়ালে এসে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও পারিপার্শ্বিকে বিশেষ ধাক্কা খেয়েছেন। গুলেরের কোমল গীতিধর্মী সৌকুমার্য যদিও বর্তমান, তবুও কিছু কিছু নতুন লক্ষণ এসেছে। মুখের আদল একটু বদলাল, রঙ হল আরও জোরালো—কড়া নীল কড়া লালের সঙ্গে এল গাঢ় কালো আর সবুজ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে নতুন

দেশে এসে শিল্পীর মন ও হাত নাড়া খেয়ে নতুন উদ্যম পেয়েছে। 'সরোবরের ধারে দেখা' বলে একটি ছবি উল্লেখ করা দরকার। ছবিটির একদিকে বিরাট পাহাড়ের খালি গা, বহুদূরে দিগ্‌রেখায় ছোট্ট সহর, আকাশের রঙ গভীর নীল, ফিগরগুলি ছকে ফেলে আঁকা, সাপের মত বিদ্যুত এঁকে বেঁকে খেলছে, মুখে ওড়নার স্পষ্ট তীক্ষ্ণ রেখা। দ্বিতীয় স্তরের ছবিতে এসেছে নতুন লক্ষণ। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি এসেছে ভিন্ন ধরনের অনুভূতি। গুলেরের শিল্পী যে ভাবে নারীদেহ আঁকতেন, এ ছবিতে পত্রহীন গাছ ঠিক একই সংবেদনা দিয়ে তন্বু, তরল, তরঙ্গায়িত রেখায় আঁকা। গাছের পাতার নক্সায় পাই বিদগ্ধ নৈপুণ্য, গাছের কাণ্ড পুরোপুরি রীতিদুরস্ত ভাবে চিত্রিত। তার সঙ্গে নারীচিত্রে এসেছে আরও বেশী কোমলতা, তনুতা। নারীদেহের সুকুমার লাবণ্যের সঙ্গে যেন প্রকৃতির কোমলতা পাল্লা দিচ্ছে। সব মিলে এক অতি প্রেমময় ভাবাবেশের সৃষ্টি করে। তৃতীয় স্তরে আমরা গাড়োয়ালের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রেমের স্বভাবে রূপান্তরিত হতে দেখি। তখন শিল্পী ভাল করে দেশটা দেখেছেন, অলকানন্দা নদীও দেখেছেন। শ্রীনগর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বর্ষাকালে অলকানন্দার জল নদীর বুকে নর ও নারায়ণ বলে দুটি পাহাড়ের গায়ে ঘা খেয়ে কি রকম আবর্তের সৃষ্টি করে তাও দেখেছেন। এই আবর্তের খেলা তাঁর রেখায় আনে অপূর্ব সুর। তিনি মোহিত হয়ে শুদ্ধ রেখায় ছবি আঁকতে লেগে যান। ফলে পাহাড়ের গায়ের রেখা হয়ে যায় সরল, আর চিত্রবিষয়ে আসে এক ঘুরপাকখাওয়া ছন্দ। বিখ্যাত কালিয়াদমন চিত্রে জল উপ্‌ছে উপ্‌ছে ঘূর্ণির মত ঘুরপাক খায়, তার ছন্দে গাছ, ফুলও রণরণিয়ে বেঁকে যায় ; এমন কি—যেমন 'কৃষ্ণের পথ' ছবিটিতে,—পাহাড়ও ঘূর্ণির ছন্দে ডেকে ওঠে।

এই হল প্রথম ভাগের ছবি, যার মধ্যে তিনটি ধাপ নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় ভাগের ছবিগুলি গৌণ শিল্পীদের কাজ। এই ছবিগুলি কয়জন শিল্পীর সৃষ্টি জোর করে বলা যায় না ; বোধ হয় বিভিন্ন সময়ে অন্তত দশ বারো জন এঁকেছেন। এঁদের কাজ খুব উল্লেখযোগ্য যদিও নয় তবুও ছবিতে প্রকৃতির সঙ্গে নারীদেহের মিল আছে। যেমন পত্রহীন গাছের ডালের সঙ্গে আদল আসে স্ত্রীলোকের শরীরের, প্রাকৃতিক দৃশ্যে আসে বৃত্তাকার, ছোট ছোট গাছ, তারার মত ফুল শুদ্ধ লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা শীষ, জলের ঘূর্ণি। এগুলি সবই গাড়োয়াল চিত্রের সাধারণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রধুসন বা প্রদ্যুম্ন ভাল যোদ্ধা ছিলেন না। ফলে গুর্খারা ১৮০৩ সালে গাড়োয়াল আক্রমণ করে প্রদ্যুম্নকে হত্যা করে। তাঁর ছেলে সুদর্শন শাহ বৃটিশ এলাকায় পালিয়ে যান। গুর্খারা গাড়োয়ালের শিল্পকলা নষ্ট করে। অনেক শিল্পী মারা যান, অনেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান।

১৮১৬ সালে সুদর্শন শাহ (১৮১৬-৫৯) তেহরি গাড়োয়ালে রাজা হন। তার কিছু পরে কাংড়ার অনিরোধচাঁদের বোনের সঙ্গে সুদর্শন শাহের বিবাহ হয়। সুদর্শন চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এবং তাঁর দরবারে চৈতু শা বলে একজন বিখ্যাত শিল্পী আসেন। সেই সময়ে কাংড়ারও কয়েক জন শিল্পী গাড়োয়ালে আসেন। ফলে ১৮৩০ থেকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে তেহরি গাড়োয়ালে

কাংড়া রীতিতে অনেক ছবি আঁকা হয়। এসব ছবিতেও গীতিকাব্যের সৌকুমার্য ও স্বচ্ছ প্রেমকাহিনীর মাধুর্য আসে। তার সঙ্গে আসে তীব্র কাব্যময় এক জগতের আলোক, আচার ব্যবহার, ছন্দ ও উৎপ্রাস। কিন্তু গাড়োয়াল চিত্ররীতির আয়ু শীঘ্রই শেষ হয়। ১৮৭০ সালের পর খুব কমই ভাল চিত্র গাড়োয়ালে হয়।

অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধে দুয়েক কথা বলা দরকার। ১৮০৫-৯ সনের মধ্যে গুর্খারা কাংড়া রাজ্য আক্রমণ করে তছনছ করে, ফলে কাংড়ার অনেক শিল্পী লাহোর, অমৃতসরে পালিয়ে গিয়ে শিখ দরবারে আশ্রয় নেন। ১৮১০ সনে কাংড়ার বিখ্যাত শিল্পী, সজন্নু, হামীরহাথ কাব্যকে আশ্রয় করে একুশটি চিত্র এঁকে মাণ্ডির রাজা ঈশ্বরী সেনকে উপঢৌকন দেন। সজন্নু এগুলি নিশ্চয় কাংড়ায় বসে আঁকেন নি, হয়ত তিনি এগুলি মাণ্ডির রাজার আশ্রয়ে মাণ্ডিতে বসেই এঁকেছিলেন। এরকম বহু ছবি আছে যা কাংড়ার নামে চলে, অথচ কাংড়ার আঁকা নয়। ১৮২৩ সনে সংসারচাঁদের মৃত্যুর পর কাংড়া রীতি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। সংসারচাঁদ মারা যাবার ছয় বছর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী অনিরোধচাঁদ তেহরি গাড়োয়ালে চলে যান। যাবার আগে তাঁর 'যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি শতদ্রু নদী পার করে নিয়ে যান'। সঙ্গে নিশ্চয়ই অমূল্য চিত্রাবলীও ছিল। তার কিছু পরেই অনিরোধচাঁদের ভগিনীর সঙ্গে গাড়োয়ালের রাজার বিয়ে হয় এবং সে বিয়েতে যৌতুক হিসাবে কাংড়ার কিছু ছবি নিশ্চয় উপঢৌকন দেওয়া হয়। তাছাড়া অনিরোধচাঁদের সঙ্গে কিছু চিত্রকরও হয়ত তেহরি গাড়োয়ালে যান। ভদ্রাওয়া, সাম্বা, কোটলা, কুলু, নুরপুরে নিশ্চয় দেশজ চিত্ররীতি ছিল। হয়ত বাঁধ্রাল্তা, জস্রোতা, মানকোট বা ভাউতেও ছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে রীতি ও লক্ষণেরও নিশ্চয় অনেক তফাৎ ছিল। বরফে ঢাকা পর্বতমালার কোলে চাম্বার ছবি নিশ্চয় তরাই এর কোলে জস্রোতার থেকে অনেক তফাৎ। তেমনি উত্তুঙ্গ পর্বতমালার বুকে কুলুরাজ্যের ছবি নিশ্চয় পাহাড়তলীর মানকোট রাজ্যের ছবি থেকে তফাৎ। কিন্তু তবুও এ সমস্ত রাজ্যের ছবির মেজাজের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব, আমেজ ও লক্ষণ যে বর্তমান সে বিষয়ে ভুল নেই। এবং সে ভাব, আমেজ, লক্ষণ, রাজপুতানা, দিল্লীর থেকে তফাৎ। রাজা সংসারচাঁদের পর কাংড়া নীতি নানা দিকে ছড়িয়ে যায়। অনেক কাংড়া শিল্পী নিশ্চয়ই লাহোর, অমৃতসরের শিখ দরবারে যান। শিখ রাজারা এঁদের লুফে নেন, কারণ শিখদের নিজেদের কোন ঐতিহাসিক বিশিষ্ট রীতি ছিল না। এইভাবে শিখরা পাহাড়ী চিত্রনীতি নানাজায়গায় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেন। তবুও বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটিতেই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও সে সম্বন্ধে গর্বের ভাব বর্তমান। সে গর্ব এবং বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন চিত্ররীতিতে বেশ ফুটে উঠেছে। একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করার মত। কাংড়া বা চাম্বার মত বড় রাজ্যে নানা বিদেশী রীতি বেশ সহজে মিশে গেছে। তার কারণ এ-সব রাজ্য ছিল বড়, তাদের সম্মান ছিল বেশী, সুতরাং বাইরে থেকে ধার করতে তাদের জাত যেত না। অর্থাৎ যে-রাজ্যের প্রতাপ ও সমৃদ্ধি ছিল যত বেশী সে রাজ্যে একান্ত স্থানীয়

বিশিষ্ট দেশজ রীতির ছাপ ছিল তত কম স্পষ্ট, কম উগ্র। অন্যপক্ষে রাজ্য যত ছোট বা দুর্বল হত, তাদের মর্যাদা বোধ হত তত বেশী, নিজেদের বৈশিষ্ট্য, দেশজ লক্ষণগুলিকে তারা তত বেশী আঁকড়িয়ে থাকত। রাজ্য বিস্তারে অক্ষম হয়ে, নিজেদের দৈন্য ঢাকবার চেষ্টায়, তারা নিজেদের টুকিটাকি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাড়িয়ে, ফলাও করে দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ পেত। ঠিক এইভাবে আঠারো শতকের শেষদিকে মুসলমানপ্রধান রাজ্য পুঞ্চের হিন্দুপ্রধান রাজধানীতে প্রথমে মুসলমান, পরে হিন্দুরাজার দরবারে কতকগুলি চিত্ররীতি বিশিষ্টভাবে দেখা দেয়। তার সবিশদ আলোচনা এই ছোট্ট বইয়ে অবান্তর হবে।

উনিশ শতকে পাহাড়ী চিত্রকলায় অবক্ষয় ও অবনতি আসে। তবুও ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কাংড়ার পুরনো ঘরোয়ানা চিত্রশিল্পীদের কয়েকজন জীবিত ছিলেন, কাজ করতেন। অজিত ঘোষ ১৯২৯ সালে এঁদের উল্লেখ করেন। কিন্তু উনিশ শতকে এই সব ছোট ছোট রাজ্যের স্বাধীনতা চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও চলে যায়। রাস্তাঘাট ভাল হয়, রেল লাইন হয়। চিত্রকরদের বংশধররা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েন, তাঁদের অনেকে সরকারী নক্সা ও জরীপ দপ্তরে কাজ নেন। কিন্তু তবুও কাংড়া কলমের কাজ এই সব পাহাড়ীরাজ্যে টিমটাম করে চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল ধরমশালার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে আধুনিক কাংড়া জেলার অধিকাংশই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতবড় প্রাচীন কাংড়া সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় শুধু যে বহু শিল্পী মারা গেলেন তা নয়, পাহাড়ী চিত্রকলারও মৃত্যুশ্বাস উঠ্‌ল।
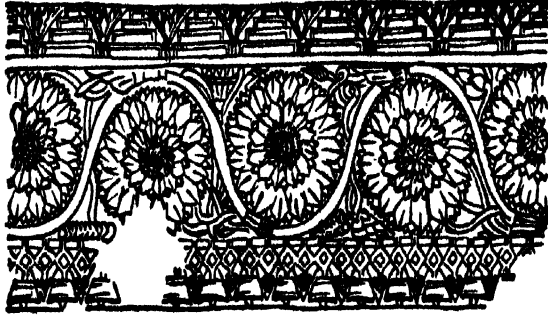
লোকচিত্র

ইতিহাসের আগের গুহাচিত্র বা সিন্ধুর পশ্চিমে দুই নদীর দেশের ছবি ছাড়া এতদূর পর্যন্ত এমন কিছু ছবির আলোচনা করিনি যা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়, যা নিত্য গৃহসজ্জার সামগ্রী, যা ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব চিত্ররীতির আলোচনা হল তা সবই দরবারী শিল্প ; ধনী, গুণী, রাজা বা সভাসদ ছাড়া যেসব চিত্ররীতির চর্চা ও উৎকর্ষ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। অজন্তা, বাঘ, ইত্যাদি গুহাতে ভিক্ষুরা হয়ত ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তখনকার রাজারা অকাতরে তাদের প্রতিপালন ও রক্ষা না করলে তাঁদের পক্ষে সে সব গুহা-চিত্র আঁকা অসম্ভব হত। একেকটি গুহা কাটা, তাকে খোদাই কবা, তার ভিতরে বসবাসের আয়োজন, আলো নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা, রঙ ইত্যাদি জোগাড় ও নিপুণ কারিগরদের তদারক করা, সুদূর চীন পারস্য থেকে দক্ষ চিত্রশিল্পী এনে তাদের দিয়ে কাজ করান ; সেই সব শিল্পীরা যাতে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা, এসব শুধু সসাগরা পৃথিবীর সম্রাটদের পক্ষেই সম্ভব। তিরুপতি তিরুমাল, আনেগুণ্ডি, তাঞ্জোর, বিজয়নগর, আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, রাজস্থান, দিল্লী, পাঞ্জাবের পাহাড়ী রাজ্যসমূহ যেখানেই চিত্রকলার উৎকর্ষ হয়েছে, সেখানেই তা সম্ভব হয়েছে রাজানুগ্রহে। এবং এই রাজানুগ্রহের ফলেই বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীরা এখান থেকে ওখানে যেতেন, এক একটি রীতির ঢেউ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ত। এমনকি বইটি এপর্যন্ত পড়ে এক আধজনের এ ধারণা হওয়াও বিচিত্র নয় যে দেশীয় রীতি বলে বোধ হয় কোথাও কিছু ছিল না ; যাও বা ছিল তাও নিতান্তই যৎসামান্য, এবং নানাধরনের 'প্রভাব' বুঝি ভারতের এখানে ওখানে নড়ে চড়ে নানাবিধ চিত্ররীতির সৃষ্টি করেছে। কোন পাঠকের যদি সত্যই এরকম মনে হয় তাহলে আফশোষের সীমা থাকবে না, কারণ বইটি লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটুকু ভাল করে দেখান যে যেকোন শিল্পী তখনই সার্থক হন যখন তিনি স্থানীয় রীতিতে ভাল করে শিকড় গেড়ে দাঁড়ান। কিন্তু মাটির তলায় গাছের কি হচ্ছে যেমন দেখা যায় না,—দেখা সব সময়ে উচিতও নয় কারণ তাতে গাছেরই ক্ষতি হয়—তেমনি চিত্রের বেলাতেও কোন শিল্পী স্থানীয় দেশজ চিত্ররীতি থেকে কি করে নিজের পুষ্টির জন্য রস

টানছেন, তা তাঁর কাজ দেখে সব সময়ে ধরা যায় না ; অথচ লোকের অগোচরে এমন কি সমঝদার, বিশেষজ্ঞেরও অলক্ষ্যে সে রস জোগানোর কাজ অবিরাম চলে, যার কোন হিসেব নিকেশ সম্ভব নয়। চিত্রজগতে যখন প্রভাবের কথা আলোচনা হয়, তখন স্থানীয় দেশজ রীতির উল্লেখ করতে অনেকেই ভুলে যান, ঠিক যেমন কোন জাতির জীবনে তার দেশের জলবায়ুর দানের আলোচনা অনেক সময়ে বাদ পড়ে। তাছাড়া আরও মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক শিল্পীরই পৃষ্ঠপোষক এবং খরিদ্দার চাই, এবং যেহেতু কোন ছবি আঁকার ফলে আপাতদৃষ্টিতে একটা ধানের শীষও বেশী ফলে না, বা হাতুড়ি একটুও জোরে পড়ে না, সেহেতু চিত্রশিল্পীকে নিজের ভরণ পোষণের জন্য পৃষ্ঠপোষক খুঁজতেই হয় ; এবং অনেক সময়ে তার মর্জিমেজাজ মত চলতে হয়। আমাদের দেশেই যে শুধু দরবারী চিত্রকলা দেখা যায় তা নয়, ইওরোপের চিত্রশিল্পীদেরও বাঁচতে হয়েছে দরবারের আশ্রয়ে, না হয় রাজানুগ্রহে। কোন দেশেই সাধারণ লোক বোধ হয় মহান শিল্পীদের চাঁদা করে বাঁচায়নি। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে কোন মহান শিল্পীর পক্ষে সাধারণ্যে ডুব দিয়ে তার মধ্যে থেকে রস ও শক্তি সঞ্চয় না করে উপায় নেই ; যতই বিদগ্ধ নিপুণ শিল্পী হোন না কেন তাঁর কাজে কোথায় কি যেন ফাঁক থেকে যায়, প্রাণের অভাব হয়ে পড়ে, নীরক্ত ভাব আসে ! তার কারণ লোকশিল্প, লোকচিত্র, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, আহারবিহার, বসন-ভূষণ, ঘরদোরের মতই একান্ত মজ্জায় চলে যায়, এবং অলক্ষ্যে কাজ করে। কোন দেশ ও জাতির সমগ্র জীবনে যে রূপ, ডিজাইন ও মূল্যসমষ্টি গড়ে ওঠে লোকচিত্র তারই প্রতীক। সুতরাং আমরা যাকে সাধারণত প্রভাব বলি তা উপর থেকে চাপানর মত কিছু নয়, সুটকেসে ভরে তা রপ্তানি করা চলে না। তা শরীরের আহারের মত দেশজ রীতির পাকস্থলীতে পরিপাক হয়ে যদি দেশের রক্তে মিশে শক্তি না বাড়ায় তবে শরীরের পরিত্যক্ত জঞ্জালের মত তা বাইরে থেকে এসে ফের বাইরে চলে যাবে। হজমশক্তি ভাল না থাকলে যেমন ভালমন্দ আহার হজম হয় না তেমনি উৎকৃষ্ট দেশজ রীতি বর্ত্তমান না থাকলে ভাল প্রভাব বা দৃষ্টান্তও কাজে লাগান যায় না। সুতরাং এটা বুঝতে দেরি হওয়া উচিত নয় যে আমাদের দেশের অজন্তা প্রভৃতি গুহাচিত্রে যখন চীনে ও পারসীক ছাপ পড়ে, রাজপুত রীতিতে পারসীক মেজাজ এসে মুঘল রীতির সৃষ্টি করে, বিজয়নগরের ঐতিহ্য গিয়ে রাজস্থানী চিত্রের উৎকর্ষ ঘটায়, রাজপুত ও মুঘলরীতি গিয়ে পাঞ্জাবের পাহাড়ী দেশজ শিল্পে ঘরোয়ানা গুণ আনে, তখন প্রত্যেক দেশেই লোকচিত্রনীতির প্রসাদে নতুন প্রভাব গ্রহণ ও আত্মসাৎ করার জন্য ক্ষেত্র সবদিক দিয়ে—অর্থাৎ ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতিতে—প্রস্তুত ছিল। এবং এ প্রস্তুতি যে শুধু দেশজ লোকচিত্রেই একমাত্র থাকে তা নয়, থাকে আচারে, ব্যবহারে, জীবনযাত্রা, শাসনব্যবস্থা, প্রভৃতি নানা খুঁটিনাটি প্রণালীর সমগ্র রূপে বা ডিজাইনে, লোকচিত্র, লোকশিল্প যার অভিব্যক্তি মাত্র ; কারণ দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যের রূপে, গড়নে, রঙে, প্রয়োজন-সাপেক্ষ আকারেই শুধু একটি জাতির আসল সংস্কৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে।

বিশ শতকের প্রথম থেকে তাই লোকশিল্প সম্বন্ধে মহা মহা শিল্পীরাও সচেতন হন এবং অসীম আগ্রহভরে নানাদেশের লোকচিত্র, ভাস্কর্য, কারুকার্য, নক্সা, আল্পনা, হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন কোসনের গড়ন সম্বন্ধে দেখাশোনা খোঁজখবর করতে শুরু করেন। জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে পাব্লো পিকাসোই প্রথম অকুণ্ঠভাবে আফ্রিকার বেনিনদের কাঠের ও ধাতুঢালাইএর কাজের কাছে ঋণস্বীকার করেন, এবং লোকশিল্পের মধ্যে কি গূঢ় ফর্ম, রূপ ও ডিজাইনের আভাস নিহিত আছে সে কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। এই ধরণের ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। বিশশতকের প্রথম অবধি ইওরোপীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের যে পরিণতি হয় তা প্রায় দু'হাজার বছরের একটানা ইতিহাসের ফল। এই দুই হাজার ধরে দরবারী ও পেশাদার শিল্পীরা বস্তু ও বস্তুর রূপের সম্বন্ধ নির্ণয় একভাবে করে গেছেন। এই এক-টানা লক্ষ্য বিশেষ করে দেখা যায় ষোল শতক থেকে। ফলে চিত্রে ও ভাস্কর্যে এই ধরনের স্থিরলক্ষ্য গতির ফলে শিল্পকলায় দুঃসহ সচেতনতা আসে, আসে অসামান্য নৈপুণ্য, কৌশল, বৈদগ্ধ্য, চূড়ান্ত বিচার। চেতনা বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের চূড়ান্ত উৎকর্ষের ফলে আসে দৃষ্টির প্রৌঢ়ত্ব, সেই সঙ্গে শ্রান্তি এবং খানিকটা অসার্থকতা বোধ—এই বোধ যে, যে পথে এতদিন অগ্রসর হওয়া গেছে, সে পথের শেষ হয়ে এসেছে, নতুন পথ খুঁজতে হবে। ফলে আসে অবক্ষয়ের স্তিমিত দৃষ্টি। পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধি ও শিক্ষালব্ধ নৈপুণ্যের পথে এগিয়ে দরবারী শিল্প এমন জায়গায় থমকে দাঁড়াল যেখানে এ উপলব্ধি এল যে জীবন থেকে শিল্প ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এবং জীবনের মধ্যে আবার সত্যরূপ, সঞ্জীবনী রস, ও প্রাণ খুঁজে না পেলে ক্রমশ পক্ষাঘাত, জরা ও মৃত্যু আসতে বাধ্য। অর্থাৎ বিশেষ একটি ধারায় এত বেশী চর্চা হয়েছে যে সেই পথে যেন শোথ এসে যাচ্ছে, সুস্থতা চলে যাচ্ছে। এ বোধ বিশেষ করে আসে সেজান, ভানগখের পরে।

ফলে শিল্পীরা আবার লোকশিল্পের দিকে তাকালেন নিজেদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টায়। বহুদিন অস্বাভাবিক জীবন যাপনের পর যেন কতকটা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবার আশায়। কারণ লোক-শিল্পের এমন একটি বল আছে যা গ্রীক রূপকথার এন্টিয়ুসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মহাবীর

হারকিউলিসের উপর স্বর্গের রাণী জুনো ক্রুদ্ধ হন। ক্রোধে তিনি হারকিউলিসকে কতকগুলি কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। তার মধ্যে একটি ছিল এন্টিয়ুস বলে একটি বিখ্যাত পালোয়ানকে হারকিউলিস পরাজিত করবেন। এন্টিয়ুসের একটি অক্ষয় কবচ ছিল, সেটি হচ্ছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এন্টিয়ুসের শরীরের কোন অংশ মাটিতে ঠেকে থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এন্টিয়ুসকে কেউ হারাতে পারবে না। মিনার্ভা দেবী গূঢ় তত্ত্বটি জানতেন, তিনি হারকিউলিস্‌কে স্নেহ করিতেন, এবং তাঁকে এই তত্ত্বের সন্ধান দেন। ফলে হারকিউলিস খুব কায়দা করে এন্টিয়ুসকে শূন্যে ঘাড়ের উপর তুলে ফেলেন, তারপরে তাঁকে আছড়ে মারতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। লোকশিল্প খানিকটা এন্টিয়ুসের মত। লোকশিল্পজাত দ্রব্য কখনও অপ্রয়োজনীয় হয় না। নিত্যব্যবহার্য কাজে সে লাগে বলেই তার একটি ব্যবহার্য আবশ্যিক রূপ ফুটে ওঠে। এবং যেহেতু সেসব সামগ্রী সাধারণ গৃহস্থের ঘরের জিনিষ, তাই সে ব্যবহার্য রূপের মধ্যে আসে আঁটসাঁট, সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত, কার্যোপযোগী গড়ন ; যার মধ্যে বাহুল্য নেই, আছে সংযম, মিথ্যা খরচসাপেক্ষ ফলাও অলঙ্কার নেই, আছে এমন একটি রূপ যাতে যে কাজের জন্য সেটি তৈরি সেই কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন হয়। ফলে খুব অল্প পরিশ্রম, অল্প অলঙ্কার, অল্প উপকরণ, অল্প কাঁচামাল, অল্প রূপসজ্জার মধ্যে এমন একটি গড়ন, রূপ, ফর্ম ও ডিজাইন ফুটিয়ে তোলার প্রশ্ন আসে যার ব্যবহারে দৈনন্দিন জীবনে আসবে আরাম, ক্লান্তি আসবে না এমন কোন গড়ন, যা নাড়ানাড়ি বা ব্যবহারের অসুবিধার ফলে আনে বিরক্তি বা শ্রান্তি, যা ঘরের স্বল্প সজ্জা ও আড়ম্বরের মধ্যে দ্বিধাহীন-ভাবে মানিয়ে যাবে এবং আনন্দের উদ্রেক করবে। মনে প্রফুল্ল প্রশান্তি আনতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে যার রূপ, রঙ, গড়ন, ডিজাইন আনবে সবচেয়ে বেশী স্বচ্ছন্ন ভাব। এইভাবে সর্ব্বদা ব্যবহারের তাগিদের ফলে স্বল্পমূল্য, কাজে কাজেই স্বল্পশ্রমে, নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার দরুণ লোকশিল্পে আসে সংযম ; বাহুল্যবর্জনের মধ্যে দিয়ে যথাযথ ব্যবহারের ফর্ম ও ডিজাইন।

সামান্য একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি হয়ত আরও স্পষ্ট হবে। অনেকে বলেন কাঠ খোদাই থেকে পাথরের ভাস্কর্য আসে। কি থেকে কি প্রথম আসে তার নিষ্পত্তি অবশ্য এখনও হয়নি তবে

এটা ঠিক যে যে দেশে পাথরের অভাব সে দেশে মাটি ও কাঠের অভাব হয় না। সুতরাং আমাদের দেশে কাঠের কাজ যে খুব প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাটলীপুত্র খুঁড়ে আবিষ্কার হয়েছে যে সেখানে বাড়ী ছিল কাঠের। বহু ভারতীয় স্কাল্পচার বা ছেদন ভাস্কর্যেই দেখা যায়, পাথর এমনভাবে কাটা হত যাতে পাথরের আঁশ ঠিক কাঠের আঁশের মত দেখাত। সুতরাং দারুশিল্পী বা সূত্রধরদের মধ্যে অনেকে যে মন্দির ইত্যাদি নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হতেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শাস্ত্রে আরও প্রমাণ আছে যে সূত্রধররাই শ্রেষ্ঠ স্থপতি হতেন। অর্থাৎ দারুশিল্পে যাঁদের বিশেষ অধিকার থাকত তাঁদের মধ্যে থেকেই স্থপতির উদ্ভব হত। এই সূত্রধররাই আবার মৃৎপ্রতিমা নির্মাণ করতেন, এবং সেই সূত্রে নিশ্চয় ধাতু ঢালাই বিদ্যাও আয়ত্ত করতেন। মৃৎপ্রতিমা নির্মাণ যোজন ভাস্কর্য বা মডলিংএর শ্রেণীতে পড়ে, ফলে তাঁরা মাটি থেকে রূপ ফোটাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মৃৎপ্রতিমা যাঁরা করতেন তাঁরাই আবার করতেন মাটির বা কাঠের পুতুল, তার থেকে লোকচিত্র, যার সাধারণ চলিত নাম হচ্ছে পট। পট কথাটি সর্ব্বশ্রেণীর লোকচিত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এই সামান্য উদাহরণে আমার একথা বলা বা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয় যে ভারতে লোক-শিল্প শুধু সূত্রধর বলে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল বা সেই জাতির এক-চেটিয়া কারবার ছিল। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে দরবারী স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দারুশিল্প, ধাতুঢালাই, পুতুলগড়া, প্রতিমাগড়া, চিত্রশিল্প যেমন নিজের নিজের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব বা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে, যার মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের যেন কোন সম্বন্ধই নেই, লোকশিল্প ঠিক তার বিপরীত, অন্তত অল্প কয়েকদিন আগে পর্যন্তও বিপরীত ছিল। বিদগ্ধ সমাজে যেমন এইসব ভিন্ন ভিন্ন জগতের মধ্যে আদানপ্রদান চলে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ সে সমাজে যেমন নানা জিনিষের ব্যবহার পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে, সরে গিয়ে নিজের নিজের বিশ্বের নিয়মকানুন নতুন করে তৈরি করে নিয়েছে, লোকশিল্পের মধ্যে সেরকম ভিন্ন ভিন্ন জগৎ ত নেইই বরং সেসব জগতের মধ্যে আছে গভীর, একান্তভাবে অন্যোন্যনির্ভর সম্বন্ধ, সে-সম্বন্ধ যেমন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আনে উদ্দেশ্যের ঐক্য, তেমনি শ্রমব্যবস্থাবিন্যাসের মধ্যে দিয়েও আনে এক সামাজিক পারম্পর্য, পরস্পর-নির্ভরশীলতা। যেমন ছুতোর নবান্নের পর করত নতুন ঘরবাড়ী, কাঠের কাজ ছেড়ে পুজোর মরশুমে গড়ত প্রতিমা, আবার শীতের দিনে মেলার মরশুমে করত খেলনার পুতুল। এর ফলে লোকশিল্পের নানা অঙ্গের মধ্যে থাকত একটি সাধারণ, পরস্পর-নির্ভর-বোধ ও বিচার। জীবনের প্রতিটি দিক এবং সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের সঙ্গে তার প্রতিটি সৃষ্টির থাকত সোজাসুজি সরাসরি সম্বন্ধ। ফলে আসত একটি কঠিন, সর্বাশ্রয়ী ডিজাইন যা জীবনের সমস্ত অঙ্গকে জুড়ে, ব্যেপে, শান্তি ও আনন্দের কারণ হত। আধুনিক শিল্পীর লোভ ও দৃষ্টি পড়ল এর উপর।

তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে। প্রতি যুগেই কোন মহৎ সামাজিক সৃষ্টি, যেমন মন্দির

বা গির্জ্জা বা সাধারণের ব্যবহারের ইমারত, বা প্রতিমার পিছনে হয়ত থাকেন একজন মহাজ্ঞানী শিল্পী যাঁর পরিকল্পনা, পরিচালনা ও প্রতিভার বলে কাজটি সম্পন্ন হয়। তিনি হয়ত নিজের হাতে একটি কাজ কেমন করে করতে হয় দেখিয়েও দিতে পারেন, সেইসঙ্গে সমগ্র রূপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু আসল কাজটি করে ছোট বড় সামান্য কারিকর। তারা তাদের হুকুম ফরমায়েসমত কাজ করতে গিয়ে, কাঁচামাল ও উপকরণ নাড়াচাড়া করার মধ্যে দিয়ে, পায় নতুন সৃষ্টির হদিস। এই ধরনের ব্যক্তিগত আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই এসেছে ভারতীয় ভাস্কর্য ও নানাশিল্পে নানা বৈচিত্র্যময় রূপ, নানা আশ্চর্যময় বিস্ময়। কিন্তু অন্য বিস্ময়কর ফলও হয়েছে। প্রত্যেক কারিকর কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি উপকরণের সম্মুখীন হয়ে পেয়েছেন নানা ব্যক্তিগত সমস্যা। সেই সব সমস্যা তাঁরা যেমনভাবে পেরেছেন নিজের মত করে নিরাকরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে নানা স্বাধীন বিচিত্র রূপের হয়েছে উৎপত্তি কিন্তু প্রত্যেকবারেই শিল্পী সরাসরি স্পষ্টাস্পষ্টি নানা আবরণ ভেদ করে সে রূপ উন্মোচন করেছেন। ফলে সঞ্চিত হয়েছে নানাযুগ ধরে বিচিত্র ঐশ্বর্যময় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে যে কোন দেশের ও সর্বদেশের জাতিস্মর কারিকরের লৌকিক শিল্প কাজে। এরই ফলে আসে এক একটি জাতির নিজস্ব রূপ, ফর্ম ও ডিজাইন ; যার বলে জলখাবার গেলাসটি দেখলে সেজাতির স্বরূপটি বোঝা যায়, অর্থাৎ অন্যান্য যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের রূপ, ফর্ম ও ডিজাইনের মধ্যে সঙ্গতি পাওয়া যায়। এর দরুণ বিশেষ কোন ওস্তাদ মহাশিল্পী কোন সময়ে যদি কোন মৌলিক ডিজাইনের প্রবর্তন করেন, তাহলে আস্তে আস্তে স্তরের পর স্তরের মধ্য দিয়ে সেই ডিজাইনটি সমগ্র জাতির জীবনে নানাভাবে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে দরবারী শিল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের পরোক্ষভাবে সংযোগ স্থাপিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অজন্তার চিত্রনীতির কথা। অজন্তার গুহাচিত্রে চীনে এবং পারসীক চিত্ররীতির প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তার কথা আগে লিখেছি। এটা খুবই সম্ভব যে ১৬, ১৭, ১ ও ২ নং গুহার চিত্র যখন আঁকা হয় তখন চীন থেকে বৌদ্ধ শিল্পীরা এসে এই সব চিত্রনির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। কারণ, মেঘ, বোধিসত্ত্বদের গ্রুপ, অপ্সর, কিন্নরদের ছবির রীতি, পুরুষদের দেহ আঁকার রীতি, রঙের বিন্যাসরীতি প্রায় চীনে, মুখের ও শরীরের আদলে চীনে এবং পারসীক ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু অজন্তার সব ছবিই নিশ্চয়ই চীনে শিল্পীরা আঁকেন নি বা করেন নি। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় শিল্পীও বহু ছিলেন, যার ফলে অজন্তার রীতি বিনা দ্বিধায় ভারতীয় চিত্রকলায় বেশ ছড়িয়ে যায়। কেমন করে ছড়ায় তা খানিকটা অনুমান করা যায়। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বোধ হয় শুধু আঁকতেন। কিন্তু তাই যদি হত তাহলে অজন্তার চিত্ররীতি অমনভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেত না, কারণ বাঘ, ইলোরা, তাঞ্জোর, আনেগুণ্ডি, তিরুপতি প্রভৃতি স্থানে যেখানেই প্রাচীরচিত্র আছে সেখানেই স্পষ্ট বোঝা যায় অজন্তারীতি সেসব রীতিকে কত প্রভাবিত করেছে। সেসব জায়গার শিল্পী অজন্তা চিত্র চোখে দেখে গিয়ে যদি পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করতেন তাহলে পরস্পরের টেকনিক ও মেজাজে এত মিল

থাকত না ; তফাৎ হতই। কিন্তু চতুর্দিকে অজন্তারীতির খুঁটিনাটি নৈপুণ্য কৌশল, এমন কি মুদ্রা-দোষও এমন সমগ্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে যাতে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে অজন্তার কাজে যে সব শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা বংশপরম্পরায় ভারতবর্ষে ও বিদেশে নানা জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে স্থান ও কাল উভয়ক্ষেত্রেই অজন্তাপদ্ধতির বিস্তারসাধন করেন। এ বিস্তারসাধন ঘটে ভারতের সমগ্র শিল্পী ও কারিকর সম্প্রদায়ের মধ্যে, কারণ অজন্তারীতিতে তুটি ধারার মিলন হয়েছে বলা যায়। একটি ধারা অজন্তার চিত্ররীতি, বিষয়-বিন্যাস, স্পেস্ বা জায়গা ছাড়া ও রাখার সমন্বয় সাধন, এবং গ্রুপ কম্পোজিশনের মধ্যে সুস্পষ্ট, এই ধারায় চীনে মেজাজ খুবই প্রকট। পরিষ্কার বোঝা যায় চীনে বা পারসীক চিত্রকলায় শিক্ষিত দীক্ষিত শিল্পী নিশ্চয় কাজ করেছেন। অন্য ধারাটি ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যার ফলে অজন্তার চিত্রে ভাস্কর্যের দ্যোতনা খুব আসে, এবং যার প্রমাণ আমরা পাই অজন্তার নারীদেহের চিত্রে ; কারণ অজন্তার নারীচিত্র দেখলেই বোঝা যায় তা সোজাসুজি একান্তভাবে ভারতীয় স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্য থেকে তুলে আনা হয়েছে। সুতরাং অজন্তায় যে সব শিল্পী কাজ করেছিলেন তাঁদের নিশ্চয় নানাস্থান থেকে, নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে বায়না দিয়ে আনা হয়েছিল। তাঁরা কিছুদিন অজন্তায় কাজ করার পর আবার নিশ্চয় চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয়ে অনেককিছু নতুন শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যান। ফিরে গিয়ে নিজেদের দেশে অধিগত বিদ্যাকে স্থানীয় কাজে লাগান। এইভাবে অজন্তারীতির প্রচার হয়। সবচেয়ে প্রথম প্রচার হয় অজন্তার আশেপাশে গুহা-চিত্রে এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের দেয়ালচিত্রে। তার থেকে একটি শাখা নিশ্চয় আনেগুণ্ডি ও বিজয়-নগরের মাধ্যমে যায় গুজরাটী পুঁথি ও ও পশ্চিমভারতীয় চিত্ররীতিতে। অন্য শাখা, এবং কিছুটা ঘুর-পথে গুজরাটী শাখাও, পরে আসে অন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে উড়িষ্যার পটে ও পাটায় এবং ছোট ছোট ভাস্কর্যে। তারপর এ রীতি ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয় তীর্থপথ দিয়ে মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, বর্ধমানে, বীরভূমে। প্রকাশ পায় বিষ্ণুপুরী তাসে, পাটায়, চৌকাপটে, জড়ানপটে। দাক্ষিণাত্য আর পশ্চিম-বাঙলার পশ্চিমদিকের জেলাগুলির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ আদান প্রদান হত তা বোঝা যায় তিরুপতিতিরুমাল মন্দিরের ছাদের চিত্র আর বাঙলার জড়ান পটের অদ্ভুত মিলে। দু' একটি তথ্য দিয়ে বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট করা দরকার।

ভাষার হরফ আর চিত্রের অঙ্কুরের উৎস নিশ্চয় এক। তেলেগু আর উড়িয়া ভাষার হরফে খুব মিল আছে। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত পুঁথিই তালপাতায় নরুণের মত কলম দিয়ে আঁচড় কেটে লেখা হত। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার বরাবরই ছিল গভীর যোগাযোগ। একসময়ে উড়িষ্যা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গুজরাটী চিত্রনীতির অনেক রীতিপদ্ধতি ব্যবসাবাণিজ্যের পথ ধরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সঙ্গে আদানপ্রদান করে। ফলে গুজরাটী চিত্রে ক্যালিগ্রাফির যে গুণ ও প্রসাদ দেখা যায়, উড়িয়া লিপি নরুণ দিয়ে লেখার দরুণ, গুজরাটী চিত্রের ক্যালিগ্রাফি-সুলভ গুণ উড়িয়া পুঁথিচিত্রে আনতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। চিত্রের যন্ত্রপাতি উপকরণ কিভাবে চিত্ররীতিতে ঐক্য আনে, গুজরাটী ও

উড়িষ্যার পুঁথিচিত্রের মিল তার অন্যতম উদাহরণ। ষোল শতকে উড়িষ্যা মুসলমানদের অধীনে যায় এবং বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ের যেসব উড়িয়া পুঁথিচিত্র পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে লিপি ও ছবি দুইই নরুণ দিয়ে আঁকা হত, আর আঁচড়ের মধ্যে আল্‌গোছে রঙ ঢুকিয়ে ছবি রঙ করা হত। ষোল শতকের আগে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার সম্বন্ধ বেশী ছিল, এবং ষোল শতকের পর বাংলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। এ তথ্যটি থেকে উড়িষ্যাচিত্রনীতিতে যে দুটি ধারা ও মূডের পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি বেশ সুষ্ঠু কৈফিয়ত মেলে। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত তালপাতায় লেখা ও চিত্রিত একটি কৃষ্ণলীলা পুঁথিতে কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় বা মিনিয়েচর ছবি আছে যার নক্সার রীতি ও কম্পোজিশন যেমন সূক্ষ্ম তেমনি সুকুমার। এর রীতির সঙ্গে গুজরাটী বসন্তবিলাস প্রভৃতি পুঁথিচিত্রের যেমন মিল আছে তেমনি নজম্‌উলমুলুক পুঁথির ছবিরও আমেজ আসে। রণপুর বা নয়াগড় থেকে যে সব উড়িয়াচিত্র পাওয়া গেছে তাতেও সুচারু সম্ভ্রান্ত অভিজাতরীতি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে কয়েকটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে আছে। পুরীর পিছনে রণপুরে যে ছবিটি পাওয়া গেছে তার বিষয়-বস্তু হচ্ছে এক রাজদরবারের বিদেশী দূতের সম্বর্দ্ধনা দৃশ্য। স্তম্ভশোভিত দরবারে রাজা পাঁচজন দূতকে অভ্যর্থনা করছেন, তাদের মধ্যে চারজন দূত, তাঁর দিকে মুখ করে বসে, তাদের পিছনে একজন পারিষদ দাঁড়িয়ে। কাগজের উপর জমকালো রঙে চিত্রিত, কাগজের জমিতে পুরু করে সাদা লাগান। বোধহয় সতেরো শতকে আঁকা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ছবিটির বিষয় হয়ত মুঘল, কিন্তু আসলে বোধহয় বিষয়টি ডেকানী, খুব সম্ভবত গোলকুণ্ডার। কিন্তু চিত্রের রীতিটি নিতান্তই তালপাতায় আঁকার রীতি স্বীকার করে নিয়েছে, বিশেষ করে কাপড়ের নক্সার সূক্ষ্ম কাজে আর দেহের নক্সায়। যেরকম জমকালো রঙ আর দরাজ কম্পোজিশন, তাতে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীরচিত্রের কথা মনে আসা স্বাভাবিক, এবং বিজয়নগরের রীতির সঙ্গে সাদৃশ্যও স্পষ্ট। রণপুরের পাশেই নয়াগড় থেকে আরেকটি পুঁথিচিত্র পাওয়া গেছে, এটিও আশুতোষ মিউজিয়মে দেখতে পাওয়া যায়। বোধহয় এককালে গীতগোবিন্দ পুঁথির অংশ ছিল। এ ছবিটি ও তালপাতার উপরে আঁকা। একদিকে কুঞ্জবনে গোপিনীর দল। অন্যদিকে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে গোপিনীরা দুধ দুইছেন। দুটি ছবিই মুসলমান আমলে বোধহয় সতেরো শতকে আঁকা, তারমধ্যে প্রথমোক্তটি বোধহয় সতেরো শতকের প্রথম অর্ধেকে তৈরী। দুটি ছবিই ছবির মাঝবরাবর বাঁ থেকে ডাইনে-টানা একটি কল্পিতরেখার উপরনীচে প্রতিসামা রেখে আঁকা, যাকে ইংরেজিতে বলে ছবির হরিজন্টাল অ্যাক্সিস্‌। এটি ভারতের মধ্যযুগের সকল ছবির বৈশিষ্ট্য। দুটি ছবিতেই কাগজের জমি মশলা দিয়ে পুরু করা, পিছনে মশলা দিয়ে টেঁকসই করা হয়েছে। এর ফলে প্রথম ছবির রঙগুলি খুব জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে এবং নয়াগড়ের ছবিদুটির রঙীন নক্সার নীল আর কমলা রঙ যেন দপ্‌ দপ্‌ করে। বৈষ্ণব বিষয়ের কৃপায় এমন একটি মূডের সৃষ্টি হয় যার ফলে ছবির যেন অন্য একটি গুণ আসে। রাজস্থানী গীতগোবিন্দ চিত্রাবলীর কথা মনে আসে। কিন্তু রাজস্থানী চিত্র দরবার

ঘেঁষা এবং এ চিত্র লোকরীতি ঘেঁষা, যদিও মনে রাখা ভাল যে নয়াগড়ের রাজা রাজপুতবংশের লোক ছিলেন। তা সত্ত্বেও এসব ছবি কেন যেন দাক্ষিণাত্যের দেয়ালচিত্রের কথাই বেশী মনে করিয়ে দেয়। তার একটি ছোট্ট লক্ষণ আছে। এসব ছবি যদি কাঁচের স্লাইড করে ম্যাজিক লণ্ঠনে দেখা যায় তাহলে আরও ভাল লাগে, অর্থাৎ ছবিগুলি বেশ কয়েকগুণ বাড়ালে যেন বেশী খোলতাই হয়। এই রীতি ষোল শতকের পর থেকে উড়িয়া পট ও পাটায় খুব বেশীরকম আসে, তার থেকে বাঙলার পট ও পাটায় এবং বিষ্ণুপুরী তাসে, এবং তার থেকে জড়ান পটে।

বাংলাদেশ দুটি রীতির সঙ্গমস্থল হয়। একটি রীতি অজন্তার পর দাক্ষিণাত্য ঘুরে, উড়িষ্যা জয় করে, বাংলাদেশের পশ্চিম জেলাগুলির সব ছবির মেজাজকে স্পর্শ করে। যে বিরাট ভূখণ্ডের উল্লেখ করলুম তাতে রেখা, রঙ ও নক্সার ও ফিগর বসানর রীতির কতকগুলি আশ্চর্য সাধারণ লক্ষণ আছে। অন্যরীতি আসে তিব্বত, নেপাল থেকে নালন্দা, উত্তর বঙ্গ হয়ে, ও পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের পথ বেয়ে, যার কথা আগে অল্প উল্লেখ করেছি। এ রীতি আসে বিশেষ করে ধাতু ঢালাইয়ের কাজের রেখায়, যে রেখা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথিচিত্রাবলীতে ছবির ভাষায় অনূদিত হয়। এই দুটি ধারার সংমিশ্রণে পনেরো ষোল শতক থেকে বাংলার স্নিগ্ধ, শ্যামল মাটিতে একটি বিশিষ্ট বাঙালী মেজাজ তৈরি হয়। তিব্বতী ও নেপালী ধাতু ঢালাইয়ের ধারা ও টেকনিক বিশেষভাবে সার্থক হয় বাংলার মন্দিরের ইঁটের টালি ও পাটার কাজে। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ যেসব নতোন্নত ভাস্কর্যসুলভ কাজ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ভুবনেশ্বর কোনারকের যত না মিল আছে, তত আছে নেপালী ও তরাই অঞ্চলের ধাতু ঢালাইয়ের কাজের, এবং এ মিল বাঙলাদেশের মন্দিরে সর্বত্র, অর্থাৎ যেখানেই মন্দির ইঁটের তৈরি এবং নক্সাগুলি ইঁটের উপর নরুণ দিয়ে খোদাই করা হয়েছে (পশ্চিম বঙ্গে সামান্য কয়েকটি পাথরের মন্দির আছে তাতে অবশ্য ভুবনেশ্বর কোনারকের কিছু আমেজ পাওয়া যায়)। মন্দিরের গায়ে যে সব দেবদেবী অসুরের মূর্তি আছে তাদের সংস্থান যে ভাবে করা হয়েছে তাতে প্রশান্ত, উদাত্ত অমর্ত্যভাব বেশী, তিব্বতী ও নেপালী মূর্তিতত্ত্বের উপর তার ভিত্তি, যে মূর্তি বা প্রতিমাতত্ত্ব (ইংরেজীতে আইকনগ্রাফি) হিমালয়ের তরাই থেকে শুরু করে বাঙলাদেশ, উড়িষ্যা হয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গেছে, যার মধ্যে শরীর সত্ত্বেও অশরীরীভাব বেশী। যে দুটি সবচেয়ে প্রাচীন ইঁটের মন্দির বাংলাদেশে এখনও বর্তমান (একটি বাঁকুড়ার ওন্দা থানার বহুলারায়, অন্যটি বর্ধমানের মেমারী থানার দেউলে) তার একটি জৈন অন্যটি বৌদ্ধ। সুতরাং তাদের কারুকার্য যে সর্বত্র ইঁটের দেয়ালের মন্দিরের কাজকে প্রভাবিত করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং এ দুটি মন্দিরে উড়িষ্যার মন্দিরের ছাপ নেই বললেই হয়। অথচ যে পাথরের মন্দির বাংলাদেশের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ বর্ধমানের অন্তর্গত বরাকর থানার বেগুনিয়ায়, তার মধ্যে বাঙালীভাব নেই বললেই হয়, সবটাই উড়িয়া।

অন্যপক্ষে অজন্তার রীতি অদ্ভুতভাবে দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও উড়িষ্যার লোকচিত্রে দেখা যায়,

যে অজন্তার রীতির রঙে, গড়নে, ছবির স্পেসিং ও গ্রুপিংএ মেঘ ইত্যাদির বর্ণনায় চীনেভাব খুব সুস্পষ্ট। যে কোন পুরনো পট বা বিষ্ণুপুরী তাসে স্পষ্ট দেখা যায় হরিজন্টাল অ্যাক্সিস, ছবির মাঝ-বরাবর বাঁয়ে থেকে ডাইনে চলে গেছে ; ছবির উপরভাগে মেঘ বা স্বর্গ আঁকার রীতি যেন একেবারে অজন্তা থেকে সরাসরি তুলে আনা ; এমন কি মেঘের রঙও। ছবিটিকে যে ভাবে খোপে খোপে, লম্বালম্বি, ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বা ফ্রেমে (কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য) ভাগ করা হয়েছে তাতেও দেয়াল চিত্রের আইন কানুন স্পষ্ট। ফিগর আঁকার রীতিতে খানিকটা জ্যামিতিক ও মনুমেন্টাল ভাব, অর্থাৎ আকৃতিটি কয়েকগুণ বাড়ালেই যেন ভাল হয় ; রঙের মধ্যেও টেম্পেরা নীতির প্রতি ঝোঁক খুব বেশী।

কিন্তু বাংলা লোকচিত্রে একটি অদ্ভুত এবং আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে যা এমন কি উড়িষ্যার লোক-চিত্রেও নেই। সে বৈশিষ্ট্য এসেছে একদিকে মন্দিরের টালির চিত্র, প্রতিমাতত্ত্ব ও ধাতুঢালাই রীতি, অন্যদিকে অজন্তার দূর ঐতিহ্য বয়ে দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার লোকচিত্র ধারার সংশোধিত রীতি, এই দুই রীতির অপূর্ব সমন্বয়-সংশ্লেষণে। ফলে যে কোন বাংলা পটে সবচেয়ে মুখ্য হয় মূল ফর্ম, আকার ও ডিজাইনটি, এককথায় প্রতিমা বা ইমেজটি। এই ইমেজটি পূর্ণমাত্রায় উচ্চারণের দিকে যায় সব ঝোঁক আগ্রহ ও শক্তি, যে ইমেজ দৃশ্য ও অদৃশ্য ফ্রেমের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ অথচ দ্যোতনায় অসীম ; যে ফ্রেমের মধ্যে থেকে ছবিতে ফুটে ওঠে এক অখণ্ড সমগ্র রূপ ও ডিজাইন। যে ফর্ম, রূপ বা ডিজাইনের কাছে অন্য সমস্ত গুণ গৌণ, সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত, এমন কি রঙের প্রয়োগও এমনভাবে আসে যাতে রঙের বিপরীত বৈষম্যে (ইংরেজিতে ডিসোনান্সে) ধাক্কা খেয়ে ফর্মটি ফুটে উঠতে সাহায্য পায়। বলা বাহুল্য এই ফর্ম বা ডিজাইনের বিবর্তনে যেমন মন্দিরের গায়ের টালির কাজ, ধাতুঢালাই কাজ, ছেদন-ভাস্কর্য (স্কাল্পচার) ও যোজন ভাস্কর্য (মডলিং) বা মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ সাহায্য করেছে, তেমনি করেছে উড়িষ্যা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের ক্যালিগ্রাফির রেখা। দুই রীতিনীতির সমন্বয়ে বাংলাপটের রেখা হয়েছে যেমন তারের মত তীক্ষ্ণ, শক্ত, স্পষ্ট, তেমনি তার গড়নে এসেছে মূর্তিসুলভ গভীরত্ব, ঘনত্ব, মডলিংএর গুণ। আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ এসেছে মুখ্যত নেপালী ধাতুঢালাইয়ের কাজ ও বাংলার মাটির প্রতিমা থেকে। তা হচ্ছে ছবিতে কাপড়ের ভাঁজে বা ইংরেজিতে যাকে বলে ড্রেপারি, তার বিন্যাসে। সে বিন্যাসের সঙ্গে তিব্বতী টাংকার আবার দূর সম্বন্ধ আছে।

শুধু যে লোকচিত্রে তা নয়, বাংলার পাথরের মূর্তিতে, মাটির পুতুলে, লক্ষ্মীর সরায়, কাঠ খোদাইয়ে একটি অখণ্ড, সমগ্র ফর্ম, রূপ ও সর্বাশ্রয়ী ডিজাইনের প্রতি খুব লক্ষ্য দেখা যায়। তার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ সৌভাগ্যক্রমে নানা সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র হয়। বাংলা দেশে হিন্দু বা মুসলিম দরবারী রীতি গভীর ছাপ রাখতে পারেনি। বাংলার লৌকিকতা বাংলার জলবায়ু মাটির নশ্বরতায়, ভারতের নানা সাম্রাজ্যের প্রান্তিক গৌণতায় ও প্রাদেশিকতায়, অনার্যের বর্ণসঙ্করতায়

গড়ে উঠেছে। আরও কারণ হচ্ছে যে, যে বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষের দূর দূর স্থানে গিয়ে নানা প্রভাব, মেজাজ ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, তাদের লোকচিত্র ও দরবারীচিত্রকে ধন্য করে, অপূর্ব সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশই হয় সেই বৈষ্ণবধর্মের আদি ভূমি।

উনিশ শতকে ও তারপর বিভিন্ন লোকচিত্রনীতি কোন্ ধারায় চলে তার সামান্য আলোচনা পরের অধ্যায়ে করব। এখানে শুধু এটুকু বললেই হবে যে এইসব লোকচিত্ররীতিতে মুঘল বা রাজপুত চিত্রের দরবারী অলঙ্কার বাহুল্য একেবারে নেই, এমনকি তাদের মেজাজের সঙ্গেও বিশেষ কিছু যোগ নেই। তার কারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষে ব্যবহারযোগ্য, আরামদায়ক গড়ন ও যে কাজের জন্য যে জিনিষ তৈরি সেই কাজের পক্ষে উপযুক্ততাই যেমন সে জিনিষের উৎকৃষ্টতার পরিচায়ক হয়, তেমনি লোকচিত্রের মুখ্য গুণ হচ্ছে তার ফর্ম ও ডিজাইনের অখণ্ডতা, যার জোরে স্বল্প এক আধটি পট বা ছবি থাকলেই ঘর আলো হয়ে থাকবে, গৃহস্থের মনে আনন্দ ও চোখে আরাম আনবে।

বর্তমান যুগে ভারতীয় চিত্রকলায় মুঘল, রাজপুত, পাহাড়ী এমন কি অজন্তাচিত্রের যে পরিমাণ অসার্থক, নীরক্ত, ঠুন্‌কো অনুকরণ ভারতীয় চিত্রঐতিহ্যের নামে অন্যায়ভাবে চালু করার চেষ্টা হয়েছে, তাতে অনেক বিদগ্ধ দর্শক যেন দরবারী চিত্রের নামও সহ্য করতে পারেন না। এর অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত, অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মিনিয়েচর হয় বিদেশী সংগ্রহে দেশ থেকে বেরিয়ে গেছে, নয় রাজা মহারাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহভুক্ত হয়ে আছে, ফলে চিত্রকলার ছাত্রদের পক্ষে সেসব দেখা খুব শক্ত, যেসব বইয়ে ভাল প্রিন্ট আছে সেগুলিও দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয়ত দরবারী চিত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভাল আলোচনাও নেই। কিন্তু অজন্তা চিত্রকে যদি ভারতীয় চিত্রের প্রাচীন দরবারী নিদর্শন বলে ধরা যায়, তাহলে তার থেকে যে দুটি স্পষ্ট ধারা সবরকম ভারতীয় চিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে তা ধরতে কষ্ট হয় না। অজন্তা বা বাঘ চিত্র যখন আঁকা হয় তখন বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে নিশ্চয় অনেক নিপুণ চিত্রকর ভারতের নানা জায়গা থেকে এসে বড় বড় ওস্তাদের নির্দেশে গুহাচিত্র নির্মাণ করেন। পরে নিশ্চয় তাঁরা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে ছড়িয়ে পড়েন। তাই অজন্তার একটি ধারা আমরা পাই লেপাক্ষী, আনেগুণ্ডি, তিরুপতি, তাঞ্জোর মন্দির চিত্রের পথ ধরে উড়িষ্যায়, বাঙলার পটে, পাটায়, এমনকি বিষ্ণুপুরী তাসে। ছবির জমিকে যেভাবে ভাগ করা হয়, ছবির স্থাপত্যে, নরনারীর ভঙ্গীতে, মেঘ এবং অন্যান্য চিহ্নের ভঙ্গীতে, সর্বত্রই অজন্তার অতীত প্রভাব স্পষ্ট। অজন্তার আরেকটি প্রভাব প্রসারিত হয় বিজয়নগরের মধ্য দিয়ে পারসীক রীতির সংমিশ্রণে পশ্চিম ভারতের মিনিয়চরে, গুজরাটী পুঁথিতে। সেখান থেকে বুন্দেলারীতির নিদর্শন রেখে, মেশে পারসীক ও মুঘল রীতির সঙ্গে। তার যে অপূর্ব ফল হয় তার আলোচনা আগেই হয়েছে। মুঘল রীতির সূচনায় আবার একটি আবার-জন্মানো যুগ আসে যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই রাজপুত, মুঘল, পাহাড়ী ও দক্ষিণী মিনিয়েচরে। কিন্তু এখানেও মনে রাখা দরকার যে শিল্পীরা সকলেই সভাসদ ছিলেন না, তাঁদের বহু অনুচর ছিলেন যাঁরা

নিতান্ত সাধারণ কারিকর। উপরন্তু মিনিয়েচরগুলি কিছুটা আঁকা হত রাজান্তঃপুরবাসিনীদের জন্য, যাঁরা হারেমের দুর্ভেদ্য আড়ালে থেকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের লোভে হাঁপিয়ে উঠতেন। উপরন্তু আবহমান কালের মত দরবারী শিল্পীদের কারিকররা দরবার থেকে যা পারিশ্রমিক পেতেন তা যথেষ্ট হত না। ফলে তাঁরা অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্রের অজস্র নকল করে সাধারণ ক্রেতাকে বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। ফলে দরবারী চিত্রেরও সাধারণ গ্রাহক ছিল, এবং এই সুত্রেই দরবারী চিত্র সাধারণ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। বলাবাহুল্য যোগাযোগ কখনও এক তরফা হয় না। এবং এই কারণেই প্রতি যুগে ভারতীয় দরবারী চিত্র ও লোকচিত্রের মধ্যে লক্ষণগত, এমনকি চরিত্রগত যোগাযোগ কিছু কিছু দেখা যায়।

অপরপক্ষে যাঁরা আজ দরবারী চিত্রকে অবজ্ঞা করে লোকচিত্রকে মাথায় তোলেন, তাঁরাও বাড়াবাড়ি করেন, তাঁদের অত্যুক্তিতে চিত্রগত উৎসুক্য ছাড়াও লঘু রাজনীতি ঢুকে যায়। শিল্পসৃষ্টি সব সময়েই সচেতন প্রচেষ্টা, সর্বদাই তা মানুষের তদানীন্তন প্রজ্ঞা ও চেতনার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পরিচয় দেয়। সুতরাং নিরতিশয় বিদগ্ধ মন ছাড়া অগ্রপশ্চাৎ বিচার করে চিত্রধারার গতি সজ্ঞানে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। লোকচিত্র সর্বদাই লৌকিক সংস্কৃতির পরিচয়, অতএব তা মূলত সজ্ঞানকর্ম নয়, যদিও পূর্বজ মহাশিল্পীদের সজ্ঞান কর্মের ছাপ তাতে থাকে। ইতিহাসে অসাধারণ ব্যক্তি, বিশেষত শিল্পীর, স্থান সর্বদাই অবিসংবাদিত। সুতরাং আজকের দিনে ভারতীয় চিত্রকলার ছাত্র মাত্রেরই ভারতের বিবিধ চিত্রধারার সম্যক জ্ঞান লাভ করার প্রশ্ন ওঠে ; একমাত্র সেই সাধনার মধ্য দিয়েই তিনি বুঝতে পারবেন কি ভাবে প্রতিযুগে দরবারী চিত্রের সঙ্গে লোকচিত্রের সংযোগ ছিল। দরবারী চিত্রঐতিহ্যকে হেয় করে লোকচিত্রকে মাথায় তোলা এক ধরনের রোমান্টিক ভাববিলাস।

আদি উপজাতিদের ছবি

যে সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, যার মধ্যে আমরা পুরুষানুক্রমে মানুষ হয়েছি, যার ইতিহাস আমাদের সমস্ত আলোচনা সাধারণত জুড়ে থাকে, আমরা এই বইয়ে সেই ভারতীয়, সাধারণভাবে যাকে আর্য সভ্যতা বলি, তারই চিত্রকলার আলোচনা করেছি। কিন্তু তার পশ্চাদ্‌পটে আদি ভারতীয় উপজাতিদের নক্সা, রঙ, ছবি, ভাস্কর্য, বসনভূষণ, ধর্মোপচার কিভাবে আমাদের সভ্যতাকে প্রতিক্ষেত্রে আবেষ্টন করেছে, আমাদের প্রতিটি গূঢ় লৌকিক আচার ব্যবহার, ধর্মনীতি, মুদ্রা, প্রতীক, চিত্র, সাজন এবং মনের গড়নকে রূপায়িত করেছে, তা আমরা সাধারণত মনে রাখি না। সম্প্রতি শিশুদের আঁকা ছবি, তাদের নক্সা, রঙের ব্যবহার, গড়ন, সাজন নিয়ে মহা মহা শিল্পীরা নিজেদের সমস্যার তাগিদে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন, শিশুদের আঁকা ছবির কাছে তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে ঋণ স্বীকার করেছেন। যুগযুগান্তরের অনুশীলনে, অভ্যাসে, নিরলস প্রচেষ্টায় চিত্রজগতে যে সমস্ত

আইনকানুন, বিধিবিচার, মানদণ্ড অলক্ষ্যে স্তূপীকৃত হয়ে শিল্পীর হাত, চোখ ও বিচারকে বাঁধাপথের দিকে ঠেলে, মহান শিল্পীরা সেই পথে উনিশ শতকের শেষভাগে এক চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে হঠাৎ তার শেষ দেখতে পান এবং মরীয়া হয়ে নতুন পথ খোঁজায় ব্যস্ত হন। আধুনিক ভাষায় যাকে 'দৃষ্টির নিষ্কলুষতা' বলে, অর্থাৎ যে দৃষ্টি বাঁধা সড়কের ঠুলিতে আবৃত নয় তার জন্য তাঁরা ব্যাকুল হন। পৃথিবীর সর্বত্র সব আদিউপজাতিদের ছবি ও ভাস্কর্যের মতই ভারতীয় আদি উপজাতিদের ছবি ও শিল্পও এই 'দৃষ্টির নিষ্কলুষতা'র ঐশ্বর্যে, জ্যামিতিক সারল্যের মহিমায়, নিরাভরণ সাবলীলতায়, সাজনের স্পষ্ট ঋজু প্রয়োগে বিশেষভাবে মণ্ডিত। সরল, বিধিবদ্ধ সমাজে, যেখানে প্রত্যেকটি প্রাণীর আচার ব্যবহার, কর্তব্য, দায়িত্ব ছকে বাঁধা, যেখানে বিশ্বাস রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ নেই, সেখানে সৃষ্টির প্রকাশ নিতান্ত ছন্দোবদ্ধ ও বাহুল্যবর্জিত হতে বাধ্য, সেখানে চিত্রত্বের প্রকাশ স্বতঃই স্বাভাবিক। সে রকম সমাজে শিল্পীর চোখে বস্তুর তন্মাত্র জ্যামিতিক রূপ সহজেই প্রকাশ পায়, বস্তু ও নির্বস্তুর প্রভেদ থাকে কম, বস্তুর প্রাকৃত রূপের চেয়ে তার প্রকৃত রূপ, বিশেষ রূপের চেয়ে সামান্য রূপ আরও সহজে উদ্ভাসিত হয়। সুতরাং সেখানে শিল্পীর দৃষ্টি বস্তুর প্রাকৃত বা আকস্মিক গড়নে আবদ্ধ থাকে না, বরং দৃশ্যমান জগতের নানা বস্তুর সামান্য রূপ বা জ্যামিতিক গড়ন আরও সহজে ধরা পড়ে ; ঠিক যে হিসাবে শিশুদের চোখ যে কোন দৃশ্যে যেটি মুখ্য এবং সম্ভাবনাময় সেটিকে ধরে তারই রূপটি প্রধান করে, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মধ্যে সীমারেখা নষ্ট করে যেটি তার হিসাবে জরুরী ও বিশেষ মূল্যবান তাকেই তুলে ধরে।

অথচ আদি উপজাতিদের চিত্রে ও ভাস্কর্যে, বসনভূষণে ও সাজনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তাদের একান্ত নিজস্ব ও তীব্র স্থানীয় ভাব। এবং এই তীব্র স্থানীয় গড়নে ও রঙের সমাবেশের স্বকীয়তায়, চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই হয় সেরকম সম্পূরক প্রবৃত্তিও দেখা যায় খুব বেশী। চারপাশের প্রকৃতির রঙ ও গড়নের সঙ্গে বিরোধ হলে যেখানে পরিপূর্ণতা আসে, উপজাতিদের বসনে-ভূষণে, সজ্জায়, চিত্রে সেখানে এসেছে ঠিক সেই ধরনের উগ্র গড়ন ও রঙ ; যেখানে সম্পূরক নম্রতা, বাহুল্যহীন সারল্য ও স্নিগ্ধতা এলে পরিপূর্ণতা এবং একাত্মতা আসে সেখানে এসেছে ঠিক সেই ধরনের অনুগ্র রঙ, নরম রেখা ও গড়ন। যথা, রাজস্থান হায়দ্রাবাদ বা তেলেঙ্গানার উপজাতিদের অথবা আসামের পার্বত্য অঞ্চলের নাগা সম্প্রদায়দের মধ্যে আমরা পাই অতি চড়া এবং নানা রঙের অদ্ভুত পোশাক, শুদ্ধ জ্যামিতিক নক্সা। অন্যদিকে আবার শ্যামল বাঙলা দেশ, সাঁওতাল পরগণা বা ছোটনাগপুরের উপজাতিদের বসনে ভূষণে আমরা পাই রঙের স্নিগ্ধ অপ্রাচুর্য, সাদা-ধূসর বা সাদা-গেরুয়া আল্পনা, ঢেউখেলানো ছোট পাহাড়ের দেশে শালপিয়ালতালের সঙ্গে মানানসই মাটির বাড়ীর খড়ের বাঁকানো বাংলা চাল। অথচ সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে শুদ্ধ জ্যামিতিক নক্সা, মৌলিক বর্ণসমন্বয়, ত্রিকোণমিতির শুদ্ধ গড়ন।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তথাকথিত আর্য সমাজ যতই চেষ্টা করেছেন আদি উপজাতিদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকতে, ততই জীবনের প্রতিটি প্রকাশে এবং বিন্যাসে ধরা পড়েছে উপজাতিদের কাছে তাঁদের ঋণ। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ভারতের যাবতীয় ভাষার পয়ার ছন্দ কিভাবে সাঁওতালী মাদলের মূল ছন্দের কাছে ঋণী। শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বাঙলার আল্পনা ও ব্রত আদি উপজাতিদের নক্সা ও আচার বিশ্বাসের কাছে কতভাবে ঋণী। আসামের অসমীয়াদের ও মনিপুরীদের বসনেভূষণে, গৃহসজ্জায় নাগা ও অন্যান্য উপজাতিদের দান বিশেষ করে দেখিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের কাজ যত এগোবে ততই আমরা বুঝতে পারব ভারতীয় উপজাতিসমাজের কাছে আর্য সমাজ কত বিষয়ে ঋণী।

আদি উপজাতিদের চিত্রে ও শিল্পে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নক্সা, রূপ ও ফর্ম, তাদের বাহুল্যবর্জিত সারল্য, বস্তুর স্পষ্ট, ঋজু, সহজ প্রকাশ, দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন গড়নের সামান্য রূপ সম্বন্ধে আগ্রহ, প্রাজ্ঞ, বহুজ্ঞানী, স্মৃতি ও নৈপুণ্য-ভারাক্রান্ত আধুনিক শিল্পীকে আজ নতুন ভাবে নাড়া দিতে, চিন্তিত করতে বাধ্য। বহু ঐশ্বর্য, জটিল অভিজ্ঞতা, সুগভীর জ্ঞান, বিরাট ঐতিহ্য ভোগ করার পরেও যেমন মানুষ সহজ, সরল, তন্মাত্রিক প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়, নিজের অতীতকে অস্বীকার করে না, বরং তাকে পূর্ণভাবে স্বীকার করে, ঠিক সেইভাবেই আজ বিদগ্ধ মহাশিল্পীরাও আদি উপজাতি সমাজের রূপে উদ্ভাসিত জ্যামিতিক, 'বস্তু-নিরপেক্ষ' চিত্রে ও শিল্পে অনেক সমস্যার এমন নিরাকরণ খুঁজে পাবেন যা পূর্ণজ্ঞানীর পক্ষে শুধু শিশুর কাজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকের ছবি

আঠারো শতকের শেষ দিকে মুঘল চিত্রকলার অপভ্রংশ কোথায় কি রকমভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার কথা আগে অল্প বলেছি। উনিশ শতকে মুঘল দরবারের শিল্পীরা ইতস্তত ছত্রভঙ্গ হয়ে মুঘল রীতি নানা স্থানে নিয়ে যান বটে কিন্তু তাঁদের দিল্লীকলমের জোর আর থাকল না। জয়পুর কলম আঠারো শতকে অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট সৃষ্টি করে, কিন্তু উনিশ শতকে জয়পুরে কলমও স্তিমিত হয়ে আসে। অযোধ্যা বা আউধে আর লক্ষ্ণৌতে লক্ষ্ণৌএর নবাব বংশের অনেক ক্ষুদ্রাকার বা মিনিয়েচর ছবি হাতীর দাঁতের পাটার উপর করাতেন। কিন্তু সে সব ছবির কোনটারই চিত্রগত মূল্য খুব বেশী হল না।

আঠারো শতকের শেষে দিল্লীর শিল্পীরা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে 'বাজার' রীতির সৃষ্টি করেন, যেমন লক্ষ্ণৌএ, হায়দ্রাবাদে, নেকোণ্ডায়, পুণায়, সাতারায়, বানারসে, মথুরায়, মহীশূরে, তাঞ্জোরে। কেউ কেউ লাহোরে, রাজস্থানের ছোট ছোট রাজ্যে, আউধে, বিজাপুরেও যান। অনেকে যান বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে, এবং মুর্শিদাবাদের আশে পাশে, যেমন কাশীমবাজারে, বালুচকে।

লক্ষ্ণৌতে যে সব ক্ষুদ্রকায় রীতি হয়, তার মধ্যে পুরনো দিল্লী কলমের যথেষ্ট সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু এসব ছবিতে ইওরোপীয় পোর্ট্রেট রীতি ঢুকে তাদের জাত নষ্ট করে দেয়, ফলে মিনিয়েচরগুলি

মেডালিয়ন ধরনে দোআঁশলা হতে থাকে। যদিও লক্ষ্ণৌ কলমে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটই বেশী হ'ত, এবং পোর্ট্রেট হিসাবে যথেষ্ট যথাযথ ও সার্থক হত, তবুও ছবিতে বড় অলঙ্কারবাহুল্য আসে, এবং ক্রমশ সেগুলি অলঙ্কারের ভারে জ্যাবড়া হয়ে পড়ে। রুচিরও অবনতি যথেষ্ট ঘটে, কারণ আউধ দরবার রুচির বিকারে প্রসিদ্ধ ছিল বলা যায়। ফলে, অনেক যত্নের প্রমাণ থাকলেও, ছবিগুলি রুচির বিকৃতিতে রসদুষ্ট ও খেলো হয়ে যায়। রেখায় আড়ষ্টভাব, জড়তাও যথেষ্ট আসে, সেই সঙ্গে আসে খানিকটা ইতরভাব। ছবিগুলি নিতান্ত সংকীর্ণ, প্রাণহীন, আড়ম্বরময় কারিগরির কাজ হ'য়ে পড়ে।

উনিশ শতকে একমাত্র পাঞ্জাবের পাহাড়ী রাজ্যগুলিতেই শুধু চিত্রকলা যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল বলা যায়। কত ধরনের কত কাজ হয়েছিল তার সম্পূর্ণ হিসাব এখনও হয়নি। পাহাড়ী রাজ্যগুলি থেকে আবার অনেক শিল্পী লাহোর ও অমৃতসরে শিখ দরবারে কাজ নিয়ে চলে যান। এ দুটি শহরে যে সব শিখ চিত্রকলার নমুনা পাওয়া যায় তার অনেক ছবিই নিকৃষ্ট স্তরের। বিশেষত উনিশ শতকের শেষ দিকে ইওরোপীয় নীতির প্রভাব বড় স্পষ্ট হয়। কপূর সিং বলে একজন শিল্পীর অনেকগুলি ক্ষুদ্রকায় প্রতিকৃতি গ্রুপের নক্সায় যথেষ্ট শক্তি ও গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের একটি কথা খুব উল্লেখযোগ্য। "সাধারণ লোকের জন্যে কালীঘাটের পট, বটতলার লিথোগ্রাফ হত ; ওরই মধ্যে লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্ত লোকদের জন্যে হত বৌবাজার আর্ট স্টুডিওর পট আর অয়েল পেন্টিং ; আর বড়লোক, জমিদার, রাজারাজড়ার জন্যে হত রবিবর্মা প্রভৃতির ছবি।" উনিশ শতকের পুরো একশ বছরের শিল্পকলার ইতিহাস এই উক্তিটির মধ্যে পাওয়া যায়।
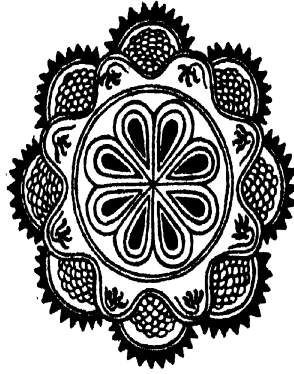
দেশজ রীতি

সারা ভারতবর্ষে সর্বত্র যে বিভিন্ন লোকচিত্র রীতি ছিল, উনিশ শতকে অবহেলা ও অবজ্ঞা পেয়ে সেসব রীতির ফিরিঙ্গী নাম হয় 'বাজার' রীতি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নতুন শিক্ষা, নতুন আলোর আস্বাদ পেয়ে দেশীয় চিত্ররীতিকে অবজ্ঞা করতে শেখেন। তখন দেশীয় চিত্র,

প্রতিমা, মূর্ত্তি থেকে অবজ্ঞায় চোখ ফিরিয়ে নেওয়াই হল শিক্ষার চিহ্ন, তাকে অস্বীকার করাই হল বৈদগ্ধ্য। অথচ ধর্ম ও আচারের সংস্কার এত শীঘ্র মরে না। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় দেবদেবীর পট পূজা কোনমতে বাড়ীর অন্দরমহলের কাণ্ড বলে অস্বীকার ও অবমাননার সাফাই গাইতে ব্যস্ত হন। এই ভাবে শিক্ষিত সজ্জনের কাছে অসম্মানিত, অবহেলিত হয়ে লোকচিত্রকররা উপবাসের রাস্তায় দাঁড়ালেন। মিত্র হিসাবে শুধু পেলেন অন্দরমহলের নারীসমাজকে। তাঁদের তখনও দেবদেবীর পটের ও প্রতিমার প্রয়োজন। উপরন্তু শিক্ষিত স্বামী, ভাই, দেবরদের অপমান, লাঞ্ছনা, ও ব্যভিচারের প্রতিবাদ হিসাবে তাঁরা এইসব চিত্রকরদের ছবিতে পেলেন সান্ত্বনা ও ব্যঙ্গের খোরাক। যে বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে চিত্রকর জাতিটি লুপ্ত হতে বসল, তাঁরাও প্রতিহিংসা হিসাবে যাবতীয় ইঙ্গবঙ্গ আচারব্যবহারের বিরুদ্ধে নিজেদের তুলিতে আনলেন তীব্র শ্লেষ। ফলে একদিকে যেমন দেবদেবীর চিত্ররচনায় তাঁদের কড়া, সতেজ, সরল রেখা হয়ে এল শিথিল, দুর্বল, অলঙ্কারবহুল, অন্যদিকে ব্যঙ্গ চিত্রে, বা কার্টুন, ক্যারিকেটি-ওরে তাঁদের এল দক্ষতা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। এবং যেহেতু চিত্র ও প্রতিমা রীতিতে তাঁদের ছিল পুরুষানু-ক্রমে অধিকার, সেহেতু তাঁদের ছবি কোনকালেই ঠিক পোস্টার বা বিজ্ঞাপনের অসারত্বে বা ক্ষণস্থায়িত্বে নেমে গেল না।

ত্রিচিনাপল্লীতে গত শতকে এই রকম একটি লোকচিত্ররীতি বা বাজার রীতির ঐতিহ্য ছিল। এখানে কাজ হ'ত কাগজে বা টাল্‌কের উপর টেম্পেরা রঙে। এই ধরনের কাজ প্রায় প্রতি বড় শহরেই হত। অধিকাংশ ছবিই হত দেবদেবীর। বম্বে, আহমেদাবাদ অঞ্চলেও যথেষ্ট পট হত। দাক্ষিণাত্যে এই ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল তাঞ্জোরে। রাজা শরভোজীর সময় থেকে অনেকগুলি তাঞ্জোরী শিল্পীর নামডাক হয়। অনেকের ধারণা তাঁরা রাজস্থান থেকে তাঞ্জোরে যান। হয়ত কয়েকজন গেছলেন। কিন্তু তাঞ্জোরের বাসিন্দা শিল্পীও নিশ্চয় ছিলেন। তাঞ্জোরের দরবারে তাঁরা বিশেষ উৎসাহ পান। তাঞ্জোরের শেষ রাজা শিবাজীর রাজত্বকালে (১৮৩৩-৫৫) আঠারো ঘর বিখ্যাত শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা হাতীর দাঁত ও কাঠের উপর কাজ করতেন। কাঠের উপর যে কাজ হত, তা প্রায় খানিকটা উত্তর ভারতের 'জারা' কাজের মত। কাঠের উপর জলরঙে ছবি আঁকার পর ছবিতে ভারী করে গিল্টি করা হত, আর নানা দুর্মূল্য জহরতের গুঁড়ো দিয়ে জমির জায়গায় জায়গায় মিনে দেওয়া হত। কখনও দামী পাথর গুঁড়িয়ে মাঞ্জার মত করে লাগান হত। এদের মধ্যে আবার যাঁরা দরবারী শিল্পী ছিলেন তাঁরা ইওরোপীয় শিক্ষা পেয়ে তেলরঙে কয়েকটি প্রমাণ সাইজের পোর্ট্রেট করেন। তার কয়েকটি তাঞ্জোর ও পুদুকোটার প্রাসাদে ছিল। তাঞ্জোরের রাজা শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঞ্জোরের রাজবংশ শেষ হয়। চিত্রকররাও চারদিকে ছড়িয়ে যান। এঁদের মধ্যে অনেকেই কারিকর হন, অনেকে স্যাকরার কাজ শেখেন, অনেকে শেখেন সোলার কাজ। আবার কিছু ঘর তাঁদের জাত ব্যবসা রাখেন, এবং দেবদেবীর পট আঁকেন। এসব পটে চিত্রগুণ কম, মণিমুক্তার

মাঞ্জা আর গিল্টির অত্যাচারে ছবিগুলি বড় জ্যাবড়া হত, কিন্তু নক্সার কাজে ত্রুটি থাকত না। তাঞ্জোরে পোর্ট্রেট শিল্প খুব ভাল ছিল, বিশেষ করে হাতীর দাঁতের উপর মিনিয়েচর রীতি। ওরই মধ্যে এক আধটি মিনিয়েচর ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হত।

দাক্ষিণাত্যে আরেক জায়গায় চিত্ররীতি রাজদরবারের আশ্রয় পায়। মহীশূরের রাজা কৃষ্ণ-রাজা উডেয়ারের রাজত্বকালে চিত্রকলার খুব উৎকর্ষ হয়। কৃষ্ণরাজা উডেয়ার উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজা ছিলেন। তারও একশ বছর আগে থেকে মহীশূরে চিত্রকলার বেশ সমৃদ্ধি ছিল। কৃষ্ণ-রাজা চিত্র শিল্পীদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিল্পীদের মধ্যে তিনি রীতিমত পরীক্ষার বাজি ফেলতেন, কোন বিশেষ বিষয়ে কে সবচেয়ে ভাল ছবি আঁকতে পারেন এই বিষয়ে বাজি হত। মহীশূরের শিল্পীরাও হাতীর দাঁতের উপর ছবি আঁকতেন। ১৮৬৮ সালে কৃষ্ণরাজা উডেয়ার যখন মারা যান তখন এঁরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন।

দেশজ রীতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় কলকাতার কালিঘাট ও বটতলার পটে। কালিঘাটের চিত্রকররা জাতে পটুয়া অর্থাৎ আদিতে সূত্রধর। কাঠের কাজ ও মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ ছিল পূর্বপুরুষের জাত ব্যবসা, তারপর আসে মাটির প্রতিমা গড়া। মাটির প্রতিমা গড়ার ঋতু আছে। যখন মাটির প্রতিমা গড়ার সময় ফুরিয়ে যেত তখন তাঁরা আঁকতেন পট, গড়তেন খেলনা, মাটির ও ও কাঠের পুতুল। সুতরাং প্ল্যাস্টিক ফর্ম সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল একান্ত রক্তে। কড়া, সাপটা, চিত্রিত রেখা আঁকার ক্ষমতা তাঁরা উত্তরাধিকারক্রমে হাতের পেশীতে পান। কিন্তু শিক্ষা চেতনা ও উৎসাহের অভাবে সে উত্তরাধিকার অসার্থক হয়ে যায়। কিন্তু তবুও তাঁরা ব্যঙ্গচিত্রে আনেন অসাধারণ নৈপুণ্য কৌশল ও পটুত্ব। প্রতিমাগড়া অভ্যাস থাকার দরুণ তাঁদের ছবিতে আসে মড্‌লিং ও ফোর-শর্টনিং এর লক্ষণ, পার্থিব মাটির ওজন ও গুণ, সেই সঙ্গে স্থূলত্ব। প্রতিমার অপার্থিব ভাব যায় নষ্ট হয়ে। বটতলার লিথোগ্রাফ পটে থাকে শুধু বঙ্গে, আহমেদাবাদসুলভ রেখার ব্যঞ্জনা, তাতে ওজন, গভীরত্ব, ঘনত্ব কম। রেখার নক্সা আঁকার পর পরিচারিকারা তাতে অপটুহাতে স্বচ্ছ রঙের লেপ (ইংরেজিতে টিণ্ট) দিতেন, ফলে রঙ প্রায়ই রেখা থেকে বেরিয়ে যেত, রেখার মধ্যে রঙ ধরা থাকত না। এটা হত নিছক অচেতন অপটুত্বের ফল যদিও আধুনিক সচেতন শিল্পীর কাছে এই ধরনের রঙ বিশেষ অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা আনে। কিন্তু এঁরা ছিলেন সত্যকারের দেশী শিল্পী। অর্থাৎ ইংরেজের কাছে শিক্ষা পাওয়া ইংরেজি রীতিতে পাটনাই শিল্পীদের মত কোম্পানির শিল্পী নয়, যদিও এঁরা ফরাসডাঙ্গায়, চন্দননগরে এবং কলকাতায় নিশ্চয় অনেক বিদেশী ছবি দেখেছেন। কারণ এঁরা হতেন পুরুষানুক্রমে সূত্রধর ও পটুয়া শ্রেণীর বংশ, মূর্তিগড়া ছিল এঁদের জীবিকা ; বেমরশুমের সময়ে এঁরা মেলার জন্য গড়তেন পুতুল, খেলনা, আর তীর্থযাত্রীদের জন্য আঁকতেন পট। শহর গ্রামের বাঙালী খরিদ্দার ছাড়া তাঁদের অন্য খরিদ্দার ছিল না। সুতরাং কালিঘাটের পটুয়া শিল্পীরা পাটনা, লক্ষ্ণৌ, তাঞ্জোর প্রভৃতি

জায়গার কোম্পানি শিল্পীদের থেকে জাতে তফাৎ ছিলেন। কারণ 'কোম্পানি' শিল্পীরা ইংরেজি চিত্র-রীতি আয়ত্ত করে ভারতীয় দৃশ্যে সে বিদ্যা প্রয়োগ করেন আর কালিঘাটের পটুয়ারা মুখ্যত জাতব্যবসা চালিয়ে যান পুরনো রীতিতে, যদিও তাঁদের ছবির শরীরের অঙ্গের স্ফীতি ও মড্‌লিং কিছুটা কোম্পানি চিত্র থেকে আসে। তাঁদের দৃষ্টিতে ও কাজে যে অবক্ষয়, অবনতি আসে তার জন্য দায়ী তখনকার সমাজের রুচি ও শিক্ষার অরাজকতা, দুর্নীতি ও স্বাস্থ্যের বিকার। সুতরাং ডবলিউ-জি আর্চার যখন তাঁর 'বাজার পেন্টিংস্ অভ ক্যালকাটা' বইটিতে নিচের অনূদিত মন্তব্যটি করেন, তখন তাঁর মন্তব্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। দরবারী শিল্পজগতে কোথাকার প্রভাব কোথায় গিয়ে কি ধরনের রূপান্তর গ্রহণ করে, আর্চার সে জাতীয় বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু লোকচিত্রের গতিপরিণতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য খুব হৃদয়গ্রাহী নয়; কারণ লোকচিত্ররীতি এক সমগ্র, সাধারণ, সামাজিক জীবননীতি থেকে আস্তে আস্তে অখণ্ড ডিজাইন হিসাবে বেরিয়ে আসে, তার বিবর্তন হয় সাধারণত খুব ধীরে, যখন তখন যে কোন 'প্রভাবে'র ধাকায় বেসামাল হয় না, যতক্ষণ না সে প্রভাব সমাজ ব্যবস্থার একেবারে নীচুস্তর পর্যন্ত পৌঁছে তার কাজ শুরু করে। তাই আর্চারের এই ধরণের উক্তি গ্রহণ করা সম্ভব নয়:

"অন্যপক্ষে কালিঘাটের চিত্রকররা বাঙালী হিন্দু, জাতে পটুয়া, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে দুজনের নাম লোকমুখে সবচেয়ে বেশী শোনা যেত,— নির্বরণ চন্দ্র (? নিবারণ) ঘোষ আর কালীচরণ ঘোষ—তাঁরা ছিলেন দুইভাই। দুজনেই ১৯৩০ সালে আশীবছরেরও উপর বয়সে মারা যান। নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাসও বড় পটুয়া ছিলেন। এঁদের কেউই ইংরেজের কাছে চাকরি করেননি। ফলে, কালিঘাটের ছবির জগতের (স্কুলের) জন্মকালে ইঙ্গভারতীয় চিত্ররীতির প্রভাব খুব গভীরভাবে আসলেও, সে প্রভাব যে শুধু ইঙ্গভারতীয় ছবি দেখার মধ্যে দিয়ে এসেছিল, বিলেতী টেক্‌নীকে শিক্ষা-নবিশীর ফলে আসেনি, সেটা বেশ স্পষ্ট। আরেকটি সম্ভাব্য উপায় নাকচ করা যায় না: হয়ত কালিঘাটের মন্দিরের আশে পাশে ইংরেজশিল্পীদের তাঁরা আঁকতে দেখেন, এবং তাঁরা যে একটি বিশিষ্ট প্রথা বা টেক্‌নিক মত চলেন, তা তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এসব নিশ্চয়ই তাঁরা দূর থেকে দেখেছিলেন, সুতরাং তাতে করে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত রীতিমত পুরো শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে আশ্চর্যের কিছুই নেই, যে বৃটিশ টেক্‌নিক আত্মসাৎ করতে গিয়ে কালিঘাটের পটুয়ারা কতকগুলি মোটা লক্ষণই আয়ত্ত করেন, এবং অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে তাঁরা নতুন এবং আরও মোক্ষম অদলবদল করতে বাধ্য হন।"

ফরাসডাঙ্গা বা কালিঘাটের পটুয়া আর লক্ষ্ণৌ বা পাটনাই কোম্পানির চিত্রকরদের মধ্যে জাতিগত তফাৎ আছে। তার ফলে দুইদলের কাজেরও তফাৎ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কালিঘাটের পটে হয়ত কিছু ইঙ্গবঙ্গ বা বিলেতী আখ্যান, বিষয়বস্তু বা পোশাক পরিধান এসেছে, যেমন টপহ্যাট, কোট, পাৎলুন, বিলেতী ছাতা, হ্যাণ্ডব্যাগ, গ্যাটম্যাট করে চলার ভঙ্গী ইত্যাদি। কিন্তু তা বলে সে সব দৃশ্য

আঁকার সময়ে আঁকার রীতি কখনও পাটনাই বা কোম্পানি রীতি হয়ে যায়নি। হয়েছে নিতান্ত দেশী, বাঙালী। ঠিক যেমন টাহিটির মেয়ে বা টাহিটির প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়েও গোগ্যাঁর তুলি ইওরোপীয় হয়ে গেল, প্রাচ্য হল না, যার ফলে ছবি দেখলেই বোঝা যায় ইওরোপীয় শিল্পীর আঁকা। পাটনাই শিল্পীর পক্ষে কোম্পানির ইংরেজ শিল্পীর রীতি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ লক্ষ্ণৌ বা পাটনার শিল্পীরা মুখ্যত ছিলেন পেশাদার দরবারী শিল্পী অর্থাৎ পরভুক। নবাব, রাজা বা ইংরেজ মনিব যেমন ইচ্ছা করতেন পেশাদার শিল্পী তাঁর তুলি ও কলমের হুকুম-তামিল-করা নৈপুণ্যে ঠিক সেইরকমটি আঁকতেন। ফলে লক্ষ্ণৌ, পাটনাই কলমে যে ছায়াতপ, গাঢ়-ফিকে, মড্‌লিং আসে তা নিতান্ত ইওরোপীয় রীতি ঘেঁষা, তাতে নিস্তেজ দিল্লী ও আউধ কলমের মিনিয়েচর রীতি ও পশ্চিমী বাস্তব ঘেঁষা রীতির মিশ্রণই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিজস্ব স্বকীয় রীতি বা চরিত্র বজায় রাখার কোন প্রশ্নই তার পক্ষে ছিল না। কাজে কাজেই পাটনাই কলমের ছবি নিতান্ত চিনিয়ে দেওয়া, গল্প-বলা বর্ণনাত্মক ছবি, ইংরেজিতে যাকে বলে ইলাস্ট্রেশন। তার জাত, চরিত্র, দর্শন, মূলত আমরা যাকে বলি কার্টুন ও পোস্টারের। এই রীতিটি উনিশ শতকের শেষার্ধে আসে চোরবাগানের শিল্পীদের ছবিতে ও বৌবাজার আর্ট স্টুডিওয়। ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষের নানা জায়গার বটতলা, বাজার থেকে দেবদেবীর ছবি সংগ্রহ হয়ে জার্মানীতে চালান হয়ে, জার্মানী থেকে লাখে লাখে ওলিওগ্রাফ এসে দেশ ছেয়ে যায়। অন্যদিকে কোম্পানি রীতির পথ ধরে রাজা রবিবর্মা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেন। ভারতের চিত্রজগতে এইভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে ষোলশতকে মুঘল রীতির আবির্ভাবের ইতিবৃত্তের মিল খুব কম। কারণ মুঘল রীতির উৎপত্তি হয় ভারত পারসীক রীতির মিশ্রণ থেকে। চীনে, পারসীক ও ভারতীয় রীতির মূলগত ঐক্য ও সাদৃশ্য অনেক। প্রথম মূলগত ঐক্য হচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রাচ্যরীতির উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ চ্যাপটা, ফ্লাট দুইমাত্রিক জমিতে অলঙ্কারাত্মক বা ডেকরেটিভ চিত্র আঁকা। ফলে একের রীতি অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে সার্থক হওয়া বেশী শক্ত নয়। কিন্তু ইওরোপীয় ছবির মূল অন্বিষ্ট হল দুইমাত্রিক কাগজের জমিতে তিনমাত্রিক স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রকৃতির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-ঘনত্ব-ভল্যুম আনা এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা। সুতরাং প্রাচ্য চিত্ররীতিতে সার্থক পশ্চিমী মেজাজ ও আমেজ আনা যেমন শক্ত, পশ্চিমী চিত্ররীতিতে প্রাচ্য অলঙ্কারাত্মক গুণ আনাও তেমনি শক্ত। ফলে ভারতীয় চিত্রঐতিহ্যে হঠাৎ যখন পশ্চিমী রীতি দেখা দেয় তখন চিত্রে চিত্রগুণ কমে গিয়ে বিজ্ঞাপন বা পোস্টারের অগভীর, ক্ষণস্থায়ী, চোখের ছাপের গুণ আসে।

কিন্তু কালিঘাটের পটুয়ার মনিব নবাব বা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল না। তাদের মনিব ছিল সাধারণ বাঙলা সমাজ, যে সমাজে একদিকে বেহুলাপট অন্যদিকে গাজীরপট, একদিকে প্রতিমা মূর্তি অন্যদিকে পীরের ঘোড়া, শিশুদের সস্তার খেলনা ও বাড়ীতে দেবদেবীর পট ছিল প্রাত্যহিক উপকরণ। ফলে বাঙালী জীবনের সঙ্গে পটুয়ার হাতের কাজের ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল। এই নিগূঢ়

প্রাত্যহিক সম্বন্ধের ফলেই পটুয়ার হাতে আসে নিশ্চিন্ত সবল আত্মবিশ্বাস, প্রতীতি ও দ্বিধাহীন সাপটা কাজ, যা বাঙালী জীবনের মতই আড়ম্বরহীন, সামান্য অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে পটুয়া সম্প্রদায় নিতান্ত অজ্ঞ, অলস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অচেতন হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তাদের হাতের কাজ দৈনন্দিন নিত্যকর্মে প্রয়োজন হত, সেইহেতু ব্যবহারযোগ্য, আবশ্যিক, সংযত, অনাড়ম্বর, সবল রূপ থেকে সে কাজ কখনও বিচ্ছিন্ন হত না। ফলে তাদের কাজ কখনও একেবারে মূল্যহীন হত না। যদিও শিক্ষা, দীক্ষা, চেতনা ও অনুশীলনের অভাবে তাদের রূপদৃষ্টি ক্রমশ আবৃত হয়ে পড়ে, তাদের তুলি নিস্তেজ হয়, তাদের ভাবচ্ছবি কুরুচিদুষ্ট হয়ে নিতান্ত স্থূল, প্রবৃত্তিমূলক, কর্কশ হয়ে পড়ে, তবুও কালিঘাটের পটুয়ার কাজ আর পাটনাই শিল্পীর কাজের মৌলিক তফাৎ আছে। প্রথমটি চিত্রের নিয়ম, ছন্দ; দ্বিতীয়টি বর্ণনামূলক পোস্টার।

কালিঘাটের ছবির উৎপত্তি দেবদেবীর মাটির প্রতিমা ও খেলার পুতুল থেকে। কালিঘাটের পটের রেখা, আকৃতি, ডিজাইন, ফর্ম সমস্তই মাটির প্রতিমার গড়ন থেকে এসেছে, তার রেখার বর্ণ, রঙ, তুলির টান সবই প্রতিমারঞ্জনের তুলির কাজ। ছবিতে গাঢ়-ফিকে, শেডিং, মডলিং ও তিনমাত্রার আভাস যে গড়নে ফুটে ওঠে সে-গড়ন মাটির প্রতিমার নিশ্চল, মাটির স্বভাবে ভারী গড়ন; রক্ত-মাংসে গড়া প্রাণস্পন্দিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন নয়। কালিঘাটের পটের যে নিশ্চল স্থির স্তব্ধতা দেখি তা নিতান্ত কাদা দিয়ে মডল করা মূর্তি বা পুতুলের নিষ্প্রাণ স্তব্ধতা, প্রশান্তি নয়, অশ্রান্ত চঞ্চল প্রাণের কেন্দ্রবিন্দুর স্তব্ধতা নয়।

কি অবস্থায় কালিঘাটের পট হত তাও একটু বিবেচনা করা দরকার। সতেরো শতকে কালিঘাটের মন্দির হবার একশ' বছরের মধ্যে কলকাতা শহরের নাম ডাক হতে শুরু হয়। ব্যবসার সঙ্গে তীর্থেরও যশ ছড়ায়। তিথিতে তিথিতে বহু হাজার লোকের নিয়মিত সমাগম শুরু হয়, ফলে দোকানপাট গড়ে ওঠে, সেখানে ঘরের আত্মীয়স্বজনকে দেবার মত খেলনা, পুতুল, ছবির পসরা আরম্ভ হয়। খেলনা, পুতুলের মতই সস্তা ছবি আঁকার তাগিদ আসে। নতুন চাহিদা বুঝে পটুয়ারা এগিয়ে আসেন। তাঁদের মূর্তি গড়ার মরশুম বছরে কয়েকবার মাত্রই আসে, সে মরশুম চলে গেলে বায়নাপত্র আর থাকে না, বছরের অনেকমাস সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। অথচ তীর্থদর্শনের সময় অসময় নেই, যাত্রী আসবেই। তাঁদের ছোটখাটো জিনিষ বিক্রি করার প্রয়োজনে শুরু হয় কাঠের ও মাটির খেলনা, আর দেবদেবীর পট। যে তুলিতে প্রতিমার অঙ্গ সংস্কার হয় সে তুলিতে পট আঁকা বিলক্ষণ চলে। কিন্তু প্রতিমা যে দামে বিক্রি হয়, পট সে দামে হতে পারে না। পটের দাম অগত্যা এক পয়সা, দু পয়সা, বড়জোর দু আনার মধ্যে রাখতেই হয়। ফলে পটে খুঁটিনাটি বিষয় বিশদভাবে আঁকার মজুরি পোষাল না, একটি ছবি যত তাড়াতাড়ি সারা যায় তার হল চেষ্টা। সুতরাং এক-আধটি মূল ডিজাইন, ফর্ম বা চিত্রপ্রতিমা পেলে তারই পুনরাবৃত্তি চলল। সেই পুনরাবৃত্তিতেও খুঁটিনাটি,

খুচখুচে কাজ, যথাসম্ভব বাদ দিয়ে, যাতে সহজে একেকটি ছবি হতে পারে, তার চেষ্টায় এল প্রতিমারঞ্জনের তুলিস্থলভ চওড়া, সাপটা, বাঁকা টান, আর মোটা বুরুষে অবহেলায় লাগান সমান উজ্জ্বল রঙ। একটু সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি যত বেশী ছবি শেষ করা যায় তার তাগিদের ফলে এল যত রকম সরল রীতি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। তখনও বাংলার অন্যত্র পটুয়াদের মধ্যে অনেকে গান গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে জড়ানপট দেখাতেন। তাঁরা ধর্মে ছিলেন দোআঁশলা, না হিন্দু, না মুসলমান। ফলে বাঙলা দেশের মাটিতে দুই ধর্মের যে রূপ ফুটে ওঠে তাঁরা ছিলেন তার গ্রামীন উত্তরাধিকারী। এই সব জড়ান পটের সঙ্গে মুঘল রীতির কিছুমাত্র মিল ছিল না। মিল ছিল দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার প্রাচীন রীতির। সে মিল ছিল মূলত চিত্রনীতির, অর্থাৎ সমান, ফ্লাট জমিতে দুইমাত্রিক অলঙ্কারময় চিত্রের, যাতে ভল্যুম, ম্যাস, পরস্পেক্‌টিভ থাকত না। এই রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হল সূত্রধরের সৃষ্টি, মাটির প্রতিমার ভল্যুম, অনড় ম্যাস্, মডলিং। দুইয়ের সংমিশ্রণে হল পট। ফলে ছবিতে ফিগরের সীমারেখায় এল শক্ত, কড়া, তীক্ষ্ণ বেড়ার মত টান এবং যদিও ভিতরে তুলির কাজ হল একেবারে সমান বা ফ্ল্যাট, তবুও কম্পোজিশনে এল মাটির গড়া প্রতিমার ছন্দ। মাটির মডলিং-এ যেমন স্বাভাবিক আকার বেঁকেচুরে আসে অস্বাভাবিক আকার, মডলিং-এর নিজস্ব নিয়মসুলভ সম্বন্ধপাত, ছবিতেও তেমনি এল নানাধরনের অপ্রাকৃত মাপ, ফোরশর্টনিং। প্রতিমাগড়ায় যেমন মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিমাটিকে স্পষ্ট করা, তার ফর্ম ও ডিজাইনটিকে সর্বস্ব করে তুলে ধরা, তেমনি পটেও বিপরীতধর্মী (ইংরেজিতে ডিসোন্যান্ট) গাঢ় রঙের সাহায্যে চেষ্টা হল, রঙের কর্কশ ধাক্কা দিয়ে ছবির আসল ফর্মটি, ছন্দটি ফুটিয়ে তোলা। ফলে সামান্য কয়েকটি রঙের ব্যবহার হল ; যেমন, গাঢ়, তীব্র সবুজ, দগ্‌দগে হিংস্র লাল, মুখর গম্‌গমে ব্রাউন, জমকালো নীল। জড়ান পট আর কালিঘাটের পটের মধ্যে রঙের ব্যবহারে তফাৎ হয়ে গেল, রেখাও তফাৎ হল। তবে কোনটাই কোম্পানির বিজ্ঞাপন মার্কা ছবি হল না। কালিঘাটের কাজ বরাবরই সামাজিক কর্তব্যবোধের গণ্ডীর মধ্যে রইল। প্রথমে হল কোম্পানি অঞ্চলের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কারের সামগ্রী, তার পরের যুগে হল সামাজিক শ্লেষ ও বিদ্রূপের চাবুক।

এই বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয় তাহলে আর্চারের মত গ্রহণ করতে একটু বাধে। কালিঘাটের পটুয়ারা যে পাটনাই ও কোম্পানি রীতির অপভ্রংশ তা তাঁর বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলতে চেয়েছেন। প্রমাণ স্বরূপ ১৮৩২ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী বেল্‌নসের 'ম্যানার্স ইন বেঙ্গল' বই থেকে ৪৮ ও ৫০ নং ছবি দুটি শেষের দিকে ছেপেছেন এবং ভূমিকায় বলেন যে ১৮৩০ সালে পটুয়ারা বৃটিশ টেকনিক সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি। কিন্তু শ্রীমতী বেল্‌নসের বইয়ে যে ধরনের ছবি আছে তার শিল্পী নিশ্চয় পাটনা বা মুর্শিদাবাদের দেহাতী হিন্দুস্থানী কায়স্থ, কিংবা মুঘল শিল্পীদের মুসলমান বংশধর। আর

কালিঘাটের পটুয়ারা ছিলেন নিতান্ত বাঙালী। সে যাই হোক, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত যে সব কালিঘাটের পট পাওয়া যায় তাতে দেবদেবীর ছবিই বেশী, সে সবে মুখ্য ঝোঁক ছন্দের উপর। ১৮২০-৩০ সালের পর বিলেতী পোশাক পরিচ্ছদ আদব কায়দা সম্বন্ধে উৎসুক্য, ব্যঙ্গভরা উৎসাহ দেখা যায়। সেই সঙ্গে ভল্যুমের প্রতি ঝোঁক চলে গিয়ে আসে বর্ণ ও বর্ণালিবিন্যাসের প্রতি আসক্তি, অর্থাৎ রঙের টোনের প্রতি উৎসাহ। এই ধরনের কাজ প্রায় ১৮৭০ পর্যন্ত চলে। তারপরে আবার আসে প্রচলিত পুরাণের প্রতি, বাঙালী দৈনন্দিন জীবন ও স্টিল লাইফের প্রতি উৎসাহ। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল এবং তারও পরে কালিঘাটের পট হয় আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সামাজিক শ্লেষ বিদ্রূপের হাতিয়ার। সে সব ছবির সঙ্গে তুলনা করা চলে 'জামাইবারিকে'র, 'সধবার একাদশী'র, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র। সামাজিক বিষয়ের প্রবর্তনের সঙ্গে ছবির ফিগরও হল নিতান্ত স্থূল, পার্থিব, উগ্র প্রবৃত্তিমূলক, তাল তাল মাংসের গোলগাল গড়নের ব্যঞ্জনাসূচক, যাকে কবি এলিয়ট বলেন, হাওয়ায় ফাঁপানো রবার টিউবের মত গড়নের সুখ, 'নিউম্যাটিক ব্লিস'। যেমন স্থূল তেমনি কর্কশ। ফলে ছবি হোগার্থ বা ডমিয়েের ছবির মত সূক্ষ্ম, অস্ত্রচিকিৎসকের তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও পুঁজ বার করে দেওয়া আঘাতে রূপায়িত হল না। হল খানিকটা মৃন্ময়, প্রাণহীন, পুতুলের সংসারের আখ্যান। শিল্পীর নিজস্ব মন বা দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান প্রায়ই মেলে না। ওরই মধ্যে যেটুকু শক্তি দেখা যায় সেটুকু আসে কালিঘাটের পটুয়ার মুমূর্ষু অবস্থার প্রতিবাদে আত্মঘোষণার ফলে। কালিঘাটের পটের শেষ অধ্যায় হচ্ছে ১৯০০ থেকে ১৯৩০ সালে। তখন রীতি হল আরও সংক্ষিপ্ত, আরও সাধারণ, আরও আড়ষ্ট, প্রাণহীন। কিছু উডকাটও হয়। ইতিমধ্যে জার্মানীর সস্তা ওলিওগ্রাফ এসে এই রীতিকে একেবারেই নষ্ট করে।

ডব্লিউ-জি আর্চার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুসারে ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে যে সব কালিঘাটের পট আছে, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। ১৮০০-১৮৫০এর মধ্যে আঁকা যে সব ছবি আছে তার কতকগুলি তাঞ্জোরের পট। কালিঘাটের যে সব ছবি আছে সেগুলি প্রায়ই ১৮২০ থেকে ১৮৩০এর মধ্যে আঁকা। এর মধ্যে অনেক ছবিতে বিলেতী জলরঙ আয়ত্ব করার বেশ চেষ্টা দেখা যায়। পটে অস্বচ্ছ রূপালি রঙেরও ব্যবহার যথেষ্ট। ছবির বিষয়ের মধ্যে একআধটি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশই ব্রহ্মা, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, শিব, পার্বতী, জগন্নাথ, কালী, হনুমানের। শ্যামাকান্তের বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের ছবিও আছে। একটি পটে আছে দুই সেপাহীর লড়াই, আরেকটিতে হাতীর পিঠে এক ইংরেজ। একটি পটে তিনটি জকি ঘোড়দৌড়ের রেস করছে। অন্য একটি পটে দুটি পায়রা। জি ওয়াইল্ড সংগ্রহে আছে ষোলটি ছবি, অনুমান ১৮৪৫ সালে আঁকা। তাতে প্রায় সবই পুরাণের বিষয়। একটি পটে আছে ইংরেজ আদালতে খুনের বিচার। শেয়ালরাজার দরবার ছবিটি খুবই ভাল। ১৮৫০-৭০ সালের সংগ্রহ খুব ভাল। একটি সংগ্রহ রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং-এর দান, তাঁর বাবা জন্‌ লকউড

কিপ্‌লিঙ সংগ্রহ করেন। স্যর রডিয়ার্ড সেটি ১৯১৭ সালে দেন। সংগ্রহটিতে ১৫টি ছবি আছে। তার মধ্যে চৌদ্দটি পুরাণ বিষয়ক। শেষটি সামাজিক, মন্দিরের সমুখে কয়েকটি দর্শনার্থী মহিলা, লজ্জায় ঘোমটা টেনে আড়চোখে তাকাচ্ছেন, তাঁদের সমুখে দু'জন নধর দেহ পাণ্ডা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছে। দেখলেই ঘৃণায় শরীর জ্বলে ওঠে। রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ-এর বাবা ১৮৬৫ সালে প্রথম ভারতবর্ষে এসে দশ বছর বম্বে স্কুল অভ আর্টে অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৮৭৫ সালে মেয়ো স্কুল অভ আর্টের অধ্যক্ষ হয়ে লাহোরে যান। সেই পদেই বরাবর থেকে ১৮৯৩ সালে অবসর নেন। স্যার মনিয়ের বিলিয়ম্‌সেরও একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ আছে। ছবিগুলির প্রায় সবই ১৮৬০ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে আঁকা। জন্ আরউইন সংগ্রহ বলে এই সময়ের সাতটি ছবির আর একটি সংগ্রহ আছে। জন্ আরউইন এক সময়ে বাঙলার লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৭০-৮৫ সালের যে সব ছবির সংগ্রহ আছে তাদের বিষয় হিসাবে চারভাগে ভাগ করা যায়; পুরাণবিষয়ক, ঐতিহাসিক, বাঙালী জীবনের নথি বা বর্ণনামূলক, শ্লেষাত্মক। ১৮৮৫-১৯৩০ সালের মধ্যে যে সব ছবি হয় তাদেরও বিষয়ানুসারে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, পৌরাণিক, প্রতিকৃতিমূলক, (বিশেষ করে মেয়েদের ছবি), স্টিললাইফ, শ্লেষাত্মক এবং বাঙালী জীবনের নথিমূলক।

মিশ্ররীতি

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসার ফলে ইওরোপীয় চিত্ররীতিও আসে। অন্যপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সঙ্গে মুঘল চিত্ররীতিরও ভাঙ্গন ধরে। সতেজ ও নিস্তেজ
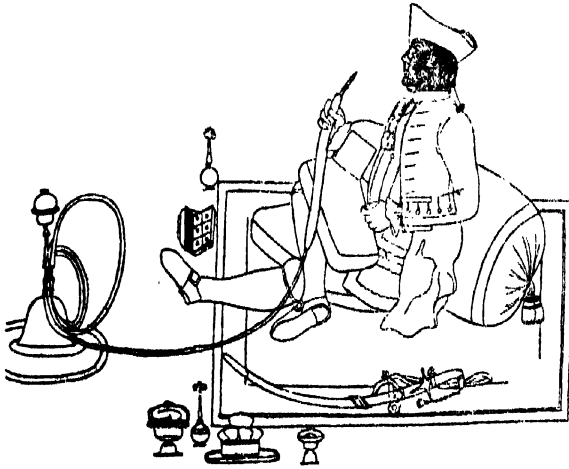
দুটি ধারার সংমিশ্রণে আবার কিছু নতুন কাজ উনিশ শতকে হয়। সে কাজের দুটি ভাগ করা যায়। এক ভাগে দেশী শিল্পী ইওরোপীয় রীতির দিকে ঝুঁকে যে ছবি তৈরি করেন। আরেক ভাগে বিদেশী প্রভু দেশী শিল্পীকে নিজের ইচ্ছামত হুকুম দিয়ে যে কাজ করিয়ে নেন। একভাগে ছিল সচেষ্ট ইচ্ছা,

অন্তভাগে মনিবের হুকুম। দুইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপীর রীতিকে ভারতের মাটিতে নতুন করে ব্যবহার করা। কার্যতও দুই ধারাই এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আলাদাভাবে আলোচনা ঠিকমত সম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে পাটনাই কলমের শিল্পীদের পূর্বপুরুষরা রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের পরতাপগড় জিলা থেকে পাটনায় যান। তাঁরা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে মুঘল দরবারে কাজ নেন ; ঔরঙ্গজেবের সময়ে তাঁদের অনেকে লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ, নেকোণ্ডা, পুণা, সাতারা, বানারস, মথুরা, মহীশূর, তাঞ্জোরে ইতস্তত চলে যান। কয়েকজন যান মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে। সেখানে নবাবের প্রাসাদের দেয়ালে ও অভ্রের উপর রঙীন ছবির কাজের উল্লেখ আমরা নানা জায়গায় পাই। এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ধনীরাম। ১৭৫০ সালের পর মুর্শিদাবাদ দরবারে গণ্ডগোল শুরু হওয়ায় মুর্শিদাবাদের অনেক শিল্পী পাটনায় যান। তখন পাটনা ব্যবসা বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে ; ১৭৭০ সালে পাটনায় কোম্পানির রাজস্ব কাউন্সিল বসে। ১৭৯০ সালের মধ্যে ফৌজদারী আদালত কোম্পানির হাতে যায়। ১৮০০ সালের মধ্যে কলকাতার পরেই পাটনা পূর্বভারতে কোম্পানি শাসনের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হয়। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে কলকাতাতেও কোম্পানির নানাবিষয়ে উৎসাহ দেখা যায়। ১৭৬০-৯০ সালের মধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ—যেমন স্যর এলাইজা ইম্পে, লেডী ইম্পে, শ্রীমতী হুইলর, ন্যাথানিয়েল, মিড্‌ল্‌টন প্রভৃতিরা—দেশী চিত্রকরদের নিযুক্ত করে এদেশের পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গাছপালা, ফলফুল, যথাযথ ভাবে আঁকিয়ে নথিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন (তখনকার দিনে ক্যামেরার সৃষ্টি হয়নি)। অবশ্য তখন কলকাতায় পাটনার মত সরকারী কোম্পানি শিল্পী ছিল না, কিন্তু ইংরেজরা জীবজন্তু, গাছপালার ছবি আঁকাবার জন্যে দেহাতী কায়স্থ শিল্পীদের পাটনা মুর্শিদাবাদ থেকে আনিয়ে নিতেন, অথবা লক্ষ্ণৌ আগ্রা থেকে মুসলমান শিল্পীদেরও আনাতেন। এইভাবে মিড্‌ল্‌টন এক বিরাট অ্যালবাম্ তৈরি করান, যা দেখে পেন্যান্ট "চতুষ্পদ, পাখী, মাছ, শাকসব্জীর এশিয়াটিক নক্সার বিরাট সম্পদ" বলে সে অ্যালবামটির উল্লেখ করেন। ওয়েলেস্‌লির সময়ে অনেক শিল্পী জড়ো করে গুছিয়ে ধারাবাহিক ভাবে দেশী গাছপালা, ফুল ফল, জন্তু জানোয়ার, মাছ পতঙ্গ প্রভৃতির ছবি আঁকান হয়। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এইসব ছবির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাতাশটি অ্যালবাম আছে। ১৮০৪ সালে ব্যারাকপুর লাটভবনে ওয়েলেস্‌লি একটি চিড়িয়াখানা করান, এবং ১৮০৫ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত বুকানন হ্যামিল্‌টনের তত্ত্বাবধানে একজন দেশী শিল্পী এই চিড়িয়াখানার জানোয়ার আর পাখীর ছবি আঁকেন। ইতিমধ্যে ১৭৯৩ সালে শিবপুরে প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক গার্ডেনে, প্রথমে রক্সবরা (১৭৯৩-১৮১৩) তার পর ওয়ালিশের (১৮১৭-৪৬) তত্ত্বাবধানে দেশী শিল্পীরা ধারাবাহিক ভাবে যাবতীয় ভারতীয় উদ্ভিদের ছবি আঁকেন। ইংরেজরাই এ কাজের সম্পূর্ণ তদারক করেন। ছবি আঁকা

হত জলরঙে, ইওরোপে এই ধরনের আঁকার যে টেকনিক ব্যবহার হত এখানেও সেই টেকনিক দেশী শিল্পীদের যত্ন করে শেখান হয়। ফলে দেশী শিল্পীরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজে উৎসাহ পায়। শুধু যে এক আধ জন শিল্পী এ ধরনের কাজে আকৃষ্ট হলেন তা নয়। জলরঙে আঁকা, আসল জিনিষটি সমুখে বসিয়ে রেখে তাই দেখে দেখে যথাযথ ভাবে চোখের চেনামত করে আঁকার বিদ্যা আয়ত্ব করার জন্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া তখন যে কোন বিলেতী জিনিষের সম্মান খুব বেশী। ফলে ঘরবাড়ীর ইঙ্গ-ভারতীয় গড়নের মত চিত্রে ইঙ্গ-ভারতীয় টেকনিকও হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র আদৃতও হল। তখনকার দিনে ইংরেজদের মৃত্যুর হার বেশী থাকায় ইংরেজ ভদ্রলোকদের আসবাবপত্র বসনভূষণ নীলামে বিক্রিও হত খুব, এবং দেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা খুব আগ্রহভরে সে সব কিনতেনও প্রচুর। আজও যেমন ম্যাকেঞ্জি লায়ালে নীলাম হয়। ফলে আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই বিলেতী জলরঙের ছবি আর ছাপাছবি বা প্রিন্ট বাজারে প্রচুর পাওয়া যেত। এমন কি ১৭৮৮ সালে টমাস ড্যানিয়েল বলেন "সামান্য ছোট বাজারেও প্রচুর প্রিন্ট পাওয়া যায়, গাড়ী গাড়ী হজেসের 'ইণ্ডিয়ান ভিউজ' বিক্রি হচ্ছে"। এমনকি কালীঘাটের পটুয়ারাও জলরঙের ব্যবহার শিখলেন। যদিও তাঁদের ছবি দেশী রয়ে গেল। পরের যুগের ইঙ্গভারতীয় জলরঙের ছবিতে ওয়েলেস্‌লির করান অ্যালবামের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। পরের অধিকাংশ ছবিই হত তাঁর অ্যালবামের সাইজে, অর্থাৎ লম্বায় কম বেশী ১৭ ইঞ্চি, চওড়ায় ১১ ইঞ্চি। ছবিগুলি সাদা কাগজের জমিতে আঁকা হত, সাদা পশ্চাদপটটি ভর্ত্তি করা বা রঙ দেবার কোন চেষ্টা করা হত না, ফলে ছবিতে আর ছবির জমিতে কোন সম্বন্ধ স্থাপন হত না। অর্থাৎ ছবির ফ্রেম থাকত না। ছবি হত নিতান্তই বর্ণনামূলক চোখের চেনা করানো ফোটোগ্রাফের পূর্বপুরুষ। এই সময়ে হাওড়ার বালীতে সস্তায় ভাল কাগজ তৈরি হয়ে কোম্পানি অধিকৃত সব জেলায় যেত। এদেশকে জানবার বোঝবার, দেশে ফিরে লোককে দেখাবার আগ্রহ তখনকার দিনের ইংরেজদের ছিল অসীম। এ বিষয়ে মহিলাদের উৎসাহও কম ছিল না। ফ্যানি পার্কস বলে এক মহিলা ১৮২২-৪৫ সালে বহু জায়গায় স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নানা ছবি আঁকেন—যেমন দারোয়ান, সেপাহী, আখ্‌মাড়া কল, সাঁওতাল পরগণার বাঘ, মন্দির ইত্যাদি। চার্লস্‌ গোল্ড বলে এক পল্টনের ক্যাপ্টেন ১৭৯৩ সাল থেকে শুরু করে অনেক ছবি আঁকেন, যেমন বাদুড় ঝোলা বটগাছ, বিয়ের শোভাযাত্রা, নাপিত, সাধু, পল্টন, সেপাই, মেয়েরা ধান ভানছে, চড়কের গাজন, নানাজাতির সামাজিক আচার ব্যবহার। ১৮০২ সালে 'ওরিয়েণ্টাল ড্রয়িংস্‌' বলে তাঁর বই বেরোয়। এর সামান্য কিছু পরে ডাঃ থর্ণ্‌টনের 'টেম্পল অভ ফ্লোরা' বেরোয় (১৭৯৯-১৮০৪), বিলিয়ম ড্যানিয়েলের 'অ্যানিমেটেড্‌ নেচার' বেরোয় ১৮০৯ সালে।

ক্যাপ্টেন গোল্ড তাঁর 'ওরিয়েণ্টাল ড্রয়িংসে' 'তাঞ্জোর মুচির' আঁকা একটি ভিখারী পরিবারের ছবি ছাপেন। গোল্ড বলেন চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঞ্জোর মুচির দেশময় খ্যাতি ছিল। তিনি নাকি

অক্লেশে ভাল ভাল ইওরোপীয় মিনিয়েচর নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারতেন। গোল্ড আরও বলেন, "ইওরোপীয়দের উৎসাহ পেয়ে দেশী শিল্পীরা নানা জাতি উপজাতির নমুনা হিসাবে একটি পুরুষ আর একটি নারীর ছবি আঁকছেন। যদিও শিল্পীরা রীতিমত শিক্ষাদীক্ষা পান্‌নি তবুও তাঁদের হাতের তারিফ করতে হয়।" গোল্ডের মত আরও অনেক পৃষ্ঠপোষক সে যুগে আসেন। ফলে দেশী দৃশ্য আঁকার জন্য অনেক ইওরোপীয় মনিব পাটনার শিল্পীদের নিযুক্ত করেন। এসব ছবির নাম হল ফার্‌কা অর্থাৎ এক ঝলকে দেখা ছবি, ইংরেজিতে স্ন্যাপশট। সাহেবের বাড়ীর আশেপাশে যারা ঘোরে এসব ছবি হল তাদের প্রতিকৃতি: যেমন ধোবা, খানসামা, বাবুর্চি, দর্জি, ঝি, কুকুরের জমাদার, মালী। বাজারের ছবিও হল, কারণ ইংরেজের চোখে প্রাচ্যের বাজার চিরকালই অপূর্ব বিস্ময়ের জিনিষ। বেণে এল, কারিকর এল, এল ফেরীওলা, চুড়িওলা, কসাই, মেছুনি, ঝুড়িওলা, ছুতোর, শুঁড়ি, পাসি, মোমবাতিওলা, মিষ্টিওলা, ভিস্তি, কাঁসারি, সুতলিওলা, কামার। তারপর যানবাহন এল, যেমন হাতী, এক্কা, গরুর গাড়ী, পাল্কী, যাত্রী, গোয়ালা। জাঁতা ঘোরাচ্ছে, চরকা কাটছে, অথবা মন্দিরে যাচ্ছে এমন অবস্থায় মেয়েদের ছবিও আঁকা হল। শ্রীমতী এস্-সি বেল্‌নস্ বলে এক মহিলা ১৮৩২ সালে 'ম্যানার্স ইন বেঙ্গল' বলে একটি বই প্রকাশ করেন তাতেও এ ধরনের ছবি অনেক আছে। তার থেকে দুটি ছবি আর্চার বাজার পেন্টিংস্ অভ ক্যালকাটায় ছাপেন।

স্যর চার্লস্ ডয়লি বলে এক ইংরেজ পাটনায় বিহার লিথোগ্রাফি বলে একটি কারখানা খোলেন। জয়রাম দাস বলে একজন পাটনাই শিল্পীকে তিনি কাজে নেন। বিহার লিথোগ্রাফি থেকে এধরনের অনেক লিথোগ্রাফ প্রকাশিত হয়। ডয়লির প্রকাশিত বইয়ের একটি বিশদ তালিকা শ্রীমতী মিলড্রেড আর্চার তাঁর পাটনা পেন্টিং বইয়ে দিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক শিল্পী ১৭৫০-৬০ সালে উঠে এসে পাটনার লোদীকাট্‌রা, চক, দেওয়ান মহল্লা, মাচারহাটায় বাস শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে সেবক রাম বলে একজন শিল্পীর খুব নাম হয়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে তাঁর ঠাকুরদা শিবলালের আমলে সংগৃহীত, সেবক রামের (১৭৭০? —১৮৩০?) হাতের বারোটি ছবি আছে। কোনটাই অবশ্য সেবক রামের সই করা নয়, কিন্তু সেগুলি যে সেবকরামের সৃষ্টি, যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার থেকে চারটি ছবি শ্রীমতী আর্চার ছেপেছেন। সবগুলি ইওরোপীয় খরিদ্দারদের উদ্দেশ্যে আঁকা। যে টেকনিকে আঁকা তার নাম কাজ্‌লি-শিয়াই। একেবারে সরাসরি তুলিতে আঁকা, পেন্সিলে প্রথমে নক্সা কর হত না। নক্সায় কিছুটা ছকে ফেলা তীক্ষ্ণতা আসত, নাক হত ছুঁচলো, ভুরু ভারি, চোখ দুটি ভিতরে ঢোকানো, শূন্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; মুখগুলি বিশীর্ণ, পাণ্ডুর। সেবক রামের কিছু ছবিতে জ্যামিতিক আকারের প্রাধান্য দেখা যায়। কোণের পর কোণ পর পর সাজিয়ে সে সব ছবি তৈরি। ফিগরগুলির রঙ সচরাচর গাঢ় সেপিয়া ও গম্ভীর লালচে-গেরুয়া, কাপড় ম্যাড়মেড়ে সাদা; ছায়াগুলি নরম ছাইরঙের; মাঝে মাঝে গভীর

সিঁদুরে-লালের চাপ দিয়ে উজিয়ে দেওয়া ; স্থানে স্থানে ম্লান সোনালি বা গাঢ় ময়ূর নীলের স্পর্শ। এই ধরনের গম্ভীর রঙের সমাবেশ নিশ্চয় ইওরোপীয় প্রিন্ট আর জলরঙ থেকে পাওয়া। স্পষ্টই বোঝা যায় পাটনাই কাজের রীতি পরিধি সবই ইওরোপীয় রুচিতে বাঁধা হয়ে যাচ্ছিল।

সেবকরামের সঙ্গে নাম করতে হয় হুলাস লালের (১৭৮৫ ?-১৮৭৫)। হুলাস লাল থাকতেন পাটনার লোদীকাটরায় ; বানারস থেকে আসেন, স্যার চার্লস ডয়লির চিত্রকর জয়রামদাসের সম্পর্কে ভাই ছিলেন। হুলাসলালের পূর্বপুরুষরা উত্তরপ্রদেশ থেকে বানারসের মহারাজাদের দরবারে কাজ নেন। হুলাসের আঁকা চেয়ারে বসা একটি বাইজীর ছবি শ্রীমতী আর্চার ছেপেছেন। হাফটোনে ছাপা ছবিটি পোর্ট্রেট হিসাবে খুবই দক্ষতার পরিচয় দেয়, মনে হয় কাঠকয়লায় আঁকা। ছবিটি ১৮১৬ সাল নাগাদ আঁকা হয়। অবশ্য কাজলিশিয়াই কথাটা থেকে মনে হয় হয়ত ছবির ফিগরের সীমা-রেখাগুলি ভূসো দিয়ে আঁকা হত, কারণ শিয়াই মানে কালি, কাজলি মানে কালো কাজল। হুলাসলালের একটি স্কেচবই পাওয়া গেছে ; নক্সাগুলি হরিণের চামড়া বা হিন্দীতে যাকে বলে চর্বার উপর আঁকা। এগুলি ছিল আসল, অর্থাৎ এর থেকে বুলিয়ে, বা উপরে কাগজ ফেলে, বা রেখায় রেখায় ফুটো ফুটো করে (ইংরেজিতে বলে 'পাউন্স' করা, যেমন তীক্ষ্ণ নখওয়ালা জন্তুরা থাবার নখ ফুটিয়ে দেয়) অন্য ছবির সীমারেখা আঁকা হত। স্কেচবইতে চৌখুপিকাটা কাগজে (গ্রাফ পেপারের মত) আঁকা কিছু ছবিও আছে, যাতে সেগুলি ছবিতে অনেক বড় সাইজে আঁকা যায়। কিছু কিছু অসমাপ্ত নক্সাও আছে। চিত্রবিষয় সবই ইঙ্গ-ভারতীয়, অর্থাৎ খরিদ্দাররা যে সবই বিদেশী, ছবি দেখলে বেশ বোঝা যায়। দৈনন্দিন জীবনের ছবির ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজ স্ত্রী পুরুষের ছবি ঘন ঘন আসে।

১৮৩০-৫০ সালে হুলাসলাল ও জয়রামদাস ছাড়া ফকিরচাঁদলাল, (১৭৯০ ?-১৮৬৫), টুনিলাল (১৮০০ ?-) ও খুব বিখ্যাত হন। তার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৮৫০-৮০ সালে ফকিরচাঁদলালের ছেলে শিবলাল (১৮২৭ ?-১৮৮৭ ?) আর টুনিলালের ছেলে শিবদয়াললাল (১৮২০ ?-১৮৮০) খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শিবলাল দেশী বিলেতী লোকদের মিনিয়েচর প্রতিকৃতি ভাল আঁকতেন, দৈনন্দিন জীবন ল্যাণ্ডস্কেপ প্রভৃতিও আঁকতেন। শিবলালই প্রথম ছোটখাটো শিল্পী জড়ো করে খুব বেশী সংখ্যায় ফার্‌কা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কারখানা তৈরি করেন। নানা জায়গায় গিয়ে গিয়ে কাশ্মিরী শালওয়ালাদের মত ছবি বিক্রি করে আসতেন। বাঁকিপুর, দানাপুর ছাউনি, বানারস, এলাহাবাদ, কলকাতা প্রায়ই যেতেন। সঙ্গে নাতি ঈশ্বরীপ্রসাদ অনেক সময়ে যেতেন। ছবির দাম হত একটাকা দুটাকা। আজ-কাল যেমন এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্টেশনে দারোয়ান, বাবুর্চি, খানসামা, প্রভৃতির মাটির পুতুল বিক্রি হয়, তেমনি তাঁর ছবির নাম হত 'নেটিভ ক্যারাক্‌টার্‌স্‌', বা দেশী চরিত্র বলে ফারকা চিত্রাবলী। শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট নাম থাকলেও শিবলালের আসল কৃতিত্ব ছিল ফারকা কারখানার পত্তন করায়। এইসব কারখানায় তিনি গোপাল লাল (১৮৪০-১৯১১) গুরুসহায় লাল (১৮৩৫-১৯১৫) ; বাণীলাল (১৮৫০

-১৯০১), বড় বাহাদুর লাল (১৮৫০-১৯৩৩), কাহ্নাই লাল (১৮৫৬-১৯১৬) জয়গোবিন্দ লাল (১৮৭৮-১৯০৮), প্রভৃতি অনেক ওস্তাদ শিল্পীকে নিযুক্ত করে মানুষ করেন। ১৮৮০ সালে শিবদয়াল লাল মারা যান, ১৮৮৭ সালে শিবলাল। তাঁদের মৃত্যুর পর শিষ্যরা ইতস্তত কাজ নেন। কাহ্নাই লাল কলকাতার কেট্‌ল্‌ওয়েল-বুলেন কোম্পানীতে কাজ নেন, গোপাল লাল যান বৌবাজার আর্ট স্টুডিওতে, গুরুসহায়লাল আর ছোট বাহাদুর লাল কার-তারখ কোম্পানিতে ঢোকেন। জয়গোবিন্দ কাজ নেন লাটসাহেবের জহুরী রায়বাহাদুর বদ্রীদাস মকিমের মোকামে। বড় বাহাদুরলাল যান এলাহাবাদে, তাঁর সম্পর্কে ভাই বাণীলাল আরা ক্যানাল বিভাগে ড্রাফট্‌স্‌ম্যান নিযুক্ত হন, তাঁর ছেলে শ্যামবিহারী লাল আরা সেচ বিভাগে কাজ করতেন, তাঁর ছেলে জ্যোতি সরবরাহ বিভাগে কাজ করেন। কিন্তু আস্তে আস্তে খরিদ্দার ও সমঝদারের অভাবে পাটনাই রীতি স্তিমিত হয়ে যায়। পাটনার মহারাজা রামনারায়ণের উত্তরাধিকারী রায় দুর্গাপ্রসাদ কিছু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ; তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে হাত ভাল ছিল মহাদেব লালের (১৮৬০ ?-১৯৪২)। পাটনা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল রাধামোহনকে তিনি শেখান। সোনাকুমারীর ছেলে শিবলালের পৌত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ (জন্ম ১৮৭০) শিবলাল আর বাণীলালের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। অল্পবয়সে ঈশ্বরীপ্রসাদ মথুরার রাজা লছমণ দাস শেঠের মাহিনা করা শিল্পী ছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলকাতা স্কুল অভ আর্টে চারুশিল্প ও ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কিছু সময় উপাধ্যক্ষও হন। সেই সময়ে তিনি অনেক অল্পবয়স্ক বাঙালী শিল্পীকে নানা রীতি টেকনিকে শিক্ষা দেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি আরায় বাস করেন এবং পাটনাই টেকনিকে আবার আঁকতে শুরু করেন। ঈশ্বরীপ্রসাদকে পাটনাই স্কুলের শেষ শিল্পী বলা যায়।

পাটনাই শিল্পে ইওরোপীয় টেকনিক যথেষ্ট আয়ত্ত হয়, বিশেষ করে জলরঙ। পাটনাই ছবিতে ভারতীয় চিত্রে প্রথম বস্তুর ছায়া আসে : আলো এক বিশেষ দিক থেকে বিশেষভাবে পড়ে, ছায়ার গড়নও বাস্তব ঘেঁষা হয়। ফিগর আঁকায় শক্ত কাঠামোও মাঝে মাঝে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের মদ্যপান বিষয়ক ছবিতে কম্পোজিশনের নৈপুণ্য বেশ দেখা যায়। তবুও সমস্ত ছবিই হয় বর্ণনা, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বইয়ের জন্য আঁকা যেন বুক ইলাস্ট্রেশন। ফলে কোন ছবিতে না আসে গভীরত্ব, না আসে চরিত্র, না আসে বাস্তবের সত্যরূপ। যে সব ছবি আঁকা হয়, মনে হয় ক্যামেরা তার চেয়েও ভাল ছবি তুলতে পারত। পাটনাই ছবিতে প্রথম ভারতীয় পোস্টার বা বিজ্ঞাপন চিত্রের গুণ আসে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য জায়গায় ইওরোপীয় রীতিতে জলরঙে ও তেলরঙে অনেক ছবি হয়। তেল-রঙে যে সব শিল্পী খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আত্মীয় রাজা রবিবর্মা। রবিবর্মা অজস্র ছবি আঁকেন। সেগুলি জনপ্রিয়ও হয় খুব। তাদের অজস্র ওলিওগ্রাফ নকল বাজারে বিক্রি হয়। রবিবর্মা প্রতিকৃতি আর প্রাকৃতিক দৃশ্য উভয়েই আঁকতেন ;

তাঁর কিছু ছবি মাদ্রাজের লাটভবনে কেনা হয়। ছবি আঁকার কাজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁর আত্মীয় রাজা রাজবর্মা। রবিবর্মা প্রথমে থিয়োডোর ইয়েনসেন ও অন্যান্য ইওরোপীয় শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেন, তার পর তিনি শেখেন মাদ্রাজ প্রদেশের মাতুরার আলাগ্রি নাইডুর কাছে। আলাগ্রি নাইডু এককালে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা শ্বাতী তিরুমলের (১৮২৯-৪৭) দরবার শিল্পী ছিলেন। ইওরোপীয় রীতিতে সিদ্ধহস্ত বলে আলাগ্রি নাইডুর বিশেষ খ্যাতি ছিল। মাতুরার নায়কবংশে রামস্বামী নাইডু বলে একজন দুর্ধর্ষ শিল্পী রবিবর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রামস্বামী নাইডু খুব ভাল পোর্ট্রেট আঁকতেন। কিন্তু রবিবর্মা ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার, বরোদার গাইকোয়াড় ও অন্যান্য ধনীলোকের অনুগ্রহে পুষ্ট হন। তাঁর সবচেয়ে সার্থক কাজ বোধ হয় পোর্ট্রেট। তেলরঙের পোর্ট্রেটে তিনি অপূর্ব দক্ষতা লাভ করেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর মড্‌ল সমুখে রেখে আঁকতেন, ফোটোগ্রাফ দেখে আঁকতেন না। সেই হিসাবে রবিবর্মার কৃতিত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর কিছু পোর্ট্রেট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আছে। ক্রমশ তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের বায়নামত তিনি হিন্দুপুরাণ ও দেবদেবী বিষয়ক ছবি আঁকায় মন দেন। প্রথমে তাঁর যশ ও খ্যাতির সীমা পরিসীমা ছিল না, কিন্তু বিদেশী সমালোচকদের হাতে পড়ে তাঁর দুর্দশা আরম্ভ হয়। ই-বি হ্যাভেলের মত ভারতীয় শিল্পীর মহান ক্ষমাশীল বন্ধুও বলতে বাধ্য হন: "ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় আর ইঙ্গভারতীয় আর্টস্কুলগুলিতে যে মেকি সংস্কৃতি ও সভ্যতার শিক্ষা দেওয়া হয় রবিবর্মার চিত্র তারই যথার্থ প্রতিচ্ছবি। আধুনিক ভারতে যেসব ভারতীয়রা ভারতীয় শিল্পকে একেবারে ঠেলে ফেলে দেন না, রবিবর্মা তাদেরই ফ্যাশন দুরস্ত শিল্পী। বিশুদ্ধ কল্পলোকজাত অত্যাশ্চর্য কাব্যকে অবলম্বন করে রবিবর্মা যেসব ছবি আঁকেন তাতেও ধরা পড়ে তাঁর কবিকল্পনার একান্ত বেদনাময় অভাব। টেকনিকের যত কসরৎই তাঁর জানা থাকুক না কেন, তাঁর এ ভীষণ পাপের ক্ষমা নেই"। বিদেশী বলে সঙ্কোচবশে হ্যাভেল যথেষ্ট কঠোর হতে পারেন নি। আনন্দ কুমারস্বামী সে অভাব পূরণ করেন। তিনি বলেন "রবিবর্মার মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে নাটুকেপণা, কল্পনার অভাব, পুরাণবিষয়ক চিত্রে ভারতীয়সুলভ ভক্তিবোধের অভাব। তিনি যেসব ছবি এঁকেছেন তা যেকোন ইওরোপীয় ছাত্র ভারতীয় জীবনের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আঁকতে পারত। বিশুদ্ধ ইওরোপীয় নীতিতে যাঁরা এঁকেছেন রাজা রবিবর্মা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি, কিংবা এই ঝুটো ইওরোপীয় টেকনিকে যাঁরা এঁকেছেন তাঁদের কেউই কিছু উৎকর্ষলাভ করেন নি। তাঁদের সবথেকে ভাল কাজও দ্বিতীয় স্তরের কাজের চেয়ে ভাল নয়।"

১৯০২-৩ সালে দিল্লীতে যে প্রদর্শনী হয় তার সম্বন্ধে পার্সি ব্রাউন লেখেন "......এদেশে তেলরঙের চিত্র ইওরোপ থেকে আসে, এখন অনেকেই তেলরঙে আঁকেন। পূবদিকের হলে কিছু কাজ খুবই ভাল। মানুষের ছবিগুলিতে মড্‌লিং, শরীরের ত্বক ও গায়ের মাংস ও পেশী সম্বন্ধে অনুভূতি ছবিতে বেশ এসেছে বলা যায়। দুএকটি ল্যাণ্ডস্কেপে হাওয়ার ও স্থানীয় পরিবেশের বোধ বেশ আছে,

কম্পোজিশনের প্রতি লক্ষ্যও বেশ উল্লেখযোগ্য কিন্তু অনেক কাজই নিতান্ত সাধারণ, ড্রয়িং বেশ খারাপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টেকনিক ও রঙের কাজ বেশ কাঁচা"।

বিলেতী রীতি
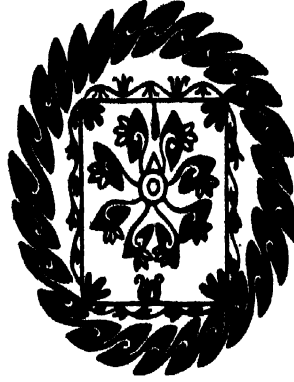
টিলি কেটল্ মাদ্রাজে আসেন ১৭৬৯ সালে। সেই সঙ্গে ভারতের চিত্রজগতে ইংরেজ আক্রমণ শুরু হয়। ইংলণ্ডে যখন তাঁর খ্যাতির সংবাদ পৌঁছয় তখন দেখাদেখি অনেকে ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৭০ সালের পর প্রথম প্রথম দুচারজন আসেন, কিন্তু ১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে অনেকে আসেন। তার কিছু পরে ইংরেজ শিল্পীদের রোজগার কমে এল; ইংরেজরা অত মুক্তহস্তে আর ছবির বরাত দিতেন না, বড় অয়েল পেন্টিংএর বদলে ছোট মিনিয়েচরই খুঁজতেন, দেশী রাজারাও খরচ কমিয়ে দিলেন। ১৭৮০-১৮০০ সালের মধ্যে ৩৭ জন পেশাদার ইংরেজ চিত্রশিল্পী ভারতবর্ষে বাস করতে আসেন। ১৮০০-১৮২০ সালের মধ্যে আসেন মাত্র ১৬ জন। উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের পর ইংরেজ পেশাদার শিল্পী আসা বন্ধ হয়ে গেল।

দুই দেশের চিত্ররীতি যেখানে প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সেখানে অন্তত এটুকু আশা করা অন্যায় হত না যে দুই রীতি মিলে অনেক কিছু আশ্চর্য জিনিষ সম্ভব হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ শিল্পীরা নেবার, শেখবার মন নিয়ে আসতেন না। সেই জন্য তাঁদের কাজে ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ছাপ খোঁজা পণ্ডশ্রম। তাঁরা পাকাপোক্তভাবে ইওরোপীয় ছাঁচে ঢালাই হয়ে আসতেন। তেলরঙের টেকনিক্, হাতীর দাঁতের ওপর মিনিয়েচর আঁকার রীতি ও এনগ্রেভিংএর রীতি থেকে তাঁরা একচুল নড়তেন না। ভারতীয় রীতি নীতি টেকনিকের প্রতি তাঁদের থাকত অসীম অবজ্ঞা, নিজেদের অনেক উঁচু ভাবতেন, শেখার কিছু পেতেন না। সেইজন্য ইংরেজরা ভারতীয় চিত্রনীতিতে শেষপর্যন্ত অপরিচিত আগন্তুকই রয়ে গেলেন; ওরই মধ্যে তাঁরা কিছুটা ভারতীয় চিত্ররীতিকে ভিন্নপথে টানলেন, কিন্তু পরিবর্তে তার থেকে কিছুই নিলেন না।

সেইজন্য ভারতে ইংরেজদের চিত্রশিল্পে নতুন বা উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। প্রাকৃতিক দৃশ্য,

পোশাক, আচার ব্যবহারের যথাযথ বাস্তবধর্মী চিত্রণে ইংরেজদের কাছে আমরা ঐতিহাসিক নথি দলিল হিসাবে অনেক কিছু পাই ; আর যেহেতু বিদেশীর চোখে তাঁরা ভারতীয় জীবন দেখেছিলেন সেহেতু সে ধরনের নিরাসক্ত দেখার দামও যথেষ্ট। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে আঠারো শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ চিত্রকলা পোর্ট্রেটে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, মিনিয়েচর শিল্পে, খুবই উৎকর্ষ লাভ করে। ভারতবর্ষে অবশ্য প্রথম শ্রেণীর শিল্পী খুব কমই কাজ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী অনেক ছিলেন। তাঁদের কাজে এই যুগের ব্রিটিশ চিত্রকলার উৎকর্ষ ও নৈপুণ্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চাহিদা ছিল প্রতিকৃতির। টিলি কেট্‌ল প্রথম এই চাহিদা মেটাতে আরম্ভ করেন। ফলে তিনি বিস্তর টাকা করে দেশে ফিরে যান। স্যার জশুয়া রেনলড্‌সের পোর্ট্রেট রীতি অনুসারে তিনি সুপুরুষ বীরোচিত চেহারা আঁকতেন। তাঁর হাতের স্যর এলাইজা ইম্পের পোর্ট্রেট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আছে। স্যর জশুয়া রেনলড্‌সের মেজর-জেনরল স্প্রিঙ্গার লরেন্সের পোর্ট্রেটও ভিক্টোরিয়া হলে টাঙ্গানো আছে। ইংলণ্ডে খুব খ্যাতি না থাকলেও কেটল্‌ ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করে সন্তুষ্ট থাকেন। বসবার ঘরে গল্পরত স্ত্রীপুরুষের ছবি আঁকায় জোফানি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, এবিষয়ে তাঁর মত কুশলী শিল্পী কমই ছিলেন। ভারতবর্ষে সাহেবদের বাংলোয় এইরকমের দৃশ্যের অভাব নেই। ফলে জোফানি মনের খুসীতে অনেক ছবি আঁকেন। তার মধ্যে বিলিয়াম পামার পরিবারের গ্রুপটি অতি সুন্দর। কলকাতার সেণ্ট জনস্‌ গীর্জায় জোফানির খৃষ্ট বিষয়ক একটি বড় ছবি আছে। তাঁর আঁকা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে মিসেস হেস্টিংসের পোর্ট্রেটটিও খুব ভাল। কর্নেল মর্ডাণ্টের মোরগ লড়াই ছবিটিও জোফানির একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। কোন্‌ কোন্‌ অর্থ নৈতিক কারণে তেলরঙে বড় প্রতিকৃতির পরিবর্তে ছোট মিনিয়েচরের রেওয়াজ শুরু হয় স্যর বিলিয়াম ফস্টার কিছুদিন আগে সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। আঠারো শতকের শেষে, উনিশ শতকের প্রথমদিকে জন্‌ স্মার্ট ইংরেজ পোর্ট্রেট শিল্পীদের মধ্যে বেশ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ছবিতে নিখুঁত যথাযথ্য, সুরুচি, আর পারিপাট্যের সমন্বয় হত। রেনলডস্‌ তেলরঙে যে পরিপূর্ণ, কোমল তুলির পরিচয় দিতেন, হামফ্রি তাঁর মিনিয়চরে সেই সব গুণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। ভারতবর্ষে আসার আগেই তাঁরা দুজনে ইংলণ্ডে খুব নাম করেন। ভারতবর্ষে এসে স্মার্ট যে সব ছবি আঁকেন তাদের বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে স্যামুয়েল এ্যাণ্ড্রুজ ও শ্রীমতী ডায়ানা হিল্‌ তাঁদের মিনিয়েচরে আনতে সক্ষম হন। অবশ্য স্মার্টের চেয়ে এ্যাণ্ড্রুজ ও হিল্‌ দুজনেই নিকৃষ্টদরের শিল্পী ছিলেন।

ইংরেজের আঁকা ঐতিহাসিক চিত্র খুব ভাল হয়নি তার কারণ যেসব জায়গায় বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা হয় সেখানে কোন শিল্পী গিয়ে আঁকার চেষ্টা করেন নি। দু'একজন শিল্পী ইংলণ্ডে বসে কল্পনার জোরে এঁকেছেন, ফলে তাঁদের কাজ মোটেই যথাযথ হয়নি। মহীশূর যুদ্ধের যে সব ছবি ম্যাথার ব্রাউন আঁকেন সেগুলি এই দোষে দুষ্ট। ওরই মধ্যে ডেভিসের দু'একটি ছবি আছে ভাল, যেমন

'মার্কিস কর্ণওয়ালিস কর্তৃক টিপু সুলতানের পুত্রদের অভ্যর্থনা'। ডেভিস এই দৃশ্যটি চারবার আঁকেন, প্রতিবারই যতগুলি সম্ভব আমীর ওমরার প্রতিকৃতি তাতে ঢোকাবার চেষ্টা করেন, বোধ হয় এই আশায় যে তাঁরা আবার ডেভিসকে ছবি আঁকার বায়না দেবেন। তা সত্ত্বেও ছবিগুলি ভাল হয়েছিল ; দেখে মনে হয় সত্যই একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাসম্ভব সততা বজায় রেখে বিনীত মনে আঁকা হয়েছে।

১৭৩২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মালয়ের দিকে কিছু সম্পত্তি কেনেন। জর্জ ল্যামবার্ট ও স্যামুয়েল স্কটকে বৃটিশ ল্যাণ্ডস্কেপ চিত্রের আদি পুরুষ বলা যায়। তাঁরা এইসব অঞ্চলের কিছু ছবি আঁকেন। কিন্তু দুজনের কেউই সে সব দেশে যান নি। অন্যের করা নক্সা দেখে এঁকেছিলেন। কিন্তু তার কিছু বছর পরে হজেস বিখ্যাত আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে যান। ফলে ১৭৭০ সালের পরে তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁর চোখ তৈরি হয়ে গেছে। এদেশে তিনি 'সিলেক্টেড্ ভিউজ ইন ইণ্ডিয়া' বলে অনেকগুলি ছবি এঁকে ছাপান, এগুলি জলরঙ করা হত। তাতে ফুটে উঠত প্রাচ্য ল্যাণ্ডস্কেপের স্বপ্নময় রূপ। সে সব ছবি দেখে বিখ্যাত জার্মান ভূগোলবিদ হামবোল্টের পৃথিবী ঘোরার ইচ্ছা হয়। হজেসের কাজ দেখে টমাস্ ও বিলিয়াম ড্যানিয়েল বহুজায়গায় ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকে ১৮০৮ সালে 'ওরিয়েণ্টাল সিনারি' বলে একটি ছবির অ্যালবাম প্রকাশ করেন। বইটি নানাস্থানের বর্ণনা হিসাবে অতুলনীয়। এর থেকেই আবার কিছু ছবি তাঁরা জলরঙ, তেলরঙ করেন। কয়েকটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আছে।

চিনারি ছিলেন এদেশে শেষ বড় ব্রিটিশ শিল্পী। পোর্ট্রেটে, মিনিয়েচরে, ল্যাণ্ডস্কেপে তাঁর ছিল সমান দক্ষতা, আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর মিনিয়েচরগুলি যেমন যথাযথ হত তেমনি ভাল হত তাঁর কালিকলমের স্কেচ। কিন্তু সে সবের গুণ চিনারির একান্ত নিজস্ব ; প্রাচ্যচিত্ররীতির সঙ্গে তার কোন যোগ না থাকলেও প্রাচ্য মেজাজ কিছুটা থাকত। জর্জ চিনারির আঁকা প্রথম আর্ল অভ মিণ্টোর পোর্ট্রেট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আছে।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলমাসে কলকাতার রাজভবনে ইংরেজ শিল্পীদের ছবির প্রিণ্টের একটি খুব ভাল প্রদর্শনী হয়েছিল। অনেকে দেখে থাকবেন। ঐ সালেই সেণ্ট জন্‌স্ গীর্জায় জোফানির দুটি ছবি দেখান হয়।
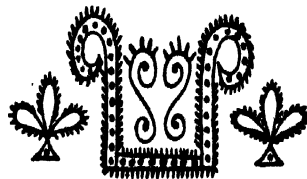
ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ শতকের ছবি

উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের প্রথমে, ভারতীয় চিত্রকলার জগতে ক্রমশ কি অবস্থা হয় তা অল্পকথায় বলেছি। পাটনাই চিত্রকর, রবিবর্মা, তাঞ্জোরী শিল্পীরা ইওরোপীয় রীতির নকল করে এমন জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে নিতান্ত মূল্যহীন বিজ্ঞাপন পোস্টার ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। চিত্রকলা থেকে আত্মা যেন অবলুপ্ত হল, পড়ে রইল শুধু খোলসটুকু। পাহাড়ী চিত্রকরদের মধ্যেও শেষ বৃদ্ধ ওস্তাদদের আস্তে আস্তে তিরোধান হল। চিত্রজগতে যেন আত্মবিস্মৃতির যুগ এল।

সুখের বিষয় এই সময়ে ভারতে সর্বত্র সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রাজনীতি অর্থনীতিতে আস্তে আস্তে আত্মবিস্মৃতি ঘুচে গিয়ে প্রাণের জোয়ার এল। যে মুহূর্তে দেশ নিজের সত্তা হারাতে বসেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে ফিরে পাবার, আবিষ্কার করার তাগিদ এল। ঠিক যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে ইংরেজ মনীষীরা তাঁদের জ্ঞান, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, শুভাকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভারতীয় মনীষীদের আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার শুভকর্তব্যে সাহায্য করলেন, তেমনি চিত্রকলার

জগতে বিশেষ সাহায্য করলেন ই-বি হ্যাভেল, বিলিয়ম রদেনস্টাইন, পার্সি ব্রাউন, ভগিনী নিবেদিতা, লরেন্স বিনিয়ন। বহুপূর্বেই গত শতকের মাঝামাঝি, বম্বে সরকারী আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। বিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতা আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য বোধহয় ছিল সুকুমারমতি শিক্ষিত বাঙালী-দের তথাকথিত 'ওরিয়েন্টাল' স্বাজাত্যাভিমানের নিষ্ফল অহঙ্কারের মধ্যে ডুবিয়ে পথভ্রষ্ট করা, কারণ ইতিমধ্যে বাঙালীদের বিপ্লবী বলে সুনাম পাকা হয়েছিল। এই আর্ট স্কুলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় স্কুল অভ ওরিয়েন্টাল আর্ট হয়। সেখানে ভারতীয় শিল্প সম্পদ সম্বন্ধে ইঙ্গ ভারতীয় গবেষণা চলে।

ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিই চিত্রকলায় নতুন পথের প্রয়োজন বোধ করলেন। নতুন যে সমাজ গড়ে উঠেছে, নতুন যে চেতনা, শিক্ষা আত্মসম্মান আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছে তার উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গী মুঘলও নয়, রাজপুতও নয়, পাহাড়ীও নয়, ইওরোপীয় ত নয়ই, এ বোধ এল। প্রথম এল খানিকটা এলোমেলো, দিকভ্রান্ত হাতড়ানি, নানারীতির মিশ্রণ, বিভ্রান্ত, বিহ্বলভাব। সেই প্রথম যুগের সচেতন শিল্পীদের মধ্যে নাম করতে হয় কিছু ত্রিবাঙ্কুরী ও মহীশূরী শিল্পীর। তাঁদের কাজে যে অসন্তোষ ফুটে উঠল তার ফলে তাঁদের চিত্রে নিছক চিত্রগুণ কিছু কিছু দেখা দিল। তারপরে এল স্বদেশীয়ানার যুগ, যে যুগে অবনীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রভৃতিরা, উনিশ শতক ভোলার প্রয়াসে আরও প্রাচীন চিত্রেতিহাসে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করলেন। নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখকে তাঁরা পাঠালেন অজন্তার চিত্র নকল করতে, এবং সেই নকলের কাজের মধ্যে দিয়ে ষড়ঙ্গ আয়ত্ত করতে। তার পরে মুকুল দে ও অন্যান্য কয়েকজন শিল্পী গেলেন বাঘের চিত্ররাজি নকল করতে। এর ফলে ভারতের চিত্রকলার স্বর্ণযুগের ষড়ঙ্গে ফিরে না গেলেও, ভারতীয় শিল্পী এটুকু বুঝলেন যে চিত্ররীতি এবং চিত্ররূপ অভিন্ন, এবং সত্যকারের চিত্র দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক অর্থ নৈতিক তাগিদের রূপ দ্বারা রূপায়িত হয়। চিত্রসৃষ্টির কাজে ময়ুরপুচ্ছবৃত্তি বেশী দিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ফলে আস্তে আস্তে ইওরোপীয় ও প্রাচ্যরীতির মধ্যে তাঁরা সীমারেখা স্বীকার করলেন। কিন্তু স্বীকার করার পরেও প্রাচ্যরীতি যে কি সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলল, এবং আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কেউই একমত হতে পারলেন না। বলা বাহুল্য শিল্পের জগতে একমত মৃত্যুরই সামিল, সেখানে একমাত্র মূল্য আছে শুধু মতান্তরের এবং নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার। এই সচেতন আত্মজিজ্ঞাসার পথে অনেকেই যাত্রা করলেন, সকলের নাম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও প্রথিতযশাদের নাম করতে হয়। তাঁরা হলেন—

(১) যাঁদের ১৮৮০ সালের আগে জন্ম :

রবিবর্মা, রাজবর্মা, আলাগ্রি নাইডু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাকিম মহম্মদ খান, ঈশ্বরীপ্রসাদ, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

(২) যাঁদের ১৮৮০-১৯০০ সালের মধ্যে জন্ম :

কৃষ্ণ ভেঙ্কটাপ্পা, সারদাচরণ উকিল, নন্দলাল বসু, মহম্মদ ফজলউদ্দিন, সৈয়দ আহমদ, যামিনী রায়, অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ধীরেন্দ্রকুমার দেববর্মণ, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরদাস, শৈলেন্দ্রনাথ দে, পুলিনবিহারী দত্ত, মুকুলচন্দ্র দে, মহম্মদ আবদুর রহমান চুঘতাই, দার্মেলা রাম রাও, রবিশঙ্কর রাভাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বীরেশ্বর সেন, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

(৩) যাঁদের ১৯০১-১৯১০ সালের মধ্যে জন্ম :

জগন্নাথ মূরলীধর অহিবাসী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কানু দেশাই, মনীষী দে, রামগোপাল বিজয়বর্গীয়, ভবেশ সান্যাল, অবনী সেন, কোওটা আনন্দমোহন শাস্ত্রী, ওয়াই-কে শুক্লা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শৈলজ মুখোপাধ্যায়, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, প্রণয়রঞ্জন রায়, ভবানীচরণ গুঁই, নারায়ণ শ্রীধর বেন্দরে, গোবর্ধন আশ।

(৪) যাঁদের ১৯১১-১৯২০ সালের মধ্যে জন্ম :

কে-সি-এস পানিকর, শিবাক্স চাভদা, দেওকৃষ্ণ জোশী, সুনীল মাধব সেনগুপ্ত, কে মাধব মেনন, কানওয়াল কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, রাণী চন্দ, অমৃতা শেরগিল, মোক্কপতি কৃষ্ণমূর্তি, কৃষ্ণজী আরা, মনোহর জোশী, রথীন মৈত্র, রামকিঙ্কর বেজ, গোবর্ধনলাল জোশী, শীলা অডেন, গোপাল ঘোষ, কে-কে হেব্বর, মাধব সৎওয়ালেকর, মাখন দত্তগুপ্ত, এম-এফ হুসেন, কিরণ ধর, হরি আম্বাদাস গাদে, ধনরাজ ভগৎ, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পি-এল নরসিংহমূর্তি, কে-এম কুলকর্ণি, দিংকর কৌশিক, এ-এ আলমেলকর, এস ধনপাল, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, দময়ন্তী চাউলা, চিত্তপ্রসাদ।

(৫) যাঁদের ১৯২১-১৯৩০ সালের মধ্যে জন্ম :

সত্যেন ঘোষাল, প্রাণনাথ মাগো, রথীন মিত্র, বিশ্বনাথ মুখোপাথ্যায়, এচ-ডি রামগোপাল, এস-এচ রাজা, হরকৃষণ লাল, কল্যাণ সেন, কে শ্রীনিবাসালু, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, আকবর পদমসী, বীরেন দে, অভয় খাটাউ, শানু লাহিড়ী।

বর্ত্তমান যুগে শিল্পীকে সচেতনভাবে কাজ করতেই হবে, আত্মসচেতনতার বিষবৃক্ষের ফল খেতেই হবে। এই যুগের জীবন থেকে এমন শিল্পরূপ বেরিয়ে আসবে যা এই যুগকে যথার্থ ও সার্থকভাবে প্রতিফলিত করবে, এই বোধ ও যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে যাঁরা মৌলিক চিত্ররূপ ও চিত্ররীতি গড়তে সমর্থ হয়েছেন, বর্তমান লেখকের মতে তাঁরা হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই অধ্যায়ে তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করব।

ইতিমধ্যে দিকে দিকে নতুন সাহসী চিত্রকর জন্ম নেন, তাঁরা নিঃসঙ্কোচে নিজের নিজের

পথ করে চলেছেন। ইওরোপীয় রীতির তাঁরা মনোযোগী ছাত্র, আবার জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থল থেকে যে চিত্ররূপ উদ্ভাষিত হয়, অর্থাৎ লোকচিত্র, তার এবং শিক্ষিত এবং মার্জিত সমাজের দরবারী চিত্রও তাঁরা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেন। ভারতবাসীর মত বিরাট জাতির জীবনে পঞ্চাশ বছর সামান্য সময়; এবং গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার চেয়ে ছিন্নভিন্নই হয়েছে বেশী। পশ্চাদ্‌পট হিসাবে এই কথাটি মনে রাখলে এই আধশতকে ভারতীয় চিত্র শিল্পী যে চেতনা ও কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, সে সম্বন্ধে আশান্বিতই হবার কথা, নিরাশার কিছু থাকে না।
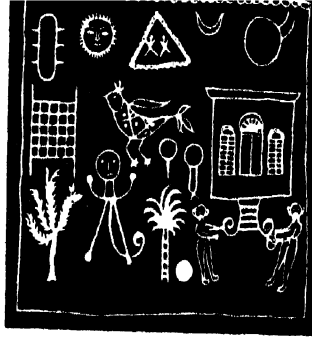
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রনীতির জনক বল্‌লে অত্যুক্তি ত হয়ই না, বরং সবটা বলা হয় না। চিত্রজগতে ভারতীয় শিল্পীর যে যথেষ্ট দেবার আছে, প্রাচ্য ও ইওরোপীয় মনের আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল ভারতীয় সমাজ থেকে এমন চিত্ররূপ উঠতে পারে যার কাছে দুই জগতেরই কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট কারণ থাকবে, একথা অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। তিনি যে সময়ে বর্তমান ভারতের চিত্রনীতির পথ খুলে দেন সে সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হয়। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং ঘটনা দুটি পরস্পরের সম্পূরক। এবং আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তথাকথিত ওরিয়েণ্টাল আর্টের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণ করে মুক্তিকামী ভারতীয় মনকে মধ্যযুগের কল্পিত ঐশ্বর্যের গোলকধাঁধায় ডুবিয়ে দিকভ্রান্ত করার যে চক্রান্ত লর্ড কার্জন ও সে যুগের শাসককুল করেন, সে চক্রান্ত ভেঙে বেরিয়ে আসার মত শুদ্ধ চৈতন্য অবনীন্দ্রনাথের ছিল। অজন্তা, রাজপুত, মুঘল, পারসীক ইত্যাদি দরবারী নীতিই যে ভারতীয়-রীতির সব নয় এ বোধ তাঁর আসে। তার পরিবর্তে লোক-চিত্র, লৌকিক আচার, রীতি, নীতি, ধর্ম, ব্রত পূজার মধ্যে দিয়ে নিজের দেশের কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন তিনি বোধ করেন, যে আত্মসমর্পণের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ফলে ইওরোপীয় রীতি-নীতিকে সরাসরি আত্মস্থ করে নিজের দেশের চিত্রনীতির পরিণতির কাজে লাগাতে তাঁর আর

লজ্জা, সঙ্কোচ রইল না। কারণ তখন তাঁর পক্ষে ধার করে ধার শোধ করার ক্ষমতা ও আত্মসম্মান এল, ধারকে অস্বীকার করার গ্লানি থেকে তিনি মুক্তি পেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ যদি নিছক চিত্রশিল্পী হতেন তবে বিশ শতকের প্রথম দিকে এই ধরনের জ্ঞান ও বোধ আসা শক্ত হত। কারণ তখনও কোন শিক্ষিত ভারতীয় শিল্পী ইওরোপীয় রীতি নকল করা ছাড়া অন্য কোন জগৎ আছে বলে জানতেন না, এবং তখন যেসব ইওরোপীয় ভদ্রলোক শিল্পকলার অধ্যাপনা করতেন তাঁরা আধুনিক চিত্রকলার সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তাঁদের কাছে তখনও চিত্রকলা মানে সতেরো আঠারো শতকের চিত্রই বোঝাত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ছিল সাহিত্যিক প্রতিভা, যা তাঁকে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করে ও চিত্রকলায় চিন্তার খোরাক জোগায়। তাছাড়া তিনি যে বাড়িতে জন্মেছিলেন সে বাড়িতে নানামুখী জিজ্ঞাসার হাত থেকে মুক্তি ছিল না। বাংলা গদ্যে তাঁর অসামান্য প্রতিভাময় সৃষ্টির যথাযোগ্য বিচার আজও হয়নি। ঠিক যে সময়ে একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী বাংলার গদ্যজগতে মধ্যাহ্নসূর্যের মত তেজ বিকিরণ করছেন, ঠিক সেই সময়ে দুজনের প্রভাববর্জিত মৌলিক গদ্যছন্দ আনা শুধু প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব, এবং অবনীন্দ্রনাথের সে প্রতিভা ছিল। সে প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, নিতান্ত বাঙালী ঘরকর্ণা, বৈঠকী আড্ডা, গল্পগুজব, রাজপথের কথার ছন্দের সঙ্গে কল্পনার রূপকথার জগতের কথার ছন্দের অপূর্ব সমন্বয়, যার ফলে ঠাহর করা শক্ত হয় কখনই বা তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, অথবা উদ্ভট গল্প বলছেন, আর কখনই বা তিনি ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বন্ধুদের কাছে সদ্য ঘটেছে এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করছেন। লিখিত গদ্যে তাঁর কথ্যভাষার ছন্দ যেমন অপূর্বভাবে এসেছে; ভাষার মধ্যে চমকদার, বেলোয়ারি, উপমা উৎপ্রাস, স্মার্ট কথা বর্জন করে, টাটকা সদ্য-পাটভাঙা কথার এমন সাবলীল ব্যবহার এসেছে; গদ্যে সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনের ধুলোমাটির এমন সোঁদা গন্ধ এসেছে, যে বাঙলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে তাঁর যে গভীর নাড়ীর যোগ ছিল একথা বুঝতে দেরি হয় না। তাঁর ভাষা পড়লেই বর্তমান লেখকের কেন যেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রাসবিহারী ঘোষের কথা মনে পড়ে, যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার উৎকর্ষ সত্ত্বেও একান্ত বাঙালী ছিলেন, এবং বাংলা দেশকে বুঝতেন। বনেদী বাঙালী পরিবারের ও মনের যে অনির্বচনীয় পরিবেশ, সরঞ্জাম ও মেজাজ রবীন্দ্রনাথ খানিকটা সাহিত্যিক ঘুরপথে এনেছেন, সেই পরিবেশ, সরঞ্জাম ও মেজাজ অবনীন্দ্রনাথ অক্লেশে, সোজাসুজি অভ্রান্তভাবে এনেছেন তাঁর বাক্যের ছন্দে, শব্দের ব্যবহারে, ইডিয়মের প্রসাদে এবং একাধারে কল্পনা, উদ্ভট খেয়াল ও বাস্তব ঘটনার একান্ত বাঙালীসুলভ মিশ্রণে; যে বাঙালীর কাছে ভূতপ্রেত, শাঁকচুন্নিও যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা, অথবা ব্রতকথা, চণ্ডীপাঠ, নামকীর্তন, অথবা ভাইভাইয়ে লাঠিলাঠি, মামলা-বাজি। এইভাবে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ও লেখক হয়ে অবনীন্দ্রনাথ গোড়ায় হলেন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। সাহিত্যে যখন ঠেকে যেতেন বা ক্লান্তি আসত তখন চলে যেতেন ছবিতে; ছবিতে যখন আটকে যেতেন

বা ব্যতিব্যস্ত হতেন তখন চলে যেতেন সাহিত্যে। সেই হেতু প্রায়ই তাঁর ছবি ও গল্প হত অভিন্নাত্মা। ছবিতে আসত সাহিত্যিক কল্পনা, বিষয়, মন। গল্পে আসত চিত্রময় কল্পনা, নিছক চিত্ররূপ। দুই জগতে তিনি ছিলেন জন্মগত উভচর। ফলে দুই-ই আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছবির জগতে বলা যায় তাঁর অপূর্ব প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটের সারি, আরব্যোপন্যাসের চিত্ররাজি অথবা কাটুম-কুটুম ; আবার সাহিত্যের জগতে বলা যায় তাঁর পথেবিপথে, বুড়ো আংলা, অথবা হংসনামা। এসবেই গল্প ও
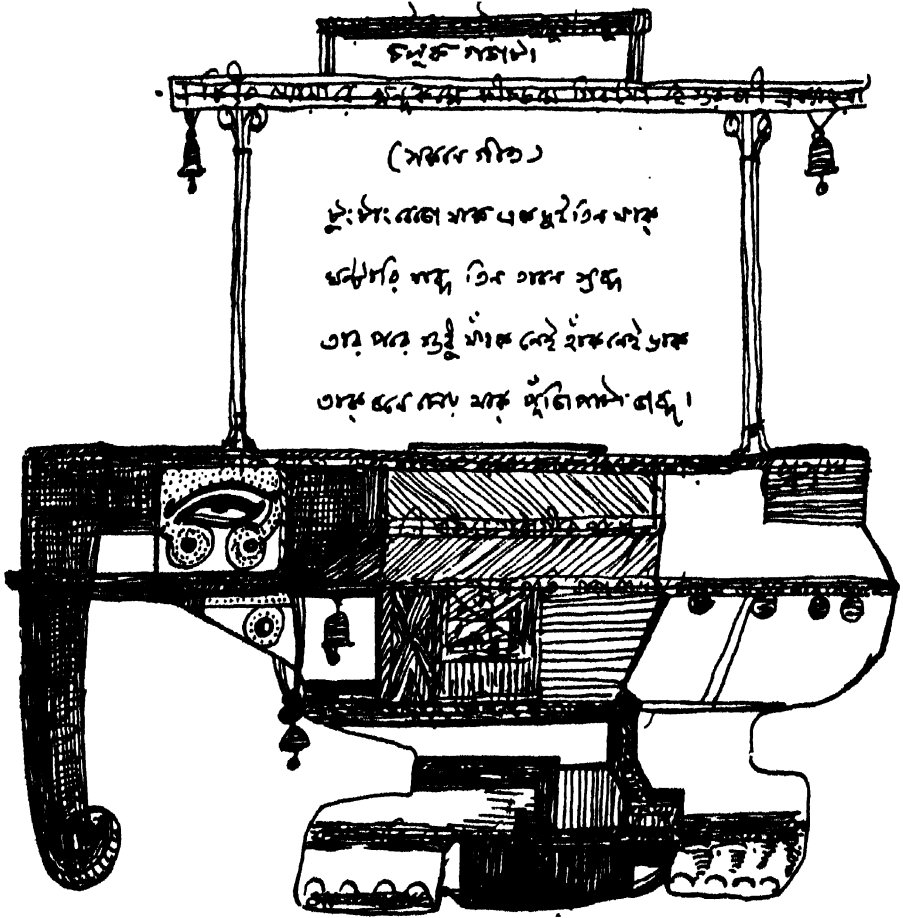
ছবি পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের পাশে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যেমন স্বদেশে কিছুটা অনাদর পেয়েছেন, তেমনি চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পাশে কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সমাদর হয়নি। অন্তত একথা প্রথমেই স্বীকার করা দরকার যে, তাঁর অদ্ভুত সাহিত্যিক প্রতিভা ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে সার্থক চিত্রশিল্পী হওয়া শক্ত হত।

অল্পবয়সে অবনীন্দ্রনাথ দুজন বিদেশী শিক্ষকের কাছে ছবি আঁকা শেখেন। তাঁর মধ্যে একজন

ইংরেজ, অন্যজন ইটালিয়ান। প্রথম বয়সে এঁদের কাছে যে শিক্ষা-দীক্ষা পান, আজীবন ঘুরে ফিরে সে শিক্ষার প্রমাণ তাঁর ছবিতে এসেছে। ইংরেজ মাস্টার মশাই পামার তাঁকে শেখান ড্রয়িং, রীতিসিদ্ধ প্রথায় পারস্পেক্‌টিভ বা দূরে-কাছে, পারস্পরিক অনুপাত, সম্বন্ধ। নক্‌শাবিদ বা ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান হিসাবে তাঁর শিক্ষা ইংরেজি অ্যাকাডেমিক রীতি-নীতিতে হয়। ফলে যেটুকু শেখেন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজে নিজে ছবি আঁকতে শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট। ইটালিয়ান মাস্টারমশাই গিলার্দির কাছে তিনি শেখেন প্যাস্টেলে আঁকার রীতি, কী করে প্যাস্টেল টেকনিকে প্রাচীন ইওরোপীয় মহারথীদের তেলরঙের বর্ণবিভঙ্গ বা রঙের টোন ও টোনালিটি আনা যায় তার গূঢ়তত্ত্ব। প্যাস্টেল বা ক্রেয়নে প্রাচীন দিকপালদের তেল-রঙের বৈভব আনা মুখের কথা নয়। কিন্তু যেহেতু এ দেশের আলোয় তেলরঙের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা শক্ত সে-হেতু তাঁর শিক্ষক প্যাস্টেলের রঙে তুল্যমূল্য আভাস আনার শিক্ষা দেন। ফলে অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একমাত্র শিল্পী যিনি আমাদের দেশে প্যাস্টেল বা ক্রেয়নের সাহায্যে ভিনিশান রঙ ছবিতে আনতে সমর্থ হন। কী করে ধূসর বা গ্রে আর ব্রাউন রঙ অন্য উজ্জ্বল রঙের গৌণ-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে, উজিয়ে দিতে হয়, কী করে এই ধরনের উজানোর মধ্যে দিয়ে, ছাই ও ব্রাউনের জৌলুষ তুলে, দ্যুতি, টোন, বিচিত্র বর্ণালিবিভঙ্গের মধ্যে দিয়ে, ছবিতে হীরা জহরতের ছটা আনতে হয়, অথচ তার মধ্যে বনেদী উজ্জ্বল কমনীয়তা, বা ইংরেজিতে যাকে বলে প্যাটিনা থাকে, অবনীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে সে-সব রহস্য আয়ত্ত করেন। ফলে তিনি অচিরে বর্ণশিল্পী বা যাকে ইংরেজিতে কলরিষ্ট বলে তাতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ইংরেজি টেকনিকে ড্রয়িং আয়ত্ত থাকার ফলে, এবং ভিনিশান টেকনিকে রঙের বিচিত্র সমস্যা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকার ফলে তিনি অচিরেই এদেশে ইওরোপীয় নীতিতে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট আঁকায় অসামান্য দক্ষতা লাভ করেন। পোর্ট্রেট শিল্পে তাঁর সমকক্ষ আমাদের দেশে কেউ ছিল না।

এই সন্ধিক্ষণে ই-বি হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। ই-বি হ্যাভেলের আগে ফার্গুসন, কানিংহ্যাম, গ্রিফিথ্‌স্‌, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীষীরা ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রসম্ভার নতুন করে আবিষ্কার করেন। ইওরোপীয় আদিপুরুষ গ্রীক ও রোমান চারুশিল্পের কাছে ভারতীয় চারুশিল্প যে কোনও অংশে কম নয় অনেকে সে-কথা জোরগলায় বলতে শুরু করেন। কানিংহ্যাম, গ্রিফিথ্‌স্‌ বা হ্যাভেল সোজাসুজি বলেন যে ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে ভারতীয় ঐতিহ্য ছেড়ে ইওরোপীয় ঐতিহ্যের পিছনে ঘোরা মরীচিকার পিছনে ঘোরার সামিল। তাঁরা স্পষ্টবাক্যে ভারতীয় শিল্পীকে স্বধর্মে ফিরে যেতে উপদেশ দেন। তার কারণও ছিল। ১৮৫৭ সালে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনের অল্পসময়ের মধ্যেই ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিকট অর্ধ-শিক্ষিত সঙ্কররূপ যে-কোন বিদগ্ধ-সমাজে বড় দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। পুরনো সংস্কৃতিতে রাতারাতি ভাঙন ধরে, এবং তার জায়গায় যে রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, রুচি দেখা যায় তাতে কারও সন্তুষ্ট হবার কথা নয়। ই-বি হ্যাভেল বুঝলেন যে ভারতীয় ছাত্রকে ইওরোপীয়

রীতিতে শিক্ষা দেওয়া শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, বরং বিষময়। সুতরাং তিনি ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর চোখ ও মনকে নিজের দেশের শিল্পের প্রতি ফেরাবার চেষ্টা করলেন। ইওরোপীয় ছবি বিদায় করে টাঙালেন রাজপুত, মুঘল ছবি। একাজে তিনি অবনীন্দ্রনাথের সাহায্য পেলেন। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হ্যাভেল লিখলেন, তিনি একজন সত্যিকারের শিল্পী, "ভারতীয় চিত্র-ঐতিহ্যের ছিন্ন সূত্র তিনি আবার জোড়া দিতে এসেছেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সত্যিকারের পরিচয় তিনি দেবেন, প্রাচ্য কাব্যজগৎ ও কল্পলোকের চাবিকাঠি তাঁর হাতে, প্রাচ্যদর্শন ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্মলোকের সংবাদ তিনি রাখেন।" কিছুদিনের মধ্যে আবার লিখলেন, অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িকরা "যদিও ভারতীয় প্রাচীন মহৎ শিল্পীদের টেকনিক এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি, তবুও তাঁদের কাজে ভারতীয় শিল্পের আসল রূপ ধরা পড়েছে ; তা ছাড়া তাঁদের কাজে স্বকীয়তার লাবণ্য এসেছে ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সুষ্ঠু মিলন ঘটেছে ; যার থেকে সারা জগতের শেখবার অনেক কিছু আছে।"

রবিবর্মা ও পাটনাই রীতির ছবির অসার্থক বিলেতী অনুকরণের পর চিত্রকলায় স্বদেশীয়ানা দেখে যে কোন আত্মসম্মানী ইংরেজের ভালো লাগার কথা। কিন্তু শুধু স্বদেশীয়ানা দিয়ে ছবি হয় না ; চিত্রের গুণ তার শক্তি আর চিত্রত্বে। সেই শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে অন্য সব গুণই অবান্তর। স্বদেশীয়ানার যুগে অবনীন্দ্রনাথ তাই পথ পেলেও গন্তব্যে পৌঁছননি। আনন্দ কুমারস্বামীর চোখে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছবির অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। 'ফেস্টিভ্যাল অভ এম্পায়ার' প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশের ১৯১১ সালে প্রকাশিত তালিকায় কুমারস্বামী লিখলেন : "কলকাতার শিল্পীরা ভারতীয় ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ, রূপকথা, ধর্ম ও লোকসাহিত্য থেকে বিষয় নিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনেও ফিরে গেছেন। তাঁদের ছবিতে এক বিশিষ্ট ভারতীয় ভাব আছে, এটাই খুব উল্লেখযোগ্য কথা। কিন্তু তবুও তাঁদের কাজ ইওরোপীয় ও জাপানী প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এসব কাজ খুবই সুচারু, রঙের সূক্ষ্ম কাজে ভর্তি ; ভারতীয় সব কিছুর প্রতি আছে তাদের গভীর মমতা। এ সবই ঠিক। কিন্তু যার কাছ থেকে এঁরা কিছুটা প্রেরণা পেয়েছেন সেই অজন্তা, মুঘল, রাজপুত ছবির তুলনায় এঁদের কাজে প্রায়ই শক্তির অভাব দেখা যায়। যেন কোথায় একটা শক্ত কাঠামো নেই। এসব কাজকে সার্থক না বলে প্রতিশ্রুতির পর্যায়ে ফেলাই ঠিক হবে। সেইভাবে দেখলে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যতের পক্ষে এ কাজের খুব বড় মূল্য আছে তা মানতে বাধবে না।" প্রায় একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১০ সালে কোয়ার্টার্লি রিভিউতে রজার ফ্রাই এঁদের সম্বন্ধে লেখেন, "দা সিদ্ধজ অভ্ দি আপার এয়ার' (অবনীন্দ্রনাথ) ধরনের ছবিতে এইটুকু প্রমাণ হয় যে এইসব শিল্পীরা তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের সূত্র আয়ত্ত করার যতই আপ্রাণ চেষ্টা করুন না কেন, তাঁদের ছবিতে যে ভাব ধরা দেয় তা আসলে আমেরিকান মাসিক পত্রিকার ছবির ভাব। এসব নক্‌শায় সদিচ্ছার অভাব নেই, কিন্তু তবুও দেখলে কষ্ট হয়। ইওরোপীয় ধ্যানধারণার স্পর্শে প্রাচ্য রুচির কী গভীর দুর্নীতিপূর্ণ বিকার ঘটেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই সব

ছবি।" রজার ফ্রাইয়ের মন্তব্যের প্রসঙ্গে আনন্দ কুমারস্বামী আবার লিখলেন: "(ফ্রাইয়ের) সমালোচনা সমুচিতই বলা যায়। কলকাতার ছবির অধিকাংশই সুকুমার; কিন্তু তাদের বেশীর ভাগেরই উদ্ভব ভাবালুতায়, তাদের নক্শা দুর্বল, রঙ 'তামসিক'। পৌরাণিক ও বীরোচিত বিষয়ক চিত্রগুলি সম্বন্ধে এই কথাগুলি বিশেষ করে খাটে। যাঁরা দেবতাকে চাক্ষুষ দেখেছেন তাঁরাই শুধু তাঁদের প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন, আধুনিক ভারতের কাছে দেবতারা ছায়ারূপী, অবাস্তব। যে মন পাশ্চাত্য জ্ঞানে আলোকিত হয়েছে তার বিশ্বাস প্রতীতির কাছে এই দেবতারা বড় বর্বর, বড় অপ্রাসঙ্গিক, এবং যদিও কলকাতা শিল্পীদের কাছে তাঁদের বিশ্বাস প্রতীতিগুলি সত্য বলে মনে হতে পারে তবুও আধুনিক মনোভাব তাঁদের কতখানি প্রভাবিত করেছে তা তাঁদের কাজে অনিবার্য ভাবে ফুটে বেরোয়। তাঁরা সুন্দর ছবি করতে বড় বেশী ব্যাকুল; অথচ সুন্দর ছবি দেখার তাগিদ তাঁরা খুবই কম বোধ করেন। উপরন্তু, কলকাতা ছবির রঙে, বিশেষ করে জাপানী প্রভাবে প্রভাবিত শ্রীযুক্ত ঠাকুরের ছবির রঙের টোন এত চাপা বা নীচু, যে প্রায়ই ছবির বিষয়বস্তুটি শুদ্ধ ঠাহর করা বেশ মুশ্‌কিল হয়। প্রাক্তন ভারতীয় শিল্পের শুদ্ধ নির্মল রঙের বিন্যাস থেকে এই কাজ যতদূর সম্ভব পৃথক; এবং যদিও কিছু কিছু বিষয়ের চিত্রণে এই অতন্তু ধোঁয়াটে ভাব কিছুটা মায়ার সৃষ্টি করে, তবুও এটা নিতান্ত ঠিক যে সৃষ্টির রহস্য বা বিস্ময় প্রকাশের সত্য পথ এ নয়।"

কুমারস্বামী বা ফ্রাই যে যুগের উল্লেখ করেছেন, ভাগ্যক্রমে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে তা চিরস্থায়ী হয়নি। কিন্তু কুমারস্বামী বা ফ্রাই বলেননি যে, এসব ছবি তখনকার যুগে নিতান্তই আবশ্যিক ছিল। যে রুচির বিকার ঘটেছিল তার থেকে মুক্তি পেতে হলে আরও বিকৃতির প্রয়োজন ছিল, তবেই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হত। কিন্তু সেটা যে বিকারের অবস্থা, ইওরোপীয় স্বাভাবিক রীতির অন্ধ অনুসরণ যে ভারতীয় চিত্রের সিদ্ধির পথ নয়, এ বোধ অন্তত অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রথম আসে। যে কোন পথেই সর্বপ্রধান পাথেয় হচ্ছে চেতনা ও জ্ঞান। এই জ্ঞান ও চেতনা আনার জন্যে ই-বি হ্যাভেল, রদেনস্টাইন ও ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পীর নমস্য, এবং তাঁদেরই সাহচর্যে অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে ওরিয়েণ্টালিস্ট হন। এর আগে তাঁর হাতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একটি পুঁথি আসে। এবং তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে কয়েকটি ছবি আঁকেন। ইতিমধ্যে আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে সারা উনিশ শতক ধরে বাঙলা ছাপা বইয়ে নানা বিচিত্র কাঠখোদাই ছবি প্রকাশিত। টেকনিকের দিক দিয়ে এসব কাঠখোদাইয়েও যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাঠের উপর খোদাই করার কতকগুলি বস্তুগত বাধাবিপত্তি আছে; সেই বাধাবিপত্তির স্বীকার ও তাদের আয়ত্তের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ, যার ফলে যে কোন কাঠখোদাইয়ে আসে একটি সংযত রীতিবিন্যস্ত ভাব। একদিকে পুঁথিচিত্র ও কাঠখোদাইয়ের আবিষ্কার, অন্যদিকে ইওরোপীয় নক্শা, প্যাস্টেল, জল ও তেলরঙে অসামান্য দখল অবনীন্দ্রনাথকে নতুন পথের সন্ধানে বার করে। তার দরুণ অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর রীতি মিশ্র

হয়ে পড়ে, তিনি দুইজগৎ থেকেই সমানভাবে শক্তি আহরণ করেন। ফলে তাঁর নক্‌শা বা ড্রয়িং হয় মিশ্র বা একাধিক রীতির সংশ্লেষণ, রঙের রীতিও হয় মিশ্র বা একাধিক রীতির সংশ্লেষণ।

আধুনিক চিত্র-জগতে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম মহৎ শিল্পী যাঁর মন, শিক্ষা-দীক্ষা কারিগরের মন নয়। তিনি আসলে বনেদী, শিক্ষিত সাহিত্যিক, যিনি দেশী-বিদেশী যে কোন দেশের যে কোন সমাজে বেওজর সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত, জাত ভদ্রলোক হিসাবে সমাদৃত হবেন। অর্থাৎ তিনি, ইংরেজি ভেঙে যাকে বলা যায়, বিশ্ব-জগতের বিদগ্ধ নাগরিক, 'সিটিজ্‌ন্ অভ দি ওয়ার্ল্ড।' এ হেন লোকের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে সংকীর্ণ স্বদেশীয়ানার গণ্ডীর মধ্যে কালক্ষেপ করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি শীঘ্রই স্বদেশী ছবি থেকে মুক্তির আশায় হাঁপিয়ে উঠলেন। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে জাপানী পণ্ডিত ও শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ওকাকুরা, বিখ্যাত জাপানী শিল্পী তাইকান, হিশিদা, আরাই প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়ে তাঁর আত্মপ্রত্যয় আরও বাড়ে যে শিল্পজগতে প্রাচ্যশিল্পীরও দেবার যথেষ্ট আছে। জাপানী চিত্রকলা তিনি খুব মন দিয়ে দেখেন, সবচেয়ে ভালো করে আয়ত্ত করেন জাপানী-রীতিতে তুলির কাজ ও রঙের সংযত নামমাত্র ব্যবহার। এত অল্প রঙের ব্যবহারে ছবিতে এত বর্ণাঢ্যতা আনা সত্যই বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কচ ও দেবযানী' ছবিটি খুব বেশী মনে পড়ে।

প্রচলিত সাধারণ ধারণা আছে যে, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে জাপানী রীতি অনুযায়ী ওয়াশ পেন্টিং-এর টেকনিক আমদানী করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ আসল জাপানী ওয়াশ প্রথায় ছবি আঁকেননি। আসল প্রথাটি নিজের মত করে পরিবর্তিত করেন। অবনীন্দ্রনাথ যে ওয়াশ টেকনিকের প্রবর্তন করেন তা মুখ্যত তাঁর নিজের প্রবর্তিত। তার ভিত্তি প্রধানত বিলেতী জলরঙের টেকনিকের উপর। সেখানেও তিনি বিশুদ্ধ ব্রিটিশ ওয়াটারকালার রীতি গ্রহণ করেননি। প্রথমে তিনি তেলরঙের রীতিকে ওয়াটারকালারের রীতিপদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। তারপর তিনি নিজস্ব ওয়াশ টেকনিক উদ্ভাবন করেন। এই ওয়াশ টেকনিক প্রবর্তনের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব রঙ দেবার নীতি তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাঁর আঁকার রীতি মোটামুটি এইরকম ছিল। খুব ভাল বিলেতী কার্ট্রিজ পেপারে সচরাচর আঁকতেন। কাঠের উপর কাগজ রীতিমত মাউন্ট করতেন না, বরং আল্‌গাভাবে কাঠের উপর পেতে বসাতেন। তার উপর রঙ দিয়ে আঁকতেন। রঙকে প্রলেপ বা স্টেনের মত করে ব্যবহার করতেন, পর্দার পর পর্দা করে, এক রঙের লেপের উপর আরেক রঙের লেপ দিতেন। মাঝে মাঝে কাগজ তুলে তলাকার কাঠটি ভিজে কাপড়ে বুলিয়ে নিতেন। ফলে এক এক লেপ রঙ আস্তে আস্তে কাগজের মধ্যে যখন খুব ভাল করে শুষে কাগজের সামিল হয়ে যেত তখন আরেক লেপ রঙ লাগাতেন। ফ্রেস্কো বুয়োনোতে যেভাবে ভিজে প্লাস্টারের উপরে জলরঙ দিয়ে জলরঙকে শুকিয়ে প্লাস্টারের সামিল করে নেয়, কাগজেও তিনি প্রায় তেমনি ফ্রেস্কো বুয়োনো নীতি অনুধাবন করতেন। ফলে তাঁর ছবিতে রঙ পাকা হত। ভিজে গেলেও সে রঙ ধেবড়ে

বা উঠে যেত না। এইভাবে ছবি তৈরি হলে তিনি ছবির উপর দিকে তুলি দিয়ে জল টেনে ওয়াশ দিতেন, অনেক সময়ে হয়ত ছবিটাই জলের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে নিতেন। বলা বাহুল্য এ রীতি তাঁর একান্ত নিজের উদ্ভাবিত। রঙ ব্যবহারের নীতিও তাঁর নিজস্ব।

এইভাবে ছবি আঁকার ফলে তাঁর মনের মেজাজ ও গড়ন হয়ে গেল মিনিয়েচর শিল্পীর গড়ন, বড় ছবি আঁকিয়ের নয় ; যদিও অবশ্য তিনি বড় আকারের অনেক ছবি এঁকেছেন। মিনিয়েচর বা সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রকায় ছবির পক্ষে প্যাস্টেলরীতি কতকটা অনুপযোগী, প্যাস্টেলে মিনিয়েচর ছবি ঠিক যুতসই হয় না। কিন্তু বাল্যাবস্থায় শেখা প্যাস্টেলরীতি তিনি কোনও দিনই ত্যাগ করেননি। বর্ণ বা রঙের ব্যবহারে অবনীন্দ্রনাথ নিতান্ত ইটালিয়ান, এমন কি ভিনিশান বলা যায়। অথচ তাঁর রেখা এবং নক্শা তাঁর ছেলেবেলার ইংরেজ গুরুর কৃপায় বরাবরই ইংরেজ চিত্রঘেঁষা থাকল ; যার ফলে তাঁর ড্রয়িং আজীবন মূলত রইল বাস্তবপন্থী। তাঁর ছবির পরিপ্রেক্ষিত বা পরস্পেকটিভ, অথবা ছবিতে স্বাভাবিক দৃশ্যমান বস্তুর বাঁকাচোরা নক্শার রীতি (ইংরেজিতে ডিস্টরশন্) মূলত বাস্তবঘেঁষা হল ; চোখের চেনার সঙ্গে মিল রাখার তাগিদকে সে কোনদিন অস্বীকার করল না। ফলে তাঁর ছবি হল মূলত প্রতিচ্ছবি। অন্যপক্ষে তিনি নিজের হাত ও স্বদেশী যুগকেও ভুলতে পারলেন না ; যার ফলে তাঁর ছবিতে এল পারসীক মিনিয়েচর চিত্রের কম্পোজিশন, এবং সেই সঙ্গে পারসীক মিনিয়েচরের অলংকার-নির্ভর মেজাজ। এর ফল হল অদ্ভুত। অবনীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী হতেন তাহলে তাঁর পদস্খলন ছিল অনিবার্য। কিন্তু কল্পনা ও প্রতিভার রসায়নে এই মিশ্রনীতিতে হল অসামান্য সৃষ্টি, একই ছবিতে এল যুগপৎ অনেক জগতের আভাস। তাঁর ছবি হয়ে দাঁড়াল তখনকার মার্জিত শিক্ষিত সমাজের প্রতীক, অন্যান্য ক্ষেত্রে যার ফল হিসাবে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের গান ও সাহিত্য, প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ গদ্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধ্রুপদী সমালোচনা রীতি। তাঁর ছবি একাধারে হল বাস্তবপন্থী ও অলংকারাত্মক ; চোখের চেনা ও কল্পনার দেখার মধ্যে সীমারেখা রইল কি রইল না ; বোঝা গেল না কখন তিনি রহস্য করছেন কখনই বা শুদ্ধ কল্পলোকে বিচরণ করছেন। এর ফলে অবশ্য তাঁর কাজ হত প্রায়ই অসমান, নির্ভর করত তাঁর মেজাজ তবিয়তের উপর। তাঁর রীতি হত নানান রীতির সংশ্লেষণ, দৃষ্টি আর স্বপ্নের মধ্যে প্রভেদ থাকত অতি অল্প, স্বপ্নের মধ্যে আসত বাস্তব, বাস্তবের মধ্যে কল্পনা। যেমন তাঁর শেষের দিকের আরব্যোপন্যাস চিত্ররাজিতে মুখ, অবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভঙ্গী সবই হত পোর্ট্রেট। অবনীন্দ্রনাথ হয়ত হলেন আলিবাবা, গগনেন্দ্রনাথ হয়ত হলেন কাশেম, রবীন্দ্রনাথ হারুণ অল রশীদ, অন্দরের কোন মহিলা হয়ত হলেন মর্জিনা, ইত্যাদি। না-কে করলেন হাঁ, হাঁ-কে না। প্রায় ফ্লোরেন্টাইন শিল্পীদের মত। এমন কি ছবিলে নামসই ব্যাপারেও দেখা যেত খেয়ালের খেলা। যেগুলি অযত্নে আঁকা, খারাপ ছবি, মনঃপুত নয়, ফস করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে অ-ব-নী-ন্দ্র বলে নাম লিখে, 'ন্যাও' বলে উপহার দিয়ে দিতেন। আবার যেগুলি অনেক প্রিয়, ভালো

ছবি তাদের কোণে ছোট্ট করে যেন লুকিয়ে নাম লিখে রাখতেন। তাঁর ছবিতে কত উদ্ভট চিন্তা, কল্পনা খেয়াল কাজ করে তা বোঝা যায় তাঁর গন্থ রচনায়; বিশেষ করে যখন তিনি পুরাণের ছায়া অবলম্বন করে যে সব উপাখ্যান বাঙলার মাটিতে নিতান্ত ঘরোয়া, গার্হস্থ্য, কৌতুকাবহ বাঙালীরূপ নিয়েছে তার পরিবেশন করেন। যতই দিন গেল ততই বাঙলা দেশের কথা উপকথা, আচার, ব্রতকথা সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ, বোধ বাড়ল, ততই তাঁর সৃষ্টি বাস্তব আর খেয়ালভরা কল্পনার মধ্যে বেড়া রাখল না। যেমন শেষযুগের আশ্চর্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চিত্ররাজিতে। শান্তিনিকেতনে পিছনে কালো কাপড় দিয়ে নিরাভরণ শূন্য মঞ্চের উপর যাত্রা করার রেওয়াজ তিনিই প্রথম আনেন; যুক্তিস্বরূপ বলেন যে পশ্চাদ্‌পট নিরাভরণ, শূন্য না থাকলে কল্পনার অবাধ, মুক্ত বিচরণ সম্ভব নয়। শুধু এতে ক্ষান্ত হলেন না, এমন যাত্রা লিখলেন যা মঞ্চে অভিনয় করলে তবেই দৃশ্য, কথা, চলাফেরা সব মিলিয়ে একটি সমগ্র উদ্ভট ছবি হয়, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়তে গেলে হদিশ পাওয়া মুস্কিল। তাঁর মন এইভাবে সমস্ত কিছু পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যে অখণ্ড চিত্রত্বের সন্ধান খোঁজে, শেষ বয়সে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই তাঁর 'কাটুম-কুটুম' কাজে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর 'কাটুম-কুটুম' কাজকে হাল্‌কাভাবে নেওয়া ভুল হবে, ঠিক যেমন ভুল হবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে তাঁর ছবিকে গৌণভাবে ধরলে। কারণ যে কোন জিনিসের— তা সে যত সামান্যই হোক—সত্যরূপটি, বাস্তবের চেয়েও বাস্তবরূপটি ফুটিয়ে তোলাই যদি শিল্পীর অন্বিষ্ট হয় তবে 'কাটুম-কুটুম' কাজে, কাঠের আঁশে, অথবা ছোট্ট ডালের টুকরোর গড়নে যে রূপ লুকিয়ে আছে তাকে ফুটিয়ে তোলাও শিল্পীর কাজ। কারণ শিল্পীর পক্ষে কোন কাজই যথেষ্ট হেয়, যথেষ্ট নীচু, নয়। এইভাবে দেখলে বোঝা যায় কেন তিনি অনেক জরুরী, আপাতদৃষ্টিতে অনেক বড়, কাজ ফেলে, কাটুম-কুটুম নিয়ে মেতে থাকতেন।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কাজে, জীবনে, খেয়ালী ভাবটি কোনদিন গেল না। অবশেষে খেয়ালী-পনাই মহৎ গুণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁর ছবির কাজও হল পাঁচমিশেলী রীতির খেয়াল। তাঁর ছবির রঙের আঁট বুননে বা টেক্‌স্‌চারে, বিষয়ে, রঙে, কম্পোজিশনে প্রতিচ্ছবি গুণ কখনও গেল না; তাঁর ড্রয়িং বরাবরই বাস্তব ঘেঁষা রইল, আশ্রয় করল চোখের চেনা জানা জগৎকে, অর্থাৎ ইংরেজিতে, রিয়ালিজ্‌মকে। কিন্তু ইংরেজ গুরুর কাছে শিক্ষা ও রাজপুত, মুঘল চিত্ররীতি অনুশীলনের ফলে তাঁর ড্রয়িং বা নক্‌শায় এল অপূর্ব তীক্ষ্ণতা, সদ্য, আনকোরা, পাটভাঙা, মুচমুচে ভাব। এই গুণ বিশেষ করে আসে তাঁর কন্‌ভার্সেশন পিসের সীমারেখায়, তীক্ষ্ণ, কোণ করা পরনের কাপড়ের নক্‌শায়। ফলে তাঁর রেখা বা লাইন ঠিক ক্যালিগ্রাফির লাইন থাকল না, হল প্রকৃতপক্ষে কন্টুর। কিন্তু, অন্যপক্ষে তাঁর চিত্রসংস্থান বা কম্পোজিশন হল দুই মাত্রিক, অলংকারাত্মক, ভারত-পারসীক।

ভারতীয় চিত্র-জগতের দুটি রাজ্যে তাঁর দান অত্যন্ত বেশী। প্রথমত প্রাকৃতিক দৃশ্যে বা ল্যাণ্ডস্কেপে, যেখানে তাঁর রঙের ব্যবহার একান্ত ইওরোপীয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে রঙের

ব্যবহার ইওরোপীয় হলেও চিত্রে যে মূড বা ভাবাবেশের সৃষ্টি হয় তা একান্ত দেশী। ল্যাণ্ডস্কেপে তাঁর রীতি বর্ণনাত্মক ; কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই সে বর্ণনা বিশেষ একটি মূডকে কেন্দ্র করে আছে। তাঁর সবচেয়ে সার্থক ল্যাণ্ডস্কেপ হয়েছে পূর্ববঙ্গের দৃশ্যরাজিতে, যে ছবির সারিতে তিনি পূর্ববঙ্গের নদ, নদী, জল, গাছপালা, ঘাস, চর, নৌকা, গ্রাম, উদ্ভিদের বর্ণনায় এক অপূর্ব স্থানীয় ভাব এনেছেন, যে ধরনের স্থানীয় ভাব এসেছে রবীন্দ্রনাথের পদ্মার বুকে লেখা শিলাইদহর চিঠিতে, বা তারাশঙ্করের উপন্যাসে। অথচ ম্লান ম্যাড়মেড়ে ধূসর এবং ব্রাউন রঙের উপরে সামান্য উজ্জ্বল রঙের ছিট এনে সমস্ত ছবি অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করার যে রীতির পরাকাষ্ঠা তিনি পূর্ববঙ্গের ল্যাণ্ডস্কেপে দেখান তা নিতান্তই শুদ্ধ ইওরোপীয় রীতি। যেমন পূর্ববঙ্গের নদীর পাশে গাছের ছায়াঘেরা ম্লান গ্রামের পাণ্ডুর আকাশের ছবির মধ্যে তিনি নিশ্চিত হাতে এঁকে দিলেন টকটকে লাল একটি ঘুড়ি। ফলে সারা ছবি ভাস্বর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই স্থানীয় ভাব এসেছে তাঁর কথকঠাকুর, মৃত নাতির পুরনো খেলনা নিয়ে বসা বুড়ি, ছড়ানো খেলনার মধ্যে বসা ছোট ছেলের ছবিতে। মূড আনতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর হিউয়েন সাঙের ভারত যাত্রা চিত্রে। সম্পূর্ণ ইওরোপীয় টেকনিকের কাজ হয়েও এই ছবিতে যেভাবে চীনে ছবির মেজাজ, আমেজ, ফুটে ওঠে, সামান্য চৌকোনা ফ্রেমের মধ্যে অসীম শূন্যমণ্ডিত বিশ্বের একান্ত চীনে-সুলভ মূড রঙের স্বল্প, সংযত ব্যবহারে তিনি যেভাবে আনেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

দ্বিতীয় রাজ্যেও তাঁর দান অদ্বিতীয়। এ রাজ্য হচ্ছে পোর্ট্রেটের, যদিও আমাদের মনে রাখা উচিত যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে মুঘল রীতিতে, কিছু উৎকষ্ট পোর্ট্রেট হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ সার্থক পোর্ট্রেট প্যাস্টেলে, যদিও জলরঙে উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও তাঁর আছে। ভারতবর্ষের আলোয় তেলরঙের কাজ হওয়া শক্ত, আলো এত উজ্জ্বল আর কড়া যে সূর্যের স্বাভাবিক আলো ঠেকিয়ে নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে ছবিকে দাঁড়াতে হলে রঙ খুব সাবধানে বাছা দরকার। তা না হলে ত সূর্যকে ছবির পিছনে রাখতে হয়। কিন্তু এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অবনীন্দ্রনাথ তেলরঙ থেকে এমন রঙ বাছলেন যা ম্লান, গম্ভীর, ধূসর বা ছাই, ব্রাউন, মোটেই মুখর বা গমগমে নয়, তাতে উজ্জ্বল রঙের সামান্য স্পর্শ দিয়ে উজিয়ে দিলেন। কিন্তু প্যাস্টেল পোর্ট্রেটে শরীরের চামড়ার বুনুনি বা টেক্‌স্‌চার তিনি যেমন আনলেন তা ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে আর কেউ আনতে পারেননি। এখানেও তিনি রঙের লেপের পর লেপ দিয়ে, বর্ণের সঙ্গে বর্ণ মিশিয়ে, আস্তে আস্তে টোন আনলেন, তার সংশ্লেষণে আনলেন বর্ণালিবিভঙ্গ, বা টোনালিটি। শেষে যেটি দাঁড়াত তাতে থাকত হীরে জহরতের দ্যুতি, যাকে ইংরেজিতে বলে 'জেমে'র মত গুণ, মার্জিত স্পর্শ। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যমুনা দেবীর পোর্ট্রেটের। ছবিটিতে শরীরের ত্বক কী অদ্ভুত নৈপুণ্য ও ধৈর্যের সঙ্গে আস্তে আস্তে তৈরি করা হয়েছে ঠিক মত বর্ণনা করা শক্ত ; তার উপরে গলার চিকচিকে সোনার সরু হার ও কানের দুল সমস্ত পোর্ট্রেটটিকে উদ্ভাসিত করেছে। রঙ ও রেখার অত সংযমে অত বিস্ময়কর কাজ সত্যিই দুর্লভ।

দীর্ঘ জীবনে অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজে শিল্পীশ্রেষ্ঠ হয়েছেন তা নয়। ভাবীকালের ভারতীয় চিত্রশিল্পীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন। ইওরোপীয় রীতির অজ্ঞ অনুসরণের বিকৃত রুচির যে চোরাবালিতে ভারতীয় চিত্রশিল্প উনিশ শতকের শেষ দিকে পড়ে মুমূর্ষু হয় অবনীন্দ্রনাথ একা হাতে তাকে টেনে তুলে বাঁচান, এবং শুশ্রূষা করে আবার পথ চলার উপযুক্ত করেন। ইওরোপীয় নীতির কাছে অকুণ্ঠভাবে ধার করে স্বকীয় প্রতিভায় নতুন সৃষ্টি করে তিনি সে ধার শোধ করেন, এবং ভারতীয় চিত্ররীতিকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল যে তিনি অতি মহৎ গুরু ছিলেন। শিল্পজগতে এ রকম গুরু দুর্লভ। সকলকে অবাধ স্বাধীনতা দিতেন, প্রত্যেককে নিজের মত করে বাড়বার সুযোগ দিতেন, নিজের মতামত, পাণ্ডিত্য, নৈপুণ্য পরের ঘাড়ে চাপাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতেন না, অথচ প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশে করতেন অকুণ্ঠ সাহায্য। কখনও প্রত্যাশা করতেন না যে, তাঁর ছাত্ররা তাঁকে নকল করবে, বরং নকল করলে রেগে যেতেন। কখনও কারোর প্রতিভার উপর ভার স্বরূপ হলেন না। তাই তিনি আজ প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পীর যথার্থ গুরু, প্রত্যেকের নমস্য। তিনি না আসলে ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিক যুগে যেটুকু সার্থকতা এসেছে, তা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।
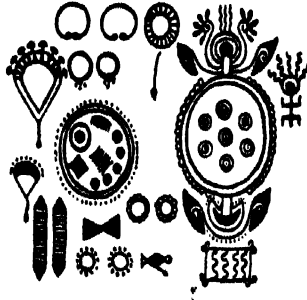
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক সময়ে আশঙ্কা ছিল গগনেন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবি একত্রে দেখার সৌভাগ্য ভবিষ্যতে কখনও হয়ত হবেনা। বহু ছবি তিনি এঁকেছিলেন কিন্তু তার অধিকাংশই যত্রতত্র এলোমেলোভাবে নামমাত্র দামে বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে তাঁর আঁকা একত্রে বিশখানা ছবি দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় ও বিশ্বভারতী বহু যত্নে গগনেন্দ্রনাথের ছবির যে সংগ্রহটি করেন তা একক সংগ্রহ হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট তেমনি অনবদ্য। আশা করা যায় রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে এই সংগ্রহটি কলকাতায় শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে।

গগনেন্দ্রনাথ মুখ্যত আধুনিক শহরের শিল্পী। ভারতের অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর কাছে আধুনিক কলকাতা বা দেশের অন্য বড় নগরের যেন অস্তিত্ব নেই ; তাঁরা নগর সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করেন ; যদিই বা কখনও নগরের ছবি আঁকেন, এমন দৃশ্য সাধারণত আঁকেন, বোঝা শক্ত হয় শহরের ঠিক কোন্ পাড়ার ছবি এঁকেছেন। মফঃস্বল শহরের সঙ্গে তার বেশী মিল থাকে। অর্থাৎ তা হয় শহর আর গ্রামের মাঝামাঝি। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু শহরকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন, কারণ তাঁর মেজাজ ছিল একান্ত সামাজিক, শহুরে। সন্ধ্যার পর শহরের কোন বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে যখন আকাশের রেখা আঁকেন তখন কলকাতা শহরের সান্ধ্য আকাশ চিনতে একটুও অসুবিধা হয়না, যে কলকাতা শহর নোংরা, বিশ্রী, অপরিসর অথচ রহস্যময়, যার বুকে নিয়ত সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুর খেলা চলছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যে দুটি বৌ পিছন ফিরে আলসের উপর ভর দিয়ে চারদিকে অগণিত বাড়ী, জানালা ও রাস্তার আলোর বিন্দু দেখছে তারাও শহরের বৌ, গ্রামের বধূ নয় ; তাদের দাঁড়ানর ঋজু, সচেতন ভঙ্গী দেখলেই একথা বুঝতে দেরি হয় না। বড় বাড়ীর জানালা দরজার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো যে সব গৃহসজ্জার উপর পড়ে, তা নিতান্তই শহরের গৃহসজ্জা, বাড়ী-ঘরের স্থাপত্য নিতান্ত নাগরিক। থামের আড়ালে সূর্যের আলোছায়ায় যে দীর্ঘাঙ্গী, রহস্যময়ী মহিলা দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি শহরের মেয়ে, তাঁর আশেপাশের কুকুর বেড়ালও শহরের বনেদী ঘরে আদর যত্নে পোষা, তাদের ভঙ্গীতে এমনই সহজ স্পর্ধা। ছায়াতপের দীপ্ত ব্যবহারে দুর্গা প্রতিমা ভাসানের যে ছবি তিনি আঁকেন তাও শহুরে রাস্তার ছবি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট বলে ভাবতে কুণ্ঠা হয়না। ছমিয়ের ছবি অস্পষ্টভাবে মনে পড়ানর মত করে যখন ছাতামাথায় দেওয়া বৃষ্টিতে ভেজা গ্রুপের ছবি আঁকেন, তখন স্পষ্ট মনে হয় ড্যালহুসি স্কোয়ার থেকে অফিসফেরতা বাবুরা কার্জন পার্কের মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছেন, অথবা শীল্ড খেলা দেখে ফিরছেন। এমন কি গ্রামের রাস্তার ছবি যখন আঁকেন তখন গ্রামের রাস্তা বস্তির রাস্তা বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। শহরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে গগনেন্দ্রনাথ যখন বাঙলা দেশের গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠঘাট আকাশের ছবি আঁকেন, তখন তাঁর তুলিতে আসে অকুণ্ঠ বিস্তার ; ঠিক যেমন অপরিসর শহুরে জীবন ফেলে শহরবাসী পূজার ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখে পান আরাম, শান্তি, আনন্দ।

উচ্ছ্বসিত, স্বাভাবিক উল্লাস চাপবার চেষ্টাও করেননা। শহরের ছাতের সারির উপর চাঁদের আলো গগনেন্দ্রনাথ যেমন দরদী নৈপুণ্যে এঁকেছেন তেমন সংবেদনায় এঁকেছেন গ্রামের মাঠ, নদীর ধারের মন্দির, তাল নারকেলের সারি, ঝড়কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের বুক, সন্ধ্যাবেলার গ্রাম, লগিঠেলা মাঝি। দুই জগৎ এইভাবে জানার ফলে তাঁর নিমাইসন্ন্যাস চিত্ররাজিতে এসেছে বাঙলার লোকজন, মাঠঘাটের টাইপ সম্বন্ধে অসামান্য দখল। এরই ফলে তাঁর আরেক ধরনের ছবি হয় যা নিছক রোমান্টিক, কাব্য ও রহস্যময়, কিছুটা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, সুদূর। ঘরের ভিতরে আলো ঢুকে কি রকম আলোছায়া হয়, সামান্য গতির ফলে আলোছায়া পড়ে কিভাবে নানা পরিবর্তনশীল রঙের ও রহস্যময় জগতের সৃষ্টি করে গগনেন্দ্রনাথের কাছে তা ছিল অসীম কৌতূহলের বিষয়। এর থেকেই হয় তাঁর রহস্যময়, রোমান্টিক বিষয়ক ছবির সৃষ্টি।

শহরকে এইভাবে কেন্দ্র করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে তাঁর ছবিতে এল আবেগময় টান, ইঁটকাঠের ইমারত স্থাপত্যের জ্যামিতিক সৌন্দর্য, যার কৃপায় মানুষের আকৃতিও হল গোটা গোটা, যা দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরবাড়ী, মন্দিরের ভাস্কর্য তাঁর ছবির মানুষকে কি ভাবে সংহতি ও বাঁধন দেয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর নটীর পূজা ছবি। উজ্জ্বল হলদে জমির উপর পুরনো কালচে রঙের দেয়ালের মন্দিরের কোলে রক্তবাসপরা নটী যেমন তন্বী, তেমনি ঋজু, কঠিন। স্থাপত্য ও আধুনিক জীবনের প্রতি ঔৎসুক্যের দরুণ তিনি যখন কিউবিস্ট ছবি আঁকেন তখন তা নিছক প্রাণহীন, ফ্যাশনদুরস্ত, কাঁপা নকল হয় না। আধুনিক ভঙ্গুর সভ্যতার যে তাগিদে কিউবিজ্‌মের উৎপত্তি হয়, তার কিছু হদিশ তাঁর আঁকা এদেশী বস্তুর ফর্মে পাই। কিউবিজমসুলভ প্রিজ্‌মের বিন্যাস ছবির অন্তঃস্থলস্থিত রূপ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে না এলেও, অন্তত বাহ্যরূপের নতুন বিন্যাস সৃষ্টি করে। সেই হিসাবে একমাত্র তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কিউবিস্ট টেকনিক কতকটা সার্থকতা পেয়েছে।

বাঙলা তথা ভারতের আধুনিক যুগের চিত্রকলায় গগনেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান কি তা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা যায়। উপরে বলেছি গগনেন্দ্রনাথ কিউবিস্ট ধরনের ছবি আঁকলেও তাঁর ছবি ইউরোপীয় কিউবিস্ট সংজ্ঞায় পড়ে না, অথচ নিরীক্ষণ না করে ভাসাভাসাভাবে দেখলে তাঁর ছবিতে কিউবিজ্‌মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মনে হয়। এটা নিতান্ত চোখের ভ্রম নয়, তার কারণ যে সব ভারতীয় শিল্পী ফ্রেমের অন্তঃস্থিত ছবির জমি বা স্পেসকে ইওরোপীয় নীতিতে বিশ্লেষণ করতে শিখেছিলেন এবং পারতেন গগনেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ও সফল বলা যায়। এবং ঠিক এই কারণেই আমরা তাঁর ছবির মেজাজে মুখ্যত আধুনিক শহরের শিল্পীকে পাই। ভারতবর্ষে পুরনো শহরও যথেষ্ট আছে, যেমন দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কাশী কিন্তু তাদের গড়ন কলকাতা, বম্বাই, মাদ্রাজ থেকে আলাদা, দুইজাতের শহরের মেজাজও আলাদা। প্রথমোক্ত শহরগুলির গড়ন অতীতের, দ্বিতীয় ধারার শহরের গড়ন স্পষ্টই ব্যবসা-বাণিজ্যের, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফল। সুতরাং সে শহরের গড়ন, তার স্থাপত্য, ঘরবাড়ীর

আকৃতি, নাগরিক জীবন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশ্রণের ফল, অর্থাৎ ইঙ্গ ভারতীয়। গগনেন্দ্রনাথের ছবি আঁকার পদ্ধতি যেহেতু স্পষ্টত ইওরোপীয়, তাঁর জমি, রঙ, আলোর ব্যবহার যেহেতু নিতান্ত খোলাখুলি-ভাবে পশ্চিমী, এমনকি তাতে প্রাচ্যরীতির মুখোসও অনেক স্থানে নেই, সেহেতু তাঁর রীতি ইঙ্গ-ভারতীয় শহরের বাহ্য রূপ ফুটিয়ে তোলার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী হল, ছবিতে ভাব ও ভাষা একাত্ম হল। ভারতীয় হাতে কাগজ, রঙ, ফ্রেমের ইওরোপীয় ব্যবহারে ফুটে উঠল আধুনিক ভারতের শহুরে মেজাজ, আধুনিক শহরের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সার্থকভাবে নিযুক্ত হল ইওরোপীয় জলরঙ, ছায়াতপ, ইওরোপীয় মতে ছবির ফ্রেম। ছবির ফ্রেম বলতে আমি এখানে নিতান্ত চারদিকে কার্ডবোর্ড দেওয়া কাঠের ফ্রেমের কথা ভাবছিনা, বিশেষ ধরনে রচনার ফলে রচনার চারপাশে আপনিই যে অদৃশ্য গণ্ডী পড়ে তার কথাই এখানে আলোচ্য : যেমন নীলকাশে একটি চিল উড়লে তার ফ্রেম থাকেনা, কিন্তু যেই দুটি, তিনটি বা আরও চিল দেখা যায় তখন সব কটি চিলে মিলে অত বিরাট শূন্যেও তারা টান বা টেনশনের সৃষ্টি করে, আপনা-আপনি নিজেদের চারদিকে গণ্ডী বা ফ্রেম তৈরি করে। অর্থাৎ কয়েকটি বস্তু বা ফিগর বিশেষ এক ধরনে সংস্থিত হয়ে যদি নিজেদের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গণ্ডী তৈরি করতে পারে, তবেই একটি আবদ্ধ রচনা হয়, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্লোজড কম্পোজিশন। মধ্যযুগের পর থেকে ভারতীয় চিত্রকলায় ফ্রেম সম্বন্ধে উৎসাহ কচিৎ দেখা যায়, অর্থাৎ ভারতীয় চিত্ররচনায় ফ্রেমসৃষ্টি কোন সময়েই বড় কথা ছিলনা। অন্য পক্ষে ইওরোপীয় চিত্রকলায় মধ্যযুগের পর থেকে ফ্রেমই হয় প্রধান। এর কারণও আছে। পনেরো শতকের পর থেকে ইওরোপীয় চিত্রকলায় গণিত এবং জ্যামিতিসিদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতের আইনকানুন ক্রমশই মুখ্যস্থান অধিকার করে। অর্থাৎ পনেরো শতকের পর থেকে ইওরোপীয় শিল্পীর প্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য হল ছবিটি এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে অঙ্কের মত বার করা যায় দর্শক কত দূরে, উপরে বা নীচে দাঁড়িয়ে ছবির দৃশ্যটি দেখছেন, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছেন বাস্তব জীবনেও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে শিল্পী যেটিকে যেভাবে আঁকছেন দর্শকও সেটিকে ততখানি, ঠিক একইভাবে দেখতে পাবেন কিনা। অর্থাৎ ইওরোপীয় শিল্পী মুখ্যত আশ্রয় করলেন জ্যামিতির হিসাবকে এবং চোখের সম্মুখস্থিত প্রত্যক্ষ দৃশ্যকে। সুতরাং সব ছবিই হল যেন থিয়েটার হলে দর্শকের আসন থেকে দেখা রঙ্গমঞ্চের নায়কনায়িকা, আসবাবপত্র, পশ্চাৎপট। এই হল ইওরোপীয় চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের নীতি। প্রাচ্য, তথা ভারতীয় শিল্পী কিন্তু এই ধরনের স্থির পরিপ্রেক্ষিত, অর্থাৎ যেখানে দর্শক এবং দৃশ্যের নড়চড় হবার উপায় নেই, কোনদিনই মানেননি। তিনিও অবশ্য এক ধরনের পরিপ্রেক্ষিতের আইন মেনেছেন, কিন্তু সে আইনের ভিত্তি চারপাশের জগতের প্রত্যক্ষ দৃশ্যের উপর নয়, অন্তর্দৃষ্টিতে, অথবা মানসচক্ষে যে আদর্শ দৃশ্য ভেসে ওঠে তারই উপর। সুতরাং ভারতীয় শিল্পী কোন দিনই চোখের দেখা যথাযথ্যের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে সম্মত হননি। ফলে তিনি প্রায় সর্বদাই দর্শককে দাঁড় করিয়েছেন একেবারে ছবির জমির মধ্যে, যার দরুণ পালঙ্ক বা চৌকির কাছের দিকটি

দূরের দিকের চেয়ে কম চওড়া দেখায় (ইওরোপীয় চিত্রে দূরের দিকটি কাছের দিকের চেয়ে সব সময়েই কম চওড়া, কত কম হবে তা একেবারে অঙ্কের হিসাবে বাঁধা, নড়চড় হবার উপায় নেই)। শুধু যে ছবির মধ্যে একটি জায়গায় দর্শককে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়েছেন তা নয়, ভারতীয় শিল্পী দর্শককে ছবির মধ্যে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতাও দিয়েছেন, যার ফলে একই ছবিতে দর্শক এদিক ওদিক মুখ ফিরিয়ে অনায়াসে একাধিক পরিপ্রেক্ষিত দেখতে পান। এহেন টেকনিকে আঁকা ছবিতে ইওরোপীয়সুলভ ফ্রেম আসা সম্ভব নয়, ফলে অধিকাংশ ছবি দেখলেই মনে হয় সেটি একটি বৃহত্তর দৃশ্যের টুকরো মাত্র, তার ডাইনে বাঁয়ের ছবিগুলি যেমন-তেমন ভাবে কাটা পড়েছে। সেইজন্যই ভারতীয় ছবি প্রায়ই ক্রমিকভাবে, অর্থাৎ ফিল্মস্ট্রিপের মত, দেখলে ভাল লাগে, অর্থাৎ ভারতীয় ছবির সঙ্গে ভারতীয় যাত্রার যথেষ্ট মিল আছে, যে যাত্রা একেবারে দর্শকমণ্ডলীর ঠিক মধ্যস্থলবর্তী আসরের উপর অভিনীত হয়, দর্শকরা যার চারপাশে ঘিরে বসে থাকেন, যে যাত্রা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে, কোন ছেদ পড়েনা। এক কথায় পনেরো শতকের পর থেকে পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিত আবদ্ধ রচনা বা ক্লোজড কম্পোজিশনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আমাদের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় দরবারী চিত্রঐতিহ্য মুখ্যত খোলা বা ফ্রেমবিহীন, ওপ্‌ন্‌ কম্পোজিশনরীতির উথর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র ভারতীয় পুঁথি এবং লোক-চিত্রেই গণ্ডীবদ্ধ রচনা দেখা যায়, তার কারণ সে সব চিত্র ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর আঁকা হয়। সে কারণেই সেসব ছবিকে ফ্রেমের ভাষায় ভাবতে হয়।

এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথ কোনদিনই পুরোপুরি মনস্থির করতে পারেননি। তিনি যে পরিবারে জন্মান সে পরিবারে ১৮৭০ সালেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত উৎকৃষ্ট পোর্ট্রেট শিল্পীর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়। বস্তুত ঠাকুর বাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ প্রভাব সঞ্চার করেন, বাড়ীর ছেলেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যহ তাঁর কাজের পরিবেশে থেকে কিভাবে ইওরোপীয় পোর্ট্রেটরীতিতে শিক্ষালাভ করে, এ পর্যন্ত কেউই তার সবিশেষ উল্লেখ করেননি। অথচ ১৮৭০ সালের আগে থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ষাট বছর ধরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে প্রতি বছর বহু পোর্ট্রেট স্কেচ করেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের দুই হাজারের উপর পোর্ট্রেট সংগ্রহ করেছেন, তাতে ১৮৭০ থেকে মৃত্যুর বছর পর্যন্ত তাঁর কাজের অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের কাছে পোর্ট্রেট আঁকা শুধু চিত্তবিনোদন ছিল না; তার প্রমাণ তিনি প্রতিটি মুখ আঁকার আগে নৃতত্ত্ববিদদের পদ্ধতিতে মাথাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাপতেন, এবং প্রতিটি মাপের হিসাবে মাথা ও মুখ এঁকে তবেই নিখুঁত বাহ্যপ্রতিকৃতির অন্তরের রূপটি চোখের চাউনিতে এবং ভাবভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করতেন। পোর্ট্রেট আঁকায় এত পরিশ্রম স্বীকার অবনীন্দ্রনাথও বোধহয় কোনদিন করেননি। এবিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খাঁটি ইওরোপীয় ছিলেন এবং তাঁর কাজ অনায়াসে

ইয়েট্‌স্ বা রদেনস্টাইনের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাজের আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠার পর অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা হল বিদেশী শিক্ষকের কাছে, ইওরোপীয় পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে ফ্রেম মুখ্য, ছবি আখ্যানমুক্ত, মুহূর্তস্তব্ধ, পূর্বাপরনির্ভর হয়েও স্বাধীন : সজীব প্রাণীজগতের ঘটনা অবলম্বন হলেও যার উৎসাহ আসলে নিশ্চল দৃশ্য, অর্থাৎ স্টিল লাইফের প্রতি। কিন্তু মনের গড়ন ছিল নিতান্ত ভারতীয়, ঝোঁক ছিল আখ্যানে, অর্থাৎ একই মুহূর্তে মনে মনে দশ জায়গায় ঘুরে বেড়ানর দিকে, মেজাজ ছিল আরামে বসে গল্প করার। উপরন্তু তিনি চিত্রকলায় ভারতীয় রীতি পুনরুদ্ধারের তাগিদও বোধ করলেন। এহেন যোগাযোগে তাঁর রীতি হল মিশ্র। উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। বিখ্যাত 'অভিসারিকা' চিত্রটি ধরা যাক। অবনীন্দ্রনাথ ছবিটিকে স্পষ্টই মুঘল ছাঁদে আঁকতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ শুধু যে ফারসি হরফের নকলে 'অভিসারিকা' কথাটি লেখায় অথবা নাম সইয়ে তা নয়, তার প্রমাণ ছবির কালো পশ্চাৎপটে, পায়ের তলার ফুলে, ছবির পাড়ে, এমন কি ছবির মেজাজে। কিন্তু ছবিটির মুঘলরীতি ঐখানেই ক্ষান্ত হল, অর্থাৎ কতকগুলি সহজে চেনা যায় বাহ্যিক চিহ্ন ছাড়া বাকী সবটাই হল ইওরোপীয়। যথা যেভাবে তিনি অভিসারিকার ফিগরটিকে এককভাবে ছবির কালো জমিতে নিক্ষেপ করে সারা জমিতে চাঞ্চল্য ও টান বা টেনশন্ আনেন, তার রচনা রীতি যতখানি ভারতীয় ততখানিই ইওরোপীয়। উপরন্তু অভিসারিকার ফিগর নিতান্তই ইওরোপীয় প্রতিকৃতির রীতিতে, অর্থাৎ বিশিষ্ট রক্তমাংসের শরীর সমুখে দাঁড় করিয়ে বা স্মৃতিপটে স্পষ্টভাবে রেখে আঁকা, ফিগরটি ভারতীয় রীতিসিদ্ধ প্রথায় মোটেই আদর্শ নারীদেহ ধ্যানের ফল নয়। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিতান্তই চোখের চেনা জানা। শরীরের ছন্দ নিতান্তই জৈব, আদর্শ ছকে ফেলা বা স্টাইলাজড্ নয়। সবচেয়ে অভারতীয় হচ্ছে অভিসারিকার মুখটি যা নিতান্তই দক্ষ ইওরোপীয় রীতিতে ভাবা এবং ইওরোপীয় শিক্ষার তুলিতে আঁকা। এই মিশ্রভাব তাঁর ছবির বিষয়েও এল। তাঁর ছবি সব সময়ে বিশুদ্ধভাবে ফ্রেম্‌ড্ হল বলা চলে না, প্রায়ই তা হল আখ্যানাশ্রয়ী, গল্প বলা প্রগল্‌ভ ছবি ; ছবি এবং সাহিত্যের সীমাস্থলে করল অধিষ্ঠান। সেইজন্য ছবির আকার বা ফর্ম এবং ছবির বিষয় বা কনটেন্ট (বিষয়বস্তু বা সাবজেকট ম্যাটারের কথা ভাবছিনা) খুব কমক্ষেত্রেই অভিন্ন হত। ছবির প্যাটার্ন বা গড়ন হল মোটামুটি প্রাচ্যধর্মী, ছবিতে তুলি এবং ড্রয়িং, রঙ এবং ছায়াতপের কাজ হল ইউরোপীয়, ফলে ছবিতে স্পেসের ব্যবহার, ডীপ স্পেস এবং পারস্পেকটিভের যোজনা হল দোমনা, অনিশ্চিত ; অন্ততপক্ষে ইওরোপীয় শিল্পী ছবির জমিকে যেভাবে মেপেজুপে বিশ্লেষণ ও ভাগ করে প্যাটার্নের সৃষ্টি করেন, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে তা সর্বদা সম্ভব হলনা। একদিকে ভারতীয় অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি, অন্যদিকে ইওরোপীয় কৌশল এবং কাগজ কলম তুলি ব্যবহারের শিক্ষা, এই দোটানায় তাঁর নক্সা বা ড্রয়িং শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ত, চিত্রশিল্পের নিজস্ব রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না থেকে প্রায়ই তা করত সাহিত্যজগতে

আনাগোনা ; অনেকক্ষেত্রেই তাঁর ফিগর চিত্রের ঋজুতা ও কাঠিন্য না পেয়ে সাহিত্যের উপর ভর করে চলত।

গগনেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভিন্ন একপ্রকার ঘটনা ঘটল। শুধু যে ইওরোপীয় রীতিতে জলরঙ ব্যবহার করলেন তা নয় ; তিনি ছবিতে আনলেন আলোছায়া, কিয়ারস্‌ক্যুরো ; তা ছাড়া কড়া আলো পেয়ে তাঁর ছবির বস্তু বা ফিগর ছবিতেই নিজের ছায়া ফেলল, যা তাঁর আগে ভারতীয় ছবিতে বিরল। কিন্তু তাঁর ছবিতে ভারতীয় রীতিতে কিয়ারস্‌ক্যুরো এলনা, যেমন নাকি আছে মুঘল যুগের 'মশালের আলোয় হরিণ শিকার' অথবা 'শীতের রাতে সরাইখানার প্রাঙ্গণে যাত্রীদের আগুনপোহানো'র দৃশ্যে, কারণ মুঘল চিত্রে যখন কিয়ারস্‌ক্যুরো আসে তখনও আলোর কোরকের চারপাশে অন্ধকারের পাপড়ির গণ্ডীটি আবদ্ধ রচনার সৃষ্টি করেনা, রচনা সেই গণ্ডীর চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে ছবির ফ্রেমের বাইরে চলে যায়, ফ্রেমে আবদ্ধ থাকেনা। কিন্তু সেই মুঘল কিয়ারস্‌ক্যুরো যখন রেম্‌ব্রান্ট বহু যত্নে নকল করে তাঁর 'ব্যভিচারিণী নারী' অথবা 'স্ত্রীলোক নখ কাটছে' চিত্রে পুনঃসৃষ্টি করেন তখন তাঁর রচনা নিতান্তই ক্লোজ্‌ড্‌ কম্পোজিশন হয় তার সঙ্গে মুঘল ছবির জাতিগত মিল না খুঁজে, তিশানের 'এনটুমমেন্ট' ছবির কিয়ারস্‌ক্যুরোর মিল আরও সহজে চোখে পড়ে। স্বদেশে মুঘল ছবির কিয়ারস্‌ক্যুরো হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও গগনেন্দ্রনাথের কিয়ারস্‌ক্যুরোর প্রকৃতি হল ইওরোপীয়। যথা, করেজ্‌জোর 'যীশুর জন্মগ্রহণ', অথবা তিশানের 'এনটুমমেন্টে', অথবা রেম্‌ব্রান্টের 'স্ত্রীলোক নখ কাটছে' ছবির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের 'বধূবরণ' চিত্রটির বাহ্যরূপ ও টেকনিকের মিল খুব চোখে পড়ে। রঙ ও তুলির ব্যবহারও তাঁর ইওরোপীয়। উপরন্তু যে বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী এবং অসঙ্কোচে ইওরোপীয়, সে হচ্ছে ছবির স্পেসের বিশ্লেষণে ও ব্যবহারে। ছবির জমিকে তিনি বৈজ্ঞানিকসুলভ ভঙ্গীতে ভাগ করে বিষয়বস্তুর প্যাটার্ণটি মেপেজুপে কক্ষে কক্ষে ন্যস্ত করতেন, ফলে তাঁর ছবিতে যে জ্যামিতিক সংহতি, বাঁধন, কাঠিন্য এবং ঋজুতা আসত তা ইওরোপীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে পশ্চিমভারতীয় পুঁথিচিত্র অথবা ভারতীয় মিনিয়েচরের জাতিগত ভেদ স্পষ্ট। জমিকে এইভাবে জ্যামিতিক উপায়ে গড়ে তোলার দরুণ তাঁর ছবিতে নির্মাণগুণ দেখা দিত, ছবি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হত। এবং ঠিক এরই জন্য অনেক সময়ে তাঁর ছবির ফিগরগুলির আলাদা আলাদাভাবে নিজস্ব অস্থিমজ্জা কঙ্কাল শিরদাঁড়া না থাকলেও, প্যাটার্ণের জ্যামিতিক বাঁধনে সেগুলি টানের মধ্যে পড়ে খাড়া হয়ে থাকত। ফলে ছবির টুকরো টুকরো অংশে বলিষ্ঠতা এবং ডিজাইনের অভাব থাকলেও সব অংশগুলি মিলে একটি প্রীতিপ্রদ প্যাটার্ণ নির্মাণ করত, সে প্যাটার্ণ হয়ত শ্রেষ্ঠ ডিজাইনের পর্যায়ে পড়তনা, কিন্তু চিত্রের নিজস্ব এলাকায় তার স্থান হত অবিসংবাদিত।

এইরকম অকুণ্ঠচিত্তে খোলাখুলিভাবে ইওরোপীয় টেকনিক গ্রহণ করায়, সে মাধ্যমে আধুনিক যুগের কলকাতা শহরের রূপ ফুটিয়ে তুলতে তাঁর বাধল না, বরং তাঁর টেকনিকের পক্ষে তাঁর বিষয়

এবং বিষয়বস্তু হল নিতান্তই মানানসই, সঙ্গত। তার কারণ ভারতের আধুনিক শহুরে সভ্যতাও মূলত বিদেশ থেকে আমদানি, ইওরোপীয় চিত্ররীতির মত সে জীবনও কতকটা বিদেশী, অনভ্যস্ত। ঠিক এই কারণেই তাঁর অধিকাংশ চিত্র চিত্রহিসাবে অত সার্থক, কারণ তার দেহ এবং আত্মা দুইই অভিন্ন-প্রকৃতির, অন্যোন্যনির্ভর, পরস্পরের সম্পূরক। কিন্তু ঠিক যেমন শহুরে জীবনে, বাঙ্গালীর সাহেবি-

য়ানাকে তিনি তাঁর শ্লেষাত্মক কার্টুন চিত্রে কঠিন ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেন, তাঁর নিজের অনেক ছবি আবার অনুরূপ স্বরচিত অতিরঞ্জনে ভ্রষ্ট। কিছু কিছু ছবিতে, যথা হরপার্বতী চিত্রে, তাঁর কিয়ারস্-ক্যুরো খুবই অতিরঞ্জিত, ফলে তা অনেক ক্ষেত্রে নিছক কালোয়াতিতে নেমে যায়, মুদ্রাদোষ হয়, নাটকীয় গুণ ত্যাগ করে নাটুকে হয়। কিন্তু প্রায় সর্বদাই তাঁর ছবি রঙের ব্যবহারে সার্থক ; এখানে ইওরোপীয়

জলরঙ বা প্যাস্টেলের নরম টোনের সঙ্গে ভারতীয় মিনিয়েচরের নক্সীকাঁথার উজ্জ্বল বিচিত্র রঙের হয় অপূর্ব সমন্বয়, ফলে ছবিতে আসে ঝকঝকে, উল্লাসময় স্ফূর্তি। তিনি দুই জগৎ থেকেই বেপরোয়া নিশ্চিন্ত হাতে রঙ কেড়ে নিয়ে নিজের ছবিতে ব্যবহার করলেন, এবং সে ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হল সার্থক।

কিন্তু এত সার্থকতা সত্ত্বেও তাঁর ছবিতে কোথায় একটু ফাঁক থেকে গেল। তার কারণ প্রতি দেশই নিজস্ব টেকনিকের সৃষ্টি করে তার নিজস্ব সভ্যতার তাগিদে, তার নিজস্ব জীবনের যাবতীয় সমস্যার নিরাকরণের উদ্দেশ্যে। ইওরোপীয় জীবনের সমস্যা ভারতীয় জীবনের সমস্যা নয়; ইংরেজ শেলি বা কীট্‌স্‌কে যেভাবে বোঝে আমাদের দেশের অতি নিখুঁত ইংরেজিনবীশও সে ভাবে বুঝতে অপারগ। সুতরাং ইওরোপীয় চিত্রের টেকনিক ভাল করে আয়ত্ত করলেও গগনেন্দ্রনাথ নিজের দেশের জীবনের উপর তা যখন প্রয়োগ করলেন তখন তাঁর টেকনিক হল মূলত আরোপিত, উপর উপর, কতকটা ভাসাভাসা। সেই থেকেই এল তাঁর ছবির কবিত্বসুলভ রোমান্টিক মেজাজ, জীবনের বাহ্যরূপের সম্বন্ধে কবিসুলভ উৎসাহ। আধুনিক ভারতীয় জীবনের উপরদেশেই তা সীমাবদ্ধ রইল। ঠিক সেই কারণেই তাঁর কিউবিস্ট ছবি ইওরোপীয় কিউবিস্টরীতির প্রতিধ্বনি হল, ইওরোপীয় রীতিকে নতুন কোন অর্থে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করলনা।

ভারতীয় চিত্রে তাঁর দ্বিতীয় বিশিষ্ট দান ক্যারিকেটিওর, কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, ব্যারিস্টরদের স্বদেশিয়ানা, চরকা বনাম পৃথিবীর সভ্যতা এসব বিষয়ে তাঁর তীব্র শ্লেষ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি গভীর। সাধারণত কার্টুন চিত্র খবরের কাগজে সকালে দেখলে বিকালে আর মনে থাকেনা। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের কার্টুন অস্ত্রচিকিৎসকের ছুরির মত; যেমন বদরক্ত বার করে দেয় তেমনি দাগও রেখে যায়। বাস্তব জীবনে তাঁর কবিত্বময় মন যেখানেই পীড়িত হয়েছে, সেখানেই তাঁর ব্যঙ্গ ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। এও তাঁর শহুরে, মার্জিত দৃষ্টির ফল; এমন কি সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতাও তাঁর ছবির সমকক্ষ নয়। এই কারণেই তাঁর বিরূপবজ্র, নবহুল্লোড়, অদ্ভুত লোক, ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

61

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের একজন তা লম্বা ভনিতা বা সংকোচ করে বলার দিন গেছে। তাঁকে সোজাসুজি মহান চিত্রশিল্পী হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে কথা আরম্ভ করাই উচিত হবে। যাঁরা অনুযোগ করেন তিনি দেশলাই-এর বাক্স ভাল করে আঁকতে পারতেন না, তাঁরা চিরকাল দেশলাই-এর বাক্স ছবির সমান জমিতে নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করেননি বলেই, ফেল মারার দম্ভ নিয়ে কটূক্তি করেন। রবীন্দ্র-চিত্রের গুণ, অম্বিষ্ট সম্বন্ধে তাঁদের কোন বোধ, জ্ঞান, বিনয় নেই। তাঁরা বর্তমান যুগের চিত্রকলার অন্বেষণ, অভীপ্সা, অভিযান সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন না, বোঝেনও না। তাঁরা জানেন না যে সেজানের পর চোখের দেখাচেনা জগৎকে রঙীন ফোটোগ্রাফের মত করে আঁকার দিন আর কোনমতে ফিরবে না। এমনকি আজকাল সামান্য বিজ্ঞাপনের ছবিতেও রঙীন ফোটোগ্রাফি অচল, সেখানেও বস্তুকে ভেঙ্গে, দুমড়ে প্ল্যাস্টিক রূপের মধ্যে না ফেললে অশিক্ষিত গ্রাম্য চোখেও প্রশংসা মেলে না।

একদিকে যামিনী রায় যেমন গেলেন বস্তুকে অতিক্রম করে ছবি আঁকতে, বস্তুর বস্তুত্ব গলিয়ে কাগজের সমান জমিতে রঙের টুকরো টুকরো খণ্ডে কণ্টুরের রেখা দিয়ে জমিয়ে বেঁধে রাখতে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ গেলেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হতে, বাস্তব থেকে তার আসল সত্যরূপ ফুটিয়ে বার করতে। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এই দুই ধারার একটি অন্তরায় ছিল 'সুন্দর' ছবি আঁকার রীতি, অর্থাৎ গীতিকাব্যধর্মী, পেলব, সুকুমার নারী ও পুরুষ দেহ, অথবা অন্য পক্ষে কামোদ্দীপক লাস্য ভাব, যাকে আমরা বলি ঠুন্‌কো সুন্দরপানা ছবি। সে ধরনের ছবি প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আবৃত করে দেয়, তার রসবোধের পথে বাধা সৃষ্টি করে, শুদ্ধ বর্ণ ও রেখার আস্বাদকে সাহিত্যিক ভাবালুতার প্রলেপ দিয়ে বিকৃত করে। ফলে প্রত্যেক মহৎ শিল্পীর মত রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম কর্তব্য হল মিষ্টি মিষ্টি, সুন্দরপানা ছবি বিষবৎ বর্জন করা, ছবিতে 'অসুন্দর' বিষয় সচেতনভাবে এনে তার চিত্রগত সৌন্দর্য, সুষমা, সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলা। ছবিতে সাহিত্যিক ভাব ও ভাবালুতার বদলে রেখা ও রঙের জোটক, সংস্থান, বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে চিত্রের মধ্যে নিছক চিত্রগুণ প্রতিষ্ঠিত করা, চিত্রের পরীক্ষা যে তার রঙ ও রেখার সাফল্যে, ব্যঞ্জনায়, ঐশ্বর্যে, সাহিত্যিক খুঁটির উপর ভর দিয়ে যে তার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা উচিত নয়, তা ঘোষণা করা। রবীন্দ্রনাথে আমরা এমন শিল্পী পেলুম যিনি সজ্ঞানে 'সুন্দর' বিষয়, 'সুন্দর' মুখ, 'সুন্দর' দেহ, সুন্দর মায়ায় ঘেরা দৃশ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে, সাধারণ, বিশ্রী, নোংরা বিষয়, সাধারণ 'অসুন্দর' মুখ, 'অসুন্দর' দেহ, এমনকি অসুস্থ, বিভীষিকাময় পরিবেশের প্রবর্তন করলেন। এবং এই উপায়ে চিত্রকলাকে ভারতবর্ষের সাধারণ, ছেঁড়াখোঁড়া, অভাব অনটন, বিভীষিকাপর্যুদস্ত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রথমে একাকার করে দিয়ে তারপর তার মধ্যে চিত্রগত ফর্ম ও রূপের অন্বেষণে বেরোলেন। এরকম অসমসাহসী, বিপ্লবাত্মক কাজ খুব কম ভারতীয় শিল্পীই

করেছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে যখন তিনি সত্তর বছর বয়সে একা চিত্রশিল্পে এই পথে বেরোলেন, তখনও তিনি কাব্যে, উপন্যাসে আগের মতই তন্নু, পেলব রুচিতে লিখে চললেন। হেনরি জেম্‌স্‌ একবার নিজের উপন্যাস রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, তিনি কখনও 'ডাউন-টাউন' অর্থাৎ শহরতলী, বস্তিতে যাননি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যে, গানে কখনও শহরতলী বা বস্তিতে যাননি, ফলে ১৯২০ সনের পর, বিশেষ করে তাঁর গল্পে, উপন্যাসে এক ধরনের হাল্কা, অসার্থক, চোখ-ধাঁধানো প্রসাদ প্রায়ই আসে। ঠিক এই সময়ে তাঁর চিত্রকলায় অত ওজন গভীরত্ব, বলিষ্ঠতা, জীবনের প্রতি মমতা, জ্ঞান ও বিচার তাই আরও বিস্ময়ের বস্তু। স্পষ্ট মনে হয়, 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' বা 'চোখের বালি'তে যে যন্ত্রপাতি, উপকরণ, মালমশলা নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন, ১৯২৭ সনের পর তিনি সে সব অপর্যাপ্ত বিচার করে চিত্রশিল্পে তার পরিপূর্ণতা খুঁজলেন।

প্রাচ্যরীতিতে সমান, ফ্ল্যাট জমিতে রঙ ও রেখার অলঙ্কারময়, ব্যঞ্জনাবহুল বর্ণাঢ্য ব্যবহার তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেন। কিন্তু এখানেও তিনি রঙ ও রেখার প্রাচীন ঐতিহ্যসিদ্ধ রীতি নির্মম হাতে ঠেলে দিয়ে রঙ ও রেখার সম্পূর্ণ নতুন নতুন ব্যবহার প্রবর্তন করলেন। তিনি শেষের দিকে সরাসরি উনিশ শতকের ইওরোপীয় পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিজ্‌মের আলো আর রঙকে বরণ করলেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা জানতেন যে চিত্রকরের তুলিতে যেটুকু রঙের পসরা আছে তা কখনও প্রকৃতির আলো আর রঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। এই ব্যর্থতার জ্ঞান ইওরোপীয় শিল্পীর আসতে বহু শতাব্দী লেগেছিল। উনিশ শতক পর্যন্ত তাই তাঁরা হেরেও হার মানতে চাননি। কিন্তু ভারতীয় শিল্পী এটা প্রথম থেকেই বুঝে রঙের নানা অস্ফুট টোন বর্জন করে সর্বদা রঙের জোরালো বৈষম্য বা কনট্রাস্টের দিকে যেতেন। রঙের এই ধরনের ব্যবহার করতে গেলেই, অর্থাৎ টোন, হাফটোন, বর্ণচ্ছটার বর্ণালিবিভঙ্গের ব্যবহার ত্যাগ করে, উজ্জ্বল কড়া রঙ আনলেই, ছবিতে গভীরত্ব, ঘনত্ব অর্থাৎ ভল্যুম এবং ম্যাস কমে যেতে চাইবে। আর ভারতীয় চিত্রে যদি কিছুর অভাব থাকে তা ভল্যুম এবং ম্যাসের।

ছবিতে ভল্যুম ও ঘনত্ব যে আনতে হবে তা রবীন্দ্রনাথ সরাসরি স্বীকার করলেন। অথচ তিনি জানলেন যে রঙের ঐশ্বর্য কমানো চলবে না। তাই নিজের মত করে নানাভাবে ঘেঁটেঘুঁটে তিনি বার করলেন নানা রঙ মেশাবার এক অভিনব রীতি। এটা স্বীকার করতেই হবে যে ঐতিহ্যসিদ্ধ চিরাচরিত পথ ছেড়ে তিনি চিত্রশিল্পে নতুন ঐশ্বর্যময় পাথেয়র সন্ধান দিলেন। তিনি নানা রঙের মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন জোরালো উপাদান আবিষ্কার করলেন, সেটি হল রঙীন জমির মধ্যে প্রাণময় ভাস্বর দ্যোতনা, রঙের তীব্র জৌলুস। সেই সঙ্গে এল ভল্যুম ও ম্যাস, যার জন্যে রঙের জমক নষ্ট হল না, বরং সমানই রইল, আরও বিচিত্র হল। রঙকে ভাস্বর, স্পন্দিত রূপ দেবার জন্য রঙের পর রঙ তিনি ব্যগ্র হাতে কাগজে লেপে দিলেন, সাদা রঙের বদলে কাগজে ফাঁক রেখে দিলেন, যা দু-তিন প্রস্থ রঙের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোবে। এইভাবে রঙকে তিনি তার স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ভারতীয় চিত্রে রঙ ছিল এতদিন উপলক্ষ, ভাবের প্রতীক, এখন হল স্বকীয়তায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত। অনেক রাজপুত মুঘল ছবি আছে যাতে রঙের সংস্থান গৌণ, অর্থাৎ ইচ্ছামত রঙ পাল্টে দিলেও ছবির যেন বিশেষ ক্ষতি হয় না, সাদা কালোয় ছাপানো ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রঙের সমন্বয় কল্পনা করে নেওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙ হল চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, রঙের ব্যবহারেই ফুটে উঠল ছবির সার্থকতা ; রঙ, রেখা ও ছবি হল অভিন্নাত্মা। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবি একরঙে ছাপলে কতকটা অবান্তর ঠেকে।

কি তাগিদে তিনি ছবি আঁকা আরম্ভ করলেন তা আন্দাজ করা যায় এইটুকু মনে রাখলে যে তিনি মোটামুটি ১৯২৯ সনের শেষ দিকে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন আর ১৯৪০ সনে শেষ করেন। মাত্র এগারো বছরেরও কমে তিনি সারাক্ষণ সমস্ত কাজের মধ্যেও দুহাজারের উপর ছবি আঁকেন। তার মধ্যে অনেক ছবি যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও তাদের সংখ্যা কম, সম্পূর্ণ ছবির সংখ্যাই বেশী। সুতরাং এটা বুঝতে দেরি হয় না যে ছবিকে তিনি মোটেই খেলাচ্ছলে নেননি। উল্টে, তিনি চিত্রকে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশের একটি মুখ্য উপায় হিসাবে নিয়ে, সাহিত্য, গানে যা সম্ভব হয়নি, রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে তার পরিপূর্ণতা খোঁজেন এবং লাভ করেন। আমাদের এখনও দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান চিত্রশিল্পী ও চিত্রশিক্ষকরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে সবদিক দিয়ে মহৎ সৃষ্টি বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা বোধ করেন। তাঁরা এখনও খানিকটা ভাব দেখান যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চিত্রকলা ছিল নিতান্তই ক্লান্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়, সবটাই অনধিকার চর্চা, এবং প্রতি-ভার প্রতি সম্মান দেখিয়ে শুধু মুখে হাসি টিপে ভাল ভাল বলা উচিত। তাঁদের এই উপেক্ষার ফলে আমাদের চিত্রকলার ছাত্ররা যথেষ্ট শ্রদ্ধাভরে রবীন্দ্রনাথের ছবির কাছে শিখতে যান না। যিনি সত্তর বছর বয়সে খ্যাতি ও সাফল্যের চূড়ায় উঠেও দিনে বারো তেরো ঘণ্টা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োগ করতেন তাঁর পক্ষে নিতান্ত অন্তরের তাগিদ না থাকলে, একান্ত প্রয়োজনীয় মনে না হলে, বলবার জানাবার কিছু না থাকলে ছবির পিছনে সময় নষ্ট করা যে বাতুলতা মাত্র, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে একথা বুঝতে দেরি হওয়া উচিৎ নয়। এখানে মাতিসের একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি একবার বলেন : "চিত্রকলায় ছবি আঁকার উপকরণ যে-বিরাট অংশ গ্রহণ করে বলে আমরা কল্পনা করি, সেটা ঠিক নয়। আমি যা করি তাতে আমি আবদ্ধ নই। আমি যদি অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতুম তবে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ছবি আঁকা ছেড়ে তাই করতুম। সেইজন্যে ফর্মের প্রকাশের চেষ্টায় আমি মাঝে মাঝে ভাস্কর্যে হাত দিই। তাতে করে সুবিধা হয় এই যে সমান ফ্ল্যাট জমির সমুখে দাঁড়িয়ে না থেকে আমি বস্তুর চারপাশে বেশ করে ঘুরে ঘুরে তাকে আরও ভাল করে নিরীক্ষণ করতে পারি, অধ্যয়ন করতে পারি।"

আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীরা রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে পারেননি তার কারণ আছে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বীকার করতে পারেননি। প্রাচ্যদেশের কলাকেন্দ্র শান্তিনিকেতনের মধ্যস্থলে বসে এমন ছবি আঁকলেন যা সে কেন্দ্রের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী, যা ওরিয়েন্টালিস্টদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। যা ইওরোপের কাছে ধার নিয়ে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে। যার মধ্যে রোমাণ্টিক ভাবালুতা নেই, গ্রাম্য মঙ্গলচিহ্নের আলপনা নেই, কাব্যপনা নেই, নেতিয়ে-পড়া, মেকি ললিতলবঙ্গ-লতার উৎপ্রাস নেই। আছে যা ঋজু, কঠিন, অস্থিকঙ্কালমজ্জাবিশিষ্ট, 'অসুন্দর'।

ছন্দ কথাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার তাগিদের হদিশ মেলে। যে ছন্দে তাঁর

সাহিত্য, গান, সৃষ্টির অনবদ্যতায় মহৎ সেই ছন্দ তাঁর ছবির মূল কথা। এবং এরই কল্যাণে বোঝা যায় কেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকায় মন দিলেন। সাহিত্যে যে ছন্দ এনেও তাঁর মন উঠল না, রেখায় রঙে সেই ছন্দ এনে সম্পূর্ণতা পেলেন।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ভারতীয় চিত্রশিল্পী শিক্ষা শুরু করেন ইওরোপীয় টেকনিকে। অর্থাৎ দুই মাত্রার সমান কাগজের জমিতে কিভাবে তিনমাত্রার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব, ঘনত্ব আনা যায়, রেখা ও রঙের সাহায্যে কি করে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বস্তুর ভল্যুম ও ঘনত্ব আনা যায়, কি করে ছবিতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গুণ আনা যায়, প্রথম জীবনে তাঁরা সেই শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। যৌবনের

উদ্যম এই বিদ্যা আয়ত্ত করায় খরচ করে তাঁরা মাঝ বয়সে আবিষ্কার করেন যে প্রাচ্য চিত্ররীতির মূল প্রতিভা হচ্ছে কাগজের দুই মাত্রার সমান ফ্ল্যাট জমিতে অলঙ্কারমূলক প্রতিমার প্রতিভাস ও বিন্যাস। প্রাচ্যরীতি কাগজকে মূলত কাগজ বলেই স্বীকার করে, রঙ ও রেখাকে, রঙ ও রেখা বলেই স্বীকার করে ; ফলে, ছবিতে প্রাকৃতিক বস্তুর তিনমাত্রিক ভ্রমকে যথাসম্ভব দুইমাত্রিক ডিজাইন বা ফর্মকে মুখ্যত রেখা, গৌণত রঙের সাহায্যে নির্মাণ বা প্রতিষ্ঠা করে। অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পীর ট্র্যাজেডি হয় এখানে। বিদেশী শিক্ষার কৃপায় ও অনুশীলনের ফলে যে পাথেয় রোজগার করেন, মাঝবয়সে আবিষ্কার করেন যে তা উত্তরাধিকারসূত্রে, জন্মগত অধিকার হিসাবে তাঁর রক্তে যে চিত্রঐতিহ্য বইছে

তার বিপরীতধর্মী। তখন একদিকে ভয়াভয় পরধর্ম, অন্যদিকে অবহেলিত স্বধর্মের দোটানায় পড়ে তাঁরা প্রমাদ গণেন। ফলে তাঁদের ছবি ইওরোপীয় অস্থিকঙ্কালের অভাবে সজীবভাবে দাঁড়ায় না, অন্যপক্ষে তাঁরা প্রাচ্যরীতির মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজে পান না। তাঁরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সার্থক, যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু বা যামিনী রায়, তাঁরা ইওরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশী নীতি পরিক্রমার পর প্রাচ্যরীতির মধ্যে নতুন পথ পান। অর্থাৎ তাঁদের পরিণতি হয়েছে পাশ্চাত্যনীতি থেকে প্রাচ্যনীতিতে মুক্তি পেয়ে।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এর ব্যতিক্রম। তিনি বোধহয় একমাত্র শিল্পী যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রক্তে পাওয়া প্রাচ্যরীতি থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য রীতিতে এগোন। এই ধরনের যাত্রা ও পরিণতি তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনেও সুস্পষ্ট। প্রথমে একান্ত উনিশ শতকের বাঙালী কবি থেকে আস্তে আস্তে ইওরোপীয় দর্শন ও মেজাজের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ঠিক যেমন সাহিত্যে ইওরোপীয় চেতনা ও প্রসাদ সত্ত্বেও তাঁর রচনা মূলত প্রাচ্য রয়ে গেল, তেমনি তাঁর ছবি শেষ দিকে অত্যন্ত ইওরোপীয় এবং ইওরোপীয় বিচারে অত্যন্ত আধুনিক হয়েও যেন কোথায় এক প্রাচ্য মেজাজের মধ্যে রয়ে গেল। চট করে কিছু বলতে হলে বলতে হয় এই প্রাচ্য মেজাজ আছে তাঁর চীনে ক্যালিগ্রাফিসুলভ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, রেখায়, তাঁর রঙের ব্যবহারে, ছবির হার্মনিতে, স্তব্ধ প্রশান্তিতে, সাহিত্যিক মূডে। কিন্তু এতে সব বলা হয় না। বোধহয় অন্য আর একভাবে বললে কথাটা আরও সহজবোধ্য হয়। ইওরোপীয় শিল্পীরা যেমন ইওরোপীয় টেকনিককে মূল ভিত্তি করে প্রাচ্যরীতিকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন যার ফলে কার্পাচ্চো, রেমব্রান্ট, দেগা, ভান গখ প্রাচ্যরীতি থেকে সোজাসুজি ধার করে ইওরোপীয় রীতির মূলধন বাড়িয়ে সে ঋণ শোধ করেছেন; রবীন্দ্রনাথ তেমনি প্রাচ্যরীতির উপর মূল ভিত্তি করে ইওরোপীয় রীতির দিকে এগিয়ে সে ধার শোধ করে প্রাচ্যরীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর চিত্রশিল্পের পথ দুই মাত্রা থেকে তিন মাত্রার দিকে অগ্রসরের পথ। অন্য ভারতীয় শিল্পীর পথ উল্টো: তা তিন মাত্রা থেকে দুই মাত্রার দিকে অগ্রসরের পথ। দুইমাত্রা থেকে তিনমাত্রায় যাত্রা করার দরুণ এবং ছবিতে শেষ পর্যন্ত দুইমাত্রার প্রাধান্য থাকার ফলে তিনি আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রের সঙ্গে আদানপ্রদানের ভাষা খুঁজে পান।

চিত্রজগতে অভিযানের আকস্মিকতাও তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছে, যেমন করেছে প্রথমদিকে চিরাচরিত অ্যাকাডেমিক রীতিতে শিক্ষার অভাবজনিত অপটুত্ব। তাঁর ছবিতে কয়েকটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক স্তর বা ধাপ দেখা যায়। খুব অল্পকথায় এ ধাপগুলির উল্লেখ করলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

চিত্রের প্রথম আভাস আসে তাঁর সুন্দর, ঝরঝরে, মুক্তার মত হাতের লেখার 'অসুন্দর' কাটাকুটিতে। তখন সে ছবি নিতান্তই আঁকাবাঁকা অথবা তির্যক কাটাকুটির রেখা, তাতে কোন জন্তু বা ফুল, লতা,

পাতার ইঙ্গিত নেই। তার পরের ধাপে এল জন্তু, লতা পাতার দূর আভাস, কোথাও বা একটা চোখ, মুখের একটু রেখা, আজগুবি জন্তুর পা, শরীর, বা মাথা, একটু ফুলের অংশ, অথবা লতা, পাতা। তৃতীয় পর্যায়ে এল 'পূরবীর' পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির শেষের দিকের পাতাগুলিতে হস্তলিপি সম্পূর্ণ কেটে কুটে তিনি আঁকলেন রাজ্যের আজগুবি আকার, প্রাকৃতিক জীবজন্তুর আভাস, দুই বা ততোধিক জীবজন্তুর আকৃতি একই নক্সায় মিলিয়ে আবোল তাবোলের বকচ্ছপ ছবি। সেগুলি যেহেতু প্রাকৃতিক জীবজন্তু বা বিষয় নয় সেহেতু সবই দুইমাত্রিক, তাতে ঘনত্ব গভীরত্ব একেবারে নেই। চতুর্থ ধাপে তিনি একেবারে সাদা কাগজে সরাসরি, সোজাসুজি ছবি আঁকতে মেতে গেলেন। ছবির বিষয় হল খানিকটা আজগুবি, কাল্পনিক, খানিকটা বস্তুবিচ্ছিন্ন বা অ্যাবস্ট্রাক্ট। রীতি হল একেবারে দুইমাত্রিক,

সমান, চ্যাপ্‌টা ফ্ল্যাট। মডলিং বা পারস্পেকটিভের চিহ্নমাত্র নেই। কাগজের সাদা জমিতে ছবিকে এমনভাবে নিক্ষেপ করলেন, এমনভাবে তার সংস্থান সাধন করলেন যে সাদা জমি মুহূর্তে গতিচঞ্চল, তৎপর, উন্মুখর হয়ে উঠল। কাগজের সাদা জমি ও ছবির মধ্যে তিনি এমনভাবে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করলেন যে মনে হবে ছবিটি একটু নড়ালে চড়ালেই তার কেটে যাবে। এই অবস্থায় তাঁর ছবিতে বিলক্ষণ রঙ এসে গেছে; অনবরত ক্ষিপ্র হাতে মনের দুর্বার তাগিদে ছবি আঁকা চলছে। এত ব্যগ্রতা-ভরে ভান গখও কোনদিন ছবি আঁকেননি।

এই সময়ে তাঁর ছবিতে যে আজগুবি ও বস্তুবিচ্ছিন্ন আকৃতি বা ফিগর এল তাতে তাঁর অসামান্য চিত্রবোধ, শুভবুদ্ধি ও চিত্রশিল্পীসুলভ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে-কোন শিল্পের উদ্দেশ্য হল বস্তুকে অতিক্রম করে, বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হওয়া, বাস্তবের আসল সত্যরূপটি ফুটিয়ে

তোলা। বাস্তবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তবের সমকক্ষ হওয়া নয়। এই সমস্যাটি বিশেষ করে প্রযোজ্য চিত্রশিল্পে, যার একমাত্র বিচারক মানুষের চোখ এবং যে-চোখের সমুখে বিশ্বপ্রকৃতি তার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দাঁড়িয়ে। চিত্রশিল্পীর যেটুকু সম্বল, তা দিয়ে প্রকৃতির রঙ আলো ও আকারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং দুইমাত্রিক সমান কাগজে নিছক চোখের দেখা, চোখের চেনা জগৎকে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করা অসম্ভব, সে রকম চেষ্টা করাও অবাস্তর। সেইজন্যে সেজানের উত্তরাধিকারীরা প্রাকৃতিক বস্তুর বিশ্লেষণে লেগে গেলেন, রেখাকে রেখা, রঙকে রঙ, কাগজ বা চটকে কাগজ বা চট বলে স্বীকার করে নিতে লজ্জা পেলেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথও এই স্বীকার থেকে শুরু করলেন, তাই তিনি প্রথমেই চোখের দেখা, চোখের চেনা জীবজন্তু বাদ দিয়ে আরম্ভ করলেন অদেখা, বা কল্পনার জগতে দেখা, অথবা স্বপ্ন বা স্মৃতির জগতে সঞ্চিত নানাবিধ আকৃতি দিয়ে, যাদেরকে চোখের চেনা জিনিসের সঙ্গে সামিল করার বালাই রইল না, যা তাঁর দুইমাত্রিক জমির ছবিকে ফোটোগ্রাফির কারাগার থেকে মুক্ত করে দিল। সেই সঙ্গেই পরের পর্যায়ের ছবির জন্যে প্রস্তুত করল। চতুর্থ পর্যায়ের আজগুবি অথবা বস্তুবিচ্ছিন্ন, অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি এইভাবে তাঁর চিত্রেতিহাসে সেতুবন্ধের কাজ করল; দুইমাত্রা থেকে তিনমাত্রার যাত্রাপথে রীতি ও বিষয়ের অদ্ভুত সঙ্গতি ঘটিয়ে তাঁর সেই সময়ের ছবিকে সার্থক করল। শুনলে অনেকেই অবাক হবেন যে তাঁর দু হাজারের উপর ছবির মধ্যে আজগুবি, উদ্ভট ছবির সংখ্যা হবে বোধহয় শতকরা পাঁচ, আর বস্তুবিচ্ছিন্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির সংখ্যা শতকরা এক। এর মধ্যে যাকে আজগুবি বা উদ্ভট ছবি বলে উল্লেখ করছি সেও আসলে নিতান্ত আজগুবি বা উদ্ভট বললে খুবই ভুল হবে। সেগুলির অধিকাংশই হচ্ছে একাধিক জন্তুর জটপাকানো ছবি। একের মাথার সঙ্গে অন্যের শরীরের তলায় হয়ত তৃতীয় কোন জন্তুর পা। কোনও একটি জন্তু নয়, বরং জন্তুত্বের ছবি নিয়েই ব্যস্ত। তাই এগুলি ক্লে'র ছবির মত সব সময়ে নিতান্তই উদ্ভট নয়। একটির ঘাড়ে যেন আর একটি কোনমতে পড়ে দুটি তিনটি মিলে খিচুড়ি হয়ে গেছে। এগুলি আবার সব সময়ে সজ্ঞানে হত না, শিল্পীর হাত ও
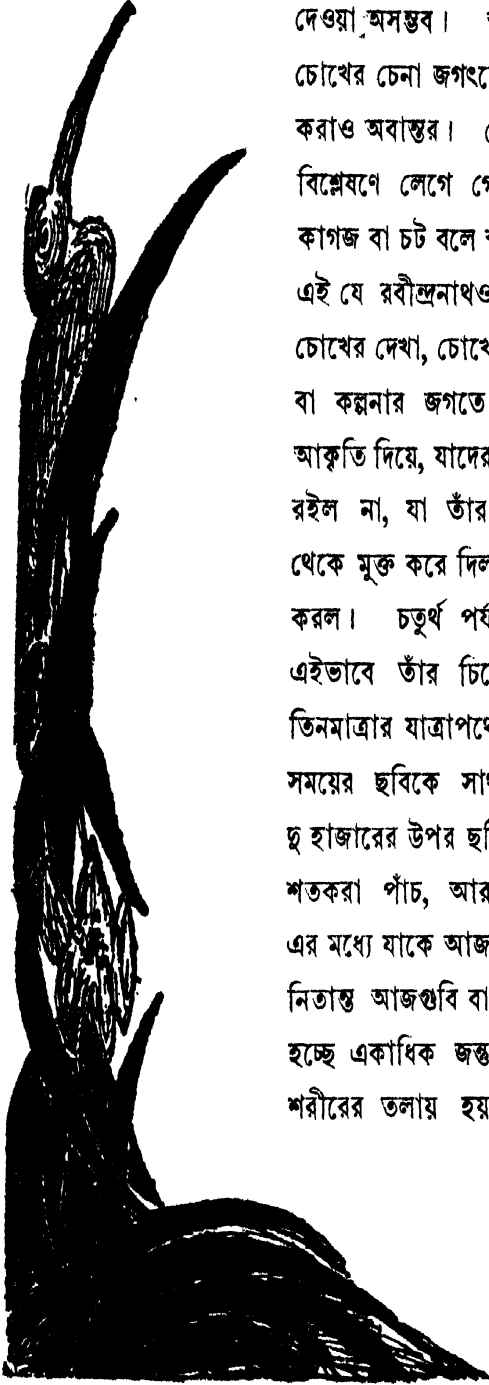
মন এত বেগে, এত তাগিদে চলত যে সব সময়ে একটা ছবি শেষ করার তর সইত না, ফলে একই ছবির অবশিষ্টে আরেকটি ছবির অংশ হুড়োহুড়ি করে এসে জোড়া লেগে যেত। সুতরাং এসব ছবিকে এক কথায় উদ্ভট খেয়াল বলে তকমা পরিয়ে দিলে ভুল হবে।

তাঁর পঞ্চম পর্যায়ের ছবি নেহাতই অকস্মাৎ অজস্র বেগে অনেকগুলি একসঙ্গে এল। এবং এতে এল প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু, ল্যাণ্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট, মানুষের শরীর, গ্রুপ, বাড়ীঘরদোর, বিশ্বপ্রকৃতি। সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল তাঁর রেখা, আলো, ভল্যুম, ঘনত্ব, পারস্পেকটিভ, গভীরত্ব, রঙের ভাস্বর দ্যুতি সম্বন্ধে বোধ ও দখল। রঙে এল ভারতীয় চিত্রে যুগান্তকারী, অভূতপূর্ব, জ্বলজ্বলে, দ্যুতিমান জমির খোল বা বুনুনি, ইংরেজিতে যাকে বলে টেক্সচার। ছবি হল তিনমাত্রিক। চতুর্থ ধাপের স্পেস কম্পোজিশন চলে গেল ; তার কারণ, সমান, ফ্ল্যাট সমতল বা প্লেনেই শুধু স্পেসে ছবির সংস্থান সম্ভব, তিনমাত্রিক ছবিতে স্পেস ছেড়ে রাখার সমস্যা গৌণ। শেষের পর্যায়ের ছবিতে ইংরেজি মতে কম্পোজিশনের গুণ যত না আছে তার চেয়ে বেশী আছে যাকে বলে ফর্মাল বিন্যাস। তার সঙ্গে এল অভূতপূর্ব শক্তি, কাঠামো, ঋজুতা, কাঠিন্য। স্ত্রী পুরুষের অনেক পোর্ট্রেট বা মাস্কে এক ধরনের হাড়ালো, পরুষ কাঠিন্য মাঝে মাঝে আসে যা আমরা পাই শুধু অসিরিয়ান ভাস্কর্য বা মজেইকের কাজে।

বরাবরই প্রায় সমস্ত ছবি এঁকেছেন 'পেলিক্যান' কালিতে। তেলরঙ ব্যবহার করেছেন বোধহয় মাত্র দুবার কি তিনবার। তার মধ্যে একটি অধৈর্যবশে ছিঁড়ে ফেলেন। তেলরঙে তাঁর আঁকা পোষাত না, কারণ তেলরঙ শুকোতে দেরি হয়, কখন শুকোবে তার জন্যে বসে থাকা তাঁর ধাতে ছিল না। ছবি আঁকার তাগিদ এত বেশী ছিল। পেলিক্যান কালিতে বরং তিনি আবার স্পিরিট মেশাতেন, যাতে তাড়াতাড়ি শুকোয়। প্রথম প্রথম ছবি হত একরঙা, জলে নষ্ট হবে না এমন কালো কালিতে আঁকা। তারপরে আসত একই রঙের দুটি ছটা বা টোন, যেমন হাল্কা নীল, গাঢ় নীল ; তার পরে এল লাল কালো, কিংবা লাল নীল। তারপর হঠাৎ একসঙ্গেই সব রঙ এসে গেল। কিন্তু প্রথমে এগুলি সবই হল কাগজের উপর সাধারণভাবে লেপা, ছবির একটি অংশে একটি রঙ। তখন রঙ ছিল অলঙ্কার মাত্র, তার স্বকীয়, নিজস্ব সত্তার কোন বালাই নেই। তারপর রঙ দ্রুতগতিতে হল ভাস্বর, কাগজের জমি থেকে রঙের লেপের পর লেপ ঠেলে বেরোল বিচ্ছুরিত দ্যুতি। অস্বচ্ছ আস্তর হিসাবে রঙ কখনও ব্যবহার হয়নি। এই ধরনের ভাস্বর, বিচ্ছুরিত দ্যুতি এল বড় বড় মাস্ক বা মুখোসে, আবক্ষ প্রতিকৃতিতে। এই পরিণতি হল যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আশ্চর্য। অনেকটা ইওরোপীয় গির্জার রঙকরা বা ষ্টেন্ড্ গ্লাসের মত।

একদিকে রঙের কৌশল যেমন বাড়ল, অন্যদিকে কলমের রেখা হল তেমনি তীক্ষ্ণ, প্রখর, নিশ্চিন্ত। রবীন্দ্রনাথ আকৃতি বা ফিগরের সীমারেখা বা আউটলাইন কখনও বদলাননি, সংশোধন করেননি। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হয় প্রথম আঁকা সীমারেখা তিনি কখনো কখনো বদলেছেন, কিন্তু

সেটা ভুল। হয়ত কোন সময়ে একটা ছবির রেখার উপর আরেকটি বিষয়ের রেখা পড়েছে। যদি কখনও ভুল করে রেখার উপর রেখা পড়েছে তখনই তিনি সেই অংশটি ঢেকে দিয়েছেন বা রঙ বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মূল আকৃতি বা প্রতিমার রেখার কখনও নড়চড় হয়নি। সর্বদা ফিগরের রেখা এক-বারই চূড়ান্তভাবে আঁকতেন, সেই জন্যে অনেক সময়ে চিত্রে সাদা জমি ছেড়ে যেতেন। বলা বাহুল্য এটা একান্ত প্রাচ্য ঐতিহ্য। যদি কোন ফিগর অসম্পূর্ণ হত তার কারণ তাঁর নক্সার অপটুত্ব নয়, কারণ কলমের উপর ছিল প্রচণ্ড দখল। প্রথম প্রথম তুলি বাগে আসত না, সেইজন্য নরম তুলি ফেলে কাঠি, বা কলমের উল্টোদিক বা আঙুল দিয়ে রঙ লাগাতেন। কোন ক্ষেত্রেই রঙ সীমারেখা অতিক্রম করত না। শেষের দিকে তুলিও আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নক্সার রীতি চিরকালই কলমের উপর নির্ভর হয়ে রইল, তাতে কঠিন তারের গুণ রইল, নিজের সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকল, কখনও কন্টুর হল না, কারণ কন্টুর লাইন নয়, লাইনের বিকার, কন্টুরে তিনমাত্রার ভ্রম আনে।
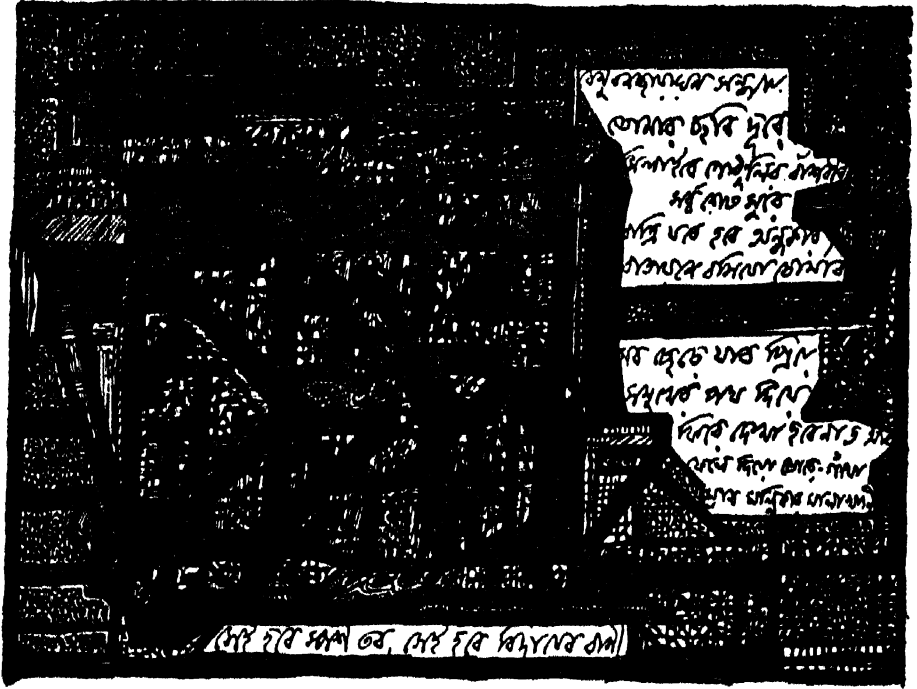
২৭ নবেম্বর
বুয়েনোস্ এয়ারিস।

স্বচ্ছ কালি দিয়ে বারবার লেপতেন। কালির লেপ কখনও ফিকে থেকে গাঢ়, বা গাঢ় থেকে ফিকে হল না। সমান ভাবে লেপা হল। প্রাচীন ইওরোপীয় দিকপালদের মত কালিকে খানিকটা স্বচ্ছ চমক বা 'গ্লেজের' মত ব্যবহার করলেন, আলো পড়ে যে রঙ ঝক্‌মক করে ওঠে। এক রঙের কালির লেপের

উপর আর এক রঙের কালির লেপ লাগালেন। স্বচ্ছ লেপের পর লেপ বিভিন্ন রঙ লাগানর ফলে নীচেকার রঙ উপরের আস্তর ভেদ করে ঝিলকিয়ে উঠল। কখনও রঙ আগে থেকে মেশাতেন না,

মেশানো রঙ ব্যবহার করতেন না। এক কথায়, প্যালেট বা রঙ মেশানর থালি ব্যবহার করতেন না, ছবির কাগজ, ছবির জমিই হত প্যালেট। যখন স্থানে স্থানে উজ্বল আলো আনার দরকার হত ছুরি দিয়ে সেখানটা চেঁচে ফেলে, বা অন্য কিছু দিয়ে ঘষে সে জায়গায় টেম্পেরা বা প্যাস্টেল বা ক্রেয়ন লাগিয়ে, অস্বচ্ছ রঙ এনে, আলো উস্কিয়ে, অর্থাৎ ইংরেজিতে হাইলাইট করে দিতেন। তাঁর বিশিষ্ট উৎকর্ষ হচ্ছে ছবিতে রঙের দ্যুতি আনা, যাকে ইংরেজিতে বলে ল্যুমিনসিটি। পরব কাটা জহরতের মত নীচের থেকে স্বচ্ছপ্রায় রঙের মধ্যে দিয়ে টলটলে আভা ফুটে উঠত। একেই ষড়ঙ্গে বোধহয় বলে লাবণ্য, অর্থাৎ মুক্তা-ফলের ভিতরকার টলটলে ভাব। ফলে আসত রঙের টেক্সচার, যেটি স্পর্শগ্রাহ্য নয়, বিভিন্ন রঙের বুনুনির ফল, যাতে ছবির ভিতর থেকে বেরোত রঙের ছটা, জহরতের মত দ্যুতি। এই প্রসঙ্গে মাতিসের একটি উক্তি স্মরণীয় : "আলো সৃষ্টির জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। শিল্পীকে ঘুরপথে স্বাভাবিক আলোর সমতুল্য আলো খুঁজতে হবে। তা না হলে ত ছবির পিছনে সূর্যকে রাখতে হয়। ছবির পক্ষেই আলো বিকিরণ করা সম্ভবপর হওয়া উচিত। ছবিতে যদি এই গুণটি থাকে তা হলে সেটি যদি ছায়ায় রাখা যায় তাহলে তার সমস্ত মূল্য বজায় থাকবে, আবার যদি রৌদ্রে রাখা যায় তখনও সূর্যের ঔজ্জ্বল্যকে সে ঠেকিয়ে রাখবে।" আকারের সবটাই রঙে পর্যবসিত হত, আকার ও রঙ হত অভিন্ন। এক এক সময়ে ছবিতে ইম্প্যাস্টোর জমক আনতেন, মনে হত তা যেন ঝিনুকের খোলার মত শক্ত। যে সব ছবিতে এনামেলের ঐশ্বর্য আসত তা হত ভার্নিশ লাগানর ফল। রঙের সত্তা তিনি ফুটিয়ে বার করেন। ক্লে যেমন রেখাকে ইচ্ছামত খেলিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ রঙকেও ইচ্ছামত অনায়াসে যেমন ইচ্ছা তেমন অক্লেশ নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন। ফলে রঙের এল এক স্বাধীন জীবন। তাই তাঁর ছবিতে আমরা পাই রঙ সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ নতুন, ঐশ্বর্যময় অভিজ্ঞতা। রঙ ও রেখার এই রকম মৌলিক সমন্বয় ও মিলন ভারতের চিত্রেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের প্রবর্তন করল। নিখুঁত সংস্থানের ফলে যেভাবে সুর বাঁধা হল, অর্থাৎ টান বা টেনশনের সৃষ্টি হল তাতে চিত্রে এল মূর্ত, প্রাণস্পন্দিত, গতিশীল বিন্দু (ডাইনামিক পইণ্ট), রঙের প্রাণময় ব্যবহারে কাগজের জমিতে এল উচ্ছল কর্মব্যস্ততা। সেই সঙ্গে রঙ সৃষ্টি করল শক্তিশালী ছন্দ, যে ছন্দ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপজীব্য, যা ছবিতে এসে প্রতিটি জিনিসকে এক ঐক্যে বেঁধে রাখল। এই ঐক্য ছবির নানা অসম আকার, অসম রেখা ও রঙের মধ্যে প্রতিসাম্য ও স্থিতিস্থাপকতা সাধন করল। নানা উপকরণের অসাম্য বা অ্যাসিমেট্রির ভার এক অখণ্ডতায় গেঁথে রীতিদুরস্ত ফর্মাল বিন্যাসের ঐক্য সাধন করল। যামিনী রায়ের ছবির মত এ ঐক্য চিত্রপ্রতিমায় ডিজাইনের অখণ্ডতা দ্বারা সাধিত হল না ; এ ঐক্য সাধিত হল বর্ণালিবিন্যাসের সমগ্রতায়। এরকম রঙ ও রেখার রাজজোটক দুর্লভ, তাহার ফলে যে ছন্দের উৎপত্তি হল তাও দুর্লভ। ফল হল আশ্চর্য রকমের আধুনিক, অথচ কোথায় যেন অনির্বচনীয়ভাবে প্রাচ্য।

এই আধুনিকতার জন্য তাঁর নক্সা ও রঙ যতখানি দায়ী তার চেয়েও দায়ী তাঁর কবি মন ও চেতনা। যেমন সাহিত্যে তেমনি জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একান্তভাবে বিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর শুদ্ধ চেতনায় বিশ শতকের স্থান কাল পাত্র হত অতি অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত। আধুনিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, শুভাশুভের সমস্যা থেকে সাহিত্যে যেমন তিনি প্রায় কখনও মুখ ফেরান নি, তাদের অস্বীকার করে স্বরচিত জগতে মুক্তি খোঁজেন নি, চিত্রজগতেও তেমনি বোধহয় আরও সোজাসুজি, স্পষ্টভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই আক্ষেপ, সংঘাত, বিবেক, মুক্তিকামী মন। বহু ছবি আছে যার অত্যাশ্চর্য জৌলুষ, সংহত সংযম ও আপাত স্তব্ধতা সত্ত্বেও রেখায় ফুটে উঠেছে গভীর অসন্তোষ, রঙে ফুটেছে চাপা গুমোটভাব, জমির ব্যবহারে এসেছে শ্বাসরোধকর পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তির তীব্র কামনা। তাঁর বহু ছবিতে রেখা, রঙ, জমি ও আলোর ব্যবহারে অধীর আগ্রহ, তীব্র আশা, ব্যগ্র ইসারা যেভাবে ফুটে ওঠে তা নিতান্ত সমগ্র চেতনার পক্ষেই সম্ভব, এবং ঠিক এইখানে, স্থান-কাল-পাত্রগুণে সম্পূর্ণ তাঁর চিত্র অধিকাংশ ভারতীয় চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিকে অতিক্রম করেছে।
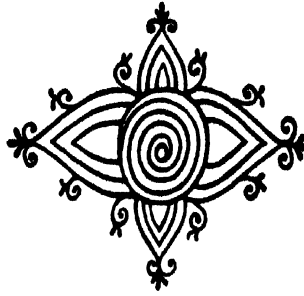
নন্দলাল বসু

গুরুশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন নন্দলাল বসু। প্রবাদ আছে প্রথম বয়সে তাঁর এঞ্জিনিয়ার হবার কথা ছিল। তা যদি হত তবে আধুনিক চিত্রকলা দরিদ্র হত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে সময়ে অবনীন্দ্রনাথের একটি প্রদর্শনী হয়। ঘটনাটি হয় তাঁর জীবনের প্রথম সন্ধিক্ষণ। প্রদর্শনী দেখে নন্দলাল খুব উত্তেজিত হয়ে একটি ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথকে দেখান। ফলে তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু হয়। গুরু আর শিষ্যের বংশগত ধারার তফাৎ একটু মনে রাখলে পরবর্তীকালের অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন বলা যায়, সাহিত্য, সঙ্গীত, নানাবিধ চারুশিল্প, বংশগৌরব, হিন্দু ও ব্রাহ্ম-ধর্মের মিশ্র সমৃদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে জন্মে, শৈশব থেকেই অবনীন্দ্রনাথের চরিত্রে মানবিকতার প্রতি উৎসাহ হয় মুখ্য, ধর্মের প্রতি, স্বদেশীয়ানার প্রতি আগ্রহ গৌণ। অন্য পক্ষে নন্দলালের পক্ষে স্বদেশীয়ানা হয় অত্যন্ত সত্য, এমনকি তাঁর কাজে তা কিছুটা সংকীর্ণতাও আনে ; তাঁর মনের গড়ন হল

সত্যকারের হিন্দু। রেখা, নক্সা, ও আকারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ও উৎসাহ আবদ্ধ হল। তাঁর মন গেল মুখ্যত এইদিকে, রঙের দিকে নয়, যদিও তিনি অজন্তার ছবি নকল করার যুগ থেকেই রঙে বহু কাজ করেছেন। ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য তিনি যেমন ভালভাবে একান্ত মনে গ্রহণ করলেন, অন্য কোন জিনিষ তত ভাল করে গ্রহণ করতে পারলেন না। তার ফলে তাঁর ছবিতে এল সেই শিল্পেরই রেখা ও ফিগর। তিনি হলেন মুখ্যত নক্সাবিদ; দুইমাত্রিক জমিতে ভাস্কর্যের রেখায়িত গুণ, নিরাসক্ত,

তন্মাত্রিক স্তম্ভিত বিস্তার কি করে আনা যায় তার দিকে গেল তাঁর উৎসাহ। জীবন আরম্ভ করলেন চিত্রকর হিসাবে নয়, ভাস্করসুলভ নক্সার প্রতি উৎসাহ নিয়ে। রঙ নিয়ে তাঁর কাজ খুব গৌণ, তাঁকে মুখ্যত বর্ণশিল্পী বলা যায়না, যদিও একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষত ১৯৩০-৩৬ সালে তিনি কতকগুলি অতি আশ্চর্য সুন্দর রঙীন ছবি আঁকেন, যার রঙের হার্মনি একটি সম্পূর্ণ স্বকীয় জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু তবুও রঙের প্রতি কিছুটা ঔদাসীন্যের ফলে তিনি কোনদিনই অবনীন্দ্রনাথ প্রচলিত ওয়াশ টেকনিক

পুরোপুরি আয়ত্ব করার দিকে মন দেননি। তাঁর ওয়াশ হয়ে যেত অস্বচ্ছ। অন্য পক্ষে তাঁর ফর্মের নক্সায় অলঙ্কার সত্ত্বেও সংযম ছিল বিস্ময়কর।

নন্দলালের জীবনে দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ আসে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে কাজ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বোধ হয় দুবার খুব গভীর ছাপ রাখেন, এমনকি তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন করেন বলাও যায়। প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে গেলেন তখন ধ্রুপদী ছাঁদের গড়নে, শিল্পসূত্রসারে নির্দেশ অনুযায়ী ছবি আঁকার পদ্ধতি দেখে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে চারিদিকের দৃশ্যমান জগৎ থেকে বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে উৎসাহ দেন। অবনীন্দ্রনাথও এবিষয়ে নন্দলালকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। রবীন্দ্রনাথের তাগিদে তিনি ভাল করে বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আঁকার আগ্রহ বোধ করলেন। ধ্রুপদী রীতিতে শিক্ষার ফলে রেখা ও নক্সার উপর অসামান্য, প্রতিভাসুলভ দখল তাঁর আগে থাকতেই ছিল। এখন নতুন বিষয় পেয়ে তাঁর তুলি শতমুখী হয়ে উঠল। দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের জীবনে পরোক্ষ প্রভাব রাখেন যখন তিনি তাঁকে চীন ভ্রমণে নিয়ে যান। চীন থেকে নন্দলাল চিত্রজগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্ভার নিয়ে ফিরে আসেন। প্রকৃতি থেকে দেখে আঁকার অভ্যাস তার আগেই হয়, সেই অভ্যাস যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত ও সমৃদ্ধ হয় চীনের অভিজ্ঞতায়। তার পরে তাঁর শিল্পী জীবনে যে যুগ আসে তা অত্যন্ত ঐশ্বর্যময়। এর পর তিনি বলেন যে চিত্রশিল্পীর কাছে যেকোন বিষয়ই অমূল্য, বিষয়মাহাত্ম্যে ছবির মাহাত্ম্য হয়না। এই সময়ে তাঁর চিত্রে বর্ণবিন্যাস এক অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য লাভ করে। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগীর কাছে শুনেছি, শান্তিনিকেতনে ভোরবেলা ছাত্রদের নিয়ে যখন মাঠে বাগানে আঁকার ক্লাস করতে যেতেন তখন উচ্ছ্বসিত আবেগে বলতেন 'ঐ যে ভোরে সূর্যের আলোয় পাতাটির উপর শিশির ঝকঝক করছে, সেইটি যদি ঠিকমত আঁকতে পার তবে তা শিব বা বুদ্ধের ছবির চেয়ে কম কিসে।' কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চিত্রমানসে ভাস্কর্যসুলভ ফর্ম বা গড়নই প্রাধান্য পায়। তার থেকেই তাঁর ছবিতে আসে উজ্জ্বোনো আলো বা হাইলাইট, মড্‌লিং এর উপর জোর, ঘনত্ব গভীরত্বের প্রতি আগ্রহ। কিন্তু বরাবরই তাঁর ঝোঁক ছিল চোখের দেখা যথাযথ্যের চেয়ে আদর্শ গ্রুপ, ল্যাণ্ডস্কেপ, কম্পোজিশনের প্রতি, কোন বিশেষ মুহূর্তের রিয়ালিটির চেয়ে সেই অবস্থার আদর্শ বাস্তবের প্রতি। অর্থাৎ তিনি সব সময়েই একটি বিশেষ পরিবেশ ও মুহূর্তের আদর্শ রূপ ও তার মূড খুঁজেছেন।

তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বোধ হয় শিল্পাচার্য হিসাবে। বিশ শতকের ভারতবর্ষের চিত্রকলায় তিনি বোধ হয় সর্বপ্রধান আচার্য। ঐতিহ্যসিদ্ধ রীতিতে তাঁর অমোঘ দক্ষতা। তিনি সত্যকারের অ্যাকাডেমিশিয়ান। বহু ধরনের বিচিত্র রীতি, পদ্ধতি, ধাঁচ ও টেকনিক তিনি অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করেছেন। বহু বিচিত্র ফর্ম, রীতি, ছক তিনি তুলিতে আনতে পারেন, চিত্রজগতে তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, দক্ষতা আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে বোধ হয় অতুলনীয়।

ট ঠ ড ঢ

ট ঠ ড ঢ করে গোল
কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।

তারই ফলে তিনি নানা রীতি অক্লেশে মিশিয়ে নতুন রীতির সৃষ্টি করতে ভয় পান না। কিন্তু তবুও শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও উৎসাহ কোনদিনই কমেনি। ভারতীয় স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্য ও ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির মধ্যে তিনি আধুনিক বিচার মতে নতুন করে সম্বন্ধ ও সংশ্লেষণ স্থাপন করেছেন।

তাঁর সবচেয়ে সার্থক চিত্র হয়েছে তাঁর স্কেচ, কালি কলম বা পেন্সিলের নক্সা, যেখানে তাঁর ক্যালি-গ্রাফির প্রতিভা, নিত্য নতুন উদ্ভাবনার খেলায় রেখা পেয়েছে অবাধ ক্ষেত্র ও প্রসার। রঙের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগের ফলে তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ল্যাণ্ডস্কেপ মহত্বগুণে ভূষিত হয়নি। প্রাচীর চিত্রশিল্পী বা মিউর‍্যালিস্ট হিসাবেও তাই তাঁর কীর্তি খুব উঁচুদরের নয়। কিন্তু যে ধরনের কাজে তাঁর হাত অবাধ মুক্তি ও স্বাধীনতা পায় তা হচ্ছে নক্সা, স্কেচ, আলপনা জাতীয় রেখাঙ্কনে ; সেখানে তিনি প্রতিভার স্বকীয়তায় অদ্বিতীয়। তাঁর অলঙ্কারমুখী গড়ন সেইজন্য খুব সার্থক হয় নাটক যাত্রার পোশাক সৃষ্টিতে, যেমন 'তাসের দেশে'র রঙ্গমঞ্চের পোশাকের নিখুঁত যথাযথ্য ও পারিপাট্যে।
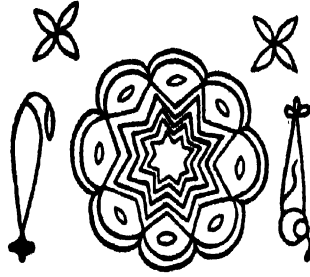
যামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর লেখা ও গানের মধ্যে দিয়ে এযুগে সারা বাঙালী জাতির এবং কতকটা ভারতবাসীর আচারব্যবহার, মনের সরঞ্জাম, ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দিয়ে গেছেন, যামিনী রায় তেমনি তাঁর ছবির সাহায্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের রঙে, ডিজাইনে প্রগাঢ় ছাপ রেখেছেন।

রঙ ও রেখার সমস্যা ; তাদের গতিধর্ম এবং তীব্রত্ব ; ঘনীভূত আবেগ ও প্রকাশ-শক্তি ; প্ল্যাস্টিক ফর্মের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ; চিত্রের এইসব মূল সমস্যা যামিনী রায়ের ছবিতে বারে বারে এমন পরিষ্কারভাবে, গোঁজামিল একেবারে বাদ দিয়ে, এমন নিঃসংশয়, মৌলিক প্রতীতিতে সমাধান করা হয়েছে যে, যে বিচারে তাঁর চিত্র বর্তমান কাল ও স্বদেশকে অতিক্রম করে সার্থক ব্যঞ্জনা এনেছে সেই ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশে স্বীকৃত হয়ে সব দেশের চিত্র ডিজাইন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন, এবং তার বদলে তাঁর সৃষ্টি সব দেশের শিল্পী ও সমঝদারের দৃষ্টি জোর করে আদায় করেছে।

যামিনী রায়ের সকল চিত্রের যা বিশেষত্ব তা প্রাচ্যদর্শন ও প্রাচ্যসভ্যতার বিশেষত্ব। সেগুলি হচ্ছে প্রথমত প্রতিটি ছবির উদাত্ত, নির্মল, বিস্তৃত প্রশান্তি; যত গরম রঙ থাকুক না কেন, যত জটিল রেখা থাকুক না কেন, ছবির সামনে দাঁড়ালে একটি ঠাণ্ডা, প্রশান্ত অনুভূতি মনে, এমনকি গায়ে

আসবে ; যে ভাব নানা বিপর্যয়সঙ্কুল দেশশাসনের রাজসিক ভাব নয়, যে ভাব চিন্তা ও কর্মশোধিত সাত্ত্বিক ভাব। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ছবিতে আছে সর্বত্র উজ্জ্বল, নিষ্কম্প সমান আলো, কোন জায়গায় আলো আঁধার নেই, ছায়াতপ নেই, ইওরোপীয় বাস্তবধর্মী চিত্রের পুরো মড্লিং নেই, আছে শুদ্ধ ফর্মের ডিজাইন। তৃতীয়ত তাঁর ছবিতে কোন ঘটনা নেই, কোন আখ্যান নেই, কোন আখ্যান বা নাটকীয় পরিস্থিতির পূর্বাপর নেই। যদি বা কোন গল্প এসে থাকে তবে গল্পের একটি বিশেষ

মুহূর্তটিকে ছবিতে থমকিয়ে শিলীভূত করে দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর ছবিতে আছে কালের স্তব্ধ ভাব, যেন সময় চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আর চলছে না, যেন সেখানে সময়ের হিসাব নিতান্তই অবান্তর! চতুর্থত তাঁর ছবিতে আছে শুদ্ধ চিত্রধর্মিতা ; চারপাশে পাড় দেওয়া একটু আবদ্ধ সমতল কাগজ বা ক্যানভাসের জমিতে ডিজাইনের অখণ্ড ঐক্য, ছবির মধ্যে সব কিছু জিনিষ এক ছন্দে গাঁথা, যে জগৎ স্বয়ম্বশ এমনকি স্বয়ংসম্পূর্ণ ; যার ফলে কোন জিনিষ, কোন বিষয়

তাঁর মনে যে রূপাবেগ আনে, তার থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, যতক্ষণ না তিনি বিষয়টিকে রঙ ও রেখার ভাষায় সম্পূর্ণ ঢেলে সেজে নির্মাণ করতে না পারেন, তাকে সর্বাশ্রয়ী ডিজাইনের মধ্যে না ফেলতে পারেন।

ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নতুন বৈচিত্র্য এবং একান্ত বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছেন যামিনী রায়। চিত্রের উপাদানগুলিকে তিনি নিরাভরণভাবে ব্যবহার করে চিত্রের মূল উৎসে গেছেন। চিত্রজীবনে অনেক বছর অ্যাকাডেমিক রীতিতে আঁকার পর তিনি তার অসারতা উপলব্ধি করে, ড্রয়িংএর পুনরুদ্ধারে মন দেন। আস্তে আস্তে নানা সরঞ্জাম বাহুল্য ছেড়ে, তিনি রঙীন পটির মত কণ্টুরে ফিগর এঁকে সাদা জমির মধ্যে স্থাপনা করেন। প্রথমে এইসব কণ্টুর হয় সাদা জমির উপর নানা রঙের পটি। এই বিষয়ে আমাদের দেশের পুতুল ও লোকচিত্রের ঐতিহ্য তাঁকে সাহায্য করে। চোখের চেনা-জানা বস্তুর সীমারেখার মত কণ্টুর না এঁকে, সমস্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে, নানা চিত্তবিভ্রান্তিকর উপকরণ বর্জন করে, চিত্রিত রেখাকে করলেন একেবারে সংহত আঁটসাঁট, তাকে এত সরল করলেন যে তাতে ফিগরের শুধু অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ, রস, তাৎপর্যটুকু থাকে, যার দরুণ আমরা চোখের চেনা ফিগরের সঙ্গে তার মিলটুকু বুঝতে পারি, যে বিষয় চিত্রিত হয়েছে

তার বস্তুনিষ্ঠ রিয়ালিটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হই, অথচ আমাদের কল্পনা মুক্তি পায়। কিন্তু রঙের অভাবে, শুধু রঙীন কণ্টুরে ড্রয়িংএর শুদ্ধগুণ আসা সত্ত্বেও তাঁর ছবি হল একটু গীতিকাব্যধর্মী,

লিরিকাল ; সুডৌল রেখা সত্ত্বেও তাঁর ছবি হল রেখাত্মক, লিনিয়ার। এর প্রধান কারণ হল, চিত্রের অন্যান্য উপাদান, অর্থাৎ রঙ, আলো, এবং ডীপ স্পেস বাদ দিয়ে, তিনি শুধু কণ্টুর ও স্পেস নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন বলে। রঙীন পটির চওড়া-সরুর ভিতর দিয়ে তিনি মডলিংএর পুরো গুণ আনেন। কিন্তু ছবিতে রঙ এবং আলো থাকল না। তখন তিনি কাগজে পাতলা করে ভুসোর আস্তর দিয়ে ভুসোর কালিতে ড্রয়িং আঁকলেন। ভুসোর পাতলা, গাঢ়-ফিকে আস্তরের উপর, ভুসোর কণ্টুরে আবদ্ধ জমিতে, ভুসোর ফাঁকে ফাঁকে যে সাদা কাগজের আলো ফুটে উঠল তাই হল যথেষ্ট। ছবি মনে হল যেন ছাইরঙের বেলে পাথরে খোদা, তাতে উপকরণের অসাধারণ মিতব্যয়ে ফুটে উঠল পুরো মডলিং, এমন কি ডীপ স্পেসের আভাস, বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তার রঙ। এ ডীপ স্পেসের ধারণা তিনি পরে আরও ভাল করে ফোটান একটি বড় ডিমের আকারের মধ্যে ছোট ডিমের আকারকে অল্প আড়াআড়ি-ভাবে রেখে, ছবিতে ভুসো, বা যখন বাঁকুড়া অঞ্চলের লাল কাঁকড়ের লাল্‌চে-ব্রাউন আস্তর পড়ে, তখন ছবির জমিতে সেই রঙের বড় বড় ফোঁটায় রঙ দিয়ে ; তাতে চিত্রের যে মনুমেণ্টাল রূপ এল তা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু রঙ, রেখা, আলো ও স্পেসের যুগপৎ সার্থক সংশ্লেষণের ফলে চিত্রে যে সৃষ্টির সত্যরূপ আসে তাঁর ছবিতে তখনও এল না। রঙ এবং আলোর অভাবে তাঁর ছবি একদেশদর্শী হয়ে পড়ল। রেখা এবং কণ্টুরের ছন্দ অস্বাভাবিক প্রাধান্য পেল। তিনি ছবিতে পুনরায় রঙ আনার অনিবার্য তাগিদ অনুভব করে কৃষ্ণ বলরাম, গোপিনী চিত্রাবলী, পরে রামায়ণ চিত্ররাজিতে, চাপ চাপ সমান উজ্জ্বল রঙ এনে কণ্টুরকে আরও উজিয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে আলো দিলেন হল্‌দে পটিতে বা মোটা রেখায়, চোখের সাদায়। রেখা এবং কণ্টুরকে দিয়ে তিনি চূড়ান্ত কাজ করিয়ে নিলেন। শুধু যে রেখায় অসীম শক্তি এল তা নয়, রেখার মধ্যস্থিত জমিতেও এল অপূর্ব টান ও আবেগ। ইতিমধ্যে বরাবরই তিনি ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেছেন ; তাতে রঙ, আলো, রেখা এবং স্পেসের ব্যবহার যথেষ্ট সার্থক কিন্তু তবুও তিনি রেখা এবং এবং কণ্টুরের বেড়াকে ভেঙ্গে তাঁর চিত্র ডিজাইনকে মুক্তি দেবার তাগিদ বোধ করেন। এই সন্ধিক্ষণে হঠাৎ আড় বুননে বোনা তালপাতার চাটাইএর উপর রঙীন ছবি আঁকা তাঁর শিল্প জীবনে মোটেই আকস্মিক বা খেয়াল খুসীপণা নয়, বরং নিতান্ত ভবিতব্য রূপে দেখা দিল। চাটাইএর বস্তুগত স্বভাবে, রঙের খণ্ড খণ্ড জমিতে তাঁর সীমারেখা বা কণ্টুর ভেঙ্গে গেল, দুপাশ থেকে কখনও বড় সীমারেখা টপকে মিশে গেল, কখনও বা কণ্টুর একেবারেই গলে, হারিয়ে গেল। চাটাইএর বুননের গুণে রঙের ফাঁকে ফাঁকে ভিতর থেকে আলো ঠিকরে উঠল। এই ভাবে রঙ, রেখা আর আলো নতুন সংশ্লেষণের মধ্যে পুনর্জন্ম পেল, ছবিতে এক নতুন ঐশ্বর্য এল।

আরেকটু বিশদভাবে বললে বোধহয় বক্তব্য পরিষ্কার হবে। প্রথমে বলব তাঁর রেখার গতি পরিণতি সম্পর্কে, তারপর তাঁর রঙ সম্বন্ধে, তারপর তাঁর ছবির সমগ্র রূপ ও ছন্দ সম্বন্ধে, যদিও এটা

খুবই স্পষ্ট যে কোনও ছবিই এভাবে আলাদা আলাদা করে বলা যেমন অন্যায় তেমন অবান্তর। তবুও লেখায় কিছুটা পরিচ্ছন্নতা আনার চেষ্টায় এ রকমভাবে আরম্ভ করা যাক।

প্রথম যখন তিনি রেখাচিত্র আরম্ভ করেন, তখন জমিতে ভুসো মাখিয়ে নিতেন, সাদা দিতেন না, ফলে রঙ হত ব্রাউন-ঘেঁষা ছাই। যে শুদ্ধ রেখার প্রমাণ তাঁর ছবিতে আছে তা ক্যালিগ্রাফির

লাইন নয়, যদিও তিনি চীনে ছবি এবং টেকনিক ধৈর্য ধরে শিক্ষা ও আয়ত্ত করেন। সে লাইন শুধু কব্জিকে কেন্দ্র করে আঙুল ঘুরিয়ে আঁকা নয়, কলমের রেখা নয়, সব সময়েই তা তুলি বা বুরুষের রেখার মত দেখায়। একথাটি স্পষ্ট হয় যদি আমরা মনে রাখি যে একেবারে প্রথমদিকের রেখাচিত্রে রেখাটি হত রঙীন, এমনকি দুটি বা তিনটি রঙের লাইনের সাহায্যে জৌলুস তুলে আঁকা। প্রথম দিকের

এই রকম রঙীন লাইনের পর আসে কাল ভুসোর লাইন। এখানেও এ রেখা সরল জ্যামিতিক রেখা হল না, এর মধ্যে ফুটে উঠল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব, গভীরত্ব, অর্থাৎ তিনমাত্রার আমেজ। তার মধ্যে থাকত ভল্যুমের আভাস, জড়ান পটের ছবির মত তা একেবারে সমান, চ্যাপটা, বা ফ্ল্যাট হত না। মড্‌লিং থাকত, ফোরশর্টনিং অথবা সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়াও থাকত, বিশেষ করে যখন একসঙ্গে একাধিক শরীর বা গ্রুপ আঁকতেন। প্রথমদিকের একটি বড় ছবি আছে, বড় করে কৃষ্ণ আঁকা, কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, পাশে ময়ূর, পা দুটি ফাঁক করে একপাশ করে দেওয়া, অথচ পায়ের পাতাটি উলটে সমস্ত আঙুলগুলি দেখা যাচ্ছে না, প্রোফিলই বলা যায়। তাতেই বোঝা যায় যে তাঁর ছবিতে মড্‌লিং ও পারস্পেকটিভের রেশ তখনও আছে, তাঁর ফ্ল্যাট ছবি তখনও এক বিশিষ্ট দর্শনভঙ্গীর মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় নি। এই সময়ে তাঁর ছবিতে রঙ হত প্রায়ই পরস্পরবিরোধী, ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসোনাণ্ট; অর্থাৎ রঙগুলি পরস্পর মিলে মিশে (ইংরেজিতে কম্প্লিমেণ্টারি) এক সঙ্গত রঙের আমেজ তৈরি করত না। উলটে রঙগুলি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ এনে রেখা ও ফর্মটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করত। যেমন প্রথম দিকে রঙ হত সবই লাল ও নীল। এমনকি হলদে, হরিতাল বা পিউরিও থাকত খুব কম। রেখার রঙ হত কালো। কখনও কখনও কালো রেখার উপর নীচে অন্য রঙের রেখা দিয়ে মূল রেখাটিকে আরও জোরালো করা হত। সবুজ রঙ এল এর অনেক পরে।

প্রথম যুগের রঙের ব্যবহারে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর প্রধান অন্বিষ্ট ছিল, শক্ত, পরিষ্কার রূপ বা রেখাটি খুঁজে বার করে তাকে অর্থাৎ প্রতিমা বা ইমেজটিকে যতদূর সম্ভব বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা, প্রতিষ্ঠিত করা, সেই কাজে রঙের ব্যবহারকে গৌণ করা। সেই হিসাবে যে সব বিভিন্ন রঙের পাশাপাশি ব্যবহার হার্মনির সৃষ্টি করে না, বরং যেগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং খানিকটা কর্কশতা আনে, সেই রঙগুলি তিনি বেছে বেছে (লাল ও নীল) পাশাপাশি সাজালেন, যাতে দর্শকের মন রঙে আকৃষ্ট না হয়ে, উলটে রঙে ধাক্কা খেয়ে প্রতিমা বা ফর্মের ধ্যানে ডুবে গিয়ে আনন্দ পায়। কাজে কাজেই প্রথম যুগে তিনি পূর্ণ প্রতিমা শূন্যে বা স্পেসে প্রতিষ্ঠিত করলেন, একটি সম্পূর্ণ সুডৌল প্রতিমার চারপাশে রইল খালি জায়গা, তারপরে ছবির ফ্রেম, অর্থাৎ কোন জায়গায় ছবি কেটে গেল না, ফ্রেম উপচে পড়ল না। রইল শুধু রেখা ও প্রতিমার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়।

পরবর্তী যুগে এই রেখাকে তিনি আরও বিস্ময়কর কাজে লাগালেন। কিন্তু কোন সময়েই তাঁর রেখা বা লাইন ক্যালিগ্রাফির লাইন বা কলমের লাইন হল না, সেগুলি হল চিত্রিত পটি, পেণ্টেড ব্যাণ্ড বা কণ্টুর। কালিঘাটের পটুয়া যে রেখা আঁকেন তা ক্যালিগ্রাফির রেখা, পটুয়া প্রথমবার যা আঁকেন দ্বিতীয়বার সে-রেখার আর পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়না, প্রথম চোটে যা হয় তাই হয় চরম। কিন্তু যামিনী রায়ের রেখা ইংরেজিতে যাকে বলে আর্কিটেকটনিক রেখা, সজ্ঞান সতত প্রচেষ্টায় স্বাধীন। যে সব ড্রয়িং এখানে ছাপা হয়েছে তা দেখলেই এর সত্যতা প্রমাণ হয়। তাঁর কোন রেখাই 'স্বভাব'-

শিল্পীর ইন্‌স্পিরেশনজাত নয়, তা সর্বদাই একান্ত চিন্তা, হিসাব, অনুশীলন ও প্রয়াসের ফল, ইংরেজিতে যাকে বলে ডেলিবারেট। অবশ্য বেশ কিছু নক্সায় তারের মত স্পষ্ট, ক্ষীণ কঠিন রেখা এসেছে এবং তাতে তাঁর চীনে রীতিতে ক্যালিগ্রাফির সম্পূর্ণ আয়ত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের চিত্রিত রঙীন ও কালিকলমের ছবিতে ক্যালিগ্রাফির রেখা যদিই বা আসে তাতে ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে উৎসাহ থাকে কম।

প্রথম দিকে তাঁর চিত্রে সমগ্র আকৃতি বা ফিগরটি কি করে চারপাশে ফাঁক রেখে ছবির জমির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল তা বলেছি। তাতে এল ভাস্কর্যসুলভ দ্যোতনা, যা তিনি একই সময়ে এবং কিছু পরে তাঁর মাটির পুতুল বা কাঠখোদাইয়ে আনেন। কিন্তু তাতে স্থাপত্যের গুণ তখনও অনুপস্থিত। তখনও চিত্রপ্রতিমার গুণ হল ভাস্কর্যের গুণ, অর্থাৎ ইচ্ছামত কয়েকগুণ বাড়ান যায়, তাতে ফর্মের ব্যাঘাত হয় না, বরং খোলতাই হয়, যাকে ইংরেজিতে বলে মনুমেণ্টাল। তাতে স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্যের ব্যঞ্জনা এল কম, যদিও এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দলবাঁধা বা গ্রুপ করা নতোন্নত ভাস্কর্যের পটি, বা ইংরেজিতে ফ্রিজের, সংহত রূপ ও আবেগ এনে স্থাপত্যের ভূমিকা তৈরি করলেন। এই সময়ে তাঁর ছবির লোকজন দাঁড়িয়ে, ছড়িয়ে পড়ে ফ্রেমে ঠেকল। পরবর্তী যুগে তিনি এই ফ্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, অর্থাৎ ফ্রেম বা চারপাশের পাড় ছবির অঙ্গ হয়ে গিয়ে ছবিকে গেঁথে ফেলল। ফ্রেম হল ছবির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ছবির প্রাণের, ফর্মের একান্ত সজীব অংশীদার। তাই এ যুগের সবচেয়ে সার্থক চিত্র ক্ষীণকটি গোপিনীর দল। তাঁর ছবির উৎস হল বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের ভিতরের দেয়ালের টালি ও দাঁইহাটের পাথরের কৃষ্ণমূর্তি।

এখানেই যদি যামিনী রায় এসে থামতেন, আর না এগোতেন, তাহলে তিনি ওস্তাদ চিত্রশিল্পী হতেন, বাংলার নিজস্ব চিত্রধারার পরাকাষ্ঠা দেখাতেন, কিন্তু তিনি তবুও অভূতপূর্ব মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতেন না। তাই তাঁর পক্ষে এখানে ক্ষান্ত হওয়া অসম্ভব হল। এর পরে তিনি যা করলেন, মৌলিক প্রতিভা ব্যতীত তা সম্ভব নয়। প্রথম যুগে তিনি সমস্ত প্রতিমার গোটাটি চারপাশে জমি ছেড়ে, শূন্যে বা স্পেসে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর ফলে চারপাশের শূন্য জমি চঞ্চল হয়ে উঠল, ফিগর ও শূন্য জমির মধ্যে এমন সম্বন্ধ স্থাপিত হল যার ফলে মনে হল ফিগরটি একটু নড়ালে চড়ালেই তার কেটে যাবে। এতে ছিল মড্‌লিং বা ভাস্কর্যের গুণ। তার পরের যুগে তিনি আকৃতি বা ফিগরকে ফ্রেমে নিয়ে ফেললেন, ফলে ফ্রেম হল ছবির অঙ্গ, ফ্রেম ও ফিগর মিলে হল অখণ্ড ছবি, তাতে এল স্থাপত্য নিহিত ভাস্কর্যের গুণ, যে স্থাপত্য বা ফ্রেম ছবি বা ভাস্কর্যকে গায়ে ধারণ করে, আটকে রাখে। তার পরের যুগে তিনি ছবির ফিগর বা প্রতিমাকে ফ্রেমকে অতিক্রম করিয়ে দিলেন, অর্থাৎ প্রতিমার খানিকটা রইল ছবির মধ্যে আটক, বাকিটা ফ্রেম থেকে চলে গেল বাইরে, ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা গেল না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফিগরের খানিকটা পড়ল ফ্রেমে কাটা। এক নিমেষে বিপ্লব ঘটে গেল।

যেই ফ্রেমে ফিগর কাটা পড়ল, অমনি ছবির জ্যামিতিক প্রতিসাম্য বা সিমেট্রি ঘুচে গেল। তখনই ছবিতে এল অ্যাসিমেট্রি বা অসম আকারের মধ্যে ভারসাম্য আনার সমস্যা, প্রয়োজনীয়তা ; অর্থাৎ ছবির মধ্যে হল এমন একটি প্রাণময় গতিশীল বিন্দুর সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা যাকে কেন্দ্র করে ছবির নানা অসম আকার ও রেখা ভারসাম্য ও স্থিতিস্থাপকতা পাবে। যামিনী রায় ছবিতে এই গতিচঞ্চল, ডাইনামিক পইণ্ট যেই আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করলেন তখনই তাঁর অসম্পূর্ণ, ফ্রেমে-কাটা প্রতিমা বা ফিগরে এল নানা বৈচিত্র্যের অসীম সম্ভাবনা, রেখা তখন কল্পনায় মুক্তি পেল, নানা সম্ভাব্যরূপে খেলে বেড়াবার অধিকার পেল। এরপর থেকে তিনি ছবির রেখাকে অজস্রভাবে খেলিয়েছেন, নানা দেশের বিচিত্র চিত্ররীতিনীতিকে নিজের ছবি বা প্রতিমায় এনে ফেলেছেন, সব দেশের ছবির অভিজ্ঞতাকে

কাজে লাগিয়েছেন, এমনকি পারস্পেকটিভ, ফোরশর্টনিংকেও সমান, ফ্ল্যাট, প্রতিমাকে উচ্চারিত করার কাজে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর ছবিতে এই ডাইনামিক বিন্দুর প্রতিষ্ঠা যেই হল, তখনই তিনি হলেন সম্পূর্ণ মৌলিক ও আধুনিক শিল্পী। তাঁর পক্ষে তখন নানা দেশের নানা রীতিনীতি পরিপাক ও আত্মস্থ করে নৈয়ায়িকের মন নিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। বলা বাহুল্য এই ডাইনামিক বিন্দুর পরিচয় ও অধিকার তাঁর কালিঘাটের পট, চিত্রকরদের জড়ান পট, বা বিষ্ণুপুরের পট থেকে আসে নি, এসেছে ইওরোপীয় ও চীনে চিত্ররীতির শিক্ষাদীক্ষা থেকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় তাঁর স্পেসের ব্যবহার। ছবিতে তিনি যেভাবে ফাঁকা জমি বা স্পেসকে ব্যবহার করেছেন, যেভাবে স্পেস ছেড়ে দিয়েছেন তার ভঙ্গী সম্পূর্ণ চীনে ; ইওরোপীয় নয়। এভাবে স্পেস ছেড়ে দেওয়া সত্বেও তাঁর ফ্রেম দুর্বল হয় নি। পরন্তু চীনে ক্যালিগ্রাফি বহুদিন ধরে অনুশীলন করে আয়ত্ত করেও, তাঁর রেখা হল ইওরোপীয়।

এর পর থেকে অর্থাৎ ১৯৩৮ সনের পর থেকে তাঁর কাজ একটানা লক্ষ্যের রাস্তা ছেড়ে নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াল। তখন তাঁর ছবিতে অলঙ্কারবহুল সমান, চ্যাপটা ফ্ল্যাট ডিজাইন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নানা বিচিত্র সংশ্লেষণ ও সমন্বয় হল। যা ঘুরে ফিরে মাঝে মাঝেই তাঁর নিজের দেশ বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টালির খুঁটিতে ফিরে যায়। এর মধ্যে নানা দেশের ছবি নিয়ে তাঁর নকল ও পরীক্ষার বিরাম নেই। অথচ তাঁর কোন ছবিই মূল ছবির হুবহু নকল হয় না, কারণ তিনি যে কোন ছবিকেই বিশ্লেষণ করে তাঁর নিজের মত করে, নিজের তাগিদের সঙ্গে মিশিয়ে আঁকেন। অনেক বছর পর পর কোন এক বিশেষ দেশের ছবিকে নতুন করে দেখেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে যেমন উল্লেখ করা যায় ঈজিপশন রীতিতে সোজাসুজি-দেখা-শরীরের কাঁধে প্রোফাইল করে মুখ আঁকা সাঁওতালদের মাদল নিয়ে নাচের ছবি। এগুলি অন্তত কুড়ি বাইশ বছর আগে প্রথম আঁকা হয়। এ সত্ত্বেও ১৯৫৫ সনে আবার তিনি ঈজিপশন ছবি নতুন করে আঁকলেন।

গত তিন বছরের (১৯৫২-৫৫) ছবি বাদ দিলে যামিনী রায়কে বর্ণশিল্পী হিসাবে প্রাধান্য দিলে বোধহয় অত্যুক্তি হবে। অন্যপক্ষে তাঁকে রঙ সম্বন্ধে অমনোযোগী বলাও সমান ভুল হবে। মুস্কিল হচ্ছে কোন সময়েই তাঁকে কোন একটি সংজ্ঞা বা বিবরণের মধ্যে ফেলা যায় না। যেমন একদিকে তিনিই প্রথম আধুনিক ভারতীয় শিল্পী যিনি একান্ত ভারতীয় চিত্রভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, অন্যদিকে ইওরোপীয় নীতিতে তাঁর কাজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় বেশ কিছুদিন আগে তিনি পার্বত্য দৃশ্য আঁকেন। হাল্কা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে চারপাশের স্বচ্ছ আলো ও স্পন্দিত হাওয়ার মধ্যে দিয়ে দূরের পর্বতের চিত্র হিসাবে এগুলি তাঁর অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়, তার আগে তিনি তিব্বতী টাংকা নকল করেছিলেন, অথচ আজীবন তিনি কোনদিন হিমালয় পর্বতের দুশ মাইলের মধ্যে যান নি। তঁরে পক্ষে এইসব ছবিতে ও পরবর্তী যুগে সেজান ও ইম্প্রেশনিস্টদের সস্তার অবহেলায় ছাপা প্রিন্ট দেখে ইম্প্রেশনিস্টদের সমতুল্য পার্বত্য দৃশ্য বা ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা, তার হাওয়ার গুণটি যথাযথ ধরা, দূরের দৃশ্যে রঙ ও আলোর মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কত কঠিন, কত আশ্চর্য বলা যায় না। কতখানি কল্পনাশক্তি থাকলে এ রকম রঙীন, স্পন্দিত ভাস্বর ছবি সম্ভব তা বিশদ করে লেখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তবুও তাঁর কাছে এ ধরনের কল্পনার কাজ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের কাজ। এবং এত নৈপুণ্য কল্পনা ও দক্ষতা সত্ত্বেও তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপের ভাষা ও চরিত্র হয় মূলত ইওরোপীয়, ভারতীয় নয়। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ল্যাণ্ডস্কেপ বোধহয় সেই হিসাবে ভারতীয় ভাষা বেশী ব্যবহার করেছে।

তাঁর ছবিতে রঙ এসেছে কখনও অলঙ্কার হিসাবে, কখনও বর্ণনা হিসাবে (যেমন কিছু বছর আগের তাড়কাবধ চিত্রে বড় বড় নীল পাতার ত্রিপত্রের মধ্যে লালফুল ফোটা গাছের পাশে একই নীলে আঁকা তাড়কার শরীর)। কিন্তু আগেকার সব চিত্রেই তাঁর রঙের পাশাপাশি সংস্থান কর্কশ বা

পরস্পর বিরুদ্ধাচারী (ইংরেজিতে ডিসোনান্ট)। খুব কম ক্ষেত্রেই সে সব রঙ পরস্পরের মধ্যে মিল (ইংরেজিতে কম্‌প্লিমেণ্টারি) এনে রঙের হার্মনি সৃষ্টি করেছে। রঙ এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যাতে চিত্রের রেখা, ফর্ম ও প্রতিমার উপরে দৃষ্টি নিবিষ্ট হয়। যেমন সমবায় ম্যান্‌সনের প্রদর্শনীতে একটি লক্ষ্মী ছিল, তার পিছনের জমি গাঢ় লাল, লক্ষ্মীর শাড়ী গাঢ় নীল, গায়ের রঙ ম্যাড়মেড়ে হলুদ, হাতে চালের কুনকো, চোখ সরু টানা টানা। প্রমাণ আকারের এই ছবিতে সবকটি রঙ পরস্পর বিরোধী হয়েও ছবিতে সৃষ্টি করে ফর্মের বিশিষ্ট ভাবাবেশ, বা ইংরেজিতে মূড, লক্ষ্মীশ্রী। যে মূড আসত পুরনো সূত্রধরদের লক্ষ্মী প্রতিমায়। সব রঙই হত সমান উজ্জ্বল, একই মূল্যের। তাই অধিকাংশ ফিগর চিত্রে রঙকে তিনি রঙের জন্য ব্যবহার করেন নি, রঙকে দিয়ে কর্তব্য পালন করিয়ে নিয়েছেন বলা যায়। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আলো যেমন তার বাইরের জিনিস, তার স্বরূপ নয়, অথচ আলো বাইরে থেকে পড়ে তার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে, তাঁর চিত্রেও তেমনি মনে হয় রঙ তাঁর ফিগরে লেগে ফিগরের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করে, যে স্বরূপ দাঁইহাটের ভাস্কর্যের মত অনাড়ম্বর, একক, একটি মাত্র অখণ্ড ডিজাইনে মূর্ত।

এই প্রসঙ্গে তাঁর মাটির পুতুল, কাঠখোদাইয়ের উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। তাঁর প্রথম দিকের মাটির পুতুলে প্ল্যাস্টিক মূল্য খুব বেশী, তার সঙ্গে তাঁর প্রথম যুগের কাগজের মাঝখানে ন্যস্ত রেখায় আঁকা সম্পূর্ণ ফিগরের ছবির মিল খুব স্পষ্ট। তার পরের যুগে আসে তাঁর কয়েকটি কাঠখোদাই। ছুরি বাটালির সামান্য কয়েকটি ঘায়ে বাড়তি কাঠটি ফেলে দিয়ে, কাঠের আঁশের চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে, কাঠটি যতখানি সম্ভব কম নষ্ট করে, প্রতিমাটি বার করার বাহাদুরিতে তিনি আধুনিক ভাস্করদের মধ্যেও অন্যতম। এমনকি এ-পর্যন্তও বলা যায় যে তাঁর কাঠখোদাইয়ের মত সার্থক কাজ আধুনিক ভারতীয় ভাস্করদের মধ্যে কেউ বেশী করেছেন কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়ী তৈরির সময়ে মাটি থেকে কিছু পাথুরে মাটি বেরোয় ; তাতেও সবচেয়ে কম কাটকুট করে যে সব আশ্চর্য মূর্তি তিনি বের করেছেন, দেখলে অবাক হতে হয়। এসব পুতুল গড়া ও মূর্তি খোদাইয়ের কাজের সঙ্গে তাঁর ছবির খুব মিল আছে। এখানে মাতিসের একটি উক্তি স্মরণীয়। একবার তিনি ফেল্‌স্ বলে এক ভদ্রলোককে বলেন : "চিত্রকলায় ছবি আঁকার উপকরণ যে বিরাট অংশ গ্রহণ করে বলে আমরা সাধারণত কল্পনা করি সেটা ঠিক নয়। আমি যা করি তাতে আমি আবদ্ধ নই। আমি যদি অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতুম তবে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে, ছবি আঁকা ছেড়ে তাই করতুম। সেই জন্য ফর্মের প্রকাশের চেষ্টায়, আমি মাঝে মাঝে ভাস্কর্যে হাত দিই। তাতে করে সুবিধা হয় এই যে সমান ফ্ল্যাট জমির সমুখে দাঁড়িয়ে না থেকে আমি বস্তুর চারপাশে বেশ করে ঘুরে তাকে আরও ভাল করে নিরীক্ষণ করতে পারি, অধ্যয়ন করতে পারি।"

গত পাঁচ বছরের কাজে পাওয়া যায় তাঁর রঙ সম্বন্ধে নতুন করে সচেতনতা। এতদিনের কাজে বর্ণ শিল্পী হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যেত না। রঙকে তিনি প্রতিমা ও ভাবাবেশ আমেজের

কাছে গৌণ করে দিতেন। কিন্তু গত কয়েক বছরের কাজে দেখা যায় রঙ ও আলো সম্বন্ধে অদ্ভুত তাগিদ, দেশী রঙের ব্যবহারে মনে হয় যেন তিনি ইওরোপীয় মহারথীদের চিত্রের স্নিগ্ধ, স্থির, উজ্জ্বল অনুভূতি, বনেদী কমনীয়তা ও ইংরেজিতে যাকে বলে প্যাটিনা আনতে চান। ছবিতে তাঁর নিজের, নিজের স্ত্রীর, মেয়ের, ছেলে পটলের মুখের আদল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায়ই এসেছে। অখণ্ড, একক ডিজাইনের প্রতি তাঁর উৎসাহ দেখা যায় তাঁর প্রদর্শনী করার মধ্যে (প্রদর্শনীর কোন্ জায়গায় কোন্ ছবি মানাবে এই ভেবে রাতারাতি নতুন করে ছবি তিনিই একমাত্র আঁকেন); তাঁর বাড়ীতে ছবি রাখার মধ্যে; বাগবাজারের গলিতে ভাড়া করা বাড়ীর অবিরাম অদল বদলের মধ্যে; নিজের তৈরি ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়ীর নিত্য ভাঙাগড়া রঙ বদলানোর মধ্যে।

একটি বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগীর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমার কাছে তাঁর কথাটি খুবই যথার্থ বলে মনে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোন একটি বিষয় নিয়ে একটি মাত্র নাম-সই করা ছবির কোন মূল্যই যামিনী রায় যেন দেন না। অনেকেই অনুযোগ করেন যে কোন দোসর নেই এমন ছবি তিনি খুব কমই এঁকেছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে তাঁর কোন ছবিই আর একটির হুবহু নকল নয়, একটু তফাৎ হবেই। পৃথ্বীশ নিয়োগীর মতে এটি তাঁর বৈষ্ণব মনের পরিচয়, যে বৈষ্ণব ধর্মে বীজমন্ত্রের উচ্চারণ অবশ্য প্রয়োজন। একই মন্ত্র কৃষ্ণ বা হরি, যেমন অসংখ্যবার জপ করলেও তার মূল্য কিছুমাত্র কমে না, অটুট থাকে, অথচ চারিদিকে ছড়িয়ে এক পরিবেশের সৃষ্টি করে, তেমনি তাঁর ছবিতে ফর্ম, ডিজাইন ও প্রতিমাই সর্বস্ব, সর্বময়। একবার যদি ফর্মটি, ডিজাইনটি, প্রতিমাটি ঠিকভাবে আসে, তবে তার বারংবার পুনরাবৃত্তিতে প্রতিমাটির ক্ষতি ত হয়ই না বরং মূল্য বেড়ে যায়, এবং সেই সঙ্গে সমাজজীবনে এক তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেইজন্যে তাঁর থীমের বৈচিত্র্য খুব কম। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, যে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগের দরুণই বোধ-হয় তাঁর যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ক থীমের উৎপত্তি।

এই বিরাট শিল্পীর সারা জীবনের কাজ এত বিচিত্র যে অল্পের মধ্যে বলার চেষ্টা করাও বৃথা। তাঁর সম্বন্ধে যে কোন বক্তব্যই একপেশে হয়ে যেতে বাধ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধ বা সম্পূরক কোন উক্তি না করলে বক্তব্য নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ তাঁর ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি চিত্রশিল্পের উপায় উপকরণকে অজড় অনড় মনে করেন না। যে সার্বভৌম ডিজাইনের পিছনে তিনি ঘুরেছেন, তার জন্যে তিনি কাঠখোদাইও করেছেন, নানা দেশের সমস্ত জানা রীতি নকল করেছেন, অর্থাৎ আঁকার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন, তাদের চিত্রপ্রতিমা ভেঙেছেন, পুনরায় গড়েছেন, এবং সেই সুযোগে সেই দেশের, জাতের মেজাজের ও চরিত্রের পুরো জ্ঞান করে নিয়েছেন। ফলে শুদ্ধমাত্র চিত্রপ্রতিমা ও রীতির মধ্যে দিয়ে যে কোন দেশের, যে কোন জাতির দেশ কাল সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত জ্ঞান যামিনী রায় ব্যতীত অপর কারো আছে কিনা সন্দেহ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ

জ্ঞান এসেছে তাঁর যে কোন জাতির ছবি দেখে। পুঁথি, ইতিহাস পড়ে নয়। ফলে তিনি যে কোন জাতির পরিচয় তার ছবি দেখে যত ভাল বলে দিতে পারেন, ইতিহাসও তত ভাল পারে না। কারণ, তাঁর কথায় বলতে গেলে ইতিহাস মিথ্যা লিখতে পারে, কিন্তু ছবি, রঙ, পোশাক, আসবাব, বাসন, কোসন, নিত্য ব্যবহারের জিনিস কখনও মিথ্যা বলবে না।

সমান উজ্জ্বল রঙ ও আলো, সজীব স্পর্শগ্রাহ্য কন্টুর রেখার সাহায্যে তিনি ছবি থেকে উত্তেজক বিষয় ত বাদ দিলেনই, এমনকি বিষয় সম্বন্ধেই উদাসীন হলেন। তাঁর কাছে কোন ভাব বা বিষয় অর্থাৎ আখ্যানের অস্তিত্ব নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর মতে ছবির ফ্রেমের মধ্যেই থাকবে সম্পূর্ণ বক্তব্য, ব্যঞ্জনা, অভিপ্রায়। মানে বেরোবার আগেই দর্শকের চোখে তা পূর্ণভাবে প্রতিভাত হবে।

ইদানীং যদি কখনও পোর্ট্রেট আঁকেন, যেমন গান্ধীজী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পোর্ট্রেট, তখন চিরাচরিত ইওরোপীয় প্রথায় পোর্ট্রেট হয় না, অথচ তাতে ইওরোপীয় ভঙ্গী সুস্পষ্ট। মুখের রেখা হয় অবিশিষ্ট, যেন মানুষের মুখের মত দেখালেই হল; তাতে মডলের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক নেই, তাতে শিল্পীর মনের ছাপই যেন বেশী। প্রথম দেখলে খুব বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত মনে হলেও মনে রাখা উচিত যে যামিনী রায় প্রাণহীন জিনিসের ছবিতে আরও প্রাণ দেন। তাঁর পোর্ট্রেটে আসে একই ধরনের তীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট, বড় বড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলঙ্কারের রীতিতে আঁকা সমান একাগ্রভাব। তাতে মনস্তত্ত্বের চিহ্ন বিশেষ থাকে না, মডলের ভিতরের জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলার দিকে আগ্রহ নেই। অর্থাৎ তিনি অলঙ্কারের ছন্দের কাছে, ছবির ডিজাইনের কাছে মডলের মুখের গড়ন গৌণ করে দেন।

শুধু যে এ শিল্পী ও শিল্পী, ইওরোপীয় মহারথীদের এক একজনকে ধরেন এবং তাঁকে এঁকে বিশ্লেষণ করে নতুন করে রূপ দেন তা নয়, ঈজিপশন, অসিরিয়ান, বাইজানটাইন, চীনে, জাপানী, রুশ, মেক্সিকান, গ্রীক ভাজ, তিব্বতী, ভারতের যতকিছু লৌকিক রীতি, একে একে ধরে তার ফর্ম, রঙ, ডিজাইন বিজ্ঞানী অস্ত্র চিকিৎসকের মত কেটে কুটে বিশ্লেষণ করে অধিকার করে তার থেকে নতুন রূপ বার করে ছাড়েন। যামিনী রায় অবিরাম, ক্লান্তিহীন উৎসাহে নক্সার পর নক্সা এঁকে চলেছেন। তাঁর নক্সা সংখ্যায় বহু হাজারে দাঁড়িয়েছে এবং নক্সাবিদ বা ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান হিসাবে তিনি ভারতে অদ্বিতীয়। এই কাজে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা যে কোন স্কেচ দেখলেই বোঝা যায়, যেমন প্রাণবন্ত তেমনি গতিমুখর, যেন কাগজ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, যেখানে যেমনটি প্রয়োজন ফিগরগুলি এমন যথাযথভাবে পড়ে যে অবাক হতে হয়। অভ্রান্ত হাতে তিনি তাঁর চিত্রবস্তুর ফর্ম আর কাগজের সমান, ফ্ল্যাট জমির মধ্যে আনুপাতিক মাপ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেন। সেইজন্য তাঁর সামান্যতম স্কেচও প্রায় পুরো কম্পোজিশন হয়। কাগজের জমিকে প্রায়ই আড়াআড়িভাবে কেটে তাঁর নক্সা একধরনের অ্যারাবেস্কে রূপ পায়। শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে কোন বস্তু বা প্রকৃতির একটু টুকরোকে নিয়ে

অলঙ্কারবহুল রেখা ও জমির মধ্যে ছন্দের অবতারণা করে; প্রাণবন্ততা ত নষ্ট হয়ই না বরং বেড়ে যায়। খুঁটিনাটির জঞ্জাল বাদ দিয়ে যামিনী রায় কোন বিষয়ের গতিবেগের অন্তঃস্থল বিন্দুটি একেবারে ধরেন, খুব কৌশলে শরীরের বাঁকাচোরা, সুডৌল গড়নটি দেখান, এবং নক্সার ঐক্যে ও যথাযথ নির্ম্মাণের মধ্যে দিয়ে ফর্মটি ফুটিয়ে তোলেন। কড়া, বাঁকা, কন্টুর মাথা থেকে নীচে পর্যন্ত চলে গিয়ে শক্তি ও প্রাণের দ্যোতনা আনে। যামিনী রায়ের নক্সা এত গতিবান, সরল, আর আঁটসাট, তাদের প্ল্যাস্টিক

গুণ এত মৌলিক, যে ভারতীয় চিত্রে তার সমকক্ষ দুর্লভ। স্পষ্ট ঋজুতা ও প্রাণবন্ততায় তা একদিকে ইওরোপীয় অন্যদিকে জাপানী রেখাকে মনে করিয়ে দেয়। মোটেই ওস্তাদি দেখানর জন্যে আঁকা হয় না। সর্বদা প্রকৃত নির্মাণের উদ্দেশ্যে তৈরি, কারণ প্রতিটিতে প্ল্যাস্টিক ফর্মের প্রকাশ যেমন নিশ্চিন্ত তেমন সম্পূর্ণ। ক্যালিগ্রাফির প্রসাদগুণে এর ক্ষান্তি বা শেষ নয়।

কিন্তু তাঁর কালি কলম পেনসিলের নক্সা যত সুন্দর যত সম্পূর্ণই হোক না কেন, দেখলেই বোঝা যায় যে তা কোরা নক্সা মাত্র, অর্থাৎ পুরো রঙীন চিত্রের সামগ্রী। অর্থাৎ তাঁর নক্সা দেখলেই রঙের কথা মনে আসে, মনে হয় রঙ হলে সম্পূর্ণ হবে। আগে বলেছি যামিনী রায়ের চিত্রে আছে স্তব্ধ, প্রশান্ত, শীতল ভাব। কিন্তু এ ভাব যে সব চিত্রে সফলভাবে এসেছে তা নয়, কারণ তাঁর অনেক ছবিই আছে যা বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত, তীব্র গতিচঞ্চল, বিশেষ করে তাঁর নক্সাগুলি।

ডিজাইনের সমগ্রতার জন্য তিনি ড্রয়িংএ এমন অভিনব অনুতাপ ও মাপ এনেছেন, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক মাপকে নিজের দৃষ্টির তাগিদ মত এমন অদল বদল করে, বাড়িয়ে কমিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে

দিয়েছেন যা যামিনী রায়ের চিত্রের প্রধান চিত্রগত লক্ষণ ; এর উৎস বোধহয় ইওরোপীয় মড্‌লিং ও ফোরশর্টনিং এ, যার ফলে তাঁর ছবি ফ্ল্যাট হয়েও হয় না। এই চরিত্র তাঁর মূলত দরকার বাস্তব বা রিয়ালিটিকে অতিক্রম করার উপায় হিসাবে যাতে করে তাঁর পক্ষে জাগতিক বাস্তবকে অতিক্রম করে এক স্বরচিত জগতের বাস্তবে আশ্বাস ও আশ্রয় খেঁাজা সহজ ও সম্ভব হয়। আগেই বলেছি, যামিনী রায় প্রথম আধুনিক ভারতীয় শিল্পী যিনি একান্ত ভারতীয় চিত্রভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, যে ভাষা নিমেষে ভারতীয়, তথা বাঙালীর বলে ধরতে ভুল হয়না। বোধহয় কিছুটা সেইজন্যই শুদ্ধ চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি আধুনিক জীবনের বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে অস্বীকার করেন। স্পষ্টই ঘোষণা করেন, এই ছেঁড়াখোঁড়া, কিম্ভূতকিমাকার, রূপ ও ডিজাইন বর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি মানেন না। তিনি তাঁর নীতি অবিচলিতভাবে ধরে থাকার সাহসও রাখেন। যে বাঙলা দেশ চলে গেছে, যে জীবন আর
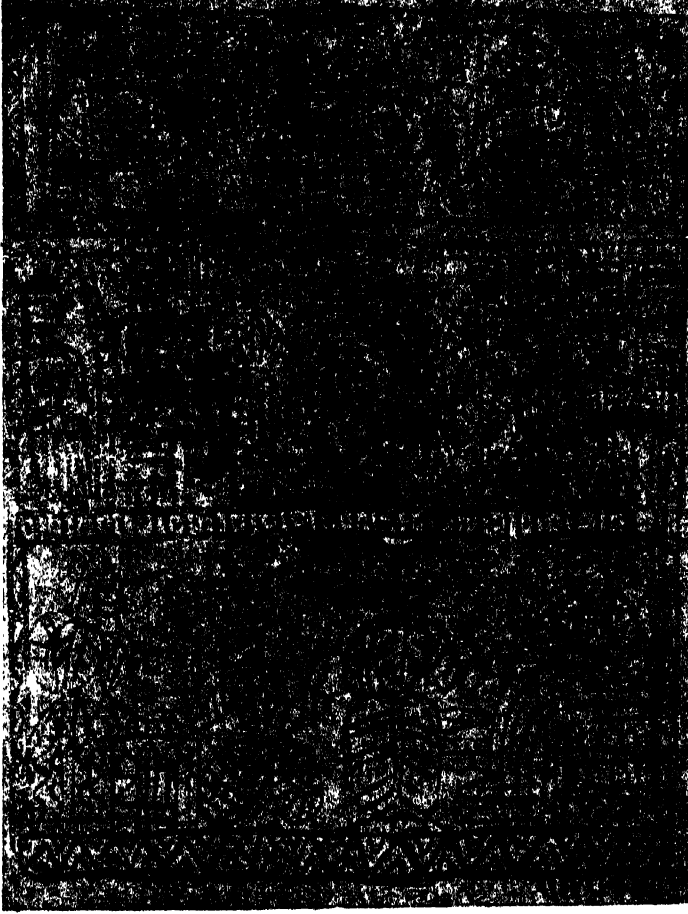
ফিরবে না, সে জীবনকে সত্য বলে মানতে তাঁর দ্বিধা নেই। তাঁর চিত্রে স্থান ও পাত্রের প্রকাশ নিশ্চিন্ত ও সুস্পষ্ট, কিন্তু কালের প্রকাশ কুণ্ঠিত। যামিনী রায়ের চিত্রে তাই বিরাট কলকাতা নগর

নেই, নেই তার কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য বন্দর। নেই রাস্তায় ভীড়, ফ্যাক্টরী বা কলকব্জা। নেই কোন দুর্ঘটনা বা আজকের দিনের মানুষ। সে সব বিষয় যখনই এঁকেছেন, ভাষা ও রীতি হয়েছে স্পষ্টত বিদেশী। এমনকি বাগবাজারের যে গলিতে আজীবন কলকাতার লোক হয়ে কাটালেন সে গলিও এঁকেছেন অনেক সঙ্কোচে। কিন্তু তাতেও আনন্দ চাটুর্জ্যের গলির অপরিসর অপরিচ্ছন্নতা নেই, বরং আছে গম্ভীর, ম্লান সৌন্দর্য। মনে হয় গত কয়েক দশকে যত কিছু যুগান্তকারী, শোকাবহ, ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেছে তা তাঁকে বদলায়নি, স্পর্শ করে নি। এই তিরিশ বছর ধরে পৃথিবীময় নানা ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। চীনের গৃহবিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা অভিযান, ফ্যাশিজমের উত্থান, স্পেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, চীনের উত্থান, দিকে দিকে স্বাধীনতাকামী মানবের সংগ্রাম, পৃথিবীর নতুন নতুন দেশ জুড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এসব তাঁর নীতি ও প্রত্যয় বদলায়নি। বরং উলটে এসব ঘটনার প্রলয়াবর্ত তাঁর আরাধ্য নীতিতে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, আরও তিনি নিজের জগতে নিজেকে আবিষ্ট করেছেন।

ফল হয়েছে এই যে দেশবিদেশ থেকে অশান্ত, ছিন্নভিন্নহৃদয়, আসন্ন প্রলয়ে উৎকণ্ঠিত মানুষ এসেছে তাঁর দ্বারে শান্তি পেতে, আশ্বাস পেতে, মন ও চোখ জুড়োতে। তাঁর ছবিতে পায় তারা গভীর আরাম, আনন্দ, শ্রান্তি অপনোদনের খোরাক ; বিক্ষুব্ধ, বিচলিত চেতনার উপযোগী শান্তি ও আনন্দের প্রলেপ। যে ভারত সম্বন্ধে তারা পড়েছে ও কল্পনা করেছে অথচ যার হদিশ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাঁর ছবিতে তারা পায় তার পরিচয় ও ইতিহাস। যাঁরা স্বদেশে আমূল বিপ্লব সাধন করে নতুন সরল, সবল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছল জীবন গড়ার সুযোগ করে নিয়েছেন বা পেয়েছেন তাঁরা আসেন সার্বভৌম, অখণ্ড, সর্বময় রূপ ও ডিজাইনের খোঁজে এবং তা পেয়ে পুরস্কৃতও হন। কিন্তু স্বদেশে যেখানে বাঙালী ও ভারতবাসীর জীবন আজ নোংরা, ছিন্নভিন্ন, কিম্ভূতকিমাকার, যেখানে সবই অসুন্দর, দরিদ্র, অস্বচ্ছন্দ, অসচ্ছল, সেখানে তাঁর চিত্রার্পিত সৌন্দর্য দুর্নিবারভাবে নাড়া দেয় না। পাশ্চাত্য দেশ আজ যেমন শান্তির জন্য কাঙাল, ভারত আজ তেমনি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আশায় ব্যাকুল। আজকের দিনে তার ছেঁড়াখোঁড়া অপরিসর, নোংরা, দরিদ্র জীবন নিয়ে ভারতবাসীর মন সুন্দর, সরল, সবল পরিচ্ছন্ন জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে যে সাবিক ডিজাইন আসে তার জন্য প্রস্তুত নয়।

ফলে আজ যামিনী রায়কে আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে অপারগ। যখন আমাদের দেশে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, সরল বলিষ্ঠতা, জীবনে সর্বাশ্রয়ী ছন্দ পুনরায় আসবে, তখনই আমরা যামিনী রায়ের ছবির কাছে আবার ফিরে যাব। ফিরে যাব তাঁর ছবির সুপ্রতিষ্ঠিত গুণের অন্বেষণে। সে গুণগুলি হচ্ছে বলিষ্ঠ, জোরালো, তীব্র, গভীর রঙ ; সাহসী, প্রাণবন্ত, অখণ্ড ফর্মের উচ্চারণ ; অলঙ্কারময় ছন্দের অসামান্য দখল ; ডিজাইনের সম্পূর্ণতা, যে সার্বভৌম ডিজাইনের কল্যাণে পুলিশের পোশাক অথবা পোস্ট অফিসের বাড়ীর গড়ন দেখলে একটি রাষ্ট্রের ও জগতের সভ্য, শিক্ষিত, ভদ্র স্বরূপ এক নিমেষে বোঝা যাবে।

ভারতের প্রধান প্রধান সাধারণ চিত্রশালা বা চিত্রসংগ্রহ

কলকাতা :	ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম
	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল
	কলেজ অভ আর্ট্‌স অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্‌
	আশুতোষ মিউজিয়াম অভ ইণ্ডিয়ান আর্ট
	ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অভ ওরিয়েণ্টাল আর্ট
	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
	এশিয়াটিক সোসাইটি
	অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্ট
	রবীন্দ্রভারতী
শান্তিনিকেতন :	কলাভবন
পাটনা :	কলেজ অভ আর্ট
বানারস :	ভারত কলা পরিষদ
লক্ষ্ণৌ :	স্কুল অভ আর্ট
	বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম
ধার (মধ্য ভারত) :	লক্ষ্মী কলাভবন
দিল্লী :	সেণ্ট্রাল এশিয়ান মিউজিয়াম
	জাতীয় মিউজিয়াম
	জয়পুর ভবন
	দিল্লী শিল্পীচক্র
	সারদা উকীল স্কুল অভ আর্ট
পাতিয়ালা :	পাতিয়ালা প্রাসাদ
উদয়পুর :	বিদ্যাভবন সোসাইটি
জয়পুর :	জয়পুর রাজপ্রাসাদ
	রাজস্থান কলা সংস্থান
আজমীর :	মেয়ো কলেজ
গোয়ালিয়র :	গোয়ালিয়র মিউজিয়াম
আমেদাবাদ :	আমেদাবাদ মিউজিয়াম
	কস্তুরভাই লালভাই সংগ্রহ

বরোদা :	বরোদা মিউজিয়াম চিত্রশালা
বম্বাই :	প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌ মিউজিয়াম
	স্যর জে-জে স্কুল অভ আর্ট
	বম্বে আর্ট সোসাইটি
হায়দ্রাবাদ :	হায়দ্রাবাদ মিউজিয়াম
	স্যর সালার জঙ্গ মিউজিয়াম
মহীশূর :	জগনমোহন রাজপ্রাসাদ চিত্রশালা
ত্রিবান্দ্রম :	শ্রীচিত্রালয়ম
মাদ্রাজ :	স্কুল অভ আর্ট
	বেসান্ট থিওজফিক্যাল স্কুল, আডিয়ার
	এস-ভি রামস্বামী মুদালিয়ার সংগ্রহ
মসলিপট্টনম :	অন্ধ্র জাতীয় কলশালা
রাজামুণ্ড্রি :	রামরাও আর্ট গ্যালারি

পরিশিষ্ট খ

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

ক — সাধারণ

Arnold, T, W. — Arabic and Persian Manuscripts. *Journal of Indian Art.* Vol. 15. No. 120. London, 1914.

Ashton, L. ed. — *The Art of India and Pakistan.* London, 1950.

Bachhofer. — *Early Indian Sculpture.* 2 vols. Paris, 1929.

Banerjee, J. N. — *The Development of Hindu Iconography.* Calcutta, 1941.

Basham, A. L. — *The Wonder That Was India.* London, 1955.

Binyon, L. — *Painting in the Far East.* 2d ed, London. 1913.

Bose, N. K. — *Canons of Orissan Architecture.* Calcutta, 1932.

Brown, P. — *Indian Painting.* Calcutta, 1927.

The Forthcoming Exhibition at the Royal Academy. *Indian Art and Letters.* Vol. 21. No. 1. London, 1947.

Coomaraswamy, A. K. — *Selected Examples of Indian Art.* London, 1910.

Portfolio of Indian Art. Boston, 1923.

Early Indian Iconography. *Eastern Art.* Vol. 1 Philadelphia, 1928.

Indian Drawings I, 1910. Second Series, Chiefly Rajput. London, 1912.

	Notes on Indian Paintings. 1—4. *Artibus Asiae*. 1927 (1,4). Dresden. 1927.
Goetz, H.	Indian Miniatures in German Museums and Private Collections. *Eastern Art.* Vol. 2. Philadelphia, 1930.
Ghose, A.	A Comparative Study of Indian Painting. *Indian Historical Qurrterly.* Vol. 2, 1926.
Gray, B.	The Art of India and Pakistan, with Special Reference to the Exhibition of the Royal Academy. *Indian Art and Letters.* Vol. 21. No. 1. London, 1947.
	Painting. *The Art of India and Pakistan.* Londen, 1950.
Gupta, S. M.	*Catalogue of Paintings in the Central Meseum, Lahore.* Lahore, 1922.
Havell, E. B.	*Indian Sculpture avd Painting.* 1st Ed. 1908. 2nd Ed. 1928.
	A Handbook of Indian Art. London, 1927.
Hendley, T. H.	Illustrations and General Notes; Portraits by Indian Artists; Symbolism, Mythology.
	Journal of Indian Art. Vol. 15, No. 120. London, 1913.
	Festival of Empire and Imperial Exhibition.
	Journal of Indian Art. Vol. 15, London, 1913.
	War in Indian Art. *Journal of Indian Art and Industry.* Vol. 17. No. 130. London. April, 1915.
	Sport in Indian Art. *Ditto.* Vol. 17. No. 134, London, 1916.
Khandalavala, K.	*Indian Sculpture and Painting:* An Introductory Study. Bombay. 1938.
	Some Paintings from the Collection of the Late Burjar N. Treasuryvala. *Marg* I. No. 1 Bombay, 1946.
Kramrisch, S.	*Visnudharmottaram.* Pt. III. 2nd ed. Calcutta, 1928.
	Indian Sculpture. Calcutta, London, 1933.
	A Survey of Painting in the Deccan. London, 1937.
	The Art of India. London, 1954.
Kuhnel, E.	*Indian Miniatures in the Berlin Museum.* Berlin (undated)
Mehta, N. C.	*Studies in Indian Painting.* Bombay. 1926.
Mitra, R. L.	*The Antiquities of Orissa.* 2 vols. Calcutta, 1880.
Nivedita, S.	*Select Essays of Sister Nivedita.* 2nd ed. Madras, 1911.
Nivedita, S. and Coomarswamy, A. K.	*Myths of the Hindus and Buddhists* (with thirty-two illustrations in colour by Indian artists under the supervision of Abanindranath Tagore). London, 1913.
Rao, T. A. Gopinath	*Elements of Hindu Iconography.* 4 vols. Madras, 1914-15.
Rao, B.	*The Art and Architecture of India,* Baltimore, 1953.
Sarkar, B. K.	The Sukraniti (Translation). *The Sacred Books of the Hindus.* Vol. XIII. Allahabad, 1914.

Sastri, H. — *Indian Pictorial Art as Developed in Book Illustrations.* Baroda, 1936.

Smith, V. A. — *History of Fine Art in India and Ceylon* 2nd ed. Oxford, 1930.

State Fine Arts Publishing House, Moscow. — *Indian Art in Soviet Collections.* Moscow, 1955.

Stchoukine, I. — *La Peinture Indienne.* Paris, 1929.

Tagore, A. — *Sadanga or the Six Limbs of Indian Painting.* ISOA. Calcutta, 1928.

Victoria & Albert Meseum. — *Review of the Principal Accessions, 1913.* London. 1914.
100 Masterpieces, Mohammedan and Oriental. London. 1931.

খ — ইতিহাসের আগের যুগের গুহাচিত্র

Cockburn, J. — On the Recent Existence of Rhinoceros Indicus. *J. S. A. B.* Vol. 52. Pt. 2. No. 1. Calcutta, 1883.
Cave Drawings in the Kaimur Range, North-Western Provinces. *J. R. A. S.* London, 1899.

Fawcett, F. — Notes on the Rock Carvings in the Edakal Cave, Wynaad. *The Indian Antiquary.* Vol. 30. Bombay. October, 1901.

Ghosh, M. R. — *Rock-paintings and other Antiquties of Prehistoric and Later Times* (Memoir No. 24 of A. S. I.) Delhi, 1932.

Gordon, D. H. — Rock Engravings and Microliths in the Bangalore Area. *Journal of the Anthropological Institute.* Vol. I. New Series, 1945.

Silberrad, C. A. — Rock Drawings in the Banda District. *J. A. S. B.* New Series. Vol. 3. August, 1907.

গ — দুই নদীর দেশের সভ্যতা

Ancient India (Bulletin of the Archaeological Survey of India).
No. 1, January, 1946.
(a) Piggott, S.—The Chronology of Prehistoric North-West India.
(b) Ghosh. A. and Panigrahi, K. C.—Pottery of Ahichhatra (U.P.)
No. 2, July, 1946.
Wheeler, R. E. M.,
Ghosh, A., and

Krishna Deva,—Arikamedu : an Indo-Roman Trading Station on the East Coast of India.

No. 3, January, 1947.

(a) Krishnaswamy, V.D.—Stone Age in India.

(b) Wheeler, R.E.M.—Harappa 1946: The Defences and Cemetery R. 37

(c) Piggott, S.—A New Prehistoric Ceramic from Baluchistan.

No. 4, July 1947—January, 1948.

(a) Piggott, S.—Notes on Certain Pins and a Mace-head from Harappa.

(b) Ghosh, A.—Taxila (Sirkap), 1944-45.

(c) Agrawala, V.S.—The Terracottas of Ahichchhatra.

Childe, V. Gordon — *New Light on the Most Ancient East*. London, 1934. New ed. 1952.

Cousens, H. — *Antiquities of Sind.* Archaeological Survey of India, New Imperial Series, Vol. 46. Delhi, 1929.

Cummings, J, ed. — *Revealing India's Past.* London, 1939.

Cunningham, A. — Harappa. *Archaeological Survey Report.* (Vol. 5) for 1872-3. Calcutta, 1875.

Gordon, D. H. — Early Indian Painted Pottery. *J. I. S. O. A.* Vol. 13. 1945.

Hargreaves, H. — *Excavations in Baluchistan, 1935, Sampur Mound, Nastung, and Sohr Damb, Nal* (Memoir No. 35 of A.S.I.) Delhi, 1929.

Journal of Near Eastern Studies, Vol. V. 1956 (for Rana Ghundai)

Mackay, E. J. H. — *The Indus Civilization,* London, 1939.

Further Excavations at Mohenjo-Daro, 2 Vols. Delhi, 1938.

Chanhu-Daro Excavations. 1935-36. (American Oriental Series, Vol. 20) Connecticut, 1943.

Early Indus Civilizations. 2nd ed. London, 1945.

Majumdar, N. G. — *Explorations in Sind,* (Memoir No. 48 of A.S.I.) Delhi, 1934.

Marshall, J. H. — *A New Type of Pottery from Baluchistan* (Annual Report of A S.I. 1904-5) Delhi 1908.

Marshall, J. & Ors. — *Mohenjo-Daro and the Indus Civilization,* 3 Vols. London, 1931.

Mitra, P. — *Prehistoric India.* Calcutta, 1923. 2nd ed. 1927.

Piggott, S. — *Same Ancient Cities of India.* London, 1945.

Prehistoric Sculpture in the R. A. Exhibition. Burlington Magazine. Vol. 90. No. 539. London, 1948.

Prehistoric India. London, 1950.

Prasad, S. — *Animal Remains from Harappa.* (Memoir No. 51 of A.S.I.) Delhi, 1947-8.

Stein, M. A. — *The Ancient Buddhist Pictures and Embroideries discovered at Tunghuang.* Journal of India Art. Vol. 15. London, 1913.

Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan, 2 Vols. Oxford, 1907.

An Archæological Tour in Waziristan and North Baluchistan Memoir No. 37 of the A.S.I. Delhi, 1929.

Archaeological Rcconnaissances in North-West India and South-East Iran. London, 1937.

Vats, M. S. — *Excavations at Harappa.* 2 Vols. A.S.I. Delhi, 1940.

Wheeler, R. E. M. — *The Indus Civilization.* Supplement to the Cambridge History of India Cambidge, 1953.

ঘ — ইতিহাসের যুগের গুহাচিত্র

Auboyer, J. — Composition and Perspective at Ajanta. *Art and Letters India and Pakistan.* New Series. Vol. 22. No. 1. London, 1948.

Bloch, T. — Caves and Inscriptions in Ramgarh Hill; Sitabenga and Jogimara. *Annual Report of the Archæological Survey of India,* 1903-4.

Binyon, L. — A Chinese Painting of the Fourth Century. *Burlington Magazine.* London. January, 1904.

Burgess. J. — *Archæological Survey of India Reports.* Vols. 1—5.

Notes on the Bauddha Rock Temples of Ajanta, Their Paintings and Sculptures and on the Paintings of the Bagh Caves, Modern Bauddha Mythology, etc. London, 1879.

Codrington, K. De B. — *Ancient India.* London, 1926.

Dangerfield, Lt. — Reference to Ajanta. *Transactions of the Literary Society of Bombay.* Vol. 2. Bombay, 1818.

Dey, M. C. — *My Pilgrimages to Ajanta and Bagh.* London, 1925.

De, Silva-Vigier, A. — *The Life of the Buddha.* London, 1955.

Fergusson, J. — On the Rock-Cut Temples of India. *Journal* of the *Royal Asiatic Society.* Vol 15. Pt. 1. London, 1844.

Illustrations of the Rock-Cut Temples of India [Selected from the best examples of the different series of Caves at Ellora, Ajanta, Cuttack, Salsette, Karli and Mahavellipore. From sketches made 1838-39] with text to accompany the folio volume of plates. London, 1845.

The Rock-Cut Temples of India. Illustratee by 74 Photographs taken on thc Spot by Major Gill. London, 1864.

Fergusson, J. and Burgess, J. — *The Caves Temples of India.* 1880.

A History of Indian and Eastern Architecture. London, 1910.

Goetz., H. — The Neglected Aspects of Ajanta Art. *Marg.* Vol. 2 No. 4 Bombay, 1947.

Griffiths. J. — *Tho Paintings of the Buddhist Cave Temples of Ajanta, Khandesh, India.* 2 Vols. London, 1896.

Haldar, A. K. — The Paintings of the Bagh Caves. *Rupam.* No. 8. Calcutta. October. 1921.

The Bagh Caves. *Burlington Magazine.* London. October, 1923

Havell, E. B. — Fundamentals of Indian Art. *Rupam.* Nos. 27-8. July-October, 1926.

Heeley, W. L. — Extracts from Taranath's History of Buddhism in India. *The Indian Antiquary.* April, 1875.

Herringham. C. J. — The Bagh Caves. *Burlington Magazine.* Vol. 17. London. June, 1910.

The Frescoes cf Ajanta. *Burlington Magazine.* London. 1910.

Description of Ajanta Caves and Frescoes. *Journal of Indian Art.* Vol. 15. No. 120. London, 1913.

Ajanta Frescoes. Being Reproduction in Colour and Monochrome of Frescoes in some of the Caves at Ajanta after copies taken in the years 1909-10 and 1910-11 by Lady Herringham and Her Assistants. India Society. 2 Vols. Oxford, 1915.

Le Coq, A. Von — Chotscho. Facsimile—Wieder gaben. etc. Berlin. 1913.

Longhurst, A. H. — The Sigiriya Frescoes. *J. I. S. O. A.* Vol. 5, Calcutta. 1937.

Luard, C. E. — The Buddhist Caves of Central India (The Bagh Caves). *Indian Antiquary.* Vol. 39. August, 1910.

Havell, E. B. and Marshall, J., Garde, M. B. Vogel, J. Ph., Cousins, J. H. — *The Bagh Caves.* India Society, London, 1927.

Royal Society. — Transactions of the, 1829 (Ajanta Paintings).

Schiefner, A. — *Taranatha's Geschichte Des Buddhismus in Indien.* St. Petersburg. 1869.

Smith, V. A. — Caves of Ajanta and the Frescoes therein. *The Journal of Indian Art.* Vol. 15, No. 120. London, 1913.

U.N.E.S.C.O. World Art Series — India, *Paintings firom Ajanta Caves* (New York Graphic Societies). Paris, undated (1951).

Yazdani, G. & Ors. — *Ajanta,* 3 Vols. Oxford 1931-46. Vol. 4 published in 1955.

ঙ — মধ্যযুগ

French, J. C. — *The Art of the Pal Empire.* London, 1928.

Gangoly, O. C. — *Vasanta Vilaṣa: A New document os Indian Painting* O. Z N. F. 2, 1925.

Ghose, A. — The Development of Jaina Painting. *Artibus Asiæ.* Nos. 3, 4, 1927.

Old Bengal Painting. Rupam 27-28. 1926.

Goetz, H. — Notes on a collection of Historical Portraits from Golconda. *Indian Art and Letters.* X (III). 1936.

A Unique Early Deccani Miniature. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 1. No. 1. 1944.

Portraits from Bijapur. *British Museum Quarterly.* Vol. III, 1937.

Decline and Rebirth of Medieval Indian Art, (Western Indian Painting). *Marg.* Vol. 4. No 2, 1949.

Gray, B. — Deccani Paintings: the School of Bijapur. *Burlington Magazine.* Vol. 73. August, 1938.

Kramrisch, S. — A Painted Ceiling. *J. I. S. O. A.* 1937.

Dravida and Kerala in the Art of Travancore. Switzerland, 1952.

Kramrisch, S., Cousins, J. H., Vasudeva Podyval, R. — *The Art and Crafts of Travancore.* London—Travancore, 1948.

Mehta, N. C. — *Gujarati Painting in the Fifteenth Century.* India Society. London, 1931.

Sivaramamurti, C. — Painting in Lepakshi *J. I. S. O. A.* Vol. 5. 1937.

চ — মুঘল চিত্রকলা

Ardeshir, A. C. — The Ardeshir Collection of Mughal Miniatures. *Roopa Lekha* N. S. I. (2), 1940.

Arnold, T. W. — The Johnston Collection, India Office. *Rupam.* No. 6, 1921.

Notes on Oriental Manuscripts (Chester Beatty Collection). *Indian Art and Letters.* Vol. III. Pt. 1. 1929.

Arnold, T. W. and Binyon, L. — *Court Painters of the Grand Moguls.* Oxford, 1921.

Arnold, T. W. and Wilkinson, J. V. S. — *The Library of A. Chester Beatty*: A Catalogue of the Indian Miniatures. 3 Vols. 1936.

Arnold, T. W. and Grohmann — *The Islamic Book.* London, 1929.

Bell, Clive — Persian Miniatures. *Burlington Magazine.* Vol. 25. London. May, 1914.

Bilgrami, S. A. A. — *Landmarks of the Deccan.* Hyderabad, 1927.

Binyon, L. — Relation between Rajput and Moghul Paintings: A New Document. *Rupam.* No. 29, 1927.

Indian Art at Wembley. The Retrospective Exhibition. *Rupam.* No. 21, 1925.

Emperors and Princes of the House of Timur. British Museum, 1930.

Blochet, E. — *Musulman Painting.* London, 1929.

Breck, J. — Four Seventeenth Century Pintadoes. *Metropolitan Museum Studies,* 1929.

An Early Mughal Painting. *Metropolitan Museum Studies,* Vol. II. Pt. 2. 1930.

Brown, P. — *Indian Painting under the Mughals. A. D. 1550 to A. D. 1750.* Oxford, 1924.

Chaghatai, M. A. — The Illustrated Edition of the Razm Nama. *Bulletin of the Deccan College Research Institute.* Vol. 5. Poona, 1944.

Clarke, C. S. — *Twelve Paintings of the School of Humayun.* Victoria & Albert Museum. 1921.

Victoria & Albert Museum. Indian Drawings; Thirty Mogul Paintings of the School of Jahangir in the Wantage Bequest. Victoria & Albert Museum. 1922.

Codrington, K. de B. — Portraits of Akbar, the Great Mughal (1542-1605). *Burlington Magazine.* Vol. 82. London, 1943.

Cohn-Wiener, E. — Miniatures of a Razm Namah from Akbar's Time. *Indian Art & Letters.* Vo. 12. No. 2. London, 1938.

Coomaraswmy, A. K. — Mughal Painting. *Museum of Fine Art Bulletin.* No. 93. Boston. February, 1916.

Notes on Indian Paintings. A Contribution to Mughal Iconography. *Artibus Asiæ.* No. 182. 1927.

Notes on Mughal Painting. *Artibus Asiæ* No. 3, 1927.

Notes on Indian Painting, Bishnudas and others. *Artibus Asiæ.* No. 4. 1927.

Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Art, Boston. *Mughal Paintings.* Boston, 1930.

De Lorey, E. — Behzad Le Gulistan Rothschild. *Ars Islamica.* Vol. IV. Ann Arbor, 1937.

Dimand, M. S. — Several Illustrations from the Dastan-i-Amir Hamza in American Collections. *Artibus Asiæ*, Vol. II, No. 1-2. Ascona. Switzerland, 1948.

Gray, B. — An Early Mughal Illustrated Page. *British Museum Quarterly* No. 8, 1934.

A New Mughal Painting on Stuff. *Ars Islamica.* Vol. 4, 1937.

Treasures of Indian Miniatures. Oxford, 1955.

Gray, B. and Wilkinson, J. V. S. — Mughal Miniatures from the Period of Akbar. *Ostasiatische Zeitschrift*, N. F. XI. 1935.

Indian Paintings in a Persian Museum. *Burlington Magazine.* 1935.

Haq, M. M. — Discovery of a Portion of the Original Manuscript of Tarikh-i-Alfi, Written for the Emperor Akbar. *Bulletin of the School of Oriental Studies.* 1934.

Hendley, T. H. — The Razm Namah Manuscript. *Memorials of the Jeypore Exhibition*, Vol. 4, 1913.

Khandalavala, K. — An Akbar Period Mughal Miniature Illustration of the Gita Govinda. *Roopalekha*, N. S. Vol. 2 No. 3, 1941.

Macaulay, D. — Mughal Art. *Burlington Magazine*, Vol. 46, 1926.

Payne, C. H. — *Akbar and the Jesuits.* From the Account of Du Jarric. London, 1926.

Schroeder, E. — *Persian Miniatures in the Fogg Museum of Art.* Cambridge Mass. 1942.

Smith, E. W. — *The Architecture of Fatehpur Sikri. Moghul Colour Decoration of Agra.* 2 Vols. Allahabad, 1901.

Wellesz, E. — An Akbar Namah Manuscript. *Burlington Magazine.* Vol. 80 London, June, 1942.

Mughal Paintings at Burlington House. *Burlington Magazine.* February, 1948.

Akbar's Religious Thought As Reflected in Mogul Painting. London, 1952.

Wilkinson, J. V. S. — *The Lights of Canopus : Anvar-i-Suhaili.* London, 1929.

A Note on an Illustrated Manuscript of the Jog-Bashisht. *Bulletin of the School of Oriental Studies.* Vol. 12, 1948.

Mughal Painting. London, 1948.

Yazdani, G. — Two Miniatures from Bijapur. *Islamic Culture.* April, 1935.

ছ — রাজপুত চিত্রকলা

Bake, A. — Kirtan in Bengal. *Indian Art and Letters* XXI (I), 1947.

Basu, R. — The Ajit Ghosh Collection of Old Indian Paintings. *The Modern Review*. Calcutta. January, 1926.

Brown, P. — *Catalogue of Loan Exhibition from the Ghose Collection of Representative Specimens of Rare Old Indian Paintings.* Held at the Government School of Arts. Calcutta, 1925.

Brown, W. N. — Early Svetambara Jaina Miniatures. *Indian Art and Letters.* Vol III. No. 1, 1929.

Early Vaishnava Miniature Paintings from Western India. *Eastern Art*. Vol. 2. Philadelphia. 1930.

A *Description and Illustrated Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina Kalapasutra as Executed in the Early Western India Style.* Washington, 1934. (Freer Gallery of Art, Oriental Studies. No. 2)

Stylistic Varieties of Early Western Indian Miniature Painting above 1400 A. D. *J.S.I.O.A.* 1937.

A Jain Manuscript from Gujarata. Illustrated in Early Western India and Persian Styles. *Ars Islamica*, IV. Ann Arbor, 1937.

Manuscript Illustrations of the Uttaradhyana Sutra. New Haven. 1941 (American Oriental Series, Vol, XXI).

Chaghatai, M. A. — *A Few Hindu Miniature Painters of the 18th and 19th Century.* Lahore, 1934.

Conze, E. — Remarks on a Pala Manuscript in the Bodleian Library. *Oriental Art*. Vol. 1. No. 1. London. Summer. 1948.

Coomarswamy, A. K. — *Rajput Painting*. 2 Vols. Oxford, 1916.

Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Art. *Jaina Paintings*. Boston, 1924.

Ditto. *Rajput Painting*. Boston, 1926.

Notes on Jaina Art. *Journal of Indian Art.* Vol. 16. No. 127. London, 1914.

The Eight Nayikas. *Journal of Indian Art.* Vol. 16. No. 128. London, 1914.

Hindi Ragmala Texts. *Journal of the American Oriental Society.* 1929.

Two Leaves from a Seventeenth Century Manuscript of the the Rasikapriya. *Metropolitan Museum Studies.* Vol. 3. Pt. 1. 1930.

An Early Rajput Painting. Bulletin of the Boston Museum of Fine Art. Vol. 30. No. 177. Boston, 1932.

The Conqueror's Life in Jaina Painting. *J.I.S,O.A.* Vol. 3. No. 2. 1935.

Dickenson, E. — The Way of Pleasure. The Kishangarh Paintings, *Marg.* Vol. 3. No. 4, 1949.

Gangoly, O. C. — *Masterpieces of Rajput Painting.* Calcutta, 1927.

Two Early Rajput Miniatures (in Bharat Kala Parishad, Benaras). *Rupam.* No, 40, 1929.

Ragas and Raginis. 2 Vols. Calcutta. 1934-35. 2nd ed, Calcutta, 1949.

Goetz, H. — Notes on some Schools of Rajput Painting. *J.I.S.O.A.* Vol. 5, 1937.

Bundela Art. *J.I.S.O.*A. Vol. 6, 1938.

The Kachhwaha School of Rajput Painting. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 4. Parts I-II. 1949.

New Discoveries of Rajput Painting. *Indian Art and Letters.* N.S- 12 (I). 1947 and 32 (II) 1948.

The Art and Architecture of Bikaner State. Oxford, 1951.

The Nagaur School of Rajput Painting, *Artibus Asiæ.* Vol. 12. Nos. 1-2, 1949.

The Marwar School of Rajput Painting. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 5. Pt. I-II. 1949.

Rajput Sculpture and Painting under Raja Umed Singh of Chamba. *Marg.* Vol. 7. No. 4. Bombay, 1954,

Gray, B, — Western Indian Painting in the Sixteenth Century: the Origins of the Rajput School. *Burlington Magazine.* February, 1948.

Rajput Painting. London, 1948.

Kbandalavala, K. — Leaves from Rajasthan. *Marg.* Vol. 4. No. 3. 1949.

Mazmudar, M. L. — Antiquities of Gujarat: Two Illustrated Manuscripts of Ratirahasya of the Gujarat School of Painting. *Journal of the University of Bombay.* Vol. 5. Pt. 6. May, 1937.

A 15th Century Gitagovinda Manuscript with Gujarati Painting. *Journal of the University of Bombay.* Vol. 6 Pt. 6. May, 1938.

Earliest Devimahatmya Miniatures with special reference to Sakti-worship in Gujarat, *J. I. S. O. A.* Vol. 6, 1938.

A Newly Discovered Illustrated Gitagovinda Manuscript from Gujarat. Journal of the University of Bombay. September, 1941.

The Gujarati School of Painting and some Newly Discovered Vaisnava Miniatures. *J. I, S. O. A.* Vol. 10, 1942.

A Note on Western Indian or Gujrati Miniatures in the Baroda Art Gallery. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. II. No. 2, 1945.

Some Interesting Jaina Miniatures in the Baroda Art Gallery *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 4. Pt. 1-2, 1946-47.

Mehta, N. C. — Indian Painting in the Fifteenth Century. An Early Illustrated (Gujarati) Manuscript. *Rupam.* No. 22-3. 1925.

Gujarati Painting in the Fifteenth Century. A Further Essay on Vasanta Vilasa. London, 1931.

Ragas and Raginis in a Laudian Manuscript. *Bodleian Quarterly Record.* Vol 7. No. 76. Oxford. 1932.

A Note on Ragmala. *J, I. S, O. A.* Vol. 3 (2). 1935.

A New Document of Gujarati Painting. *J. I. S. O. A.* Vol. 13, 1945.

Mizra, K. — An Illustrated Manuscript of Madhu Malati. *Rupam.* No. 33-4, 1928.

Motichandra — *Jain Miniature Paintings from Western India.* Ahmedabad. 1948.

Sarabhai, M. N. — *Jaina Chitra Kalpadruma* (Masterpieces of Kalpasutra Painting). Ahmedabad. 1936.

Sastri, H. — *Ancient Vijnaptipatras.* Baroda, 1942.

Stooke, H. J. — An XI Century Palm Leaf Manuscript (The Bodleian Library Astasahasrika-prajnaparamita). *Oriental Art.* Vol. 1, No. 1 London. Summer, 1948.

Villiers-Stuart, C. M. — The Last of the Rajput Courtpainters. *Burlington Magazine.* Vol. 48. January, 1926.

ঙ — পাহাড়ী চিত্রকলা

Archer, W. G. — *Garhwal Painting.* London, 1954.

Kangra Painting. London, 1952.

Some Nurpur Paintings. *Marg.* Vol. 8. No. 3, 1955.

Chandradhar, Giri Pandit. — A Signed Molaram. *Rupam.* No. 2, 1920.

French, J. C. — *Himalayan Art.* London, 1931.

Sansar Chand of Kangra. *Indian Art and Letters.* N. S. Vol. 21. No. 2, 1947,

Kangra Frescoes. *Indian Art and Letters.* N. S. Vol. 22. Eo. 2, 1948.

Ganguli, K. K. Chamba Rumal. *J. I. S. O. A.* Vol. 11, 1943.

Ghose, A. The Basohli School of Rajput Painting. *Rupam.* No. 37, 1929.

Goetz, H. Raja Isvari Sen of Mandi and the History of Kangra Painting. *Bulletin of the Baroda State Meseum.* Vol. 2. No. 1, 1946.

The Coming of Muslim Cultural Influence in the Punjab Himalayas. *India Antiqua.* Leyden, 1948.

Hutchinson, J. and Vogel, J. P. *History of the Punjab Hill States.* 2 Vols. Lahore, 1933.

Mukundi Lal. Some Notes on Mola Ram. *Rupam.* No. 8. 1921.

The Pahari (Himalayan) School of Indian Painting and Mola Ram's Place in it.

Roopa-Lekha. No. 1, 1929. No. 3, 1929.

Randhava, M. S. *Kangra Valley Painting.* Delhi, 1955.

Guler, The Birthplace of Kangra Art.

Marg. Vol. 6. No. 4. Bombay, 1953.

Sastri, H. The Hamir-Hath or the Obstinacy of Hamir.

Journal of Indian Art. Vol. 17, 1916.

Traeasuryvala, B. N. A New Variety of Pahari Painting. *J. I. S. O. A.* Vol. II. 1943.

খ — লোকচিত্র

Archer, W. G. *The Vertical Man.* A Study in Primitive Sculpture. London. 1947.

Bhattacharya, B. Twentytwo Buddhist Miniatures from Bengal. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 1. Part I, 1943.

Birdwood, G. C. M. *The Industrial Arts of India.* 2 Vols. London, 1880.

Chandra, R. P. *The Beginning of Art in Eastern India.* A. S. I. Memoir No. 30, 1927.

Chatterjee, T. M. *Alpona.* Calcutta, 1940.

Codrington, K. De B. Animals in Indian Art. *Geographical Magazine.* London, 1948.

Coomaraswamy A. K. *The Arts and Crafts of India and Ceylon.* London, 1913.

Visva-Karma. London, 1914.

Das, C. R. Tie-and-Dye Work, *J. I. A.* Vol. 2. 1888.

Dey, M. C. Drawings and Paintings of Kalighat. *Advance* Calcutta, 1332

Dutt, G. S. The Indigenous Painters of Bengal. *J. I. S. O. A.* Vol. 1. No. 1, 1933.

Painted Saras of Rural Bengal. *J. I. S. O. A.* Vol. 2. 1932.

Bengali Terracottas, *J. I. S. O, A.* Vol. 6, 1936.

Elwin, V. *The Tribal Art of Middle India.* Bombay, 1951.

French, J. C. — The Land of the Wrestlers (A Chapter in the Art of Bengal) *Indian Art & Letters.* New Series. Vol. 1, No. 1, 1927.

Ghose, A. — Old Bengal Painting. *Rupam.* Nos. 27-8. July—October 1926.

The Art of the Bengal "Pat" Drawings. *The Hindoosthan.* Vol. I. No. 3, July—September. 1944.

Ghosh, D. P. — Orissan Paintings, *J. I. S. O. A.* Vol. 9, 1941.

An Illustrated Ramayana Manuscript of Tulsidas and Pats from Bengal. *J. I. S. O. A.* Vol. 13, 1945.

Hadaway, W. S. — *Cotton Painting and Printing in the Madras Presidency.* Madras, 1917.

Hendley, T. H. — Indian Pictures: Indian Art Styles, Dressed Dolls and Models, etc. *Journal of Indian Art.* Vol. 15, No. 121. London, 1913.

Irwin, J. — The Folk-art of Bengal. *Studio.* Vol. 132, No. 644, 1946.

Shawls. London. 1955.

Kramrisch, S. — Kantha. *J. I. S. O. A.* Vol, 7, 1939

Kanthas of Bengal. *Marg.* Vol. 5, No. 2, 1949.

Von Leyden, R. and N. — Ganjifa. The Playing Cards of India. *Marg.* Vol. 3, No. 4. 1949,

Mookherjee, A. — *The Folk-art of Bengal.* Calcutta, 1939.

Mukharji, T. N. — The Art Industries of Bengal. *J. I. A.* January, 1886.

Art Manufactures of India. Calcutta, 1888.

Smith, A. D. H. — Indian Embroidery. *Journal of the Embroiderers' Guild.* Vol. 3. No. 3, London, 1935.

The Dyed and Printed Cottons of India. *Indian Art and Letters.* New Series Vol. 14, No. 2, 1940.

Steel, F. A. (Mrs.) — *Phulkari Work.* J. I. A. Vol. III. 1888.

Stooke, H. J. — Kalighat Paintings in Oxford. *Indian Art and Letters.* Vol. XX. 1946.

Fergusson, J. — *Tree and Serpent Worship.* 2nd ed, London, 1880.

এ — দেশজ রীতি

Archer, W. G. — *Bazar Paintings of Calcutta.* London, 1952.

Maithil Painting. *Marg.* Vol. 3, No, 3, 1949.

Baden-Powell, B. H. — *Handbook of the Manufactures and Arts of the Punjab.* 2 Vols Lahore, 1872.

Baker, G. P. — *Calico Painting and Paintings in the East Indias.* London, 1921

Beglar, J. D. — *Archæological Survey Reports.* Vol. VIII, 1873.

Coomarswamv, A. K. — A Bengali Painting. *Bu'letin of the Boston Museum of Fine Art.* Vol. 30, No. 177, 1932.

ট — বিদেশী রীতি

Crane. W. — India from the Landscape Artist's Point of View. *J. I. A.* Vol. 15, No. 177. London, 1913.

Fischer, E. H. — Animal Life of India from the Artist's Standpoint. *J. I. A.* Vol 15, No. 177. London, 1943.

Foster, W. — The Munro Zofanny. *Indian Art and Letters.* Vol. 21, No. 1, 1947.

Hendy, P. — John Zofanny, R. A, *Bulletin of the Museum of Fine Arts.* Boston. Vol. 30. No. 177, 1932.

Lyell, G. — The Two Daniells. *J. I. A.* Vol. 15. 117. London, 1913.

Reynolds, G. — British Artists in India. *The Art of India and Pakistan.* London, 1950.

ঠ — মিশ্র রীতি

Archer, M. (Mrs.) — *Patna Painting.* London, 1948.

Belnos, C. S. (Mrs.) — *Twenty four Plates: Illustration of Hindoo and European Manners in Bengal.* London, 1832.

Birdwood, G. C. M. add Foster, W. — *Relics of the Honorable East Indian Company.* London, 1909.

Ganguly, D. C. — *Victoria Memorial Hall.* Calcutta. 1953.

Manuk, P. C. — The Patna School of Painting. *Journal of the Bihar Research Society.* Vol. 29.

ড — বিংশ শতক

Appasamy, J. — Some Contemporary Painters in Delhi. *Marg.* Vol. 7, No. 4 Bombay, 1954.

Coomaraswamy, A. K. — Modern School of Indian Painting. *Journal of Indian Art.* Vol. 15, No. 120. London, 1913.

Fischer, K. — The Calcutta Group. *Marg.* Vol. 6, No. 4, Bombay, 1953.

Irwin, J. and Dey, B. — Jamini Roy. *J. S. I. O. A.* Vol. 12, 1944.

Marg, Vol. 4, No. 3. — Some Contemporary Artists (N. S. Bendre. S. Chavda, K. K. Hebbar, K. H. Ara, S. K. Bakre, S. Choudhury, M.F. Hussain)

Ramachandra Rao, P.R. — *Modern Indian Painting.* Madras, 1353.

Suhrawardy, S. — *Prefaces.* Calcutta, 1936.

Jamini Roy. *Marg.* Vol. 2. No. 1. 1947.

Thompson, F. — Amrita Sher Gil. *Marg.* Vol. 1. No. 1, 1946.

পরিশিষ্ট গ

ভারত ইতিহাসের প্রধান প্রধান সন তারিখ

ইতিহাসের আগের যুগ: খৃষ্টপূর্ব অনুমান ৩০০০—১৫৫০

২৪০০—১৬৫০ খৃষ্টপূর্ব	বালুচিস্তানে চাষবাস আরম্ভ: সিন্ধু উপত্যকা সংস্কৃতি; হরপ্পা সংস্কৃতি	শীলমোহর, ব্রোঞ্জ ও ধাতুর মূর্তি, মাটির পাত্র, পুতুল, নগর সভ্যতা

বৈদিক যুগ: খৃষ্টপূর্ব অনুমান ২০০০—৫০০

১৫০০ — ৯০০ খৃষ্টপূর্ব	ঋগ্বেদ মন্ত্র
৯০০	মহাভারতের যুদ্ধ
৯০০ — ৫০০	পরবর্ত্তী বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ

বৌদ্ধ যুগ: খৃষ্টপূর্ব ৫৬৩—৩২৫

৫৬৩ — ৪৮৩	গৌতম বুদ্ধ
৫৪২ — ৪৯০	মগধরাজ বিম্বিসার
৩৯০ — ৪৫৮	,, অজাতশত্রু
৩৬২ — ৩৩৪	,, মহাপদ্ম নন্দ
৩২৭ — ৩২৫	আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ

মৌর্য যুগ: খৃষ্টপূর্ব ৩২২—১৮৩

৩২২ — ২৯৮		অখণ্ড স্তম্ভ, যক্ষ মূর্তি, বৌদ্ধ স্তূপ
২৯৮ — ২৭৩	বিন্দুসার	
২৬৯ — ২৩২	অশোক	
১৮৩	মৌর্যবংশের লোপ	

বিদেশী আক্রমণের যুগ: খৃষ্টপূর্ব ১৯০—খৃষ্টাব্দ ৩৮৮

২৩০ খৃষ্টপূর্ব — ২২৫ খৃষ্টাব্দ	অন্ধ্রবংশ (দাক্ষিণাত্য) রাজধানী নাসিক	গুহামন্দির, অমরাবতী স্তূপ প্রথম অজন্তার চিত্র
১৯০ খৃষ্টপূর্ব	উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজ্য	ভারুত ও সাঁচি
১৮০ ,, — ১৪৭ খৃষ্টপূর্ব	পুষ্যমিত্র শুঙ্গ	

৯০ খৃষ্টপূর্ব	শকদের উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ	
৭১ ,,	সুঙ্গবংশের লোপ	
৫০ ,, — ২৫০ খৃষ্টাব্দ	দাক্ষিণাত্যে শতবাহন বংশ	
প্রথম শতক খৃষ্টাব্দ	উত্তরপশ্চিম ভারতে কুশাণদের আক্রমণ	রোমক-বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
৭৮ — ১০১ খৃষ্টাব্দ (১২০—১৬২?)	কণিষ্ক (রাজধানী পেশোয়ার)	(২য়—৫ম শতক) মথুরায় দেশজ
১৩০ — ৩৮৮	উজ্জয়িনীতে শক শাসন	ভাস্কর্য রীতি (২য়—৪র্থ শতক)
		বুদ্ধ মূর্তির আবির্ভাব

গুপ্তযুগ: ৩২০—৫৫০ খৃষ্টাব্দ

৩২০ (৩৩৫ ?)	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক প্রথার
৩৩৫ (?) — ৩৭৫	সমুদ্রগুপ্ত	আবিষ্কার। সংস্কৃত ভাষার
৩৭৫ — ৪১৫	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	চরম উৎকর্ষ। অজন্তা ইলোরা
৪১৫ — ৪৫৪	প্রথম কুমারগুপ্ত	বাঘ চিত্ররীতি। বৌদ্ধভাস্কর্য
৪৫৪ (অনুমান)	প্রথম হুণ আক্রমণ	
৪৫৫ — ৪৬৭	স্কন্দগুপ্ত	
৪৯৫	দ্বিতীয় হুণ আক্রমণ	
৪৪০	গুপ্তবংশের লোপ	

হর্ষবর্ধন: ৬০৬—৬৪৭ কান্যকুব্জ

মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যের রাজবংশ: ৩০০ খৃষ্টাব্দ—১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ

৩০০ — ৮৮৮	পহ্লব বংশ (মাদ্রাজ)	মহাবল্লীপুরম ভাস্কর্য; কাঞ্চী-পুরমের মন্দির
৫৫০ — ৭৫৭	বাতাপীর প্রথম চালুক্য বংশ (পশ্চিম ও মধ্য দাক্ষিণাত্য)	বাদামী গুহা
৬৩০ — ৯৭০	ভেঙ্গীর পূর্ব চালুক্য বংশ (,,)	
৭৫৭ — ৯৭৩	মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট বংশ (,,)	ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়, বেদান্ত প্রচার, শঙ্করাচার্য (৭৮৮—৮২০ ?) রামানুজ (১০১৭—১১৩৭ ?) ভক্তিতত্ত্ব

৮৫০ — ১২৬৭	তাঞ্জোরের চোলবংশ (মাদ্রাজ)	দক্ষিণ মাদ্রাজের মন্দির, দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ
৯৭৩ — ১১৮৯	কল্যাণীর দ্বিতীয় চালুক্য বংশ (পশ্চিম ও মধ্য দাক্ষিণাত্য)	
১১১০ — ১৩২৭	হয়শল বংশ (মধ্য ও দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য)	বেলুড়, হালেবিদ মন্দির
১১৯০ — ১২৯৪	দেবগিরির যাদব বংশ (উত্তর দাক্ষিণাত্য)	
১১৯৭ — ১৩২৩	ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় বংশ (পূর্ব দাক্ষিণাত্য)	
১২১৬ — ১৩২৭	মাদুরাইএর পাণ্ড্য বংশ (মাদ্রাজ)	
১৩৩৬ — ১৫৬৫	বিজয়নগর সাম্রাজ্য	ভাস্কর্য, লেপাক্ষী,
১৫০৯ — ১৫২৯	কৃষ্ণদেব রায়া	দাক্ষিণাত্যের মন্দির
১৫৬৫	তালিকোটের যুদ্ধ ও বিজয়নগর লুণ্ঠন	

মধ্যযুগে উত্তর ভারতের রাজবংশ : ৭১২—১১৯২ খৃষ্টাব্দ

৭১২	আরবদের সিন্ধুদেশ দখল	
৭৩০	কান্যকুব্জের যশোবর্মণ	
৭৬০ — ১১৪২	পালবংশ (বাঙলা বিহার)	মহাযান ও তান্ত্রিক ধর্ম, বৌদ্ধ ভাস্কর্য, তন্ত্রের প্রসার
৭৬৭ — ১১৯৭	গুজরাটের শোলাঙ্কী বংশ	আবুপর্বতের দিলওয়ারা মন্দির, সোমনাথ মন্দির
৮০০ — ১০১৯	কান্যকুব্জের প্রতিহার বংশ	
৯১৬ — ১২০৩	বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল বংশ	
৯৫০ — ১১৯৫	ত্রিপুরীর কলচুরি বংশ (মধ্যপ্রদেশ)	
৯৭৩ — ১১৯২	আজমীরের চাহমান বংশ	
৯৭৪ — ১২৩৮	গুজরাটের চালুক্য বংশ	
৯৭৪ — ১০৬০	ধারার পরমার বংশ (মালোয়া)	
১০৭৬ — ১৫৮৬	কলিঙ্গের গঙ্গ বংশ (উড়িষ্যা)	পুরী, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর
১০৯০ — ১১৯৩	কাশী কাণ্যকুব্জেয় গহরওয়াল বংশ	
১১১৮ — ১১৯৯	বাঙলার সেন বংশ	
১১৯২	তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ	

১২০০ — ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ

১২৯৬ — ১৫২৬	দিল্লী সুলতান বংশাবলী	মুসলমান স্থাপত্য, দিল্লী,
	বাঙলা	আজমীর, মাণ্ডু, বিজাপুর।
		পশ্চিম ভারতীয় চিত্ররীতি।
	দাক্ষিণাত্য	বিজাপুর চিত্ররীতি। বিজয়- নগর চিত্ররীতি
৮১৬ · ১৮০০	রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের রাজপুত বংশাবলী	রাজপুত দুর্গ ও প্রাসাদ, রাজপুত চিত্র

মুঘল যুগ : ১৫২৬ — ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ

১৫২৬ — ১৫৩০	বাবর	মুঘল স্থাপত্য, দিল্লী, আগ্রা,
১৫৩০ — ১৫৫৫	হুমায়ুন	ফতেপুর সিক্রি, এলাহাবাদ,
১৫৫৬ — ১৬০৫	আকবর	লাহোর। মুঘল চিত্ররীতি।
১৬০৫ — ১৬২৭	জাহাঙ্গীর	রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্ররীতি
১৬২৮ — ১৬৬৬	শাহজাহান	গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৩)
১৬৬৬ — ১৭০৭	ঔরঙ্গজেব	মাদুরার প্রাসাদ
১৬২৭ — ১৬৮০	শিবাজী	
১৭৯০ — ১৮৪৯	শিখ রাজা, পাঞ্জাব (রঞ্জিত সিংহ)	